বেদ-বেদান্ত

উত্তরখণ্ড

বেদ-বিচিন্তন

ওঁ

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্"

বেদ-বেদান্ত

উত্তরখণ্ড

বেদ-বিচিন্তন

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

VEDA-VEDANTA UTTAR KHANDA VEDA - BICHINTAN
by Dr Mahanambrata Brahmachari

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক :
মালবিকা দত্ত
সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ :
শ্রীপশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮৩বি, গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ অলংকরণ
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

উৎসর্গ

হে অনন্তানন্তময় প্রভু বন্ধুহরি !

এই বিশ্বনাটকে তুমি নাট্যকার, 'সর্বেষাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'। ঋষিবর্য শ্রীবিশ্বামিত্রের 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' মহামন্ত্রের সার্থকতা এই ক্ষুদ্র জীবননাট্যের সর্বত্র সর্বতোভাবে। ইহা অনুমিতি নহে, সুদৃঢ়ভাবে অনুভব ভূমিকায় 'সুবিরূঢ়মূলম্'। এই জীবননাট্যের শেষাঙ্কের প্রয়াস – দূরবগাহ বেদ সমুদ্রের কিঞ্চিৎ স্পর্শপ্রাপ্তি। এক্ষেত্রেও এই জীবকের অতিক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রচোদকও তুমি – লেখা, লেখনী ও লেখকও তুমি।

তুমি 'বেদবিদেব চাহং' বলিয়া আত্মগৌরব করিয়াছ। তোমার পূত করপদ্ম পার্শ্বে 'ত্বমস্মাকং তব স্মসি' মন্ত্রে এই 'বেদ বিচিন্তন' নামক পুস্তিকাটুকু অর্পণ করিলাম। সুস্মিত বদনে একটিবার কৌতুকাবহ দৃষ্টিপাত করিলে – ধন্যোঽস্মি, ব্রতপূর্ণতায়।

বেদের গাম্ভীর্যে স্তব্ধ
'মর্তেষু অমৃতম্' লুব্ধ
মধুরিমায় মুগ্ধ
প্রার্থনারত

মহানামব্রত।

সূচীপত্র

আদ্যে অবতরণিকায়

পণ্ডিত শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম

শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

অন্তে উপসংহারে অভিমতের আড়ালে আশীর্বাণী

"আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও

হৃদয় পদ্ম দলে।" — কবিগুরু

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর

ড. শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

প্রাগ্-বাণী

পূজ্যপাদ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থখানি পড়িলাম। ইহা পড়িয়া এমন অত্যাশ্চর্য বোধ হইল যে, বলিতে ইচ্ছা হয় "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।" অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ? তাহার উপমা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, রাম-রাবণেরই মত। ইহার তাৎপর্য—তাহার উপমা নাই। সেইরূপ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির লিখিত 'বেদ-বিচিন্তন' কিরূপ? ইহার উত্তর -- ঐ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিরই লিখনের মত। ইহা বুঝিতে গেলে ঐ ব্রহ্মচারীজির মত আর একজন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আবশ্যক। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ও তাঁহারই রূপান্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ বলিয়া তিনি ঐ 'বেদ-বিচিন্তনে'র অর্থ সর্বতোভাবে জানেন, আমাদের মত অত্যল্পশ্রুত ব্যক্তিদের পক্ষে উহা জানা সম্ভব নয়। আর যাঁহারা জানেন তাঁহার কৃপায়।

এই গ্রন্থে ব্রহ্মচারীজি আমাদের দূরবগাহ্য বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া কি কি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা বলিতেছি। তিনি সমস্ত বেদেই গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাতে অসাধারণভাবে সমস্ত বেদেই যে তিনি ভাগবত ধর্ম, ভগবদ্‌গীতোক্ত তত্ত্ব, মহাভারতান্তর্গত পদার্থ ও তন্ত্র-গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব গূঢ়ভাবে আছে তাহার ব্যাখ্যা পরিষ্কার ভাবে করিয়া ঋগ্বেদের ১০টি মহামণ্ডলের মধ্য হইতে প্রত্যেকস্থলে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ঐ বেদের অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়বহ এবং ভবিষ্যদ্ভারতীয়দের ধর্মপথের পাথেয় এবং গবেষকদের গবেষণীয় বিষয়ে মহোপকারক, তাহার আর তুলনা নাই।

এই গ্রন্থে তিনি ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা কে, তাহা ঋগ্বেদের বহু সূক্তের বহু ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া তাহার অভূতপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে কবি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন দেখাইয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষিগণেরও সমর্থন দেখাইয়াছেন। আর যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমার কাছে অভূতপূর্ব মনে হইল। মনে হইয়াছে—এইরূপ বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা ভবিষ্যতে হিন্দুদের বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদের ইহাতে পরম উপকার সাধিত হইবে। তারপর শুক্লযজুর্বেদের শেষ মন্ত্র ও সামবেদের শেষ মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াও পূর্বোক্ত শ্রেষ্ঠ দেবতা ও তাঁহার আরাধনায়

যে মানুষের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আর একটি অভিনব কথা— শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবরূপ পঞ্চভাবেরও আকর যে বেদ, তাহা এবং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের প্রত্যেকের দৃষ্টান্ত বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাও যে বেদেতে আছে দেখাইয়াছেন। আবার শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের কথা এবং বেদে যে সেই রসের শ্রেষ্ঠত্বও সূচিত আছে তাহাও দেখাইয়া জগদ্বাসীকে বিশেষত বাঙালী বৈষ্ণব মহাত্মাগণকে বিস্ময় সাগরে ও মহোপকারিত্ব সম্পাদনে চিরকালে ঋণিত্ব করিয়াছেন।

আমাদের ভারতীয় আস্তিক দর্শনকারদের বক্তব্য স্মৃতি,পুরাণ মহাভারত, রামায়ণ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি সকল পৌরুষেয় আস্তিক, ঋষি প্রণীত শাস্ত্রগুলিরও বীজ বেদ। ইহা সকল আস্তিকদর্শন বলিয়াছেন, কিন্তু কি ভাবে ঐ সব আস্তিক প্রস্থানভেদগুলির কথা বেদে আছে তাহা পরিষ্কারভাবে কেহ বলেন নাই। কিন্তু এই বেদ-বিচিন্তনে ব্রহ্মচারী মহাশয় সেই সব পরিষ্কারভাবে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া জগতের নিকট নূতন আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন।

তারপর অথর্ববেদের শেষ পর্বের মন্ত্র ব্যাখ্যার দ্বারা কালের নির্ণয় করিয়া শেষে গীতাবাক্যের দ্বারা সেই কালের যে স্বয়ং কৃষ্ণই পরাকাষ্ঠা তাহাও সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তারপর 'বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র' নামক নিবন্ধাংশে বৈদিক ধর্মের বিরোধীদের উল্লেখ করিয়া সেই সব বিরোধীদের সমাধানে স্মৃতিকারগণের স্মৃতি নিয়ম প্রবর্তন দ্বারা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

তারপর 'বাক্ ও অর্থ', 'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম', 'শব্দঃ খে', 'পুরুষ-প্রকৃতি', 'দিবা-রাত্রি', 'দ্যাবা-পৃথিবী', 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়', 'অগ্নিষোম', 'মিত্রাবরুণ', 'দিতি-অদিতি'— প্রভৃতি যুগনদ্ধ তত্ত্বের আলোচনায় এবং 'অগ্নিসূক্ত', 'অগ্নি', 'গায়ত্রী', 'বৈশ্বানর অগ্নি', 'প্রণব', 'ওঁ তৎ সৎ' 'ইন্দ্র' এইসব প্রকরণে বাক্-অর্থ, পুরুষ-প্রকৃতি, অশ্বিনীকুমারাদি দেবতাদের তত্ত্ব ও রহস্য অর্থ, বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহাও যে অভূতপূর্ব (পূর্বে এইরূপ কেউ করেন নাই) ইহা নিশ্চিত তথ্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কথা বলিয়া সেই ধর্মনিরপেক্ষতা যে অধর্মেই পরিণত হইতেছে ও হইবে—ইহা উল্লেখ করিয়া একটি 'মহাসত্যের' উক্তি করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর 'প্রণব' এবং 'ওঁ তৎ সৎ' প্রকরণে গ্রন্থকার পরিষ্কারভাবে লৌকিকে শব্দ ও অর্থ ভিন্ন হইলেও তাহারা সমান্তরাল রেখার উদাহরণ দ্বারা একত্র

মিশিয়া যায় বলিয়া 'নাম ও নামীর' অর্থাৎ বাচ্য ও বাচকের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের বিশেষত ভারতীয় সাধকদের যে কত মহোপকার করিয়াছেন তাহা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগামীদের প্রতিপাদিত এই নাম ও নামীর অভেদের উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবদের যে চির আকাঙ্ক্ষিত ভগবৎপ্রেম তাহারই উদ্বোধনে সহায়ক হইয়াছেন—তাহাতে আর 'কিমু বক্তব্যম্' ন্যায় প্রসক্ত হইয়াছে। যাই হোক আমার অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মহাপুরুষের বেদ-বিচিন্তনাংশের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য লিখিলাম।

এই গ্রন্থে ব্রহ্মচারীজি কি কি কথা কিভাবে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। আমি এখন দুইটি কথা বলিব একটি তাঁহার বেদের অপৌরুষেয়বাদ সম্পর্কে, অপরটি বেদের অধিকারী প্রসঙ্গে। একটি প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য আছে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' আমি মুনি-ঋষি না হইলেও একজন সন্ন্যাসাশ্রমী, তাই ঋষি-গ্রন্থ লইয়া একটু-আধটু আলোচনা করি। তাই মত-ভিন্নতা স্বাভাবিক। এই ভিন্নতার কথা আমি অতি বিনয়ের সহিত উল্লেখ করিতেছি। শাস্ত্রকথা বলিয়াই বলিব। উনার মনগড়া রচনা হইলে বলিতাম না। বেদের অপৌরুষেয়বাদ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার দুই একটি কথা যোগ দিব। যদি কেহ বলেন, এমন সুন্দর কথার মধ্যে আপনার কথা আবার কেন যোগ দিবেন? তাহার উত্তরে বলিব — সমুদ্রেও বৃষ্টি হয়।

বেদ-বিচিন্তনের ১৬ পৃষ্ঠায় ১ম পঙ্‌ক্তি থেকে ৩১ তম পঙ্‌ক্তি যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য লিখিতেছি, আমাদের ষড় দর্শন-কারের সকলের মত এবং বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্যাদির মতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলা হয়। এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ সমস্ত বেদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ন্যায়ে রচয়িতা হইতেছেন পরমেশ্বর। মীমাংসা মতে তো সমগ্র বেদই নিত্য, কেহ এমন কি ঈশ্বরও রচয়িতা নন। ঋষিরা মন্ত্র-দ্রষ্টা মাত্র, রচয়িতা নন।

আমাদের ভারতীয় দর্শনে আস্তিক দর্শনকারগণের মধ্যে বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায় দর্শনের স্রষ্টা সূত্রকারগণ ও তাহার ভাষ্যকারগণের মতে বেদ পৌরুষেয় হইলে, সেই পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরই প্রতিকল্পে পূর্ব পূর্বকল্পের মত বেদ রচনা করিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রথমে তাহার উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার শিষ্য ও পুত্রাদিক্রমে তাহার উপদেশ দিতে আজ্ঞা করেন। এই উভয় মতে শব্দ ও অর্থ অনিত্য। কল্পের প্রথমে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর পূর্বকল্পের মত বেদ রচনা করিয়া থাকেন। বৈশেষিক মতে ঠিক পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রের মত ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকার না করিলেও কল্পের প্রথমে মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর বেদের উপদেশ দেন

— ইহা "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (বৈঃ সূঃ, ১/১/৩) এই সূত্রের ভাষ্য ও টীকাদিতে সূচিত আছে। আর ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে সমস্ত কার্য-জগতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। সেইভাবে বেদও যখন কার্যপদার্থ (শব্দ-স্বরূপ) তখন তাহারও স্রষ্টা ঈশ্বর, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। ন্যায়-দর্শনের আচার্য উদয়ন তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে বলিয়াছেন —ঈশ্বর কল্পের প্রথমে শরীর পরিগ্রহ করিয়া শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি করিয়া প্রথমে মানুষকে তাহার ব্যবহারশিক্ষা দেন। ইহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। আর ঈশ্বর অবতার পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাদির নিকট জগৎ সৃষ্টি ও বেদের উপদেশ কিভাবে করিতে হইবে তাহাও বলিয়া থাকেন। আর সেই ঈশ্বরই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি শরীরাবেশে (শরীর পরিগ্রহে) ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম নিবারণ করেন। সুতরাং উদয়নাচার্যের মতে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ স্বীকৃত। উদয়নাচার্য সমস্ত ঈশ্বর-বিরোধী মতের খণ্ডন করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন ঈশ্বরের পরম প্রাধান্য। এই জন্য বেদান্ত মতে ঈশ্বর স্বীকার ও তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার করিলেও বেদান্তে ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন সব মিথ্যা, ইহা প্রতিপাদন করায় ঈশ্বর মায়োপহিত চৈতন্য বলিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব মিথ্যা, ইহা বেদান্তে প্রতিপাদিত বলিয়া উদয়নাচার্য তাঁহার 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক'গ্রন্থের 'অনু-পলব্ধিভঙ্গ' গ্রন্থে বেদান্তের অদ্বৈত মত অতি সুনিপুণভাবে খণ্ডন করিয়া জীব হইতে ঈশ্বর ভিন্ন এবং ঈশ্বরই জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিধাতা ইহা বলিয়াছেন। তিনি 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে ও 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক' গ্রন্থে বিশেষভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া আমাদের বৈদিক ধর্মকে যেভাবে স্থাপন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। বিশেষ অভিজ্ঞগণের মুখ হইতে শুনিয়াছি বৌদ্ধেরা জগন্নাথের ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করিয়া দিয়া সেই জগন্নাথ মূর্তিকে বুদ্ধদেবের মূর্তিরূপে খাড়া করিয়াছিল। উদয়নাচার্য বৌদ্ধদের মতকে সুনিপুণভাবে খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদের পরাজিত করিয়া পুনরায় জগন্নাথের পূর্ববৎ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগন্নাথদেবকে বলিয়াছিলেন, "মদধীনা তব স্থিতিঃ" ইত্যাদি। যাই হোক, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্বীকৃত। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বর সাংখ্য মতে বেদ কোন ঋষিরচিত তো নয়ই এমন কি নিরীশ্বর সাংখ্য মতে ঈশ্বর নাই বলিয়া বেদ ঈশ্বর রচিতও নয়। সাংখ্য মতে সব কিছু কার্যই প্রকৃতিতে সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া নিত্য। সুতরাং বেদও শব্দাত্মক হইলেও প্রকৃতিতে থাকে। কল্পের প্রথমে সেই বেদকে ব্রহ্মা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া মানুষের নিকট পরম্পরাক্রমে উপদেশাদি দেন। কেহ বা কপিল প্রভৃতি বেদের রচয়িতা নন এই কথা সাংখ্যকারিকার ২য় কারিকায় "আনুশ্রবিকঃ" পদের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "শ্রূয়ত এব পরং ন তু কেনচিৎ ক্রিয়তে" এই বাক্যে স্পষ্টভাবে

বেদ কাহারও রচিত নয়— ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর নিরীশ্বর সাংখ্য মতে ঈশ্বরই যখন নাই তখন ঈশ্বরের অবতারও নাই ইহা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য মতে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ব্যাখ্যাদিতে নিত্য ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও জন্য-ঈশ্বর ব্রহ্মাদির প্রতিপাদন স্বীকার করিয়া জগতের প্রয়োজনে তাঁহার অবতারাদি স্বীকার করিয়াছেন। বেদ সেই জন্য ঈশ্বর কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রচিত ইহা স্বীকৃত নয়।

যোগদর্শনে — "শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সংকরস্তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্" (যোঃ সূঃ,৩/১৭) সূত্রের ভাষ্যবার্তিক টীকাদিতে যোগ মতে শব্দকে স্ফোট রূপ স্বীকার করিয়া স্পষ্টভাবে নিত্য বলা হইয়াছে। আর অর্থকে দ্রব্য গুণ কর্ম জাতি প্রভৃতিরূপে বাচ্য বা লক্ষ্য বলিয়া অনিত্য বলিলেও প্রবাহরূপে নিত্য এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব নিত্য শব্দ ও নিত্য অর্থের যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ তাহাও নিত্য। তবে কল্পের আদিতে ঈশ্বরের সঙ্কেতের দ্বারা সেই সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হয় ইহা "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" (যোঃ সূঃ, ১/২৭) এই সূত্রের ভাষ্যাদিতে বলা হইয়াছে। আর বেদ কপিলাদিকৃত নয় কিন্তু নিত্য বেদকে ঈশ্বর কল্পের প্রথমে ব্রহ্মাদির হৃদয়ে আবির্ভূত করাইয়া মানুষের ধর্মাদির পথ প্রদর্শন করতঃ করুণাবশতঃ জীবের মুক্তিতেও সহায়ক হন। ইহা "স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (যোঃ সূঃ, ১/২৬) সূত্রের ভাষ্যাদি ব্যাখ্যায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এমন কি যোগদর্শনে ঈশ্বরকে ব্রহ্মাদিরও অধিষ্ঠাতৃরূপে ও অন্তর্যামিরূপে প্রতিপাদিত করিয়া জগতের কর্তৃত্ব— বেদোপদেষ্টৃত্বের কথাও বলা হইয়াছে। তবে ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্বটি নিমিত্ত-কারণরূপে, উপাদান কারণরূপে নয় বলিয়া প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরই নিত্য-বেদকে ব্রহ্মাদির মধ্যে আবির্ভূত করাইয়া জগতের পরম হিতকারক হন, কপিলাদি সেই বেদের স্মর্তা মাত্র, রচয়িতা নন। প্রয়োজনবশতঃ ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন ইহা যোগদর্শনের অন্যান্য সূত্রে সূচিত আছে, এবং ভাষ্য-টীকাদিতে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব-মীমাংসাদর্শনে তো বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে। ঋষি প্রভৃতি সেই বেদের স্মর্তা, কর্তা নয় ইহা বলা হইয়াছে। আর বেদান্তদর্শনের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (সূঃ, ১/১/৩) সূত্রের ভাষ্যে ভাস্করাচার্য স্পষ্ট ভাবে "অস্য মহতো ভূতস্য" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ন্যায় বেদ বলেন, তাহাতেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই। পূর্ব পূর্বকল্পে যেমন আনুপূর্বী বিশিষ্ট বেদ ছিল পর পর কল্পে ঈশ্বর সেইরূপই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি বলিয়া ঐ ভাবে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরের অবতারের কথা শঙ্করাচার্য

গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, ''বসুদেবাদংশেন কিল কৃষ্ণঃ সম্বভূব'' বাক্যে। তাহার অর্থ আনন্দ গিরি বলিয়াছেন, ''অংশেন'' মানে এক অলৌকিক অনির্বাচ্যরূপে, যা মানুষ বুঝিতে পারে না। ইহা ''নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'' (গী. ৪/৬) শ্লোকে ভগবান্ সূচিত করিয়াছেন।

সুতরাং ভারতীয় আস্তিক-দর্শনকারগণের সকলেরই মত এই যে, বেদ কোন মানুষ বা ঋষি রচিত নয়। যাই হোক পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থে আমাদের যে মহান্ উপকার-সাধন করিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয় ও ভারতীয়দের ধর্মপথের পরম উপাদেয় পাথেয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

একটি কথা বলা হইল। দ্বিতীয় কথাটি হইল বেদে অধিকারী প্রসঙ্গের কথা। বেদেই আছে স্ত্রী ও শূদ্র বেদ শ্রবণ করিবে না, উচ্চারণ করিবে না। যেমন নৃসিংহ-পূর্বতাপনী উপনিষদে (নৃঃ পূঃ তাঃ, ৩) আছে ''প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াদ্। যো জানীতে সোঽমৃতং চ গচ্ছতি। সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।।'' অর্থাৎ আচার্য বেদের অধ্যাপক স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে প্রণব (ওঙ্কার) যজুর্মন্ত্র লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীসূক্ত এইগুলি শোনাইতে ইচ্ছা করিবে না। কিন্তু স্ত্রীশূদ্র বত্রিশ অক্ষর যুক্ত সাম (মন্ত্র) ''হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।'' (কলিসন্তরণোপনিষদ্, ১) জানিবে (শুনিবে ও উচ্চারণও করিবে উপলক্ষণবশতঃ)। যে স্ত্রী বা শূদ্র (এমন কি যে কোন প্রাণী) এই মন্ত্র জানে, শুনে বা উচ্চারণ করে সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্ত্রী বা শূদ্র যদি প্রণব, যজুঃ, সাবিত্রী (গায়ত্রী, গায়ত্রীকে সাবিত্রীও বলা হয়) জানে বা শুনে বা উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে মৃত্যুর পর অধোলোকে নরকাদিতে গমন করে (জন্ম হয়), সেই হেতু আচার্য (বেদাধ্যাপক) স্ত্রী ও শূদ্রকে কখনও ঐ প্রণব, যজুঃ ও গায়ত্রী বলিবেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কলিসন্তরণোপনিষদ্‌ও বেদ বলিয়া তাহা কিরূপে স্ত্রী ও শূদ্র শ্রবণ বা উচ্চারণ করিবে? তাহার উত্তর এই যে, কলিপাবনাবতার (অবতার নন অবতারীই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, বেদে সকলের অধিকার নাই জানিয়া এ কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত মন্ত্রের আনুপূর্বী ভাঙিয়া দিয়া বলিলেন,

''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।''

এই মন্ত্র স্ত্রী শূদ্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই জপ কীর্তন করিবে। তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। ইহার দ্বারা মানুষমাত্রই

পরম শ্রেয়ঃ যে ভক্তি তাহা প্রাপ্ত হইবে। বেদের ক্রম ভগ্ন হইলে তাহাতে আর বেদত্ব থাকে না। সুতরাং "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদিরূপে মহাপ্রভু যে মহামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন তাহাতে বেদত্ব না থাকায় সকলেই তাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে। যদি বলা হয় ঐ কলিসন্তরণ উপনিষদের মন্ত্রকে ক্রম ভগ্ন করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহাতে যেমন বেদত্ব থাকে না সেইরূপ মন্ত্রত্বও তো থাকে না। তাহা হইলে মহাপ্রভু মন্ত্র বলিয়া শোনাইলেন সকলকে কিরূপে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, "শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" (বার্ধুল স্মৃতি) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, বেদ ও স্মৃতি এই উভয়ই আমার আজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ। আমি যেমন বেদ উপদেশ দিই সেইরূপ ঋষিপ্রণীত স্মৃতি (এখানে স্মৃতি শব্দের অর্থ ঋষি রচিত পুরাণ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র সবই)-র দ্বারাও আমিই মানুষের ধর্মের উপদেশ দিই। বিশেষত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপী (শ্রীকৃষ্ণের একদেহে রাধা ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ হইতে ঐ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ক্রমে যখন উচ্চারিত হইয়াছেন তখন উহার বৈদিক মন্ত্রত্ব না থাকিলেও পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রত্ব যে আছে তাতে আর সন্দেহ নাই। ঋষিদের রচিত অনেক পুরাণের মন্ত্র যখন পৌরাণিক মন্ত্র হইতে পারে তখন স্বয়ং ভগবান্ (অবতারী)- এর মুখে উচ্চারিত হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি বাক্য যে মন্ত্র হইবে তাহাতে বলিবার কি আছে? আবার বেদের সার, বেদের শীর্ষস্থানীয় সর্বশাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ ভাগবতও বলিয়াছেন — "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।।" (ভাগবত, ১/৪/২৫) অর্থাৎ স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (যাহারা দ্বিজ হইয়াও দ্বিজের মত কার্য করে না, নিন্দিতাচার) ইহাদের পক্ষে বেদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় (শোনাও) নয়। এইরূপ বৈদিক কর্মে শ্রেয় বিষয়ে যাহারা মূঢ় অর্থাৎ অনধিকারী তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া মহামুনি বেদব্যাস ভারত বর্ণনা করিলেন। ভগবদগীতাতেও "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।" গীতা (৯/৩২) ইহাদের পাপযোনি বলিয়াছেন।

দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম

বৈদিক বাঙ্ময় প্রবাহে শ্রীমহানামব্রত

'বেদ' এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত বলে বেদও অনন্ত — 'অনন্তা বৈ বেদাঃ'। বিশেষ অর্থে এই বেদ আবার বোঝায় মোহমুক্ত ও স্বচ্ছহৃদয় ঋষিদের অন্তরে যে জ্ঞান বিদ্যুতের স্ফুরণের মত চকিতে স্ফুরিত হয়ে ওঠে সেই অনন্য জ্ঞান। শব্দটির প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ অবশ্য ঐ অনন্য জ্ঞান যে-সব বিশেষ গ্রন্থে বিধৃত হয়ে রয়েছে সেই সব গ্রন্থ। বেদের বক্তব্য বিষয়কে দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি ভাগের নাম 'মন্ত্র' এবং অপর এক ভাগের নাম 'ব্রাহ্মণ'। আচার্য আপস্তম্ব তাই বলেছেন 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ বেদনামধেয়ম্'। দুই শ্রেণীর বিষয়বস্তুর মধ্যে মন্ত্রাংশগুলিতে থাকে দেবতার নিকটে প্রার্থনা নিবেদন এবং বিভিন্ন দেবতার স্তবস্তুতি। বেদের মধ্যে সেই অংশগুলির নাম ব্রাহ্মণ যেখানে ঐ মন্ত্রগুলিকে কোন্ যজ্ঞে কে কখন কীভাবে কেন প্রয়োগ করবেন তা নিয়ে রয়েছে নানা আলোচনা। এককালে বেদ ছিল অখণ্ড, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ পরস্পর পাশাপাশি মেশামিশি হয়েছিল; পরে সেগুলিকে পৃথক্ করে নিয়ে একটি ভাগে কেবল মন্ত্রগুলিকেই স্থান দেওয়া হয় এবং অপর এক ভাগে সঙ্কলিত হয় কেবল ব্রাহ্মণই। মন্ত্রের সঙ্কলনকে 'সংহিতা'ও বলা হয়ে থাকে, আর ব্রাহ্মণের সঙ্কলন ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত। ব্রাহ্মণে অবশ্য যেমন স্থূল দ্রব্য-পাত্র প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পাদ্য যজ্ঞের কথা বলা আছে, তেমন আবার প্রতীকী যজ্ঞ ও সৃষ্টিযজ্ঞ বা সৃষ্টিরহস্যের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের এই তিনপ্রকারের বিষয়বস্তুকে যথাক্রমে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (বেদান্ত) বলা হয়ে থাকে। আধুনিকেরা উপনিষদ্‌কে অবশ্য মন্ত্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে ধরেন না, বেদ বলে গণ্য করেন না। তাঁদের মতে উপনিষদ্ হচ্ছে মন্ত্র-ব্রাহ্মণ বা বেদ থেকে স্বতন্ত্র; কর্মের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই; উপনিষদের ঋষিরা যজ্ঞপন্থী নন, জ্ঞানমার্গী।

বেদের মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের — পদ্যবদ্ধ, গীতিবদ্ধ ও গদ্যবদ্ধ। প্রাচীন আচার্যদের মতে পদ্যবদ্ধ মন্ত্রের নাম 'ঋক্', গীতিবদ্ধ মন্ত্রকে বলে 'সাম' এবং গদ্যবদ্ধ মন্ত্রগুলি 'যজুঃ' নামে পরিচিত। এ ছাড়া পদ্যময় অথবা গদ্যময় অথবা গদ্যপদ্যমিশ্রিত এমন কিছু মন্ত্র আছে যেগুলির প্রচার

ও প্রয়োগ অথর্ব নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত মধ্যে সীমিত ছিল তা 'অথর্ব' নামে পরিচিত লাভ করে। সাধারণত পদ্যবদ্ধ মন্ত্রগুলি যজ্ঞভূমিতে হোতা নামে ঋত্বিক্ পাঠ করে থাকেন, গীতিবদ্ধ মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় উদ্গাতাদের এবং গদ্যবদ্ধ মন্ত্রগুলি হল অধ্বর্যুর পাঠ্য। অথর্ব মন্ত্রগুলি গৃহীর নিজের অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কল্যাণের জন্য গৃহযজ্ঞে অথবা ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক্ কর্তৃক দেবযজ্ঞে পঠিত হয়ে থাকে। গৃহযজ্ঞ হচ্ছে বিবাহ, উপনয়ন, অন্ত্যেষ্টি, প্রভৃতি গৃহ্য অনুষ্ঠান অথবা ধর্মীয় গৃহকর্ম। দেবযজ্ঞে লাগে একাধিক পুরোহিত (ঋত্বিক্) ও একাধিক অগ্নিকুণ্ড (আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ), কিন্তু গৃহযজ্ঞে একজন পুরোহিত ও একটি অগ্নিকুণ্ডই (স্মার্ত বা গৃহ্য বা আবসথ্য) যথেষ্ট। বেদের মন্ত্র সঙ্কলনে রয়েছে এই চার শ্রেণীর অথবা এই চার ঋত্বিকের পাঠ্য মন্ত্রগুলিরই সমাবেশ। কোন সংহিতা ঋকের, কোনটি সামের, কোনটি যজুঃ-র এবং কোনটি অথর্ব মন্ত্রের সঙ্কলন। সম্প্রদায়ভেদে বা সংস্করণভেদে একই ঋক্মন্ত্রগুলি একাধিক সংহিতায় সঙ্কলিত হয়ে থাকতে পারে। এই প্রকার অন্য তিন শ্রেণীর মন্ত্রের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকতে পারে। শুধু হয়ে থাকতে পারে না, হয়েছেও । একে বলে একই বেদমন্ত্রের শাখাভেদ। শাখা বা সম্প্রদায়ের ভেদের জন্য সংহিতাও ভিন্ন ভিন্ন। আবার সংহিতা ভিন্ন ভিন্ন বলে সংহিতার মন্ত্রগুলির প্রয়োগসম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থও অর্থাৎ ব্রাহ্মণও ভিন্ন ভিন্ন। এককালে ঋগ্বেদের (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দুই ভাগেরই) একুশটি, সামবেদের হাজারটি, যজুর্বেদের একশত এবং অথর্ববেদের নয়টি সম্প্রদায় বা 'শাখা' বর্তমান ছিল। সব শাখারই নিজ নিজ মন্ত্রসংহিতা ও স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থও সম্ভবত ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেদের মূল ভিত্তি হচ্ছে মন্ত্রাংশগুলিই এবং ব্রাহ্মণ হচ্ছে ঐ মন্ত্রাংশগুলিরই অনুবর্তী সেবক, কারণ তারা মন্ত্রের যজ্ঞভূমিতে প্রয়োগের প্রয়োজনীয় নির্দেশই দান করতে উদ্যোগী। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ধরেই নিয়েছে যে, প্রত্যেক মন্ত্রই যজ্ঞকর্মের প্রয়োজনে উদ্ভূত এবং যজ্ঞে প্রয়োগেই বেদমন্ত্রের সার্থকতা। এইভাবে কোন্ মন্ত্র কোন্ বিশেষ যজ্ঞকর্মের সঙ্গে যুক্ত তা নির্দেশ করায়, মন্ত্রের ভাবানুষঙ্গটি তুলে ধরায় বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থেই বেদমন্ত্রকে ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস করা হয়েছিল। সরাসরি অর্থনির্দেশ না করায় এই ব্যাখ্যা পরোক্ষ এবং অবশ্যই যজ্ঞপন্থী। এ ছাড়া কোন কোন স্থানে আবার মন্ত্রের অন্তর্গত বাক্যাংশের অথবা শব্দবিশেষের ব্যাখ্যাও সেখানে করা হয়েছে। এইভাবে বেদব্যাখ্যায় গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারার মতো ব্রাহ্মণের কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে।

ঋষির নিকটে উদ্ভাসিত মন্ত্রের মধ্যে যে পদগুলি রয়েছে সেগুলিকে আমরা সংহিতার মধ্যে পরস্পর সন্ধিযুক্ত অবস্থাতেই পেয়ে থাকি। সংহিতায় মন্ত্রকে যে অবস্থায় পাই তাকে বলে মন্ত্রের 'সংহিতাপাঠ'। যদি মন্ত্রের পদগুলিকে সন্ধিবিযুক্ত করে পাঠ করা হয় তাহলে সেই পাঠকে বলে 'পদপাঠ'। এই পদপাঠে পদগুলিকে কেবল যে সন্ধি বর্জন করেই পাঠ করা হয়েছে তাই নয়, ণত্ব-ষত্ব বর্জন করে পদকে প্রকৃতি-প্রত্যয়ে ও সদস্যশব্দে (সমাসের ঘটক বা সমস্যমান শব্দে) ভাগও করা হয়েছে। কোন পদে ছন্দের কারণে হ্রস্ব স্বরের স্থানে সংহিতাপাঠে যদি দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে পদপাঠে তাকে তার স্বাভাবিক ব্যাকরণসম্মত হ্রস্বস্বরেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাই ঋষি যে আকৃতিতে মন্ত্রটি পেয়েছিলেন ঠিক সেই আকৃতিকে অবিকৃত রাখার জন্যই, মন্ত্রকে স্মৃতিতে ঠিক ঠিক ধরে রাখার কারণেই যে পদপাঠের প্রবর্তন তা নয়, মনে হয় মন্ত্রের অর্থবোধে সাহায্য করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। পদপাঠও তাই বেদের এক প্রাচীন পরোক্ষ ব্যাখ্যা। ঋগ্‌বেদের পদপাঠের প্রবর্তক শাকল্যের নাম ঋগ্‌বেদেই আরণ্যক অংশে আছে। তিনি তাই অর্বাচীন নয়, সুপ্রাচীনই এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

বৈদিক যুগ অতিক্রম করে বেদাঙ্গের যুগে চলে আসি। এই যুগে বেদার্থীদের বেদচর্চায় সাহায্যের জন্য মাত্র ছয়টি নয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ নামে ছয় শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলিকেই বলা হয় 'বেদাঙ্গ'। এর মধ্যে ব্যাকরণ. নিরুক্ত ও ছন্দ বেদমন্ত্রের অর্থবোধে আমাদের সাহায্য করে। এই তিন শ্রেণীর বেদাঙ্গের মধ্যে আবার নিরুক্তের (নিঘণ্টু নামে বৈদিক কোষগ্রন্থ ও তার নিরুক্ত নামে ব্যাখ্যাগ্রন্থ) কাজই হল বৈদিক শব্দের অর্থ সরাসরি নির্দেশ করা। নিঘণ্টুতে আছে বিভিন্ন একার্থবাচী, অনেকার্থবাচী ও দেবতাবাচী শব্দের তালিকা। কোন্ তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে দেখে বুঝে নিতে হয় শব্দটির কী অর্থ। নিরুক্তে কিন্তু কেবল শব্দের স্থূল অর্থই নয়, ব্যুৎপত্তি বিচার করে তার যৌগিক অর্থও নির্দেশ করা হয়েছে এবং যে মন্ত্রে এই শব্দটি রয়েছে প্রসঙ্গত সেই মন্ত্রেরও একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এককালে হয়তো একাধিক নিরুক্ত গ্রন্থই পাওয়া যেত, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, একটি ছাড়া অন্য সব নিরুক্তই বর্তমানে বিলুপ্ত। যে একটি মাত্র নিরুক্ত আমরা পেয়ে থাকি তা হল আচার্য যাস্কের রচনা। যাস্কের নিরুক্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর আগেও বৈদিক শব্দের অর্থ ও বৈদিক দেবতার স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞজনের মধ্যে নানা মতভেদ ছিল। পূর্বাচার্যদের মধ্যে কেউ দিতেন ইতিহাস (মিথ)-মুখী ব্যাখ্যা, কেউ

যজ্ঞমুখী, কেউ নিসর্গপন্থী, কেউ বা অধ্যাত্মধর্মী ব্যাখ্যা। কেউ কেউ বা মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ভূলোকের (অগ্নিরই রূপান্তর বা নামান্তর) অথবা অন্তরিক্ষলোকের (অতএব বায়ু বা ইন্দ্রেরই নামান্তর ও রূপান্তর) অথবা দ্যুলোকের (এবং সেই কারণে সূর্যেরই প্রতিনিধি) দেবতা তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতেন। এ ছাড়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সন্ধানও যে আমরা নিরুক্তে পাই না তা কিন্তু নয়। আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ থেকেই বৈদিক মন্ত্রকে আধ্যাত্মিক বিষয় বোঝাতে গিয়ে আরণ্যক ও উপনিষদে বেশ কিছু বেদমন্ত্রই সমুদ্ধৃত হয়েছে। বেদবাক্যের তাৎপর্য কীভাবে নির্ণয় করা উচিত, সন্দিগ্ধ ও বিতর্কিত স্থলগুলিতে সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হয় তার অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা পাই জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে। দুইই সূত্রাকারে রচিত।

এর পর আমরা চলে আসি সেই-সব ভাষ্যকারদের যুগে যাঁরা বেদের মন্ত্রগুলির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসংহিতার ভাষ্যকারদের কথাই বলা যাক, কারণ সামবেদের প্রায় সর্বত্র এবং অন্য দুইবেদে অনেকাংশে এই ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলিকেই আবার আমরা দেখতে পেয়ে থাকি। ঋক্-সংহিতার ভাষ্যকারদের মধ্যে আছেন বলভীর অধিবাসী স্কন্দস্বামী (৬৭৮ বিক্রমাব্দ)। নারায়ণ ও উদ্‌গীথ ঐ একই সময়ের দুই ভাষ্যকার। তাঁদের দু-জনেরই পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য আছে। চোলরাজ্যের কাবেরী নদীর দক্ষিণতীরের অধিবাসী বেঙ্কটমাধব (একাদশ শতাব্দী) ঋক্‌সংহিতার উপর 'ঋগর্থদীপিকা' নামে একটি ভাষ্য লিখে গিয়েছেন। বস্তুত এই ভাষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও টীকাধর্মী। বেঙ্কটের মতে কেবল নিরুক্ত ও ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে মন্ত্রার্থ বোঝার চেষ্টা করলে মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্থই বোঝা যাবে—"সংহিতায়াস্ তুরীয়াংশং বিজানন্ত্যধুনাতনাঃ। নিরুক্ত-ব্যাকরণয়োর্ আসীদ্ যেষাং পরিশ্রমঃ।।" তাহলে কী করা উচিত? তাঁর মতে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে বেদব্যাখ্যা করতে হবে। আচার্য সায়ণ বেদের এক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। বিজয়নগরের রাজা বুক্ক ও হরিহরের সময়ে তিনি তাঁর সেই বিস্তৃত অথচ প্রাঞ্জল ভাষ্য রচনা করেন (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। তিনি তাঁর ভাষ্যরচনায় পূর্বসূরি স্কন্দস্বামী, কপর্দিস্বামী, ভরতস্বামী ও ভট্টভাস্করের সাহায্য নিয়েছেন। মুদ্‌গল (পঞ্চদশ শতাব্দী) ঋক্‌সংহিতার যে ভাষ্য রচনা করেছেন তা বস্তুত সায়ণের ব্যাখ্যারই সারসংক্ষেপ। এঁদের সকলের ব্যাখ্যাই প্রধানত যজ্ঞমুখী।

অন্যান্য ভাষ্যকারদের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক আনন্দতীর্থ

(চতুর্দশ শতাব্দী) ঋক্‌সংহিতার প্রথম দিকের কিছু সূক্তের (৪০টি) উপর নারায়ণমুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই ভাষ্যের উপর আবার জয়তীর্থ ও রাঘবেন্দ্র টীকা লিখেছেন। জয়তীর্থের টীকার আবার ব্যাখ্যা করেছেন নরসিংহ। অদ্বৈতবাদী আত্মানন্দ (ত্রয়োদশ শতাব্দী) সংহিতার প্রসিদ্ধ 'অস্যবামীয়' সূক্তটির (ঋ. ১/১৬৪) উপর একটি ভাষ্য রচনা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চতুর্বেদস্বামী সংহিতার কিছু সূক্তকে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেন। 'জজ্ঞান এব—' (ঋ. ১০/১১৩/৪) মন্ত্রের মধ্যেই তিনি কংসবধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, গোবর্ধন পর্বত-ধারণ, পূতনাবধ প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন।

বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে যাঁরা (ভারতীয়) বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৫—১৮৮৪ খৃঃ)। বেদের কোন আখ্যানমূলক ব্যাখ্যা (মিথ) তিনি মানেন না। বেদমন্ত্রকে সাধারণত তিনি পরমাত্মার অনুকূলেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও যান্ত্রিক প্রগতিই যে বেদমন্ত্রের প্রতিপাদ্য তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭২—১৯৫০ খৃঃ) মতে বেদের শব্দগুলিকে যদি আমরা তাদের স্থূল অর্থে গ্রহণ করি তাহলে বেদ আমাদের কাছে উন্মাদের বাক্যের মতো অসংলগ্ন ও অর্থহীন বলে মনে হবে। বেদের প্রতীকী অর্থই তাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। তাঁর অভিমত হল এই যে, বেদমন্ত্রে বিভিন্ন গূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি অবশ্য বেদের কোন ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দেননি অথবা বহুসংখ্যক মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করেননি, করেছেন বিশেষ কিছু সূক্তেরই ব্যাখ্যা ও আলোচনা।

বালগঙ্গাধর তিলক বেদের বিশেষ কিছু মন্ত্র উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, ঐ মন্ত্রগুলিকে স্থূল অর্থে গ্রহণ করলে কোন স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় না, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে বলে মেনে নিলে মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমেশচন্দ্র দত্ত সমগ্র ঋক্‌সংহিতার বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং স্থানে স্থানে কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ শব্দের উপর ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানের আধারে নিজ মন্তব্যও উপস্থাপিত করেছেন।

সাম্প্রতিককালের বেদব্যাখ্যাতাদের মধ্যে অনির্বাণ অন্যতম। তিনি তাঁর 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডেই প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গে বেদের নানা মন্ত্র অথবা মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর নিজ রাহস্যিক ব্যাখ্যা বা মন্তব্যের সমর্থনে, দিয়েছেন বেশ কিছু শব্দ ও মন্ত্রাংশের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ষড়দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সব-কিছুর সাহায্য নিয়েই তিনি বেদব্যাখ্যার পক্ষপাতী। মহাভারতেও অবশ্য বলা হয়েছে যিনি

অল্পপাঠী অল্পজ্ঞ, বেদ তাঁর কাছ থেকে প্রহার বা অপব্যাখ্যার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে— 'ইতিহাস-পুরাণ্যাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাম্ অয়ং প্রহরেদ্ ইতি।।" (১/১/২৬৭)।

আসুন, এর পর আমরা চলে আসি পাশ্চাত্ত্য দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের কথায়। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষ্যকারদের বেদব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাঁদের বক্তব্য হল, ভাষ্যকারদের আবির্ভাব বেদ রচিত হওয়ার বহুকাল পরে। ঋষিদের মনের ভাব, ব্যবহৃত শব্দের অর্থ, গঠনপ্রক্রিয়া, প্রয়োগভঙ্গী তাঁদের কাছে তাই অজ্ঞাত। তাঁরা (ভাষ্যকারেরা) তাই বেঁদোত্তর যুগের শব্দার্থ, আখ্যান, ধর্ম ও দর্শন বেদের উপর আরোপ করেছেন। এই আরোপিত অর্থ তাই ঋষির অভিপ্রেত অর্থ বা বক্তব্য হতে পারে না। বৈদিক শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত ও গঠনগত মিল আছে এমন নানা বিদেশী প্রাচীন শব্দের পারস্পরিক তুলনা করে বৈদিক শব্দের অর্থ স্থির করা উচিত এবং বিভিন্ন দেশে যে-সব প্রাচীন উপাখ্যান ও ধর্মীয় আচার - অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলির সঙ্গে তুলনা করে বৈদিক আখ্যান ও আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য স্থির করা কর্তব্য। ম্যাক্সম্যুলার, ওল্ডেনবার্গ, হিলেব্রান্‌ত, রোট, গেল্ড্‌নার প্রভৃতি বিদ্বজ্জন তাই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞানের সাহায্যে বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের সেই ব্যাখ্যায় দেখা যায় বেদের ঋষিরা তাঁদের জীবনের নানা পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণের জন্যই প্রকৃতিজগতের বিভিন্ন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে দেবতাজ্ঞানে সেই-সব শক্তির পূজা ও স্তবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রতীচ্যের এই পণ্ডিতগণও যে বেদব্যাখ্যায় সর্বত্র ঐকমত্যে উপস্থিত হতে পেরেছেন তা নয়। শব্দের গঠনপ্রক্রিয়ার গোলকধাঁধায় পড়ে তাঁরাও একই শব্দের নানা অর্থ করেছেন। যেমন 'শিপ্র' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন ওষ্ঠ, কেউ অধর, কেউ দাড়ি, কেউ বা করেছেন গোঁফ। এইভাবে 'রধ্র' শব্দের অর্থ কারও মতে অনুগত, কারও মতে দুর্বল, কেউ বলেন শ্রান্ত, কেউ সৎ, কেউ বা বলেন অত্যন্ত হতভাগ্য। এ ছাড়া বেদের সকল সূক্ত (কবিতা) ও মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষেই রচিত ও প্রযোজ্য কি-না এবং কোন্ দেবতা কোন্ বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এ-সব যা-ই হোক, বেদকে তাঁরা উচ্চস্তরের কোন দার্শনিক গ্রন্থ বলে মনে করেন না।

যাঁরা বেদকে অধ্যাত্মবিদ্যার আকর বলে মনে করেন তাঁদের মূল বক্তব্য হল — শব্দের আক্ষরিক বা স্থূল প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলে বেদবাক্যগুলি অসংবদ্ধ অসঙ্গত ও উন্মত্তের প্রলাপের মত মনে হয় এবং বেদে যদি কেবল জৈব কামনা-বাসনার কথাই বলা থাকে তাহলে পরবর্তীকালের

আস্তিক দর্শনগুলি বিনা দ্বিধায় ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদের প্রামাণ্য কেন স্বীকার করে নিয়েছে? বস্তুত বেদের গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই জৈব বৃত্তির তোষণ ও পোষণ নয়, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই প্রতীকী বর্ণনা; দর্শনের বীজ তিলে তৈলের মতই বেদে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— 'তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ'।

এ-বার আমরা আসি শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গে। নিছক সংসারত্যাগী প্রথাপালনে ব্যস্ত সাধারণ মঠবাসী তিনি নন। যতদূর জানি তিনি কৃতী ছাত্র, জ্ঞানী ব্যক্তি, ধর্ম ও দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা এবং বেশ কিছু গ্রন্থের লেখক। বর্তমানে তাঁর বয়স নব্বুই-এর ঊর্ধ্বে, কিন্তু এই সুপরিণত বয়সেও জ্ঞানস্পৃহা কমেনি, লেখনীও ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। এখনও তিনি লিখে চলেছেন। তাঁর লেখার ভাষা খুবই সহজ, সরল, সুস্পষ্ট, সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য। বক্তব্য বিষয়কে পরিচিত দৃষ্টান্ত ও সহজবোধ্য যুক্তি দিয়ে তিনি বেশ সরস ও আকর্ষণীয় করে তোলেন। কেবল আবেগ নয়, তাঁর লেখায় যুক্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়। বেদের অনুশীলনে ব্রতী হয়ে সম্প্রতি তিনি 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থটি প্রকাশ করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন । নিজ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষ্ণবী ভাবনার উৎসন্ধানে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার মধ্যে সন্ধানও পেয়েছেন সেই-সব ভাবনার। আমাদের দৃষ্টিতে বলতে পারি ভাগবতের আলোকে তিনি বেদকে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। বেদের নানা দিকের আলোচনাই তিনি এই গ্রন্থে করেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে ঋষিদের নামের তাৎপর্য, নারী ঋষি, ঋষির ব্যক্তিগত জীবনের ক্লেশ, বেদের প্রাচীনত্ব, বেদ ও গীতা, বেদ ও ভাগবত, বেদ ও তন্ত্র, ছাত্রজীবন, ঋগ্‌বেদের মণ্ডল অনুযায়ী বিভাগ, মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ও ঋষি, বেদাঙ্গ, পদপাঠ ইত্যাদি, উদাত্ত প্রভৃতি স্বর, সামগান, বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য, নারীর যজ্ঞে অধিকার, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে কিছুটা অরবিন্দের এবং কিছুটা ভাগবত পুরাণের আলোকে গ্রন্থকার আমাদের জানিয়েছেন যে 'দিবা' হচ্ছে মানুষী চেতনা এবং 'রাত্রি' দৈবী চেতনা, 'ঘৃত' অন্তরের নির্মল চেতনা, 'অপত্য' নিজেরই নবজন্ম, 'স্বাহা' স্বতঃস্ফূর্ত আবাহন ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, সোম প্রেমমদিরা, 'গোতম' উজ্জ্বলতম, 'ভৃগু' দুঃখতাপে ভর্জিত হয়েও যিনি দগ্ধ হননি, 'সপ্তবধ্রি' যে ঋষির দুই কান, দুই চোখ ইত্যাদি সাতটি দ্বার বধির অর্থাৎ যিনি অসম্পূর্ণ মানুষ, 'নিণ্য' সাঙ্কেতিক শব্দ বা বাক্য। তাঁর মতে বেদে বিষ্ণুর কথা থাকা মানেই কৃষ্ণকথা থাকা, কারণ বিষ্ণুই কৃষ্ণ;

ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলে যে সোমের কথা বলা হয়েছে তা আসলে অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন যে, গীতায় বেদের যে নিন্দা দেখা যায় তা বস্তুত বেদের যাঁরা অপব্যাখ্যা করেন তাঁদেরই নিন্দা। ঋগ্‌বেদ অগ্নিসূক্তেই আরম্ভ হয়েছে, শেষও হয়েছে অগ্নির স্তুতিতে। বেদ 'ত্রয়ী', কারণ যজ্ঞভাবনা, দেবভাবনা (আলোর গান) ও অধ্যাত্মভাবনাই বেদের মূল বক্তব্য। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে এবং অথর্ববেদে তন্ত্রের বীজ বর্তমান বলে তিনি মনে করেন। আরাধ্য শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি বাণী উদ্ধৃত করে সমগ্র বেদের মূল তাৎপর্য তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এইভাবে 'চারি বেদকে যুদ্ধ কহে' অর্থাৎ বেদে আছে দেবভাবনা ও অসুরভাবনার মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষের কথা। মহাসত্যের আবরণ উন্মোচিত করাই হচ্ছে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া। অথর্ববেদের স্কম্ভকে তিনি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই স্কম্ভ যেন একটি মাত্র স্তম্ভের উপর নির্মিত বর্তমান যুগের অট্টালিকা। 'সত্য' তাঁর মতে স্থিতি, অবিচলতা, 'ঋত' হচ্ছে সেই অবিচলতার মধ্যে ছন্দের দোলন বা ভাগবতী লীলা, আর 'বৃহৎ' হচ্ছে সত্যের অমোঘ বিস্ফারণ; সত্যই বা স্থিতিই ঋতের পথ অনুসরণ করে লাভ করেছে ঋজু গতি। ভাগবতের একটি শ্লোক (৪/১৮/১৪) উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন যে, ঋষিরা দেহ-ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে বেদের দুগ্ধ দোহন করেছিলেন; আমাদেরও তা-ই করতে হবে, তুলতে হবে প্রাকৃত জীবনকে অপ্রাকৃত (দিব্য) করে।

মহানামব্রতজী বেদের মধ্যে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি এই পঞ্চরসের সন্ধান পেয়েছেন (ঋ. ১/১/১০: ২/১/৯; ৪/১/৩; ৭/৮৬/৭; ৮/৯১/১-৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে সখ্যরতিরই যে বেদের প্রাধান্য তাও তিনি বলেছেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তির সন্ধানও তিনি বেদের মধ্যে পেয়েছেন ('শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' বাক্য, মন্ত্রে দেবতার স্তুতি ও গৃহ ধাতুর বহুল প্রয়োগ, 'স্মরেথাম্', 'শ্রিয়ে তে পাদা দুব—', 'বিপ্রম্ অর্চত', 'বন্দস্ব মারুত গণম্', 'অরং দাসো ন মীল্হুষে', 'অগ্নে সখ্যে মা রিষামা—', 'উপ হ্বেয়াম শরণা বৃহন্তা' ইত্যাদি মন্ত্রাংশ দ্রষ্টব্য)। বেদের সাহিত্যিক মূল্য এবং বিশিষ্ট কিছু বৈদিক দেব-দেবী সম্পর্কেও তিনি তাঁর আলোচনা এই গ্রন্থে করেছেন। তাঁর এই আলোচনার পিছনে আছে স্বকীয় মনন ও বেদের উপর রচিত নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের দীর্ঘ অনুশীলন। ব্রহ্মচারীজী দু'একটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম অনেকবার উদ্ধৃত করেছেন। সে সকল ক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীজীর মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির আপন মননই আমাদের নিকট বেশী মূল্যবান ও উপাদেয়।

গতানুগতিক পথে না হেঁটে গ্রন্থকার বেদকে দেখেছেন ভিন্ন এক দৃষ্টিতে। পাঠককে গ্রন্থের সকল মতই যে গ্রহণ করতে হবে বা পাঠকমাত্রই সর্বক্ষেত্রে গ্রন্থের সকল মতই যে গ্রহণ করে থাকেন তা নয়, কিন্তু এইটুকু অন্তত বলা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় বস্তুর এতই বৈচিত্র্য এবং ভাষার গতি এতই স্বচ্ছন্দ যে তা পাঠককে সর্বদাই আকৃষ্ট করে রাখবে, অন্তত জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী যাঁরা তাঁদের। বয়সের বাধা পেরিয়ে লেখকের মনের এই যে অপ্রতিরোধ্য দুরন্ত গতি, নিজ সংস্কৃতির উৎসকে জানার জন্য এই যে প্রবল ও মহতী আকূতি এবং নিবিড় নিষ্ঠা তা অন্তত আমাদের সকলের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়া উচিত, উচিত সকল জ্ঞানপিপাসুরই এই দৃষ্টান্ত দেখে নিজ নিজ জীবনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া। 'আরো আলো আরো আলো এই নয়নে, প্রভু, ঢালো' এই তো হওয়া উচিত সকল মানুষের জীবনের পরম আকূতি। যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বর্ণিত এক উপাখ্যানে দেখি বয়সের ভাবে জরাজীর্ণ ও উত্থানশক্তিশূন্য ঋষি ভরদ্বাজ তিন শত বৎসর আয়ু পূর্ণ করার পরও চাইছেন আরও একটি শতায়ু। কিন্তু কেন? দেবতার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি জানালেন— ত্রয়ীর অপেক্ষায় আরও বেদ অধিগত করতে চাই। মহানামব্রতজী গোপনে আয়ু প্রার্থনা করছেন কি-না জানি না, কিন্তু তাঁর জীবনের ব্রত বোধ হয় এই যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্ঞানের চর্চায় ব্রতী থাকব, জানব আর জানাব, তরণী ভাসিয়েছি আলোর সমুদ্রে নূতন মহাদেশে অবতরণের জন্য, ফেরার জন্য নয়। তাই এই দিক্ থেকে অন্তত তিনি আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ও অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁকে অভিনন্দিত করা মানে নিজ অন্তরকেই বন্দিত ও নন্দিত করা। মহাকাশকে সীমিত দৃষ্টিশক্তি (তা যতই প্রখর হোক) নিয়ে কে সামগ্রিকভাবে ও ঠিক ঠিক দেখতে পায়? কিন্তু দেখার প্রবল অদম্য ইচ্ছা, চোখ মেলে তাকানো, দু-চোখ ভরে আকাশের অনন্ততা ও নীলিমাকে দেখার প্রয়াস, আর যেটুকু দেখা যায় তা দেখে পরম বিস্ময়ে ও অপূর্ব আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠা ও সেই শিহরণের কথা অস্ফুট স্বরে সকলকে বলার জন্য সীমাহীন যে অস্থিরতা তা-ই বোধ করি বড় কথা।

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশুতোষ কলেজ

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'বেদ-বিচিন্তন' প্রসঙ্গে

রামায়ণ মহাভারত পড়িবার সময় বুকের ভিতরে একটা আকুলতা একটা আক্ষেপ জাগে, কত ঋষি মহাপুরুষ, তাঁহাদের ব্রহ্মবর্চ জীবন, তাঁহাদের উদ্দীপ্ত বাণীর কথা মনে পড়ে। আর ভাবি, সেই যুগে কেন জন্মাই নাই? তাঁহাদের দিব্য অঙ্গের সৌরভ, যজ্ঞধূমের গন্ধ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের ব্রহ্মনির্ঘোষ আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হয়। তাঁহারা বলেন, জরা নাই, মৃত্যু নাই। প্রমাদ মোহই মৃত্যু — "মৃত্যুর্নাস্তীতি। প্রমাদং বৈ মৃত্যুঃ" (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৪১/২)। মৃত্যু তাঁহাদের কাছে তৃণনির্মিত ব্যাঘ্র অর্থাৎ কাগজের বাঘ — "মৃত্যুস্তার্ণ ইবাস্য ব্যাঘ্রঃ"। (ঐ, ৪২/১৫) কি বীরত্বপূর্ণ বিপুল বীর্য, ওজঃপূর্ণ ব্রহ্মনির্ঘোষ। এই তো বেদমন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি — "বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ" (ঋ. ২/১/১৬) — দিব্যজ্ঞানের সঙ্গে বৃহতের কথা বলিব, বীরের মত বলিব। বেদের ঋষিদের এই হইল বীর্যবান্ ওজস্বান্ কম্বুকণ্ঠ।

পূজ্যপাদ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাঁহার অতিক্রান্ত বয়সে যে ' বেদ বেদান্তের' অন্তর্গত দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন— 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'বেদ-বিচিন্তন' নামে, তাহার ভিতর দিয়া মহাভারতের দৃপ্তবাণীকে তিনি নীরবে ঘোষণা করিয়াছেন। এই কলিযুগে সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগের সাধনা ও সিদ্ধিকে নামাইয়া আনিয়াছেন। সত্যযুগকেই আমাদের মলিন মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। এই মহৎ গ্রন্থ তাঁহার "যশসং বীরবত্তমম্" (ঋ. ১/১/৩)।

কথা এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই বেদের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। যাঁহার নিজের ভিতরে সকল সংশয় জাল ছিন্ন হইয়াছে তিনিই অপরের অজ্ঞান সংশয় অপনোদন করিতে পরেন — "অভিজানামি ব্রাহ্মণং ব্যাখ্যাতারং বিচক্ষণম্। যশ্ছিন্ন বিচিকিৎসঃ স ব্যাচষ্টে সর্বসংশয়ম্" (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৪৩/৫৬)।

কেবল বেদের মন্ত্র মুখস্থ করিলেই বেদকে জানা যায় না। যিনি সত্যে স্থিত যিনি মর্মজ্ঞ তিনিই বেদকে জানেন — "ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি বেদ্যেন বেদং ন বিদুর্ন বেদ্যম্।" (ঐ, ৪৩/৫৩) তাই ব্রহ্মচারীজী গ্রন্থের অবতরণিকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "বেদের কথা আগে শুনিতে হইবে।

শুধু কান দিয়া নহে, সমগ্র সত্তা দিয়া শুনিতে হইবে। শুধু বুদ্ধি দিয়া জানা নহে, সমস্ত অনুভব শক্তি দিয়া জানিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সমস্ত আমিত্বকে হারাইয়া মহা যজ্ঞাগ্নিতে একাকার হইয়া যাইতে হইবে। যে আমি এই আছি, সেই আমি কোন কার্যে যোগ্য হইতে পারিব না। যে আমি নাই বা রিক্ত হইয়াছি, সেই আমি সর্বকর্মে যোগ্য, সেই আমি আত্মদানে সার্থক।" (পৃ. উনত্রিশ-ত্রিশ)

অপরূপ একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি তিনি বুঝাইয়াছেন। এই অনবদ্য বাক্‌রীতি ব্রহ্মচারীজীর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা তাঁহার রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা জানেন, অতি অল্প অতি তুচ্ছ সাধারণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়া মহৎ ভাব বিপুল সত্যকে কি নিপুণ কৌশলে তিনি বোধগম্য করিয়া তোলেন। তাঁহার ভাষা যথার্থই যেন 'ধূলি-মুঠি-সোনা'।

"যেখানে বিজলীবাতি (ইলেকটিক লাইট) নাই, সেই স্থানে সভাসমিতি আলোকিত করার জন্য এক প্রকার আলো (লাইট) ব্যবহার করা হয়। আলো (লাইট)-টির নাম 'হ্যাজাক্ লাইট'। ঐ হ্যাজাকের মধ্যে একটি সুতার তৈরী গোল জালের মত জিনিস থাকে, তাহাকে বলে ম্যান্টেল। উহা ধরাইয়া দিলে আলো জ্বলিতে থাকে। ধরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে এ ম্যান্টেলটি ভস্ম হইয়া যায় অর্থাৎ শুধু ছাইটি থাকে। ছাইটি নষ্ট না হইয়া গেলে মাসের পর মাস আলো দেয়। যে ম্যান্টেলটি ঘরে আছে বা দোকানে আছে, সে আলো দেয় না। যে ছাই হইয়াছে, সে-ই আলো দেয়। আত্মবিলোপ করিয়া যখন আর আমি (অহং) থাকিবে না বা ছাই হইয়া যাইবে, তখনই আত্মসমর্পণ কার্য সুসম্পন্ন হইবে।" (পৃ. ত্রিশ)

ঋষির ঋষিত্ব ইহাকেই বলে। ব্রহ্মচারীজী বলিয়াছেন, "বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় অর্থ কোন পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই। ......মন্ত্র যাঁহার কাছে প্রকটিত হইবে তাঁহাকে অপৌরুষেয় হওয়া চাই। অপৌরুষেয় হওয়ার অর্থ হইল পুরুষকর্তৃত্বহীন হওয়া। আমি কর্তা এই অভিমান সর্বতোভাবে বিদূরিত হইয়াছে যাঁহার তিনিই অপৌরুষেয় বাণী গ্রহণের যোগ্য। বেদার্থ তাঁহারই বুঝিবার কথা। আমরা তাহা নই বলিয়া বুদ্ধির সীমার মধ্যে শত ইঙ্গিত বুঝিলেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।" (পৃ. ৫৪)

"ঋষির দৃষ্টি অখণ্ড। আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, ভাসা ভাসা, খণ্ড খণ্ড। ঋষির দৃষ্টিই সৃষ্টি। কবিদেরও তাহাই। ঈশ্বরেরও তাহাই। ভাগবত ঈশ্বরকে আদিকবি বলিয়াছেন। এই সৃষ্টিতে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বেদমন্ত্রকে যাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহারাই ঋষি। 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতঃ' বেদকে তাই বলা হয় 'শ্রুতিঃ', revealed scripture', (শ্রীঅরবিন্দ)"। (পৃ. ৫৭)

শতপথব্রাহ্মণে বলিয়াছেন, মন্ত্র দেবতাদের শরীর ('বাগ্ এব দেবাঃ' — ১৪/৪/৩/১৩) ঊর্ধ্বের পরাচেতনার জ্যোতিঃসমুদ্র আলোড়িত উদ্বেলিত করা এক চিৎশক্তি মন্ত্রের মধ্যে নিহিত ('ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তঃ' — ঋ. ৪/৫০/২) আর তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ভাব ও অর্থের এক জ্যোতিঃপুঞ্জ। এই দুই মিলিয়া মন্ত্রের শক্তি ও ক্রিয়া উৎসারিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে অপ্রতিহত বীর্যে ("পৃযন্তং সৃপ্রম্ অদব্ধম্ ঊর্বম্" — ঋ. ৪/৫০/২)।

মন্ত্রের এই ক্রিয়া রহস্যকে কি অপূর্ব সরল ঋজু ব্যঞ্জনায় ব্রহ্মচারীজী ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন করিয়া দেবতারা কথা বলেন — শান্ত ঋজু সরল অথচ গভীর —"পরম চৈতন্যের সৃষ্টির আবেগে স্ফুরিত হয় মন্ত্র; প্রথমে নিজের মধ্যে, তাহার পরে বিশ্বজগতে।"

"সকল সিদ্ধমন্ত্রেরই অর্থ শাশ্বত নিত্য। বেদের মন্ত্রের কেবল অর্থ নিত্য নহে — অক্ষরও নিত্য।"

"ঋষির যখন মন্ত্র প্রাপ্তি ঘটে তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র মানুষ নহেন। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র পুরুষাকারের তিনি ঊর্ধ্বে। তিনি তখন অপৌরুষেয়"। (পৃ. ১৮)

বৈদিক ঋষিদের সকল সাধনার মূলমন্ত্র হইল সত্যং ঋতং বৃহৎ — ঋষিদের ধ্যানে মননে ক্রিয়ায় কর্মে সর্বদা এই তিনটি মহাবাক্য কখনও উচ্চারিত কখনও-বা অনুচ্চারিত ভাবে মন্দ্রিত হইয়াছে। যাহা বৃহৎ তাহাই সত্য। ক্ষুদ্র কখনও সত্য হইতে পারে না। এবং সত্য সতত ক্রিয়াশীল, গতিময়, তাহাই ঋতম্। বেদ অর্থই অনন্ত বৃহৎ। তাহা গতিময় ছন্দোময় এক মহাসংগীত।

বড় চমৎকার করিয়া ব্রহ্মচারীজী তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের কথা বলিয়া, "তিনি বলিতেন — ভগবান্ কি করেন জানেন? নিজেই পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহেন। তাঁহার নিজের গান নিজেই মুগ্ধ হইয়া শুনেন। তিনি বলিতেন, 'ব্রহ্মাণ্ডটি একটি বিরাট পিয়ানো ...' এই পিয়ানোর গানটিকে পিথাগোরাস বলিতেন 'Music of spheres'।" (পৃ. ৮)

বেদের আলোচনায় ব্রহ্মচারীজী তাই সর্বদা সকল কথার মধ্যে সুরের অন্তরার মত এই অনন্ত মূর্ছনার এক গভীর ব্যঞ্জনা ধরিয়া রাখিয়াছেন। যাহা না থাকিলে 'বেদ-বিচিন্তন' হইত না, একটি শুষ্ক দার্শনিক গ্রন্থ মাত্র হইত।

বৃহতের অনন্তের এই নিবিড় আবেশ ধরিয়াই বেদে প্রবেশ হয়। অসীমের এই আকাশদৃষ্টি যাহার লাভ হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদে প্রবেশ সম্ভব নহে।

আজকের দিনে অমাদের হয়তো মনে হইতে পারে, আমি তো তেমন স্বাধ্যায় করি নাই, অগ্নিহোত্র করি নাই, তাই বলিয়া নিজের মনে যেন কোনও হেয় বুদ্ধি না আসে। যদি এই অনন্তের বৃহতের আবেশ লাভ হয়— তাহা হইলে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অতি সত্বর স্থির বুদ্ধিপ্রদান করে — "নানধীতং নাহুতমগ্নিহোত্রম্। মনো ব্রাহ্মী লঘুতামাদধীত প্রজ্ঞাং চাস্মৈ নাম ধীরা লভন্তে" (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৪৬/২৪)। বেদ স্বয়ং আশ্বাস দিয়াছেন, অন্তরে যাহার ব্রাহ্মী বিদ্যা ব্রাহ্মী আকাশের উদয় হইয়াছে সেই তো রাজা, অদম্য বীর্যে সকল বিশ্বকে জয় করিয়াছেন — 'স ইদ্ রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ" (ঋ. ৪/৫০/৭)।

আমাদের পরম সৌভাগ্য ব্রহ্মচারীজী আমাদের মাথার উপরে বেদের সেই ব্রাহ্মী আকাশ বিস্তার করিয়া ধরিয়াছেন — যাহাতে আমরা সেই গভীর বিপুল বৃহতের মধ্যে অবাধে থাকিতে পারি — "উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম" (ঋ. ৫/৪২/১৭)। এবং বেদমন্ত্রের মধ্যে যে গুপ্তরহস্য নিহিত আছে, যাহাকে বলা যাইতে পারে গুপ্তবিদ্যা বা মন্ত্রগুপ্তি ("নিণ্যা বচাংসি"— ঋ. ৪/৩/১৬) তাহার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "বাক্যের অর্থ সাধন করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। আপাত যে অর্থ তাহা মুখোশ মাত্র। বেদের গুপ্ত শব্দ সমূহের অর্থ খুলিবার যে চাবিকাঠি ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সায়ণাচার্যও ঐ চাবি পান নাই। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর যাস্কও পান নাই। তিনি বেদের অভিধান ও নিরুক্ত লেখক। তিনি এক একটি শব্দের দশ-পনেরোটি অর্থ দিয়াছেন। কোন্‌টি যে হইবে বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেক পূর্বেই ঐ চাবিকাঠি হারাইয়া গিয়াছে অথবা কোন অত্যাচারে দগ্ধীভূত হইয়াছে।

এই চাবি না পাইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বেদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অনেক স্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছে।" (পৃ. ১১)

এই গ্রন্থে মহানামব্রতজীর মহাদান হইল তিনি বেদের মন্ত্রগুপ্তির রহস্য বহুলাংশে উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ মেধা মনীষা ও সাধনলব্ধ সত্য উপলব্ধির এক অত্যাশ্চর্য পরিচয়। বেদের গুপ্ত ধনের রুদ্ধ দুয়ার তিনি আমাদের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন। বেদের অর্থ যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পরম নিষ্ঠা লইয়া পাঠ করিলে ভাগ্যবান্ হইবেন। দেবতারা এইভাবে মনে মনে দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন —"মনোতরা রয়ীণাম্" (ঋ. ১/৪৬/২) এইভাবেই তো তাঁহারা আমাদের মনে মনে বিচরণ করেন 'দেবা মর্মাণি সঞ্চরন্তি' (ঋ. ১০/১২/৮)।

শুধু মন্ত্র নহে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নাম মাহাত্ম্য নামের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন—বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা, অঙ্গিরা, ভৃগু, দীর্ঘতমা, সপ্তবধ্রি, বৃহস্পতি, প্রমুখ। এই সব ঋষিগণ ব্রহ্মচারীজীর ব্যাখ্যায় নূতন ভাবে নূতনতর মহিমায় দীপ্যমান হইয়া পরম জ্যোতির্ময় চেতনা হইতে নামিয়া আসেন— "পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি ষেদুঃ" (ঋ. ৪/৫০/৩)।

বেদের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে বেদাঙ্গের পরিচয় প্রয়োজন। তাই প্রথমেই বেদের অনন্ত চেতনার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া মন্ত্রের মাহাত্ম্য ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া অতঃপর ব্রহ্মচারীজী বেদাঙ্গকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তির নাম জানিলেই তাহাকে জানা হয় না। সকল জ্ঞাতব্য তথ্যের সহিত ব্যক্তিটিকে সর্বতোভাবে জানিলে তাহাকে ঠিক ঠিক জানা হয়। বেদের ছয়টি অঙ্গ — শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ছন্দ বেদের চরণ। কল্প বেদের হস্ত। জ্যোতিষ বেদের চক্ষু। নিরুক্ত বেদের কর্ণ। শিক্ষা বেদের নাসিকা। ব্যাকরণ বেদের মুখ। অঙ্গ ব্যতীত যেমন কোন অঙ্গধারীর পরিচয় হয় না, সেইরূপ বেদাঙ্গ না জানিলে বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব হয় না।" (পৃ. ৪৩)

জ্ঞান কত গভীর ও বিশাল হইলে তবেই এই বিচিত্র জটিল বিষয়কে তিনি এমন নিপুণ কয়েকটি আলোর আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তাহা বিস্ময়কর।

বেদের ঋষিদের মন্ত্র প্রার্থনা ও স্তবের ভিতর যে কি গভীর বিশ্বকল্যাণের আর্তি ও নিবিড় আত্মিক মমত্ববোধ নিহিত রহিয়াছে, কি অপরূপ সাহিত্য সম্পদ্ ও শিল্পচেতনা রহিয়াছে তাহা এমন করিয়া আর কেহ পূর্বে আমাদের দেখান নাই।

এতদিন আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, বেদে গভীর জ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে কিন্তু ভক্তির কথা নাই। কিন্তু মহানামব্রতজীর কাছে আমরা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইয়াছি তাঁহার অনবদ্য মার্গ প্রদর্শনে। বেদ সংহিতা ও সাত্বত সংহিতা অর্থাৎ বেদ ও ভগবদ্ ভক্তির মধ্যে অনন্য সম্বন্ধ প্রদর্শনে। বেদের মধ্যে কি নিবিড়ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ ভক্তি, তাহা তিনি না দেখাইয়া দিলে আমরা দেখিতাম না। তিনি এক-এক করিয়া নববিধা ভক্তির কথা — শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন — বেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহারই সঙ্গে পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়াছেন বেদে ভক্তি সাধনা, পঞ্চ রসের মধ্যে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিন রসের অনুভূতির কথা। আর যে দুইটি, শান্ত ও দাস্য, এই দুইটি রসের

প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী বলেন, "শান্ত ও দাস্য রসে রসের আস্বাদন হয় না। কারণ, শান্ত রসে কোন সম্বন্ধ হয় না, তুমি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, এই মাত্র সম্বন্ধে রস হয় না। স্রষ্টা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে এত দূরত্ব যে, তাহাদের সম্ভ্রম বুদ্ধি এত প্রবল যে, প্রীতিময় রসের উদয় হয় না।

দাস্য রসে তুমি প্রভু, আমি দাস — এই সম্পর্কও সম্ভ্রমযুক্ত, নৈকট্যের অভাব। পায়ের তলায় বসিয়া পাদুকা পরানো যায় মাত্র; কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া ধরা যায় না এবং তাহা না হইলে রস জীবন্ত হয় না। স্নেহপ্রীতিতে জীবন মন দ্রবীভূত হইলে রসের আস্বাদন হয়।" (পৃ. ৯২)

ইন্দ্র ও অপালার (ঋ. ৮/৯১) মধুর রসের নিবিড়তা ব্রহ্মচারীজী এমন করিয়া না দেখাইয়া দিলে আমরা বঞ্চিত থাকিয়া যাইতাম। তিনি মন্ত্রের পর মন্ত্র নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "সব রসের প্রসঙ্গই বেদে আছে। এমনকি পরকীয়া রসের কথাও বেদে আছে তাহা অপালার দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো হইয়াছে। .... ধর্মের উপাস্য পরম দেবতা ভগবান্, উহাই ভাগবত ধর্ম। বৈদিক দেবোপাসনা বস্তুত ভগবানেরই উপাসনা। অতএব বৈদিক ধর্মও ভাগবত ধর্ম।" (পৃ. ১০১)

আরো চমৎকারিত্বের কথা এই, ব্রহ্মচারীজী মহাভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া -- "বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষব। আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।" (মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৬/৯৩) বেদে হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। দীর্ঘতমা ও ভৃগু ঋষির দুইটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন (পৃ. ১০৩ - ১০৫), নামকীর্তন বেদের অন্তরের কথা। এইটি এক অভিনব সংবাদ। তিনি প্রমাণ সহযোগে এই বার্তা স্পষ্ট করিয়া দিয়া শেষে বলিয়াছেন, "মহাপ্রভুর দান যে হরিনামের কথা ও তাহার অসীম মাহাত্ম্যের কথা যে বেদ বলিয়াছেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। মহাপ্রভুর দানকে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, বৈরাগীদের কতকগুলি অবান্তর কথা বলিয়া মনে করেন। মহাপ্রভু যে কিছুই অবৈদিক বলেন নাই, তাহাই আমাদের বক্তব্য।" (পৃ. ১০৩)

গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথাও আমরা যেন অন্যমনস্ক হইয়া শুনি, তাহার যথার্থ গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুধাবন করি না — "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো" (গীতা, ১৫/১৫)। বেদের মন্ত্র সব সান্ধ্যভাষায়, কিছু আলো কিছু অন্ধকার বিশিষ্ট কথা, কিন্তু হরিকথায় বেদের মন্ত্র সর্বত্র প্রায় আলোর ভাষা হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারীজী তাই বলেন, "লুকানো ঠাকুর ধরা পড়িয়া গিয়াছেন এমন মনে হয়।" (পৃ. ১০৩)

এইভাবে ব্রহ্মচারীজী বেদমাতার মন্দিরের আলোর দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন, বেদের ভিতরে অবৈদিক ধারা, বেদ ও তন্ত্র, আবরণের

আড়ালে মূল তত্ত্ব, বেদের নিত্যত্ব, বেদে অবতারবাদ, দেবতা সাকার না নিরাকার? ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে তিনি সহজ সারল্যে প্রতিভাত করিয়া দিয়াছেন। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করিয়াছেন। পুরাণের দৃষ্টির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি মিলাইয়া দেখাইয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত হইবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞানের গবেষণা ও ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি বেদতত্ত্বকে কি চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিজ্ঞান-মনস্ক অল্পজ্ঞ সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বেদের প্রতি একটা উন্নাসিকতা রহিয়াছে। তাহাদের নূতন করিয়া ভাবাইয়া তুলিবে।

বেদের অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই ত্রয়ী দৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করিয়া ব্রহ্মচারীজী একে একে বৈদিক সব দেবতাদের আবাহন করিয়া তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। দেবতাদের দর্শন করাইয়া দিয়াছেন। দেবতারা দ্যুলোক ভূলোকের অন্তরে সোনার আলোয় ঝলমল করিতেছেন — "দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বিভাতি দেবাঃ" (ঋ. ১/৯৬/৫) একমাত্র ব্রহ্মচারীজীই পারেন তাঁহার অনুপম ভাষায় বলিতে। তাঁহার ভাষা শুচি সরল তপঃসিদ্ধ গম্ভীর — যাহা যথার্থ দেববাহন। আমরা দর্শন করিতে পারি — অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য বা সবিতা, বরুণ, মিত্র, রুদ্র, দধিক্রা, উষা, বৃহস্পতি, পূষা, ত্বষ্টা, অপাং নপাৎ, স্বাহা ও স্বধা, দ্যাবা-পৃথিবী একের পর এক — মহিমার পর মহিমা, আলোকিত আকাশ, স্বর্গের পরিব্যাপ্ত দীপ্তচ্ছটা — "শীর্ষণি দ্যাং মহিনা প্রতি অমুঞ্চত", "ওজো মিমানো মহিমানম্ অতিরৎ" (ঋ. ২/১৭/২)।

ইহার পরেই তিনি দেবতাদের বহুত্বের ও একত্বের বিরোধিতার সমাধান করিয়াছেন।

বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয় গায়ত্রী সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা। এমন প্রাঞ্জল চিত্তাকর্ষক সর্বাবগাহী আলোচনা আর লেখা হয় নাই। আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ ভরে না। এমন চিত্তপ্রসাদ এমন অনুভববেদ্য ভাষা না হইলে গায়ত্রী ধ্যান হয় না। এই চুরানব্বই বৎসর বয়সে কন্কনে শীতের সন্ধ্যায় বাগানে একটি ফুলের দিকে যিনি তন্ময় হইয়া তাকাইয়া থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, একটি ফুলের গঠন সুষমার দিকে তাকাইয়া বিভোর হইয়া যান; তাঁহার সেই ধ্যানদৃষ্টির অতলতা পরিমাপ করিবে কে? তিনি ছাড়া গায়ত্রী-মাতাকে দেখিবার বলিবার আমাদের আছে কে?

উর্বশী ও পুরূরবার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাহা যে কত গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত, সে ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া আর কে করিবে?

তাঁহার হস্তের স্পর্শে সত্য তাহার সবখানি সৌন্দর্য লইয়া পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। উর্বশী পুরূরবা, অগস্ত্য লোপামুদ্রা সূক্তগুলি সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ অনুভূত হয়।

তাঁহার বর্ণনায় দেবতাদের পরিচয় জানিতে পারিলে জানা যায় বেদের মূল তত্ত্ব ও সাধনার রহস্য। সেই সঙ্গে আমাদের জীবন জগৎ ও বাস্তব অবস্থার মূল অর্থ ও তাৎপর্য। দেবতারাই হইলেন জগতের অস্তিত্ব ও মনস্তত্ত্ব — "য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ" (ঋ. ১০/৬৩/৮)। লেখক প্রসঙ্গত রায়মুণ্ড পানিক্করের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "The mystry of God is the mystry of Man and mystery of Reality" — বেদের এই রহস্য ও তত্ত্ব কি তাহা ব্রহ্মচারীজী বলিয়াছেন, "সমগ্র বেদ মুখ্যত দুইটি তত্ত্বকথা আমাদের জানাইতে চাহেন: (১) পরব্রহ্ম কি বস্তু ও (২) তাঁহাকে পাইবার উপায় কি। বেদে এ দুইটিই যুদ্ধময়। বহুর মধ্যে দিয়া একত্বের উদ্ধার ইহাও যুদ্ধ। আর মায়ার অন্ধকারের আবরণ কাটাইয়া সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানা — তাঁহার জন্য উপাসনা করাও এক ভয়ানক যুদ্ধ। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চলে। সাধন ভজন একটি কঠিনতম সমর। মনে হয় এই দু'টির দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বেদকে যুদ্ধ বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, 'বেদ পড়িলে ভেদ থাকে না।' যখন আমরা ভেদবুদ্ধি রহিত হই, তখন যুদ্ধে আমরা জয়ী।" (পৃ. ৭৫)

তাহারই প্রয়াসে ব্রহ্মচারীজী বেদের অখণ্ড তত্ত্বের জ্ঞাপক বিখ্যাত কিছু সূক্তের ব্যাখ্যা দিয়াছেন; যেমন, পুরুষ সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত, স্বর্গ সূক্ত, সৌভ্রাত্র সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, সংজ্ঞান সূক্ত, যাহার কোনও একটি সূক্তকে সম্যক্ অধ্যয়ন করিলে প্রাচীন কালে বেদপাঠীকে সমাবর্তন দেওয়া হইত। এই সঙ্গে জানাইয়াছেন বেদের মধুবিদ্যা, মহাজাগতিক স্কম্ভ, বিশ্বের মূলা স্থিতি ও ধৃতি ('axis mundi') তাহার কথা।

ব্রহ্মচারীজী সিদ্ধপুরুষের সত্য দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন বেদ ও তন্ত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক। ভক্তিসাধনা ও শক্তিসাধনার মধ্যে মূলত কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "অহমেব অক্ষয়ঃ কালঃ" (গীতা, ১০/৩৩) — আমিই অক্ষয় কাল। এবং কালই কালী। তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন লিঙ্গভেদ নাই। বেদের মধ্যে অন্তঃশায়ী হইয়া রহিয়াছেন চিন্ময়ী মহাশক্তি। বেদের ঋষি বামদেব তাই বলিয়াছেন সৃষ্টির সপ্ত ভুবনে রহিয়াছেন এই মাতৃশক্তি — "সপ্ত মাতুঃ পরমাণি" (ঋ. ৪/১/১৬)। অগ্নির যে সপ্ত জিহ্বা তা সবই কালীশক্তির ক্রিয়া। 'বেদে কালীমাতার সঙ্কেত' প্রবন্ধে ব্রহ্মচারীজী তাহার প্রত্যেকটির চমৎকার অর্থ ও বিবরণ দিয়াছেন — কালী করালী মনোজবা

সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি। অগ্নিই মহাশক্তিরূপে লেলায়মানা। ব্রহ্মচারীজী আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন মা কালীর গলায় একান্নটি ছিন্নমুণ্ড, এই মুণ্ডমালা আসলে বর্ণমালারই মাতৃকারূপ। ভারতের একান্নপীঠ। মা কালীর গলার মুণ্ডমালার মত সরস্বতীর হাতের বীণাও বর্ণমালার প্রতীক। ব্রহ্মচারীজী পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য এবং তাঁহারই হাতে আমরা পাইয়াছি 'চণ্ডীচিন্তা'-র মত গ্রন্থ যাহা শক্তি সাধনার মর্মকথা। বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধিতে যুগপৎ কৃষ্ণ ও কালীর দর্শন ও মিলন সাধিত হইয়াছে — হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী। তিনিই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কালীসাধনার কথা, তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী মা সারদার কথা। শ্রীঅরবিন্দের কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল কারাগারে। তাহার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের কালীদর্শন ও কালীশক্তির সাক্ষাৎ সম্পাৎ হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে।

আলোচ্য গ্রন্থে অথর্ববেদ হইতে যে কালসূক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার দ্বারা বেদতত্ত্বকে নূতন করিয়া জানিতে সাহায্য করিবে। শুধু তন্ত্র ও বেদ নহে, লৌকিক পৌরাণিক দেব-দেবীরও বৈদিক তাৎপর্য ও সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন বাংলার ঘরে ঘরে যে মা-মনসার পূজা হয় তাহা আসলে বেদের সার্পরাজ্ঞী। ব্রহ্মার মানসকন্যা মনসার লৌকিক রূপ। বেদের মন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে এই সার্পরাজ্ঞীর বা সাপের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দের মত শক্তির স্ফুরণ— "পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ" (ঋ. ১/৮৪/৮)।

ব্রহ্মচারীজী আমাদের অনেক দিয়াছেন। আমাদের গ্রহণ সামর্থ্য বিচার না করিয়া নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই মহাদান কখনও বিফলে যাইবে না। বাঙালী জাতি এই ভূরিদানের যোগ্য হইয়া উঠিবে এই প্রার্থনা করি। আমরা যাহারা দুর্বল, অজ্ঞানের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ, আমাদের বলাধান করিয়া ধরিয়াছেন। যাহারা কাতর তৃষ্ণার্ত আস্পৃহায় উন্মুখ, আমাদের কাছে ব্রহ্মচারীজী তৃষ্ণাহরা হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার এই বেদগ্রন্থখানি হাতে লইয়া। তাঁহারাই চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা জানাই, আমাদের সুপথে অধ্যাত্মিক পথে লইয়া চলুন। লইয়া চলুন আমাদের উত্তম জ্ঞান ও বিদ্যার পথে।

অবতরণিকা

বেদশাস্ত্রীয় বিশ্বদৃষ্টি

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন আমার অধ্যাপক। লণ্ডনে একটি সভায় আমরা উভয়েই ছিলাম বক্তা। একই স্থানে আমরা বন্ধুর মত বাস করিয়াছিলাম। তিনি ভারতের রাষ্ট্রদূত হইয়া রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি কার্ল মার্ক্সীয় তথাকথিত সাম্যবাদ বা রাশিয়ার উগ্র রাজনৈতিক মতবাদে মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি সেখানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির অবদান যে সাম্যবাদ, যাহা বিশ্বের সকল মানবের মধ্যে, এমনকি প্রতি জীবের মধ্যে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত আছেন এই জ্ঞানে সকলকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে; যাহা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুক্কুরে কোন পৃথক্ত্ব দর্শন করে না (গীতা, ৫/১৮), সেই সাম্যবাদই ছিল তাঁহার আদর্শ।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ *The Hindu View of Life* নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। জীবনের প্রতি সকলেরই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে বা থাকে। হিন্দুগণেরও আছে। তাহাই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার *The Hindu View of Life* গ্রন্থে। শুধু হিন্দুর নহে, যে সকল দেশ বা জাতি সুগঠিত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু উন্নত, তাঁহাদেরই একটি জীবনদর্শন থাকে বা আছে। শিক্ষা-সভ্যতার আলোকে তাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। শুধু দেশ বা জাতির নহে, বিশিষ্ট মনীষী ব্যক্তিগণেরও একটি জীবনদর্শন থাকে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহারও একটি জীবনদর্শন আছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ অজস্র লেখনীর মধ্য হইতে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যায়। মনে হয় তাঁহার 'বসুন্ধরা' কবিতায় এই জীবনদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন —

> " .... নিখিলের সেই
> বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই

একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে।"

তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ লেখার মধ্যে প্রকাশমান।

বেদ একখানি সুবিশাল গ্রন্থ। গভীরতায়, ব্যাপকতায় সকল দিক্ দিয়াই সুবিশাল। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও সূত্র বাদ দিলেও চারিখানি বেদ-সংহিতায় কুড়ি হাজারের কিছু বেশী মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া ঋষিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেইটি অনুধ্যান করিলে বেদের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় সম্ভব।

বেদ যেন একটি বিশাল সংগীত। সংগীতের একটি ধ্রুবপদ বা ধুয়া থাকে, যাহা বারংবার সংগীতের অগ্রগতির সঙ্গে কিছু পরে পরেই কর্ণগোচর হয়। বেদের ধ্রুবপদটি হইল — "বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ" (ঋ. ২/১/১৬) — বৃহতের কথা বলিব। বৃহতের মহিমার কথা বলিব। বীরের মত বলিব। বীরোচিত বীর্যবত্তার সহিত বলিব। যিনি বৃহৎ, তিনি অখণ্ড, অনন্ত ও ভূমা। যে ভূমা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল, তাঁহাকে যেন বাঙ্ময় করিতে পারি। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বলিব। আমাদের জীবন যেন হয় সেই সীমাতীতের উদাত্ত ঘোষণা। যেন সর্বদাই উদ্‌ঘোষণা করিতে পারি, সজ্জনসভায় যাইয়া সেই সীমাতীতের কথা যেন ঢক্কানিনাদে জানাইতে পারি। যেন সংশয়শূন্য ভাষণে, দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট উচ্চারণে, দুর্দমনীয় বীর্যবত্তার সঙ্গে, সাক্ষাৎ উপলব্ধিকে বাঙ্ময় মূর্তি দিতে পারি। যেন বৃহতের মহাশক্তি বা মহামহিমাকে মানবসমাজে জানাইতে পারি। ইহাই বৈদিক ঋষিসংঘের আশা, আকূতি ও সঙ্কল্প। ইহাই তাঁহাদের সাধনা ও সাধনার পূর্ণসিদ্ধি। ইহা যেন বৃহতেরই কম্বুকণ্ঠ। ঋষিবৃন্দের ভাবাবেশে সমদ্ভূত। ঋষিগণের এই আর্তি শ্রীঅরবিন্দের বিস্ময়কর ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে — "May we voice the vast, strong with the strength of Heroes." ।

বেদশাস্ত্র ভরিয়া তিনটি কথা বারংবার শ্রুতিগোচর হয় — "সত্যং, ঋতং ও বৃহৎ"। ইহা বেদশাস্ত্র গঙ্গোত্তরীর উচ্চে বিরাজিত। ইহার পরিণতি বেদান্ত-সিন্ধুর অচঞ্চল অতলস্পর্শী ভূমিতে, সচ্চিদানন্দরূপে।

সত্য সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। তাহার মধ্যে ছন্দের গতি আনয়ন করে "ঋতম্"। সত্যের মধ্যে ক্রীড়া-কৌতুক আনে, ভাগবতী লীলার উদ্বোধন করে "ঋতম্"। ঋতের ক্রীড়ায় সত্যের অমোঘ বিস্ফোরণই বৃহৎ। যিনি সর্বাধিক বড়, তিনি নিজে কেবল বড় নহেন, অন্যকেও বড় করেন। যিনি তাঁহাকে ভাবনা করেন, তাঁহাকেও বড় করেন।

যাঁহাকে "অবাঙ্‌মনসো গোচরঃ" বলিয়া বেদ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারই আবার নামকরণ হইয়াছে পরব্রহ্ম। তাঁহার কথা অশেষ প্রকারে বহুস্থলে ঘোষিত হইলেও, মনে হয় অথর্ববেদের স্কম্ভ সূক্তটিতে তাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুপরিস্ফুট হইয়াছে (অথর্ববেদ, ১০/৭)। তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বহুস্থানে, বহু কথায় থাকিলেও পুরুষসূক্তের বিশ্বযজ্ঞের বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে সুব্যক্ত।

যে কোনও সুসিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বৈষ্ণব আচার্যপাদেরা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করেন সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। আমার আলোচ্য বিষয় বেদ-শাস্ত্রের সাধ্য-সাধন রহস্য।

জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে 'ভেল্ট-আন্‌সাউঙ্‌' (*Weltanschauung*)। তাহারই অনুবাদ করিয়াছি শিরোনামায় — 'বিশ্বদৃষ্টি'। শ্রীকুমারবাবু বাঁচিয়া থাকিলে আরও সুন্দর পরিভাষা দিতে পারিতেন।

একটি ছাউনি করিতে হইলে চার কোণে চারটি পিলার (Pillar) বা স্তম্ভ অপরিহার্য। উহা আর একটু দৃঢ় করিতে হইলে বারোটি স্তম্ভ দরকার হয়। আরও পাকাপোক্ত করিতে হইলে আরও চারিটি চাই, ষোলোটি পিলার হইলে সুন্দর হয়। কিন্তু বর্তমানকালে RCC (Reinforced Concrete)-এর যুগে অনেক স্থলে একটি স্তম্ভের উপর বিরাট ভবন বা স্ট্রাক্‌চার (structure) দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ে ভাবি, ঐ একটি স্তম্ভের সঙ্গে প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশের যোগাযোগ আছে। চোখে দেখা যায় না, সব আড়ালে আছে, "কত ভালবাস থাকি আড়ালে।"

স্কম্ভ সূক্তটি বলিয়াছেন, এই নিখিল বিশ্ব দাঁড়াইয়া আছে একটি স্তম্ভের উপর। সূক্তটিতে আছে এক-ই দৃষ্টির বা একত্বের মন্ত্র। শ্রীরাইমুণ্ড পানিক্কার (Raimundo Panikkar) তাঁহার *The Vedic Experience* গ্রন্থে মন্ত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। (পৃ. 61) দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :

Skambha

10. Through whom men know the worlds and what enwraps them,
the waters and Holy word, the all-powerful
in whom are found both Being and Non being —
Tell me of that support — who may he be ?

12 On whom is firmly founded earth and sky
and the air in between; so too the fire,

moon. sun. and wind. each knowing his own place—
Tell me of that Support — who may he be ?

32. Homage to him of whom the earth is the model,
the atmosphere his belly, who created the sky
from his head. Homage to this supreme Brahman !

সূক্তটি পাঠ করিলে বুঝিতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, পরাৎপর পরব্রহ্মই বেদশাস্ত্রের চরম সাধ্যবস্তু। সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে একাক্ষর বীজে প্রণবে, ওঙ্কারে।

এই সাধ্যবস্তুকে জানিতে হইলে, শুধু জানিতে হইলে নহে, একাত্মক হইয়া পাইতে হইলে যে সাধন, তাহা জানাইয়াছেন পুরুষসূক্ত। পুরুষসূক্তের প্রধান কথা বিরাট সৃষ্টিসংসার একটি যজ্ঞ, একটি বিরাট যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পুরুষ আপনাকে আহুতি দিয়াছেন, দিতেছেন। অনন্তকাল ধরিয়া দিবেন। এই মহাযজ্ঞ নিরন্তর চলিতেছে। এই যজ্ঞের যজমানও তিনি, বলিও তিনি। তাঁহার আত্মবলি হইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সকলই উদ্ভূত, স্থিত ও গতিময় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলে এই মহাযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া ঐ যজ্ঞ চলিতেছে।

এই সাধ্যলাভে আমাদের সাধন হইতেছে ঐ মহাযজ্ঞে আত্মবলিদান। যাহা আমি, আমার যাহা আছে, ভবিষ্যতে দৈব কৃপায় যাহা আমার হইতে পারে, কর্মপ্রবাহে আর যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা ঐ মহাযজ্ঞে হবিরূপে অর্পণ করিতে হইবে — ইহাই সাধনা। ক্ষুদ্র সর্বস্বদানে অখণ্ড সর্বস্বলাভ করিতে হইবে, ইহাই বেদের সাধনা। পুনরায় বলি, বেদের সাধ্য পরাৎপর ব্রহ্ম ও সাধনা পরব্রহ্মে আত্মাহুতি। গীতায় শ্রীভগবান্ সেই কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন —

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।" ৪/২৪

ভাবানুবাদ — ব্রহ্ম অর্পণ (যজ্ঞপাত্র), ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা (যিনি যজ্ঞ করেন) ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আহুতি, যাহা কিছু বিশ্বে দেখিতেছি, যাহা কিছু করিতেছি, যাহা কিছু ঘটিতেছে, যাহা কিছু ঘটিবে, সবই ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব এই বিরাট সৃষ্টির মূলে অন্তর্নিহিত। ত্যাগ, তপস্যা ও আত্মবিলোপ ভিন্ন এই সাধনা সম্পন্ন বা পূর্ণ হয় না।

বেদের কথা আগে শুনিতে হইবে। শুধু কান দিয়া নহে, সমগ্র সত্তা দিয়া শুনিতে হইবে। তারপর তাঁহাকে জানিতে হইবে। শুধু বুদ্ধি দিয়া

জানা নহে, সমস্ত অনুভব শক্তি দিয়া জানিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সমস্ত আমিত্বকে হারাইয়া মহা-যজ্ঞাগ্নিতে একাকার হইয়া যাইতে হইবে। যে আমি এই আছি, সেই আমি কোন কার্যে যোগ্য হইতে পারিব না। যে আমি নাই বা রিক্ত হইয়াছি, সেই আমি সর্বকর্মে যোগ্য, সেই আমি আত্মদানে সার্থক।

যেখানে বিজলী বাতি বা ইলেকট্রিক লাইট নাই, সেই স্থানে সভা-সমিতি আলোকিত করার জন্য একপ্রকার আলো (লাইট) ব্যবহার করা হয়। আলো (লাইট)-টির নাম 'হ্যাজাক্ লাইট'। ঐ হ্যাজাকের মধ্যে একটি সুতার তৈরী গোল জালের মত জিনিস থাকে, তাহাকে বলে 'ম্যান্টেল'। উহা ধরাইয়া দিলে আলো জ্বলিতে থাকে। ধরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ম্যান্টেল্‌টি ভস্ম হইয়া যায় অর্থাৎ শুধু ছাইটি থাকে। ছাইটি নষ্ট না হইয়া গেলে মাসের পর মাস আলো দেয়। যে ম্যান্টেল্‌টি ঘরে আছে বা দোকানে আছে, সে আলো দেয় না; যে ছাই হইয়াছে, সে-ই আলো দেয়। আত্মবিলোপ করিয়া যখন আর 'আমি' (অহং) থাকিবে না বা ছাই হইয়া যাইবে, তখনই আত্মসমর্পণ কার্য সুসম্পন্ন হইবে।

বেদশাস্ত্রের সাধ্য একাক্ষর ওঙ্কারমন্ত্র—"ওঁ"। সাধন আত্মসমর্পণ, তাহার মন্ত্র স্বাহা। বেদে যজ্ঞ ও জপকালে যে সকল বিশিষ্ট মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির আদিতে ওঙ্কার (ওঁ) এবং শেষে স্বাহা থাকে। ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বাচক ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলম্বন ও অবলম্বন এই মন্ত্র। প্রণব স্বরূপে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মন্ত্র হইল স্বাহা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কাব্যময় ভাষায় প্রণবের তাৎপর্য প্রকটিত। যথা —

"হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোল আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে

এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।।"
('গীতাঞ্জলি', "ভারততীর্থ")

আত্মসমর্পণের পূর্ণতা আত্মবিলোপে, ক্ষুদ্র আমিত্বের পর্যবসান পূর্ণব্রহ্মে, ইহাতেই সাধনার পূর্ণতা।

"সত্যং ঋতং বৃহৎ"— সত্যং-ই সৎ, ঋতং-ই চিৎ, এবং বৃহৎ-ই আনন্দ (তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আম্নাত, ৩/৫-৬)। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।"

বৃহতের বৃহত্ত্ব ও অফুরন্ত স্বরূপ আনন্দেই পর্যাপ্ত।

একটি অনুনয়

আচার্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর আমাদের একটি অতি ভদ্র পরিচয় দিয়াছেন 'বেদপন্থী'। পরিচয়টি স্বরূপ-প্রকাশক সন্দেহ নাই; কিন্তু অতি ভদ্র পোশাকী। ঐ নামে কেহ চিনিবে না। আমাদের আটপৌরে নাম, সর্বজনজ্ঞাত আদৃত বা অনাদৃত পরিচয় 'হিন্দু' শব্দটিই দৃঢ়তায় ও ব্যাপকতায় চূড়ান্ত। কিন্তু হিন্দু শব্দটির সংজ্ঞা-নির্দেশ দুরূহ কার্য। পারসীকেরা সিন্ধুকে হিন্দু বলিত বলিয়া আমাদের এই নাম। উত্তরে হিমালয়ের 'হি' ও দক্ষিণে বিন্দু সরোবর 'ন্দু' — এই আদ্যন্ত পরিচয় হিন্দু। এই পরিচয়টিও সুন্দর। হিন্দুস্থান বলিলে সমগ্র ভারতকেই বুঝায়।

বাংলাদেশে ঘন বর্ষার দিনে মায়েরা আমাদের খিচুড়ি খাওয়াইতেন। তাহার মধ্যে ছিল সব — তণ্ডুলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বালাম-বাসমতি, দ্বিদলের মধ্যে অতি সুগন্ধ মুদগ-মটর, মসল্লার মধ্যে লবঙ্গ-এলাচির সৌরভ — সর্বোপরি ঈষৎ তপ্ত গব্যের সংযোগে উপাদেয় আস্বাদন। একটি উপভোগ্য সামগ্রী। আমাদের হিন্দু কথাটিও সেইরূপ একটি তৃপ্তিকারক ভোগ্য সম্পদ্।

আমরা প্রায় আশি কোটি লোক এই হিন্দুধর্মাবলম্বী, এই পরিচয় দেই হাতে কলমে; কিন্তু আমরা ইহার উন্নতিকল্পে বিন্দুমাত্র চিন্তা বা গবেষণা করি না, বর্তমানে শাসনদায়িত্ব যে ক'জনের হাতে তাঁহাদের কাছে 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া নিন্দনীয় হইবার ভয়ে। আমরা এতগুলি জনশক্তি কি কাজ করি? কোন ত্যক্ত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সমালোচনা করি। বিশ্বকবির ভাষায় —

"কে বড়ো কে ছোট, কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে

কার জয় কার পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি কাহার হইল ক্ষয়
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়
কে উপরে কেবা নীচে''....... ইত্যাদি।

বিশেষত বাঙ্গালা ভাষী হিন্দুর এই নিত্যকর্মপদ্ধতি। তবু হিন্দু ইহা কত শত শতাব্দীর পরিচয়। ইহা কত প্রাচীন কেহ জানে না। প্রাচীন পুরাণাদিতে এই শব্দ নাই। পাই, তবে তাহা একটি গিরির নামে— হিন্দুকুশ। হিন্দুকুশ ছোট খাটো পাহাড় নহে, সর্বোচ্চ ২০,০০০ হাজার ফুট শৃঙ্গসহ পশ্চিম হিমালয়ের একটি বিস্তীর্ণ শাখা — যাহা আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবর বিরাজিত। কত প্রাচীন যে এই নাম তাহা কেহ জানি না। হিন্দুস্থান যত প্রাচীন, হিন্দুকুশ তত প্রাচীন।

মানুষ যতদিন এই ধরণীর পৃষ্ঠে বিচরণশীল, তদবধি যতপ্রকার ভাবধারা চিন্তা-প্রবাহ জন্ম-কর্মের লক্ষ্যবস্তু, জীবনযাত্রার আদর্শ, যত প্রকার মত-পথ, পথ্য-পাথেয় মানুষের ভাবনার ক্ষেত্রে শির তুলিয়াছে — তাহা লইয়া হিন্দুধর্ম। কথাটি আবার বলি —

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবীয় চিন্তারাজ্যে যতপ্রকার ভাবনাধারা, ধ্যান-ধারণা মানুষের ধর্তব্য-স্মর্তব্য চিন্তার সম্পদ্, সুখ-দুঃখ সংবেদনে গৃহীত আদৃত হইয়াছে তাহাদের সকলের বীজ-অঙ্কুর, বৃদ্ধি-বিস্তার, প্রাপ্তি-প্রসার, গ্রহণীয়-উপেক্ষণীয় হইয়া আসিয়াছে, রহিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে হিন্দু-মুলসমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান আউল-বাউল মরমীয়া-মোহান্ত আর্য-অনার্য বৈদিক-অবৈদিক ব্রাত্য সন্ত-সজ্জনের যে দান, তাহা বাংলাদেশের পূর্বোক্ত অতি উৎকৃষ্ট কৃশরান্ন বা খিচুরির মত হিন্দু সভ্যতায় রূপদান করিয়াছে। তাহাতে আছে কি, নাই বা কি? সর্বপূর্ণতা ও সর্বশূন্যতার সমাহারে একটি অভিনব আস্বাদনের বস্তু।

বীজগণিত শাস্ত্রে যেকোনও অঙ্ককে শূন্য শক্তিতে তুলিলে এক (১) হয় তাহার ফল ($a^0 = 1$)। এই একত্বের মধ্যেই ছিলাম, আছি ও থাকিব। ইহার মূলে একটি অনির্বচনীয় শাস্ত্র, তাহার নাম বেদ।

প্রাচীনকালে একদিন ছিল মানুষের জীবনই বেদ। আগাছা পরগাছায় বেদকে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পরিণত করিলেও এখনও এই ভারতে কোটি কোটি নরনারীর জ্ঞানধারা ও কর্মধারা মুখ্যতঃ বেদনির্দিষ্ট প্রণালীতেই প্রবাহিত। আজও বেদবৃক্ষ জীবন্ত, এখনও তাহার শাখা-প্রশাখার বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে সমগ্র আর্যসভ্যতা ও হিন্দুসমাজ বিরাজিত।

এই বৃদ্ধবয়সে একটি ভাবনা পাইয়া বসিয়াছে — হিন্দুসভ্যতা তথা ভারতের সংস্কৃতি তথা সমগ্র মানবজাতি যদি মানবীয় দৃষ্টি লইয়া এক

প্রাণতায় বাঁচিতে চায়, তাহা হইলে বেদোন্মুখী হইতেই হইবে। 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

এই গ্রন্থে আমি বেদের কোন ভাষ্য লিখিতে প্রয়াসী নই। সেই ধৃষ্টতা আমার নাই। তাহা গ্রন্থটির 'বেদ-বিচিন্তন' এই নামেই পরিচয়। পূর্বে তিনি যাহা হাতে ধরিয়া লিখাইয়াছেন, তাহাতেও ব্যাখ্যার কোন চেষ্টা নাই, তাহাও গ্রন্থগুলির নামেই পরিচয়; যেমন— চণ্ডীচিন্তা, উপনিষদ্ ভাবনা, গীতাধ্যান, গৌরকথা ইত্যাদি। যিনি "বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তিনি যখন যে চিন্তা এই মানবক-হৃদয়ে জাগাইয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কাহার কি উপকার হইবে তাহাও ভাবনায় নাই। যদি কোন মানুষ বেদমুখী হয় তবে তাহাও তাঁহারই ইচ্ছা।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর জীবজগতের কল্যাণকে দুইটি নূতন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন — উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ। মানুষ পশুত্বের সীমা ছাড়াইয়া যখন মানবতায় পৌঁছিবে তখন তাহার উদ্ধারণ। মানবতা ছাড়াইয়া যখন মহামানবতায় বা দেবত্বে নিত্য লীলাকুঞ্জে প্রবেশপথে, তখন মহাউদ্ধারণ। এই দুইয়েরই পথ বেদে নিহিত। তাই প্রভু উপদেশ দিয়াছেন — "বেদবিধি মতে সব করিবে পালন।"

শুধু হিন্দুধর্মের নহে, অন্যান্য ধর্মেরও যাহা মূল কথা, তাহারও উৎস বেদ। সেই উৎসের প্রাণশক্তি কিঞ্চিৎ উদ্বেলিত হইলে সকল ধর্মেরই জীবনাধান হইবে এই বিশ্বাস লইয়া জীবনযাপন করি। ঋগ্বেদের ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আবার বলি —

"বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ।" (ঋ. ২/১/১৬)

বৃহতের কথা বলিব, বীরের মত বলিব। সজ্জন সমভিব্যাহারে ঊর্ধ্ববাহু করতঃ বলিব। ঢক্কা নিনাদে উদ্‌ঘোষণা করিয়া সত্য, ঋত ও বৃহতের বাণীই বলিব। শ্রীপাদ শ্রীগুরুমুখোক্তি —

"কেহ শুনুক বা না শুনুক,
যাচুক বা না যাচুক,
আগমনী গেয়ে যাব।।"

পরম সুন্দর বেদারাধ্য শ্রীহরির কথা বলিয়াই যাইব। জন্মজন্মান্তরে ইহাই হউক মহাব্রত। শ্রীগুরু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর ইহাই নির্দেশ।

দ্বিতীয় স্তরের কথা — মহাউদ্ধারণ স্বরূপে। বেদোক্ত ভাষায়, "ত্বমস্মাকং তব স্মসি" (ঋ. ৮/৯২/৩২)— তুমি আমাদের, আমরা তোমার। এই গভীর অনুভূতিতে স্বরূপে শাশ্বতী স্থিতি। পরম

আরাধ্যতমের সঙ্গে নিত্য সখ্যে বাস। চিত্তের চির চৈতন্যময় আরোহিণীতে, অতিমানস ভূমিতে গতি লাভ। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অমৃত ভাষায় — "ঘাটে ঘাটে যমুনা, হৃদে হৃদে রাস" এই শিখরভূমিতে চিরনিষন্নতা।

বেদে মাতৃজাতির অধিকার

আমি আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শ্রীমৎ দামোদরাশ্রমজীকে একবারে পাঠাইতে পারি নাই। একাধিকবার পাঠাইয়াছি। এইজন্য উনার লেখার মধ্যে ক্রমচ্যুতি দোষ অনেকে ধরিতে পারেন, সেই জন্য আমি দায়ী। একবারে পাঠাইতে পারিলে এইরূপ হইত না। এই লেখার মধ্যে আমি কোন হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি নাই। করিলে পাছে আমার উদ্‌গার দোষ স্পর্শ করে এইজন্য হাত দিতে সাহস করিতে পারি নাই। আমি কিছু মন্তব্য লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, উনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভূমিকা তুল্য। এই ভূমিকার 'প্রাগ্-বাণী' নাম আমার দেওয়া।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার কোথায় বিশেষ অমিল আছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া উনি আমাকে সুখী করিয়াছেন, এই সব কথার উত্তর দিয়া একটি বিতর্কের (dibate) সৃষ্টি করার স্থান ইহা নহে। তবে দু একটি কথার সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি।

মাতৃজাতির বেদে অধিকার নাই — এইকথা শুধু উনিই বলেন নাই, আরও অনেকে বলিয়াছেন। শাস্ত্রেও কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। উহার উত্তরে শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, শৌনকীয় বৃহদ্দেবতায় যে কুড়ি জন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা নারী-ঋষির উল্লেখ পাই তাহা কেমনে হয়, মাতৃজাতির যদি বেদে একেবারেই অধিকার না থাকে? অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ এইরূপে মন্ত্রদ্রষ্টা। নারী-ঋষিদের উল্লেখ বেদ-সংহিতায় একাধিক বার রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নীর অন্যতমা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী নারী মৈত্রেয়ী। এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে কত বৈদিক মন্ত্র আমরা নিত্য পূজাচর্নায় ব্যবহার করি। উহাদের মধ্যে একটি বিখ্যাত মন্ত্র আচমন মন্ত্র। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।" তবে কি মাতৃজাতি পূজার্চনের পূর্বে আচমন করিবে না? আচমন ভিন্ন পূজার্চনা কিরূপে সম্ভব হইবে? বেদের স্বস্তিবাচন উচ্চারণ না করিয়া পূজার্চনা আরম্ভ করিবে? কোন অর্চনীয় অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে গেলেই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। মাতৃজাতির বেদে অনধিকার, তাহার নিজের কোন পাপের ফল হইতে পারে না। কেননা সে নারী হইয়াই জন্মিয়াছে।

যদি বলা যায় পূর্ব জন্মের কোন পাপের ফলে নারীজন্ম হয় — এই-রূপ কথা কোন স্থানে কেহ বলেন নাই। আর, যে পাপে নারীজন্ম হয়, জগতে সকলে যদি সেই পাপ হইতে মুক্ত হয় তবে তো আর নারী জাতিরই জন্ম হইবে না। নারীবিহীন সমাজ অকল্পনীয়।

প্রণব উচ্চারণ সম্বন্ধেও নারী জাতির অনধিকার। এই প্রসঙ্গেও জিজ্ঞাসা করি, এই অনধিকারের কথা ভগবান্ কি জানিতেন না? জানিলে তিনি গীতার মূল শ্লোকের মধ্যে তিন তিন বার প্রণব দিলেন কেন? "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" (৮/১৩), "ওঁ তৎসদিতি নির্দেশঃ" (১৭/২৩) এবং "তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য" (১৭/২৪) এই শ্লোক তিনটি গীতা পাঠ করিতে গেলেই বলিতে হয়। এই বিষয়ে 'ভারতাজির' পত্রিকার সম্পাদক শাস্ত্রসেবক শ্রীমান্ জয়নারায়ণ সেন আমাকে লেখা তাঁহার একটি পত্রে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন উভয় কূল রক্ষার্থে। তিনি বলেন, স্ত্রী ও শূদ্রগণ গীতার উক্ত প্রণব উচ্চারণের স্থানগুলির ক্ষেত্রে মানসে অথবা অনুচ্চস্বরে পাঠ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবের সমর্থনের কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ আমরা দিতে পারিব কি?

শাস্ত্রে আছে দ্বিজবন্ধুদেরও বেদাধিকার নাই। দ্বিজবন্ধু বলিতে "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামপি মধ্যে যে পতিতা নিন্দিতকর্মণশ্চ।" (শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবত', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭) অর্থাৎ গর্হিত-আচার ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, নিষাদ ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ দ্বিজবন্ধু বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত। তাহারা শাস্ত্রে অনধিকারী। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের কথা বলিতে গেলে দেখি শাস্ত্রানুসারী অধিকারী ব্রাহ্মণের অভাব — বাংলায় তবে বেদচর্চার আর কোনরূপ সুযোগই বুঝি রহিল না। এ যেন "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়"। আমরা বাঙ্গালী জাতি আমাদের সব সম্পদ্ হারাইতে বসিয়াছি। সম্প্রতি আমার নিজের দেখা এক সদ্ ব্রাহ্মণবংশজ শিক্ষিত যুবক — বয়স তাহার কুড়ি হইতে চলিল অথচ তাহার এখনও উপনয়ন সংস্কারই হয় নাই নানা কারণে। অথচ তাহার নামের সহিত ব্রাহ্মণোচিত পদবী খানি যথারীতি নিঃসঙ্কোচে সে ব্যক্ত করিল। হয়ত এইভাবেই বাকী জীবন চলিয়া যাইবে। আমাদের এ দুঃখ, এ লজ্জা বলিবারও নহে। তাই ভাবি, দেশে বেদশাস্ত্রের অধিকারীর এতই যখন অভাব, তখন কি কাজ এ বেদালোচনার? কে শুনিবে এই কথা? আবার শাস্ত্রেরও নির্দেশ শূদ্র ও নারী জাতি বেদপাঠ দূরের কথা—শুনিতেও পারিবে না (ন শ্রুতিগোচরা)।

পূর্বেই বলিয়াছি অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত মনে করেন যে, বেদে স্ত্রী ও শূদ্র জাতির অধিকার নাই। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে বেদে আছে বলিয়া 'নৃসিংহ-পূর্বতাপনী' উপনিষদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন। সেখানে আছে— "প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী সাবিত্রীং শূদ্রায় নেচ্ছন্তি দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্ব চ গচ্ছতি সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।।" ৩।।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি যে, 'নৃসিংহ-পূর্বতাপনী' উপনিষদ্ কোন্ বেদের কোন্ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদ্? যদি চারিবেদের প্রামাণ্য কোন ব্রাহ্মণের অন্তর্গত উপনিষদ্ না হয় তবে ইহাকে অভ্রান্ত বেদ বাক্য বলিয়া মানিবার সারবত্তা থাকে না।

দ্বিতীয় কথা— বেদে কে অধিকারী কে অনধিকারী, ইহার ফল পরিণাম কি? এই সব বিচার বেদ-বাদিতারই নামান্তর নয় কি? কেননা বেদের সত্য এবং তাহার অধিকার সার্বলৌকিক (universal)। কেননা সত্য সর্বগত(univeral), অতএব তাহা লাভের অধিকারও সার্বলৌকিক (universal)।

তৃতীয়তঃ— বেদ স্বয়ং কি কোথাও বলিয়াছেন যে, কে অধিকারী, আর কে অনধিকারী?

শ্রুতি স্মৃতিকে ঈশ্বরের আদেশ বলা হয়। স্মৃতি ও শ্রুতির আপাতবিরোধিতা হইলে তো স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতিরই প্রামাণ্য। আবার শ্রুতির ভিতরেও স্ববিরোধিতা থাকিলে তখন ঋষির স্মরণ লইতে হয়।

চতুর্থতঃ— ভাগবতে যে শ্লোকটি পাই অধিকারী প্রসঙ্গে তাহা এইরূপ—

> "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
> কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
> ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।।" (ভা. ১/৪/২৫)

তবে যে অনেকস্থলে নারী জাতির বেদে অনধিকারের কথা উক্ত হইয়াছে তাহার কারণ আমার নিজস্ব বিচারে এইরূপ মনে হয়— নিত্য বেদ স্বাধ্যায় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য, ইহা বেদের একটি সাধারণ উপদেশ। স্বাধ্যায় অর্থ নিয়মপূর্বক নিত্য বেদপাঠ। এই কার্যটিতেই কেবলমাত্র নারীর অনধিকার। ইহার হেতু এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নারীদের প্রত্যেক মাসে তিনটি দিন সর্বকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। সেই তিনদিন স্বাধ্যায় চলিতে পারে না। নিয়মিত বেদ পাঠে বাধা পড়িয়া যায়, এই জন্য নিত্য স্বাধ্যায়ে তাহাদের অনধিকার বলা হইয়াছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে কথাটি এইরূপ ছড়াইয়া গিয়াছে যে, নারীমাত্রেরই বেদে কোনও অধিকার নাই।

প্রত্যক্ষ যখন দেখা যায় সমাজ-জীবন যাপনে পুরুষজাতি ও মাতৃজাতির সমান দায়িত্ব, তখন যে বিষয়ে পুরুষের অধিকার আছে সেই সেই বিষয় হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। বরং পুরুষজাতি হইতে মাতৃজাতির দায়িত্ব অধিকতর। তাহাকে উদরে দশ মাস সন্তানধারণ করিতে হইবে ও অন্ততঃ দুই বৎসর বক্ষের স্তন্যপান করাইতে হইবে। এই দায়িত্ব পুরুষের নাই। এই জন্য মাতৃজাতির অধিকার পুরুষ হইতেও অধিকতর হওয়া উচিত। মাতা শাস্ত্রজ্ঞ হইলেই সন্তানাদির শাস্ত্রজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা অধিক।

বেদমন্ত্রে সকলের বিশেষতঃ স্ত্রী-শূদ্রের অনধিকার তাই কলিসন্তরণোপনিষদ্-উক্ত 'হরে কৃষ্ণ' নামের পর্যায় শ্রীগৌরসুন্দর উল্টাইয়া দিয়াছেন এইরূপ ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রটি উক্ত উপনিষদে এইভাবে ছিল—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই নামের পর্যায় ভঙ্গ করিয়া—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এইভাবে আমাদের তরে দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বা তাঁহার পার্ষদদিগের কোন উক্তিতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে না। তাই এই সিদ্ধান্তটি বিচারসহ নয়।

ছন্দ রক্ষা করিয়া সমবেত কণ্ঠে গীতা পাঠের বিধান আছে। ইহা অনেক মঠ-মন্দির বা আশ্রমেই হয়। বর্তমানে গীতাযজ্ঞও অনেক হইয়া থাকে।

কেহ শ্লোকের মাঝখানে অনুচ্চস্বরে গীতাপাঠ করিলে গীতার ছন্দ ভঙ্গ হয়।

ভাগবতের উক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা হয় —

"স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (যাহারা দ্বিজ হইয়াও দ্বিজের মত কার্য করে না, নিন্দিতাচার) ইহাদের পক্ষে বেদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় (শোনারও) নহে। এইরূপ বৈদিক কর্মে শ্রেয় বিষয়ে যাহারা মূঢ় অর্থাৎ অনধিকারী তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া মহামুনি বেদব্যাস ভারত বর্ণনা করিলেন।"

ভাগবতের এই শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করেন বেদে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার নাই। অথচ এই প্রসঙ্গেই মধ্বাচার্য, ব্যোমসংহিতা বচনের ভাষ্যে বলিয়াছেন, না, "যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্ত্রী-শূদ্র ইত্যাদিরও অধিকার আছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং তন্ত্রজ্ঞানেহধিকারিতা।।"

বর্তমান কালে দেশের সর্বজনপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঋষি অরবিন্দ ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ ইঁহারা বেদ-বেদান্তপারগ।

দৈন্যস্তুতি

"মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতি ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ শর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।।"

— পুষ্পদন্ত

অনন্ত অপার যিনি তাঁর কথা
অক্ষম হয়েও কেন বলতে চাও?
এ যদি বল, তবে চারমুখো ব্রহ্মাকেও বল—
নীরব হয়ে রও।।
যদি বল, যার যতটুকু শক্তি
বলুক না মিটায়ে সাধ।
তা হলে, আমার সাধ্যমত ব্যক্ত বেদকথা যত
হোক নির্দোষ নিরপবাদ।।

অন্তরের প্রার্থনা সদা যেন গভীর বিপুল বৃহতের মধ্যে অবাধে থাকিতে পারি। "উরৌ দেবা অনিবাধে শ্যাম" (ঋ. ৫/৪২/১৭)।

এই গ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মুখপত্র শৃণ্বস্তু মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। শ্রীঅমলেশ পত্রিকার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়ায় লেখার ধারাবাহিকতা আর রক্ষা হয় নাই। সম্প্রতি দেওঘরের দেবসঙ্ঘের প্রবর্তিত মুখপত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'দিব্য দর্শনে' শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর আগ্রহে প্রকাশ হইতেছে। এইরূপ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ হইয়াছে। এইজন্য পুনরুক্তি দোষ সর্বত্রই দৃষ্ট হইবে। পুনরক্তির পক্ষে একটু ওকালতী করা যায় — বেদান্ত-সূত্র দুইটি সূত্রে পুনঃপুনঃ উক্তির পক্ষে রায় দিয়াছেন—"..... অভ্যাসাৎ" (১/১/১৩) এবং

"অসকৃদুপদেশাৎ" (৪/১/১)। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি শ্বেতকেতুর পিতা তাহাকে নয় বার "তত্ত্বমসি" বাক্যটি উপদেশ দিয়াছেন। সাহিত্যে পুনরুক্তি দোষাবহ হইলেও দর্শন বা শাস্ত্রীয় সাহিত্যে এই দোষ কখনও কখনও গুণাধায়কও হইতে পারে। কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির মুখে ইহা গুণাধায়ক হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও একটি শ্লোকার্ধ দুইবার উক্ত হইয়াছে— "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" (গীতা, ৯/৩৪ ও ১৮/৬৫)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় মোক্ষযোগাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি — কোনও কার্যের কারণ সম্বন্ধে। প্রত্যেক কার্যেরই কারণ পাঁচটি—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।" ১৮/১৪

এই বেদ-বিচিন্তন গ্রন্থটির পাঁচটি কারণ বক্ষ্যমান রূপ বলা যায়।

(১) অধিষ্ঠান। শঙ্কর-বেদান্তের পরিভাষায় অধ্যাসের যিনি মূলভিত্তি তিনি অধিষ্ঠান। সর্পভ্রান্তিতে রজ্জু অধিষ্ঠান। উপনিষদের ভাষায় "বহু স্যাং প্রজায়েয়" যাঁহার সংকল্প তিনি অধিষ্ঠান। মূল সংকল্পয়িতা।

(২) কর্তা। সাংখ্যের পরিভাষায় অহংকার বা অহংকারী জীবই কর্তা। আমার মধ্যে বসিয়া আমি আমি করে যে সে-ই কর্তা বলিয়া নিজেকে ভাবনা করে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভাষায়—

"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।।"

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বরাকরূপী মাদৃশ জীবক।

(৩) করণ। করণ বহুজন হইতে পারে। যদি করণ অর্থ সাধকতম বা সহকারী ধরিয়া লই। এই গ্রন্থের রূপায়ণে একাধিক সজ্জন। কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করি — শ্রীঅরবিন্দ পদাশ্রিত শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য, আমার অধ্যাপক পূজনীয়চরণ শ্রীঅমরেশ্বরাত্মজ শ্রীপরিতোষ ঠাকুর, স্বনামধন্য ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, আদ্যাপীঠের বিদুষী ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী এবং নবদ্বীপের অধ্যাপক ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

(৪) চেষ্টা। আমার দুইজন অন্তেবাসী জগদানন্দ ভারতী ও শ্রীমান্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। ইহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম শ্রদ্ধামণ্ডিত। র‍্যাঙ্ক কম্পিউনেটের অপারেটর শ্রীমান্ দীপক দাস-এর প্রীতিযুক্ত ব্যবহার ও কর্মনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। উক্ত প্রেসের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপক সুহৃদ্

পাবলিকেশনের শ্রীনির্মল ও পরিমল দত্তের আন্তরিক সহযোগিতা স্মরণীয়। সকল মানুষের সকল প্রকার শুভকর্মে প্রাণময় উৎসাহদাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী মহোদয়ের ঔদার্যময় প্রেরণা চিরবরণীয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থিত 'স্কুল অফ বেদিক স্টাডিজ'-এর ডিরেক্টর ড. সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তীর অকুণ্ঠ সহায়তাও মুগ্ধকর।

আদ্যাপীঠের শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ বালকাশ্রমের বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসীপ্রবর পণ্ডিত দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রমজীর আশীর্বাদস্বরূপ 'প্রাগ্‌বাণী', ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কৃতী ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ কলেজের বেদাধ্যাপক শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈদিক বাঙ্ময় প্রবাহে মহানামব্রত', শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্যের 'বেদ-বিচিন্তন প্রসঙ্গে'— এই ভূমিকাত্রয় আমার গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছে। আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণে তাঁহাদের সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি। দুইটি হার্দিক অভিমত প্রদানের জন্য শ্রীপরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীমান্ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলময় শুভেচ্ছা জানাই।

(৫) দৈব। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
তবু লিখি এ বড় বিচিত্র।"

এই বিচিত্রতার হেতুভূত যিনি তাঁহাকেই যদি দৈব বলি তাহাতে দোষ কি? পণ্ডিতেরা পূর্বজন্মকৃত কর্মকে দৈব বলেন। আমরা তাহা বলিব না। মূলতঃ যে ঈশ্বরের অদৃষ্ট কৃপাশক্তির ফলে বাঁচিয়া যে আছি চুরানব্বই বছরেও — এবং এখনও যে লেখনী চালান ইহা বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহার করুণা শক্তিরই বহুবিধ বিকাশের অন্যতম।

গ্রন্থ মুদ্রণে অর্থানুকূল্য অনেকেই করিয়াছেন, কারণ আমি নিষ্কিঞ্চন। তবে তাঁহারা কেহই নামের প্রত্যাশী নহেন। তবু একটি নাম বলিব। কারণ, সে আমার পরম স্নেহভাজন হইলেও একটি কারণে কৃতজ্ঞতার পাত্র। বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিব। আমার পুণ্যশীলা গর্ভধারিণী জননীর পার্থিব দেহত্যাগের সময় সে কাছে ছিল, আমি ছিলাম না। তাহার নাম পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী। ডাকনাম ছিল ধলু। দেহ ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে মা বলিলেন— ধলু! যাইবার সময় আসিল। এবার শোনাও "ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখম্"। শোনা মাত্র ধলু শ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়টি উচ্চকণ্ঠে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিধানে আবৃত্তি করিল। এই কল্যাণকর্মটি

তাহাকে আমার চির কৃতজ্ঞতার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে। আমারই নির্দেশে ধলু প্রথম জীবনের পর দ্বিতীয় জীবনে আর প্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ সংসারী হয় নাই। শিক্ষকতার কার্য হইতে অবসর লইয়া প্রাপ্ত পেনশনেই জীবিকা নির্বাহ করে। শুভ কর্মাদিতে অর্থদান স্বভাবটি তাহার শ্লাঘনীয়।

যাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানানো পাশ্চাত্যানুকরণ, অভারতীয় রীতি। যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই আমার সঙ্গে প্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অতি নিকটবর্তী। সকলের সম্বন্ধেই বলি তাঁহাদের সেবাধর্মময় সুপবিত্র শুদ্ধজীবন আরও সুন্দর সুস্বাস্থ্য লাভ করতঃ সুদীর্ঘতর হউক।

বলি, আমাদের তুমি রক্ষাকর্তা হও, "নোহবিতা ভব" (ঋ. ১/৮১/৮)।

বার্ধক্যের অপটুতা দরুণ যে সকল ভুল-ত্রুটি রহিয়া গেল তাহা সুধীজনের ক্ষমার্হ। ইতি শম্।

আশ্রব

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

বেদ-বিচিন্তন

বেদ - বিচিন্তন

প্রাথমিক ভাবনা

সমাহিতচিত্ত ঋষির হৃদয়ে উৎসারিত যে বাণী তাহাকে বলে ঋক্। ঋক্‌গুলি জ্ঞানগর্ভ। অর্ক্ ধাতু হইতে ঋক্ শব্দ। অর্ক্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বলতা বিধান। জগৎকে আলোকিত করে বলিয়া সূর্যের নাম অর্ক। ঋক্‌কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'Revealed Verse'।

ঋক্ যখন ঋষির অন্তরে প্রকাশিত হয় তখন তাহা একটি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের আকার। ঋক্-মন্ত্র গীত হইলে তাহাকে সাম বলে।

ঋগ্বেদে দশহাজার পাঁচশত বাহান্নটি ঋক্ আছে। কতিপয় ঋক্ লইয়া একটি সূক্ত হয়। কয়েকটি সূক্ত লইয়া একটি অনুবাক হয়। ঋগ্বেদে এক হাজার সতেরোটি সূক্ত আছে। (বালখিল্য সূক্ত ১১ টি ধরিয়া মোট ১০২৮ সূক্ত আছে।) পঁচাশিটি অনুবাক আছে। কয়েকটি অনুবাক লইয়া একটি মণ্ডল হয়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে। অষ্টকেও একটি ভাগ আছে। সমগ্র ঋগ্বেদে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার অক্ষর আছে। অন্ততঃ দশ হাজার বৎসর ধরিয়া উহা অক্ষুণ্ণ আছে। অক্ষরে লিখিবার প্রণালী আবিষ্কারের পূর্বে কয়েক সহস্র বৎসর উহা গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে উহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

এত বড় প্রাচীন এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ পৃথিবীতে নাই। এই গ্রন্থ মানবকৃত নহে, ঈশ্বরের দান। ইহা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই আর্যগণ অতি যত্নে ইহা যথাযথ ভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

গ্রন্থ পাঠ করিয়া কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অবাক্ বিস্ময়ে স্ব স্ব মাতৃভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। Wilson নামক একজন বিদ্বান্ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ইনি কলিকাতা টাঁকসাল (Mint)-এর সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন।

জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ছাব্বিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদ দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। তার দুই বৎসর পর তিনি উহা রোমান অক্ষরে প্রকাশ করেন। লাংলোয়া (অথবা লাঁগ্লোয়া) (Langlois) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত সমগ্র ঋগ্বেদ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন (১৮৫১ খ্রীঃ)। ঋগ্বেদের সূক্তে

আপাতদৃষ্টিতে বহুদেবতার স্তবস্তুতি আছে। যথা, অগ্নি ইন্দ্র বরুণ সবিতা মিত্র মরুৎ পূষণ বৃহস্পতি দ্যৌ সোম রাত্রি রুদ্র অদিতি যম অপ্ অশ্বিদ্বয় ভগ ত্বষ্টা সোম বিষ্ণু উষা অর্যমা পৃথিবী পর্জন্য সরস্বতী বিশ্বকর্মা প্রজাপতি অপাং-নপাৎ তনূনপাৎ সরণ্যু ইলা সূর্য পৃশ্নি সিনীবালী প্রমুখ।

প্রত্যেক সূক্তেই একজন দেবতার নাম আছে। এখানে দেবতা অর্থ বিষয় বস্তু। কারণ, সোম উষা পৃথিবী রাত্রি এইসব দেবতার নাম নহে। সর্বাপেক্ষা বেশী সূক্ত ইন্দ্র দেবতার নামে, তারপর অগ্নি, তারপর সোম। দেবতার গুরুত্ব চিন্তা করিলে মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বরুণ। ইঁহাদের অবস্থিতির জন্য তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পৃথিবীস্থানস্থ দেবতা— অগ্নি পৃথিবী অপ্ সোম। অন্তরিক্ষস্থ—ইন্দ্র বরুণ পর্জন্য। আর দ্যুলোকস্থ— সূর্য বিষ্ণু মিত্র উষা প্রভৃতি।

আমরা বেদ-বেদান্ত : পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনের সূত্রসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এই সূত্রসমূহের ভিত্তি হইতেছে উপনিষদ্। উপনিষদ্‌সমূহ বেদের অন্তিমাংশ। অন্তিমাংশ অর্থ তত্ত্বাংশ। সুতরাং বেদান্ত বেদ-সংহিতারই জ্ঞানপ্রধান অংশ। বেদান্তে আমরা দেখিয়াছি 'একমে-বাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের কথা। ব্রহ্মতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব— এই তত্ত্বগুলির মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন। "তত্তু সমন্বয়াৎ।।" সর্বত্র একটি সমন্বয় আছে ইহা যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা।

এখন আমরা সংহিতায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছি। সংহিতাই বেদের মূল মন্ত্রসমূহ। আমরা বেদান্ত হইতে বেদে যাইতেছি। অন্ত হইতে প্রথমে যাইতেছি। অর্থাৎ উজানে চলিয়াছি। আমরা যেন গঙ্গায় ঘাটে ঘাটে স্নান করিয়া সাঁতরাইয়া উজানে গঙ্গোত্তরীর দিকে চলিয়াছি। আমরা আশা করিয়া যাইতেছি যে, গঙ্গোত্তরীতে গিয়া দেখিব এই অফুরন্ত জলরাশির উৎস ভুমি। যদি তাহা না দেখিয়া দেখি সাহারার মত শুষ্ক মরুভূমি তাহা হইলে আমরা স্তব্ধ হইয়া অবাক্ হইয়া যাইব। আমরা সংহিতা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই দেখিলাম দেবতার পর দেবতার মহিমা কীর্তন। কোন্ দেবতা বড় তাহা লইয়া যেন প্রতিযোগিতার লড়াই। আর দেখি কেবল যাচ্ঞা-প্রার্থনা — ধন দাও, ঐশ্বর্য দাও, যুদ্ধে জয় দাও, শত্রুদের নির্মূল কর, সুহৃদ্‌গণের উন্নতি বিধান কর। কোথায় বেদান্তপাঠে আমরা নিষ্কাম হইলাম—আর বেদে দেখি তদ্বিপরীত, দেখি অসংখ্য যাচ্ঞা। দেবতার স্তব করিয়া কাম্যবস্তু আদায়ের প্রণালী। বেদে আর দেখি মদিরার মত সোমরস পান। দেবতাদের পান করাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অভীষ্ট আদায়। একই প্রকারের কথা বারংবার। আমরা মাথায় হাত দিয়া ভাবি, কোথায় পরব্রহ্মের ভেদশূন্য একত্ব, আর কোথায় অগণিত দেবতার স্তবস্তুতি! কোথায় বেদান্তানুশীলনের ফলস্বরূপ নিষ্কামতা প্রাপ্তি, আর

কোথায় ধনরত্ন নশ্বর বৈষয়িক কামনার পর কামনা! আমরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়ি। আপাতত মনে হয় বেদান্ত-সূত্র ও বেদ-সংহিতার মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বেদান্ত যেন বলে, কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠ; বেদ-সংহিতার মন্ত্র যেন বলে, যত পার ভোগ্য বস্তু আহরণ কর। দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া চাহিয়া চাহিয়া সকল ভোগ-বাসনা তৃপ্ত কর। বোধহয় এই জন্য অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এ যেন আদিম যুগের চাষার গান। প্রকৃতির বিপর্যয়ে আর্ত ভীত অজ্ঞ মানুষের পরিত্রাহি আর্তনাদ 'ত্রাহি মাম্' 'রক্ষ মাম্'! এ কেমন ধর্মশাস্ত্র!

বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন, এই মন্ত্রগুলির প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ঘৃতের আহুতি দেবার সময় এক এক স্থানে এক এক মন্ত্রের প্রয়োগ বা বিনিয়োগ কার্যের জন্য। এই যজ্ঞপর ব্যাখ্যা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, কারণ এইযুগে আমরা এখন রাজসূয়, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করি না। এই জন্য ঐ বিনিয়োগ ব্যাখ্যা আমাদের প্রাণে কোন স্পন্দন জাগায় না। যে গভীর শ্রদ্ধা লইয়া আমরা বেদ খুলি তাহা যেন বিশুষ্ক হইয়া যাইতে চায়। উপনিষৎ পাঠে যে আনন্দ তাহার একবিন্দুও যেন সংহিতার মন্ত্র মধ্যে পাই না। এ যেন এক সঙ্কটময় অবস্থা। এই সংকটে ঋষিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ গবেষণাত্মক বহু গ্রন্থ মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদের বাহিরের ভাসা ভাসা অর্থের অন্তস্তলে রহিয়াছে এক সুগভীর মর্মকথা। শ্রীঅরবিন্দের কৃপাপুষ্ট শ্রীঅনির্বাণ, শ্রীনলিনীকান্ত, শ্রীঅমলেশ প্রমুখ বেদানুসারীগণ আমাদের দিশারীরূপে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের অভিমুখে আমাদের দৃষ্টি চালনা করিতেছেন। একটি গভীর তত্ত্বগর্ভ বেদব্যাখ্যানের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়া আমরা সেইদিকে অতিধীরে চলিবার পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু পথ অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল। হিমালয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা চড়িবার মত সহস্র চড়াই উৎরাইর সমারোহে অতি সুকঠিন।

দুই-চারিজন দেবতার দুই-চারিটি সূক্ত আলোচনা করিবার সাধ জাগে, কিন্তু ভয় হয়। বেদ নিজেই নিজের কথা বলিয়াছেন—বেদের যথার্থ অর্থ লুকাইয়া আছে। কোথায় লুক্কাইত আছে? অপ্রকাশিতলোকে, পরমব্যোমে, যেখানে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন সেই রহস্যময় যথার্থ তাৎপর্য যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তার বেদপাঠে কি ফল?

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।"

(ঋ. ১/১৬৪/৩৯)

বেদের বাক্যগুলিকে আমাদের ঋষি বলিয়াছেন 'নিণ্যা বচাংসি'।

"এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।"

(ঋ. ৪/৩/১৬)

আবার বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন (ঋ. ৭/৫৬/৪)—

"এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত পৃশ্নির্যদূধো মহী জভার।"

অতিগুপ্ত নিগূঢ় অর্থে 'নিণ্যা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন একাধিকবার। যেন বেদের আসল কথাই 'নিণ্যা'—গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "Secret Word"। ঋষিবাক্যের অর্থ অতি নিগূঢ়, 'নিহিতং গুহায়াম্'। ক্রমেই আমরা ইহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

একপ্রকার পিষ্টক থাকে যার উপরটা কঠিন ও আস্বাদন বৈচিত্র্যহীন। আস্বাদনের বস্তু থাকে ভিতরে তাকে বলে 'পুর'— সেইটুকুই পিষ্টকের প্রকৃত ভোগ্য বস্তু। সেইরূপ প্রতিটি মন্ত্রের চারিটি চরণ— তাহাতে চারিটি স্তর ঃ পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী। তন্মধ্যে তিন স্তর অতি গভীরে— আর উপরে ভাসা ভাসা যে চতুর্থ বৈখরী স্তর, তাহা লইয়া আমাদের বোঝাপড়া। পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা থাকে চৈতন্যের সর্বোত্তম ভূমিতে।

নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন—তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বেদমন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে— অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম।

অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখা যাইবে বেদে শুধু যজ্ঞেরই বিবরণ। অধিদৈব দৃষ্টিতে মনে হইবে, কেবল দেবগণের গুণমহিমা ও কার্যকলাপ লইয়া বেদশাস্ত্র পরিপূর্ণ। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অনুভব হইবে যে, জীবাত্মার ঊর্ধ্বমুখী গতিতে ক্রমে সর্বতোভাবে ব্রহ্মময় হইয়া যাইবার যে কৃচ্ছ্র সাধনা তাহারই কথা। তাহাই ধাপে ধাপে সুষমামণ্ডিত করিয়া বেদশাস্ত্রময় বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধকজীবনের উত্থান-পতন, পরম সাধ্যের অভিসারে উজান মুখে প্রধাবন, পরমতম বস্তুর প্রাপ্তি— ইহাই বেদমন্ত্রের মুখ্যতম বক্তব্য বিষয়।

মহাপ্রভু গৌরসুন্দর স্বয়ং ঐ অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারাই বলিয়াছেন—

"গৌণী মুখ্যা বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে।।'

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

বেদে আর কোন কথাই নাই। কেবল কৃষ্ণ কথা। নিজ শ্রীমুখেও বলিয়াছেন— "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।"

আমার মনে হয়, ঐ তিনটি দৃষ্টিকে মিলাইলে বেদের মন্ত্রের তত্ত্ব হৃদ্গত হইবে। অথবা আরও সত্য কথা, ঐ তিনটি দৃষ্টি মূলত একটাই। এই অনুভূতি জাগ্রত হইলে 'নিণ্যা' বাক্যের রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া যাইবে।

যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃত ঢালা নহে, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ। আরও সুন্দর কথা, সমগ্র সৃষ্টিটাই একটা মহাযজ্ঞ—পুরুষযজ্ঞ। পরম-পুরুষ এই মহাযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়াছেন—সর্বদা দিতেছেন। এই মহাযজ্ঞে

ব্রহ্ম সতত নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত। তখন যজ্ঞদৃষ্টি ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কোন ভেদ থাকিবে না। যখন দেখিব বৈদিক দেবগণ বহু নহেন— তাঁহারা একেরই বিভূতি—'মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্', 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—তখন অধিদৈবদৃষ্টি ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কোন পার্থক্য রহিবে না। তিন দৃষ্টি ভঙ্গী একাকার হইয়া গেলে তখন ঠিক তখনই বেদমন্ত্র আপনার আবরণ ফেলিয়া দিয়া সাধকের সম্মুখে প্রকটিত হইবেন। কিভাবে? বেদেরই দৃষ্টান্ত— প্রিয় বল্লভের সান্নিধ্যে সুশোভনা সতী সাধ্বী ভার্যার মত।

প্রারম্ভিক কথা

বেদ বহু প্রাচীন। কত প্রাচীন বলা সুকঠিন। কতিপয় সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টি-সম্মুখে উদ্ভাসিত রহস্যপূর্ণ তত্ত্বময় জ্ঞানগর্ভ কয়েক সহস্র মন্ত্রসমষ্টি বেদ। এই মন্ত্রসকল একই সময়ে আম্নাত নহে। কেহ কেহ মনে করেন কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইহা প্রকটিত হইয়াছেন। মন্ত্রসমূহ কোনও সময় নানা ভাবে ছড়ানো ছিল। ব্যাসনামা কোন একজন ত্রিকালজ্ঞ দ্রষ্টা পুরুষ মন্ত্র সমূহকে কিছু শৃঙ্খলিত করিয়া এই চারিভাগে ভাগ করিয়া স্থাপন করিয়াছেন: ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

যে সকল মন্ত্র ছন্দে অর্থাৎ পদ্যে ব্যক্ত, সেই সকলের নাম ঋগ্বেদ। যে মন্ত্র সমূহ শুধু পদ্যে নহে, সঙ্গীতে গীত, তাহার নাম সামবেদ। যে মন্ত্র ছন্দে নহে, শুধু গদ্যে প্রকাশিত, তাহার নাম যজুর্বেদ। যে সকল গদ্য পদ্য মিশ্রিত, তাহার নামকরণ অথর্ববেদ। পদ্য, গদ্য ও সঙ্গীতময় বলিয়া বেদের আর এক সংজ্ঞা 'ত্রয়ী'। কোনও কোনও পণ্ডিতের অভিমত — যজ্ঞ বিষয়ক, দেবতা বিষয়ক ও অধ্যাত্ম বিষয়ক বলিয়া 'ত্রয়ী' নামের সার্থকতা। শ্রীঅনির্বাণ বলেন, "সংগ্রহ হিসাবে বেদ চারখানি, কিন্তু মন্ত্রের রকমারী হিসাবে বেদ তিনখানি।" ঋগ্বেদে দশহাজার পাঁচশত বাহান্ন (১০,৫৫২)টি মন্ত্র আছে। সামবেদে আঠার শত পঁচাত্তর (১৮৭৫)টি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদ ঊনিশশত পঁচাত্তর (১৯৭৫)টি মন্ত্রের সমষ্টি এবং অথর্ববেদে মন্ত্রের সংখ্যা ঊনষাট শত সাতাত্তর (৫৯৭৭)টি। চারিবেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা বিশহাজার তিনশত ঊনাশি (২০,৩৭৯)।

ম্যাক্সমূলার তাঁহার *Selected Essays*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে 119 পৃষ্ঠায় শুধু ঋগ্বেদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "As early as about 600 B. C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that, varies from 10,402 to 10,662, that of the words 153,826, that of the syllables, 432,000"। ম্যাক্সমূলর ঋগ্বেদ ছাড়া আর কোন বেদের কথা বলেন নাই। আর অঙ্কও নির্দেশ করিয়া বলেন নাই। এত হইতে এত - এর মধ্যে এইরূপ বলিয়াছেন।

চারিবেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ব্যাপক ও সর্বাপেক্ষা তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্র যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে আছে। সামবেদের আঠারশত মন্ত্রই ঋগ্বেদের। সুতরাং নানাপ্রকার বিচারে ঋগ্বেদই মহান্। তথাপি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামবেদকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। নিশ্চয়ই ইহার কোন গভীর কারণ আছে, তাহা আমরা জানি না। (কেহ কেহ মনে করেন, সামবেদ একাধারে ঋক্মন্ত্র এবং সঙ্গীতরূপে গীত হয় বলিয়া।)

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, সামবেদের আগাগোড়াই গান। পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে, "গানাৎ পরতরং নহি"। শ্রীভগবান্‌কে পাইবার যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে গানই সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনেকেই জানেন তানসেন এক বড় গায়ক ছিলেন। আকবর বাদশার সভায় সর্বশ্রেষ্ঠ গায়করূপে আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। তানসেন প্রায়শঃ তাঁহার গুরুদেবের অপূর্ব কীর্তনের কথা আকবর বাদশার নিকট গল্প করিতেন। বাদশা একদিন তাঁহার গুরুদেবের গান শুনিবার জন্য তানসেনকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে আসেন। আকবর বাদশা গান শুনিতে চাহেন, এইকথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমি কোন মানুষকে গান শুনাই না।" বাদশা হতাশ হইলেন। তানসেন বলিলেন, "আপনাকে গান শুনাইব। নিশ্চিন্ত থাকুন।" তানসেন বাদশাকে লইয়া নিধুবনে এক ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকিলেন। হরিদাস স্বামী শেষরাত্রে দুইদণ্ড কাল গান গাহিলেন। বাদশা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

বাদশা বলিলেন, "তানসেন! তোমার গান শুনিয়া মুগ্ধ ছিলাম। এখন দেখিলাম, তোমার গুরুদেবের গানের কাছে তোমার গান কিছুই নহে। তুমি কি গুরুদেবের কণ্ঠের মাধুর্য ও বৈচিত্র্য কিছুই আয়ত্ত করিতে পার নাই?"

তানসেন উত্তর করিলেন, "বাদশা! গুরুকৃপায় প্রায় সবই আয়ত্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রোতার দোষে গান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার গুরুদেবের গানের শ্রোতা জগদীশ্বর, আর আমার গানের শ্রোতা দিল্লীশ্বর। জগদীশ্বর বঙ্কুবিহারী নিত্যই নিধুবনে আসিয়া আমার গুরুদেবের গান শ্রবণ করেন।"

গানের দ্বারা ভজন করিতেন লীলাশুক, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ অনেকে। আমি বন্ধুসুন্দরের একজন ভক্তকে দেখিয়াছি, নাম 'জয়জয় মহাপ্রভু'। তাঁহার ঘরে একখানি মহাপ্রভুর তৈলচিত্র ছিল। তিনি সঙ্গীতে অত্যন্ত পারদর্শী গায়ক ছিলেন। তাঁহার ঘরে অনেক বাদ্যযন্ত্র ছিল। যে সময়কার যে রাগিণী, তাহা গাহিয়া তিনি মহাপ্রভুকে শোনাইতেন। এক এক রাগিণী শেষ করিয়া মহাপ্রভুর দিকে তাকাইয়া বলিতেন, "ঐ দেখ, মধুর হাসিতেছেন! ঐ দেখ, চোখ ছলছল করিতেছে! ঐ দেখ, আনমনা হইয়া পাগলপারা হইয়াছেন।"

প্রাচীনকালে গ্রীক দেশে একজন সাধক দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার নাম পিথাগোরাস (Pythagoras)। তিনি বলিতেন — "ভগবান্ কি করেন জানেন? নিজেই পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহেন। তাঁহার নিজের গান নিজেই মুগ্ধ হইয়া শুনেন।" তিনি বলিতেন, "ব্রহ্মাণ্ডটি একটি বিরাট পিয়ানো। আকাশে দেখ মঙ্গল, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ। এইগুলি পিয়ানোর সাতটি স্বরগ্রাম সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-র মতই সমানুপাতিক (proportionate)।" এই পিয়ানোর গানটিকে পিথাগোরাস বলিতেন "Music of Spheres"। গানে শুধু ভগবান্ই মুগ্ধ হয়েন না; হরিণ, সর্প, পশু, পাখী, সবাই মুগ্ধ হয়। সামবেদের মন্ত্রগুলি অপূর্বভাবে গানের স্বরলিপিতে সন্নিবদ্ধ। তাহাই বোধ হয় সামবেদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের নিয়ম ছিল, কোনও গ্রন্থ আরম্ভ করিতে হইলে — হয় আশীর্বাদ, না হয় নমস্কার অথবা বস্তুনির্দেশ করিতে হইবে। এই নিয়ম পরবর্তী কালের। প্রাচীন গ্রন্থ বেদে ঐরকম কোন নিয়ম দেখা যায় না। বেদের আরম্ভে, হয় দেবপ্রশস্তি, না হয় প্রার্থনা।

ঋগ্বেদের আরম্ভ অগ্নির স্তুতিতে।

"ওঁ। অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।।"

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

সামবেদের আরম্ভ — ইহাও অগ্নির আহ্বান।

"ওঁ। অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি।।"

"হে অগ্নি, আনন্দের জন্যে এস; স্তবযুক্ত হয়ে দেবলোকে আহুতিভার বহনের জন্য এস; হে দেবগণের আহ্বাতা, যজ্ঞাসনে উপবেশন কব।"

যজুর্বেদের আরম্ভ — ইহা মূলতঃ প্রার্থনা।

"ওঁ। ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ।
দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।
আপ্যায়ধ্ব মঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসো।
ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ।
যজমানস্য পশূন্ পাহি।।"

"হে দেব, আমাদের অভীষ্ট পূরণ, বল ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করছি। হে দেবগণ, তোমরা বায়ুর মত গতিশীল হও। সৎকর্মের প্রবর্তক দেবতা তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্মে পরিচালিত করুক।

অজর, অক্ষয়, অবিনশ্বর লোকপালিকা দেবীগণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদের পূজা সম্যক্‌রূপে বর্ধন করুন।"

"হে সদ্বৃত্তিসমূহ, তোমাদের শৈথিল্যে পাপমতি ইন্দ্রিয়াদিরূপ চোরগণ যেন আমাকে হিংসা করতে সমর্থ না হয়। হে দেবগণ, সত্যস্বরূপ সদ্বৃত্তি-সমূহ জ্ঞানের আধারভূত আমাদের এ হৃদয়ে নিয়ত দেবভাবের স্ফুরণ করুক। হে দেব! যজমানকে (প্রার্থনাকারী আমাকে) পাপ হতে রক্ষা কর।"

["শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে"—শ্রেষ্ঠতম কর্মের নিমিত্ত। কর্ম চতুর্বিধ—অপ্রশস্ত, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম। লোক-বিরুদ্ধ বধ, বন্ধন, চৌর্য প্রভৃতি অপ্রশস্ত। লোকে প্রশংসনীয় বন্ধুবর্গপোষণাদি প্রশস্ত। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বাপী, কূপ, জলাশয়-খননাদি কর্ম শ্রেষ্ঠ। বেদপাঠ ও বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম শ্রেষ্ঠতম।]

অথর্ববেদের আরম্ভ —

"ওঁ। যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে।। ১
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্।।" ২

"যে ভগবান অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে নিখিল জগতের কল্যাণের জন্য চেতন-অচেতনাত্মক জগতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, হে বাচস্পতিদেব! আমি যেন সেই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই।।১।।"

"হে জ্ঞানাধিপতি, তুমি প্রকাশমান সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত ক'রে আমার মনের সাথে মিলিত হও। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি! আমার অন্তরে অবস্থান ক'রে আমাকে মেধা সমৃদ্ধি প্রদানে আনন্দিত কর।।২।।"

এই মন্ত্র দুইটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা করিতেছেন বাচস্পতির নিকট। বাচস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি সমানার্থক। ব্রহ্ম যখন বাণীময় তখন তিনি বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি। বৃহস্পতি হইলেন বৃহৎ চেতনার অধিপতি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "The master of the inspired Word"। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, আমি যেন ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই। 'পরিযন্তি' অর্থ প্রতিদিন প্রতিকল্পে, প্রতি শরীরে জড় অজড় সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান। কিভাবে বিরাজমান? 'ত্রিসপ্ত' রূপে।

'ত্রি' পদে তিন কাল—অতীত, অনাগত ও বর্তমান। 'ত্রি' পদে তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তম। 'ত্রি' পদে তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। 'ত্রি' পদে তিনটি অক্ষর— অ, উ, ম্।

'সপ্ত' পদে সপ্তলোক— ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। 'সপ্ত' পদে সপ্তঋষি— বসিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ ও ক্রতু। ৩ x ৭ = ২১, একবিংশতি —পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, প্রকৃতি ও পুরুষ। অর্থাৎ, অনন্তরূপে যিনি বিরাজ করেন তিনি ভগবান্। তিনি 'ত্রিষপ্তাঃ'।

"যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি"—এই বাক্যাংশে ভগবানের পরিচয়। এইরূপে পরিচয় ঋগ্বেদে একবার মাত্র দৃষ্ট হয়। ঋক্-সংহিতায় ১/৭২/৬ মন্ত্রে পরাশর ঋষি বলিয়াছেন, 'ত্রিঃ সপ্ত যদ্ গুহ্যানি' (অর্থাৎ, যে যজমানগণ তোমার একবিংশতি নিগূঢ় পদ জানিয়াছেন। নিগূঢ়ত্ব যে কি তাহা প্রকাশ করেন নাই।) শ্রীঅরবিন্দ *Hymns to The Mystic Fire* গ্রন্থে 37 পৃষ্ঠায় বলেন, "hidden in thee the thrice seven secret planes"। শ্রীঅমলেশ বলেন — "Sevenfold principle in three spheres"। ইহার যে অর্থ উপরে বলা হইল তাহা সায়ণাচার্যের সংকেত মত। ইহাই কি ঠিক অর্থ, না আর কিছু, তাহা সায়ণও জানেন না, আমরাও জানি না। এইরূপ বাক্য বেদে বহু আছে, যাহার ঠিক অর্থ বুঝা যায় না, সেই কথাগুলিকে বলা হইয়াছে 'নিণ্যা বচাংসি'। ইহা একপ্রকার কথা কহিবার কৌশল। কৌশলে কথা কেবল বেদই বলেন নাই, আমরাও বলি। কেহ কেহ বলেন, মরমীয়াদের এইরূপই ভাষা। কেহ কেহ ইহাকে 'সান্ধ্য ভাষা' বলেন। সন্ধ্যার সময় কিছু আলো কিছু অন্ধকার। কথার মধ্যে কিছু প্রকাশিত, কিছু অপ্রকাশিত।

'নিণ্য' বাক্যগুচ্ছ

"ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ।।"

(ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৩৭)

বৃটিশ রাজত্বে ভারতের কতকগুলি যুবক কুশাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক দল গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন পরস্পরকে পত্র দিয়া কোন আদেশ নির্দেশ দিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা তখন অন্যের অবোধ্য ভাষা তৈয়ারী করিয়াছিলেন অংক দিয়া। তাহা বৃটিশ সরকার কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। হয়তো চিঠি খানিতে লেখা আছে '$10\frac{3}{5} + 12\frac{2}{7}$'। ইহার আসল অর্থ বলিতেছি : প্রত্যেক বিপ্লবীর পকেটে একখানি গীতা থাকিত ও ছোট বাইবেল থাকিত। এই অংকটির অর্থ --- এই বাইবেলের 10 পৃষ্ঠায় পঞ্চম পংক্তির তৃতীয় শব্দ। মনে করুন সেখানে 'come' শব্দটি আছে। তারপর 12 পৃষ্ঠায় সপ্তম পংক্তির দ্বিতীয় শব্দটি দেখ। ধরুন সেখানে 'soon' শব্দটি আছে। লেখা হইল 'come soon,' বা 'শীঘ্র আইস'। গুপ্ত সংকেত যাহারা না জানিত, তাহারা এই অংকটার অর্থ বুঝিতে পারিত না।

যখন দুই পক্ষের যুদ্ধ লাগে তখন প্রত্যেক পক্ষেরই একটা গুপ্ত ভাষা বা code language থাকে, তাহা দ্বারা জাহাজকে, প্লেনকে বা সৈন্যাধ্যক্ষকে কি এখন করণীয় তাহা বলা হয়। এই সংকেত বা code যাহারা জানে না, তাহাদের শত চেষ্টাতেও অর্থ বোধগম্য হয় না।

এইরূপ বেদশাস্ত্রের কতকগুলি গুপ্ত শব্দ আছে, আমাদের ঋষি তাহার নাম বলিয়াছেন 'নিণ্যা বচাংসি'। নিণ্য অর্থ নির্ণয় করণীয়। বাক্যের অর্থ সাধনা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। আপাত যে অর্থ তাহা মুখোশ মাত্র। বেদের গুপ্ত শব্দ সমূহের অর্থ খুলিবার যে চাবিকাঠি ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সায়ণাচার্যও ঐ চাবি পান নাই। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর যাস্কও পান নাই। তিনি বেদের অভিধান ও নিরুক্ত লেখক। তিনি এক একটি শব্দের দশ-পনেরোটি অর্থ দিয়াছেন। কোন্‌টি যে হইবে বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেক পূর্বেই ঐ চাবিকাঠি হারাইয়া গিয়াছে অথবা কোনও অত্যাচারে দগ্ধীভূত হইয়াছে।

ঐ চাবি না পাইয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বেদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অনেকস্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। যেখানে যেখানে আছে 'উষার গোরাজি বা গোগণ', তাঁহারা অর্থ করিয়াছেন 'উষার গরুর দল'। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, 'উষা দেবী একটি গরুর দল পালিতেন'। এইরূপ বহু স্থলে প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় তাঁহারা ভাবিয়াছেন, বেদ 'অসভ্য চাষার গান'। আসলে 'গো' অর্থ যে 'জ্যোতি', তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যখন কোন পূজারী দেবতার কাছে শত অশ্ব যাচ্ঞা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা মনে করিয়াছেন, সেই কালের লোক খুব ঘোড়া ভালবাসিত, ঘোড়ায় উঠিয়া যুদ্ধ করিত, আনন্দে বেড়াইত। আসলে গুপ্ত ভাষায় 'অশ্ব' অর্থ যে 'শক্তি', তাহা বুঝেন নাই। এখনও আমরা 'শক্তি' অর্থে 'অশ্ব' শব্দ প্রয়োগ করি। বলি, এই মেশিনটির এক হাজার 'হর্স পাওয়ার' (Horse Power)।

গত-দুই তিন হাজার বৎসর আমরা ঐ বেদের গুপ্ত ভাষার চাবি অনুসন্ধান করি নাই বা করিয়া পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ বাসুদেব দর্শনে ভাগ্যবান্ পরম জ্ঞানী মরমীয়া সাধক ঋষি শ্রীঅরবিন্দ সারা জীবন কঠোর তপস্যার ফলে ঐ গুপ্ত বাক্যের চাবিকাঠি কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়া বেদশাস্ত্রের প্রতি একটি অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার খুব উত্তম গ্রন্থগুলি সুকঠিন ইংরেজী ভাষায় লিখিত। সেইহেতু অনেকেই তাহার মর্ম উদঘাটনে অক্ষম। বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দের অনুগামিগণ বাংলা ভাষায় অনেক কথা তর্জমা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীঅনির্বাণ, দিলীপকুমার রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, নারায়ণী দেবী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, গৌরী ধর্মপাল, শ্রীঅমলেশ প্রভৃতি কতিপয় নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে আমার এই গ্রন্থে ঋক্ সংহিতার কিঞ্চিৎ অর্থ প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

শ্রীঅরবিন্দের দানটিও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তবে ঐরূপ যে একটি নিগূঢ় অর্থের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতেই বিপুল আনন্দোদয় হইয়াছে। বেদ নিজেই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন— 'সতী নারী সর্বাঙ্গ বস্ত্রালংকারে আবৃত অবস্থায় চলেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় বল্লভের নিকট মাত্র উন্মুক্ত হইয়া থাকেন।' সেইরূপ বেদার্থ আবৃতই থাকেন। ঋষিতুল্য ব্যক্তির কাছে আপনাকে ব্যক্ত করেন। ঋষি কে তাহা বুঝাও কঠিন।

দুই রকমের লোক ছিল সমাজে— দীক্ষিত ও অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত তাহারা আহার নিদ্রা বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু জানিত না। তাহারা বেদমন্ত্র না বুঝিয়া পাঠ করিলে ভুল উচ্চারণে পাপী হইবে ও মন্ত্রের অসদ্ব্যবহার করিয়া পাঠ করিলে লোকের ক্ষতি সাধন করিয়া

সমাজের অপকার করিবে, এই ভয়ে অনধিকারী যাহাতে বেদার্থ না বুঝে এই জন্য গোপন রাখা হইত। যাহারা অদীক্ষিত সাধারণজন, তাহারা বেদ পড়িয়া বুঝিত যে, স্বর্গে কতকগুলি দেবতা আছেন— তাঁহাদের নাম ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, সবিতা, বরুণ, মিত্র, ভগ, অশ্বিনী, বিভু, সোম, মরুৎ, রুদ্র, ইলা, ভারতী, সরস্বতী এবং বিষ্ণু। ইঁহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রার্থিত বস্তু গরু, ঘোড়া, সুবর্ণ, অর্থ, শত্রু পরাজয়, মিত্রের উন্নতি, কোন স্থানে যাত্রায় শুভফল, ব্যবসায় উন্নতি বিধান, ইত্যাদি। রোগ শোক হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণ অশিক্ষিত অদীক্ষিত সমাজের লোকও বেদ পাঠ করিত এবং ঐ অর্থ না বুঝিয়া যজ্ঞাদি করিত।

দীক্ষিতেরা বাহ্যার্থ ভাবিতেন না। তাঁহারা জানিতেন এই আপাত অর্থ একটি মুখোশ মাত্র। ভিতরে একটি তাত্ত্বিক অর্থ লুক্কায়িত আছে। তাহার উদ্দেশ্য আত্মিক ক্রমোন্নতি। সত্যলোক পর্যন্ত ঊর্ধ্বগতি— সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া নিজ সত্তার ব্যাপকতা লাভ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি আত্মিক মহাশক্তি গুপ্তভাবে আছে। তাহার বিকাশ ঘটিলে সাধক পরম সত্য-সত্তার সঙ্গে একীভূত হইয়া জীবনের মহাসার্থকতা লাভ করিতে পারেন। যজ্ঞাদি বাহ্যিক আচরণের মূলে আছে আত্মিক যজ্ঞ। তাহার ফলে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া যায়।

'অগ্নি'—বাহিরের অর্থ, যাহা দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইয়া গৃহ আলোকিত করা হয় ও কাঁচা শাকসব্জী, তণ্ডুল, গম, রান্না করিয়া আহারোপযোগী করিয়া লওয়া যায়। অভ্যন্তরীণ অর্থ— পরম বস্তুকে পাইবার জন্য ঊর্ধ্বগামী অভীপ্সা। 'অগ্নি'—আলো, জ্ঞানের বা আলোর প্রতীক। 'তাপ'— তপস্যার প্রতীক। 'সূর্য' বাহ্যার্থ— যাহার উদয়ে রাত্রি, দিনে পরিণত হয়। অন্তরের অর্থ— যে জ্ঞান সত্য তত্ত্বের দ্বার উন্মোচন করিয়া শাশ্বত ঔজ্জ্বল্যে হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

'ঘৃত' শব্দটিতে প্রচলিত অর্থে বুঝায়, পরিশোধিত নবনী হইতে জাত একটি উত্তম বলকারী আহার্য পদার্থ, যজ্ঞের কাজে আহুতি দিতে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু রহস্যবাদী ঋষিরা বুঝেন 'ঘৃ' ধাতুর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দীপ্ত হওয়া। অতএব 'ঘৃত' পদের অর্থ দীপ্ত। ঘৃত দীপ্তিময় আলোর প্রতীক। বেদে ঘৃতস্রাবী মন কথাটি পাওয়া যায়। তাহার অর্থ আলো স্রাবী মন অথবা জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত স্বচ্ছ মন। ঘৃতের ঈদৃশ অর্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করা বেশ কঠিন।

দ্রষ্টা ঋষিরা কেবল তত্ত্বজ্ঞ বা জ্ঞানী মাত্র ছিলেন না, তাঁহারা দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁহারা যখন কোন বস্তুর উপর গভীর ধ্যান করিতেন, তখন তাঁহাদের মানসে সব কিছু মূর্তিমান্ হইত, আকারিত হইত।

'অপত্য' শব্দে সচরাচর সন্তান বুঝায়। ঋষিরা পুত্র বা অপত্য কামনা করিয়াছেন— তাহার বাহ্য অর্থ নবজাত পুত্র, তাহার অভ্যন্তরীণ অর্থ নবজন্ম।

'সোম' অর্থ— বাহিরের নেশা উৎপাদক পাতার রস। আন্তর অর্থ— প্রেমমদিরা। ভগবানের সঙ্গে আত্মিক মিলনে যে পরমানন্দময় শান্তির উৎস, তাহাই।

বেদের বাহ্যার্থের অন্তরালে যে একটি গভীর রহস্যময় তাৎপর্য আছে ইহা কেবল অনুমানের কথা নহে। বেদ মন্ত্রের মধ্যেই তাহার সুন্দর ঈপ্সিত ইঙ্গিত আছে। ঋ. ৪/৩/১৬ মন্ত্রে 'নিণ্যা' শব্দ আছে ও ঋ. ৪/১৬/৩ মন্ত্রে 'কবির্ন নিণ্যং বিদথানি' কথা আছে। এইরূপ কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। মন্ত্রের গুহাহিত মর্মরহস্যই 'নিণ্যা'।

প্রায় সূক্ত মধ্যেই দুই একটি 'ব্যাসকূট' দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম সূক্তটিই ধরা যাউক। প্রথম সূক্তটি অগ্নি সূক্ত। তাহাতে অগ্নির কয়েকটি বিশেষণ আমাদের সহজ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায় না; যথা— 'কবিক্রতু', 'চিত্রশ্রবস্তম', 'সত্য' ও 'ঋত'। 'কবি' অর্থ মনে করি ক্রান্তদর্শী, দ্রষ্টা। 'ক্রতু' অর্থ যজ্ঞ ও কর্ম। 'দ্রষ্টার কর্ম অগ্নিদেব' — এইরূপ বাক্যের অর্থ বোধগম্য হয় না। অগ্নি বলিতে যদি রান্না ঘরের অগ্নি বুঝি, তাহা হইলে তাহাতে পুরোহিত, হোতা, ঋত্বিক্, রত্নধাতম, কোনও শব্দই সহজে লাগানো যায় না।

'অগ্নি' বলিতে যদি তেজ বুঝি, সেই আদিম তেজ অর্থাৎ পরম সদ্‌বস্তু ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, অমনি সেই তেজ ''তত্তেজোঽজায়ত'', অমনি তিনি তেজঃস্বরূপ হইলেন। বিশেষণগুলির তাৎপর্য কিছু বোধগম্য হয়। তেজের কার্য 'কবিক্রতু' দ্রষ্টা পুরুষের কর্মের মত নির্দোষ।

'চিত্রশ্রবস্তম'—এই শব্দে 'শ্রবঃ' অর্থ, সায়ণ বলিয়াছেন 'যশঃ'। ভাল অর্থবোধ হয় না। 'শ্রবঃ' অর্থ যদি শ্রুতি বা শ্রবণ হয় তাহা হইলে দিব্য-শ্রবণ যাঁহাদের, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এইরূপ একটি অর্থ হয়। 'রত্ন' বলিতে ধন-সম্পদ্ না ভাবিয়া যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান মনে করি, তাহা হইলে যে জ্ঞানের তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা, এইরূপ অর্থে কিছু যেন বুঝা যায়। 'সত্য' বলিতে সায়ণ মনে করেন— 'যজ্ঞের ফল ঠিক ঠিক দান করেন'। ইহা অত্যন্ত হালকা অর্থ মনে হয়।

'সত্য' বলিতে মূল সত্তার সত্য ভাবিলে, 'তেজ সেই সত্য' — এইরূপ অর্থ অনেক ভাল হয়। তেজ বলিতে তপঃশক্তি বলিলে আরও সুষ্ঠু হয়। সায়ণ সত্য ও ঋতকে প্রায় একই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদে সত্য, ঋত ও বৃহৎ শব্দ তিনটি বহু স্থানে আছে। ইহারা একার্থক নহে। ঋত

বলিতে সত্যের ক্রিয়া। তাহার মধ্যে একটি শৃঙ্খলা, একটি অদ্ভুত নিপুণতা, যাহার ফলে বিশ্ব ধৃত আছে, তাহা বুঝিলে তেজের সহিত তাহার মিলন হইতে পারে।

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৩য় সূক্তে শেষমন্ত্রটিতে ঋষি বামদেব অগ্নি দেবতাকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

''এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।
নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভির্বিপ্র উক্‌থৈঃ।।'' ১৬

অর্থাৎ—''হে বিধাতা অগ্নি! তুমি বিদ্বান্‌ ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বক্তব্য ও কবিগ্রথিত এ সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শাস্ত্রের সাথে উচ্চারণ করি।''

কবি নিজেকে 'প্রাজ্ঞ' বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ নিগূঢ় বাক্যের মর্ম ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের মত অজ্ঞের জন্য কোন উপায় বলেন নাই।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব

সনাতন ধর্মের মূল বেদ। বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়, কিন্তু যাহা অপার্থিব, অচিন্তনীয়, অনুমানের অতীত, তাহা জানিতে হইলে বেদই একমাত্র অবলম্বন।

বেদ কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত নহে, তাহা অপৌরুষেয় এবং নিত্য। অপৌরুষেয় বলিয়াই বেদ নিত্য। ন্যায়-শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বেদ পরমপুরুষের রচিত। পরমপুরুষও একজন পুরুষ; সুতরাং বেদ পৌরুষেয় এবং অনিত্য।

ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত বলেন, চারিবেদ পরমেশ্বরের রচিত নহে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মত তাঁহার অঙ্গ হইতে স্বতঃনির্গত। এই জন্য বেদ অপৌরুষেয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন, বেদ পরমেশ্বরের 'নিঃশ্বসিতম্'; চেষ্টাকৃত বা বুদ্ধিকল্পিত নহে। পরমেশ্বরের জ্ঞানই বেদ। সায়ণাচার্য তাঁহার বেদের ভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্।।"

অর্থাৎ, "যে চারিবেদ হইতে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বেদচতুষ্টয় যাঁহার নিঃশ্বাস স্বরূপ এবং যিনি সর্ববিদ্যার আধার, সেই মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি।" ইহার দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইল।

এই সম্বন্ধে ষড়্‌দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন মত। ন্যায়দর্শনের কথা বলিয়াছি। এখন বেদান্ত দর্শনের কথা বলিতেছি। বেদান্ত মতে নিত্যত্ব দুইপ্রকার-কূটস্থ নিত্যত্ব ও প্রবাহ নিত্যত্ব। কূটস্থ নিত্যত্ব একমাত্র পরব্রহ্মেরই আছে। ইহার কখনও কোনও পরিবর্তন হয় না। সর্বদা একরূপ নির্বিকার। দিবা ও রাত্রি সর্বদা পরিবর্তনশীল। গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু সর্বদা পরিবর্তনশীল; কিন্তু ইহাদের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব আছে। বেদের কূটস্থ নিত্যত্ব নাই, প্রবাহরূপে নিত্যত্ব আছে। পূর্ব-মীমাংসা দর্শন বেদের দুই প্রকারের নিত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন বেদের কূটস্থ নিত্যতা স্বীকার করেন না, প্রবাহ-নিত্যত্ব স্বীকার করেন। পাতঞ্জল দর্শন বলেন— বেদের

অর্থ নিত্য, কিন্তু শব্দরাশি অনিত্য। প্রতিকল্পে বেদের শব্দরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়. আবার নূতনকল্পে ঋষিরা স্মরণ করেন। কিন্তু বেদের অর্থের কখনও বিনাশ হয় না। সুতরাং পতঞ্জলির মতে বেদ নিত্য ও অনিত্য—অর্থের দিক্ দিয়া নিত্য, অক্ষরের দিক্ দিয়া অনিত্য।

বৈশেষিক দর্শন বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বমীমাংসা ঈশ্বর মানেন নাই, বেদ ঈশ্বরের বাক্য—ইহা স্বীকার করেন নাই। পূর্বমীমাংসা মতে বেদের শব্দ নিত্য। বেদের শব্দ নিত্য বলিয়াই বেদ নিত্য, ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া নহে। অনেকে বলেন— ঋগ্‌বেদের মধ্যেও এমন মন্ত্র আছে যাহা পড়িলে বেদ ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মনে হয় না, ঋষিগণের সৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তে চতুর্থ মন্ত্রে আছে— "ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ", অর্থাৎ বসিষ্ঠ ঋষি মন্ত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার ঐ মণ্ডলেরই ২২ সূক্তে নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে— "ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ" অর্থাৎ বিপ্রগণ মন্ত্র সকলের জন্ম দিয়াছেন। ১ম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে ১৩শ মন্ত্রে বলিয়াছেন—"গৌতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ ব্রহ্ম।" ইহার অর্থ করেন—"হে ইন্দ্র, গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের জন্য তোমার এই নূতন মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।" ইহাতে স্বভাবতঃই তাঁহাদের মনে জাগে, অনেক মন্ত্রই ঋষি রচিত।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে নানা মত বলা হইল। এখন দেখা প্রয়োজন বেদ নিজে নিজের সম্বন্ধে কি বলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বলেন — "বাগেব দেবাঃ।" সত্যের জ্যোতির্ময় সাক্ষাৎরূপই দেবতা। দেবতাই মন্ত্র। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত লোকে দেবতারা জাগ্রত হয়েন মন্ত্রময়রূপে। বেদের ঋক্ গুলি সব মন্ত্রমূর্ত— দেবতাদের সূক্ষ্ম কায়া দেহ। "ঋঙ্‌মূর্তিরব্যয়" (কৌষীতকি উপনিষৎ, ১/৬) আপন তপস্যার তেজে ও শুদ্ধমনের প্রয়োগে ঋষিরা সত্যকে পরিস্ফুট করেন আপন হৃদয়ে। মন্ত্র ঋষিদের অন্তর্গুহা হইতে আবির্ভূত হয়, "নিহিতং গুহাবিঃ" (ঋ. ১০/৭১/১)। দেবতার ও মন্ত্রের জন্ম অর্থ জাগরণ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মত। ঋষির তপস্যায় মন্ত্র জাগ্রত হয়েন। ঋষিরা গোদোহনের মত সত্যকে ও ঋতকে দোহন করেন। কোথাও কোথাও তক্ষণ করেন এই ভাষা আছে। তক্ষণ তিষ্‌ধাতু হইতে। তক্ষণ করেন অর্থ দীপ্তিমান করেন। "ত্বিষের্বা স্যাদ্ দীপ্তিকর্মণঃ" (নিরুক্ত, ৮/১৪)।

ঋষি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন। সেই মন্ত্রই বেদমন্ত্র। মন্ত্রের অক্ষরগুলি ঋষি দর্শন করেন। তিনি উচ্চারিত মন্ত্র শোনেন, সমস্ত সত্তাটি দিয়া অনুভব করেন। এইরূপ কয়েক সহস্র মন্ত্র আমরা পাইয়াছি। বাকের জন্মের ইতিহাস অনেক গভীরে। প্রথমে আকাশ মহাশূন্যে স্পন্দনহীন। মূল চেতনা যখন আত্মমুখী বা সৃষ্টিমুখী তখন ঈক্ষণ। ঈক্ষণ হইতে প্রথম স্পন্দন।

এই স্পন্দনই বাক্। বহু হইব এই সৃষ্টি-বাসনা। তাহা হইতে অরূপের আত্মরূপায়ণ। মহাশূন্য হইতে বাকের স্ফুরণ পর্যন্ত চারিটি ধাপ ঃ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী।

প্রথমে আনন্দের আন্দোলন তাই পরা। তারপর রূপ—পশ্যন্তী। রূপ ফুটিয়া উঠে ভাবের মধ্যে—মধ্যমা। ভাব ফুটিয়া উঠে ভাষায়—বৈখরী।

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'আদিকবি'। জগতে কবির সৃষ্টিই প্রকৃত সৃষ্টি একথা বলিয়াছি। তাহাতে নিমিত্ত ও উপাদান অভিন্ন। আর যত সৃষ্টি সবই নির্মাণ। একমাত্র কবিই স্রষ্টা। পরম চৈতন্যের সৃষ্টির আবেগে স্ফুরিত হয় মন্ত্র; প্রথমে নিজের মধ্যে, তারপর বিশ্বজগতে।

সকল সিদ্ধ মন্ত্রেরই অর্থ শাশ্বত নিত্য। বেদের মন্ত্রের কেবল অর্থ নিত্য নহে— অক্ষরও নিত্য। বিশ্বামিত্র ঋষির দৃষ্টিসৃষ্টি গায়ত্রী মন্ত্রের কেবল অর্থই নিত্য নহে -— ঐ মন্ত্রের আনুপূর্বিক অক্ষরবিন্যাসও নিত্য। ঐ অক্ষরগুলি ঐভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋষির যখন মন্ত্রপ্রাপ্তি ঘটে তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র মানুষ নহেন। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র পুরুষকারের তিনি ঊর্ধ্বে। তিনি তখন অপৌরুষেয়। তাঁহার প্রাপ্তিও অপৌরুষেয়।

মন্ত্রটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ভাবের অনুকূল ভাষার স্পন্দন। ঋষি মন্ত্রটির প্রবক্তা। কিন্তু ঐ মন্ত্রে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই, কোন মালিকানা স্বত্ব নাই। কারণ উহা সত্য। কোন সত্য বলিবার সময় কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। সকল ব্যক্তিরই ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, কোন স্বার্থ প্রেরণা থাকিতে পারে। সত্য ঈশ্বরকৃতও নহে। সত্যের সত্যতা কোন ঈশ্বরের উপরও নির্ভরশীল নহে। ঈশ্বর অসত্যকে সত্য করিতে পারেন না। সত্যের উপর কোন গুণাধান করিতে পারেন না। সত্যের সত্য ছাড়া আর কোন বিশেষণ চলে না। এইজন্য বৈদিক ঋষিরা বেদ-বাক্যকে ঈশ্বর-বাক্যও বলেন না। যাহা প্রকৃত সত্য, চিরন্তন সত্য, তাহা অপৌরুষেয় হইতেই হইবে। বেদ, ঋষির অপৌরুষেয় সাক্ষাৎকার। মুনিরা এই অপৌরুষেয়বাদ লইয়া অনেক তর্ক-বিচার করিয়াছেন। এই অপৌরুষেয় মন্ত্ররাজিকে যাঁহারা কণ্ঠে করিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের নাম মীমাংসক। কিভাবে যে এই মন্ত্রগুলি এতকাল বাঁচিয়া আছে, অক্ষুণ্ণ আছে তাহা অলৌকিক ব্যাপার, বিস্ময়কর ঘটনা।

বেদ কত প্রাচীন?

বেদের প্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত ভারতীয়দের কথাই বলিব। ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দেবতা—সরস্বতী, ঋষি—বসিষ্ঠ। (ঋ.৭/৯৫/২)

"একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।।"

সকলের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী ইহা জানেন।

সরস্বতী অর্থাৎ পুণ্যতোয়া নদী, যে নদী গিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত গিয়াছে। এই কথা বেদমন্ত্রে আছে। বর্তমানে সরস্বতী নদী রাজস্থানের বিকানীর অঞ্চলে মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কোন্ প্রাচীনযুগে সরস্বতী সমুদ্র পর্যন্ত ছিল, তাহা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কেট্‌কার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি পুরাতত্ত্বের বিবিধ দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ৭৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সরস্বতী মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রের বিদ্যমানতা খৃষ্টপূর্ব সাড়ে সাত হাজার বৎসর পূর্বে ছিল। বসিষ্ঠ ঋষির নিকট মন্ত্র কখন মূর্ত হইয়াছিল তাহা আমরা কেহই জানি না।

Rigvedic India গ্রন্থের লেখক পরম পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (অষ্টম পৃষ্ঠায়) কেট্‌কার মহোদয়ের ঐ সিদ্ধান্ত বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহার *Rigvedic India* গ্রন্থে (549পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন— "The Rigvedic civilization had its beginning in Sapta Sindhu about 25,000 years ago, and was at it is probably in the seventh millennium B.C."।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার *The Orion* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যখন সূর্য মহাবিষুব সংক্রান্তিতে মৃগশিরা নক্ষত্র পুঞ্জের নিকট অবস্থিত আর্দ্রানক্ষত্রে অবস্থান করিত, সেই সময়ে ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত প্রকট হইয়াছিল। ঐ সময় ছিল মোটামুটিভাবে ৪০০০ হইতে ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাকোবি (H. Jacobi) পূর্বোক্ত তিলক মহোদয়ের সঙ্গে কোন আলোচনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সংহিতা

ও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যের গবেষণা করিয়াছেন এবং আশ্চর্যরূপে দুইজনেই (তিলক ও জ্যাকোবি) একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বলেন— সংহিতার কালে বসন্তকালীন বিষুব সংক্রান্তি, মৃগশিরা (Orion) নক্ষত্রে হইয়াছিল, এবং গণনা করিলে তাহার কাল ৪৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাওয়া যায়।

আরও একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ডন বুলার, তিলক ও জ্যাকোবির সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— "অধ্যাপক জ্যাকোবি ও তিলকের সিদ্ধান্ত আমি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি না। মৃগশিরা নক্ষত্রের যে প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন, আমি তাহা অতিশয় মূল্যবান্ মনে করি।" (*Indian Antiquary* পুস্তকে পৃষ্ঠা 24৪) খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ বৎসর ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময়। তাহার অনেক পূর্বে বেদ সংহিতার মন্ত্রের প্রকাশ। ব্রাহ্মণ হইল সংহিতার মন্ত্র লইয়া নানাবিধ বিচার। মন্ত্র প্রাচীন হইলে বিচারযোগ্য হয়।

বালগঙ্গাধর তিলকের মতে বৈদিক সভ্যতার শেষ খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে। অধ্যাপক দাস তিলকের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার *Rigvedic India*-এর গবেষণা খুবই মূল্যবান্।

যাঁহারা বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য বেদের কাল আলোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক কোন যুগে ঋষিগণ কর্তৃক বেদ রচিত হইয়াছিল, তাঁহাদের জন্যই বেদের কাল বিচার। আজ হইতে অন্ততঃ দশ হাজার বৎসর পূর্বে বেদের প্রকাশ ইহাতে সংশয় নাই। বেদ-সংহিতাকে যাঁহারা অপৌরুষেয় ভাবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কথা।

জন মার্শাল (John Marshall) বলেন— "One thing that stands out clean and unmistakeable both at Mohenjo-daro and Harappa is that the civilization hitherto related at this two places is not an incipient civilization, but one already age-old and stereotyped on Indian soil with many millenniums of human endeavour behind it."।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি হাতে বালা ও গলায় হার পরিহিতা চার ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট নৃত্যরতা ব্রোঞ্জের বালিকামূর্তি অন্যতম। উহা সেই যুগের উন্নত শিল্প-নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐ ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রায় তিন হাজার শিলমোহর পাওয়া গিয়াছে। উহাদের পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয় নাই। একটি শিলমোহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — একটি বৃক্ষে পরস্পর সখ্যভাবে

দুইটি সুন্দর পাখি বসিয়া আছে; একটি পিপ্পল ভক্ষণ করিতেছে, অপরটি কেবল তাকাইয়া তাহা দেখিতেছে। ইহা বেদের বিখ্যাত একটি মন্ত্র স্মরণ করায়; যথা—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি।।"

(ঋ.১/১৬৪/২০)

এই মন্ত্রটি অথর্ববেদে দৃষ্ট হয় (৯/৯/২০) এবং কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও রহিয়াছে দেখা যায়। ইহার অর্থ— সর্বদা সংযুক্ত ও তুল্য নামবিশিষ্ট দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তাহাদের মধ্যে একটি বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে।

বৈদিক সংস্কৃতি যে সিন্ধু সভ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই আলোচনা হইতে তাহা বুঝা গেল। ইহা যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও বলেন— "After being preserved for over five thousand years under a covering of sand and soil.." (*The Discovery of India*, p.59)।

বেদের বিভিন্ন অর্থ

প্রাচীনেরা বেদশাস্ত্রের তিন প্রকার অর্থ আছে বলিয়াছেন— আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক অর্থ —এই পঞ্চভূতময় জীব ও প্রাকৃত জগৎকে অবলম্বন করিয়া বেদমন্ত্রের যে একটি ব্যাখ্যা হয় তাহাই।

আধিদৈবিক অর্থ — বেদের দেবতাগণকে অবলম্বন করিয়া; দেহ-মনঃ-প্রাণ ও বিরাট্ ভূতময় জাগতিক বস্তু সকলকে অবলম্বন করিয়া এই ব্যাখ্যা।

আধ্যাত্মিক অর্থ — আত্মাকে অবলম্বন করিয়া। আমাদের সকলের মধ্যে যে অজর, অমর, বিকারহীন আত্মা এবং সকল আত্মার মূলে যে এক পরমাত্মা আছেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাখ্যা, তাহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

যেমন, অগ্নি অর্থ ভৌতিক অগ্নি, যে অগ্নি আমরা ব্যবহার করি — পঞ্চভূতের একটি ভূত। আবার অগ্নি অর্থ দৈব শক্তি, আমাদের মধ্যে তপঃশক্তিরূপে বিরাজমান। ভৌতিক অর্থ অগ্নি যেমন সর্বদাই উর্ধ্বগতি, তপঃশক্তিও আমাদের উর্ধ্বদিকে লইয়া যায়, ধীরে ধীরে আত্মাকে উর্ধ্বদিকে লয়। উর্ধ্বদিকে অর্থ উঁচুদিকে নহে, ব্যাপকতার দিকে। আত্মা বড় হইয়া যায়, বিশাল হইয়া যায়। বাড়ীঘর লইয়া যাহারা অন্ধ নহে তাহারা ক্রমে দেশ মহাদেশক্রমে ব্যাপ্তি লাভ করে। এই আত্মার ব্যাপকতা বাড়ায় যে অগ্নি বা তপস্যা সেই অগ্নি আধিদৈবিক অগ্নি।

আর আধ্যাত্মিক অর্থ — সূর্যের পরম জ্যোতি। গায়ত্রী মন্ত্র যাঁহাকে ভর্গ বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্মজ্যোতি বা পরব্রহ্মই। ইহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা ক্রমে বড় হইয়া ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই ব্রহ্মভূত হওয়াই জীবের সাধনার লক্ষ্য। আমাদের আত্মার চরম ব্যাপকতা ও বিশালতা প্রাপ্তি আধ্যাত্মিক সাধনার সার কথা।

এই তিন কোণ (Angle of vision) হইতে বেদশাস্ত্রকে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভব আমাদের বিশাল বুদ্ধির অনুভব নহে, সত্যের সঙ্গে একাত্মতায় যে অনুভূতি সেই অনুভূতি লাভ করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি — ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের একটি বিশিষ্ট ও অর্থগর্ভ মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রটির অনুবাদ —

"সত্য দ্বারা আবৃত এক সত্য আছে। এখানে সূর্যদেবের অশ্বগুলিকে তাহারা বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা একত্রে দাড়াইয়াছিল সংখ্যায় দশ শত। সেই একও ছিলেন, দেখেছি তাঁকে। দেবশরীরধারীদের মধ্যে দুইই মহোত্তম সর্বাধিক মহিমশালী।"

এখন দেখা যাক এই মন্ত্রটিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা উপনিষদের ঋষিরা কিভাবে গূঢ় অর্থ টানিয়া বাহির করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সূর্য প্রতীকটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপনিষদের ঋষির আধ্যাত্মিক দর্শন এইরূপ :

"সত্যের মুখ আচ্ছন্ন রহিয়াছে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা। হে পূষা! হে পোষক! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! হে যম! হে প্রজাপতি! হে সূর্য! সংহত কর, সুসজ্জিত কর তোমার কিরণজাল। দেখি তোমার মনোহরতম ও কল্যাণতম জ্যোতিরূপটি। তিনি যিনি সেই একপুরুষ, তিনিই আমি।"

দশশতের একত্র সম্মিলিত হওয়ায় বুঝা গেল সূর্যদেবকে রশ্মিসমূহকে সংহত ব্যূহিত করার প্রার্থনা। যাহাতে তাহার পরমজ্যোতিঃস্বরূপটি দৃষ্টিগোচর হয়। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই বলা হইয়াছে সূর্যদেব পরম সত্য ও পরমজ্ঞান অধিদেবতা। তাঁহার কিরণজাল সত্য ও তাঁহার জ্ঞানরশ্মির বিচ্ছুরণ।

এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, বেদের সম্যক্ অর্থবোধ উপনিষদের ঋষি কবিদের ছিল। কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাকার জৈমিনি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যাজ্ঞিক দেবতাদের অর্থে মন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছেন। আর আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী কিছুই বুঝেন নাই। তাঁহারা বেদকে প্রাচীন যুগের 'চাষার গান' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বেদের অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বুঝিতে হইলে অধ্যাত্ম মনস্তত্ত্ববাচক শব্দগুলির গভীরতম অর্থ নির্ধারণ করিতে হইবে। যেমন সত্য বাচক 'ঋত' শব্দ। যেমন বিচার শক্তিবোধক 'ধী' শব্দ। সাধারণতঃ 'ধী' শব্দ বুদ্ধি অর্থে বুঝিতে হয়। বহুবচনে 'ধিয়ঃ' অর্থ চিন্তাসমূহ। কিন্তু গায়ত্রীতে 'ধিয়ঃ' শব্দের অর্থ গভীরতর।

যেমন ক্রতু শব্দ, যাহার অর্থ সূর্যরশ্মি। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার অর্থ অন্তর্হৃদয়ের জ্ঞানরশ্মি। ক্রতুশব্দের স্বাভাবিক অর্থ কর্ম বা যজ্ঞ। আধ্যাত্মিক অর্থ হৃদয়স্থ সংকল্প শক্তি। অগ্নি হইলেন কবিক্রতু। (ঋ. ১/১/৫)

যেমন বেদে বহুপ্রযুক্ত 'শ্রবস্' শব্দ অর্থে বলা হইয়াছে কীর্তি। ভাষ্যকারেরা অন্য অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ শ্রুত-বিষয় অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়-জ্ঞান বা শ্রুতজ্ঞান। ঋষিরা নিজেদের অভিহিত করেছেন 'সত্য-শ্রুতঃ'। তাঁহাদের শ্রবণলব্ধ জ্ঞানকে বলিয়াছেন শ্রুতি। এই দৃষ্টিতে 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ পাই অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তঃপ্রেরিতজ্ঞান। যেমন 'গো' শব্দটির সহজ অর্থ পশু — গরু। অশ্ব শব্দের অর্থ পশু ঘোড়া। ঘৃত শব্দের অর্থ দুধের সারাংশ যাহা আমরা খাই। কিন্তু বেদে ঐগুলি আধ্যাত্মিক

পরিভাষা। ঋষি উষার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন — "গোমদ্ বীরবদ্ ধেহি রত্নম্ উষা অশ্বাবৎ।" ইহার আধিভৌতিক অর্থ রমণীয় ধন, যাহার সঙ্গে গরু পরিজন বা পুত্র যুক্ত থাকে। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ — "আমাদের মধ্যে এমন এক আনন্দের অবস্থা সুদৃঢ় কর যা আলোকে জয়দাত্রী, শক্তিতে ও প্রাণবত্তার তেজে পূর্ণ।

গো শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ জ্যোতি। কারণ উষার গো, সূর্যের গো — এই সকল স্থলে 'আলো' অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ করা যায় না।

বেদে উষাকে গোমতী ও অশ্বাবতী বলা হইয়াছে। ইহাতে আপাতত মনে হয় উষার সঙ্গে অনেক ঘোড়া ও গরু থাকে। ইহার কোন তাৎপর্য হয় না। ইহার প্রকৃত অর্থ উষা সমস্ত জগতের জন্য আলো সৃষ্টি করে। যে আলোটি সৃষ্টি করে সেইটি খুব শক্তিশালী, গভীর অন্ধকার নাশকারী। যেমন গোরুর খোয়াড় উন্মুক্ত করা হয়, তেমনি উষা অন্ধকার নাশ করিয়া চরাচর উন্মুক্ত করেন।

গো বা ধেনু বাকের প্রতীক। আদি বাক্ গৌরী। তাঁহার হাম্বাধ্বনিতে অক্ষরের ক্ষরণ বা সৃষ্টি। (বেদ-মীমাংসা, ২য়, পৃ. ৩২৬) "দেবতার সঙ্গে গো-র সম্পর্ক বেদে নানাভাবেই এসে গেছে এবং তা হতে শব্দটি একটি রহস্যার্থের বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে — অধ্যাত্ম এবং অধিযজ্ঞ দুই দৃষ্টিতেই। নিঘণ্টুতে মোটের পর গো-র তিনটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে — পৃথিবী, বাক্ এবং রশ্মি।"

অশ্ব সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন — "The Vedic 'horse' is a symbol of power spiritual strength, force of tapasya." (*Hymns to the Mystic Fire*)।

অশ্ব শক্তির প্রতীক। আধ্যাত্মিক শক্তি, প্রাণশক্তি, তপঃশক্তি, ওজঃ-তেজো-বীর্য-গতি ও বেগের বাহন। পূর্ণ সত্যের দিকে যাহার গতি, বিশুদ্ধ প্রাণের যে ঊর্ধ্বায়ন, দিব্য আনন্দ ভোগের যে যোগশক্তি, তাহাই হইল অশ্ব।

ঘৃত—'ঘৃ' ধাতু হইতে ঘৃত। 'ঘৃ' ধাতু অর্থ দীপ্ত হওয়া। ঘৃত অর্থ আলোক। পরিশুদ্ধ মানসচেতনা — "clarified mental consciousness" (*OV*, p. 349)।

ইন্দ্রের অশ্বকে বলা হয় 'ঘৃতস্নু' — আলোকস্নাত। ঋষির ধ্যানকে বলা হয় "ধীয়ং ঘৃতাচীম্।"

যাস্ক ঘৃ ধাতুর অর্থ করিয়াছেন ক্ষরণ, দীপন, সেচন (নিরুক্ত, ৭/২৪)। আবার যেহেতু ঘৃত অগ্নির স্পর্শে গলিয়া তরল হইয়া যায় তাই ঘৃত অর্থ উদক।

অনির্বাণ উপরের দুইটি সংজ্ঞা মিলিয়া ঘৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন "জ্যোতির ধারা"।

ঘৃত অর্থ — দিব্য-জ্যোতি। তাই ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, "এই

দ্যাবা-পৃথিবী দিব্যজ্যোতির ধারায় বর্ধিত হইয়া নিষ্ণাত হইয়া জ্যোতির্ময় রূপে ঝলমল করিতেছে। "ঘৃতেন দ্যাবা-পৃথিবী অভীবৃতে ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা।" (ঋ. ৬/৭০/৪)

ঘৃত অর্থ তেজস্। তাই অগ্নি হইলেন 'ঘৃতাচীম্' (ঋ. ১০/৭০/১) জ্যোতির্ময় ভাবনায় যাহার আনন্দ।

ঋষি যখন অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন (ঋ. ১/১/৮)—

"রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।।"

অর্থাৎ নিজধামে বিরাজমান দেদীপ্যমান সত্যের সংরক্ষক মিত্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতারা সত্যস্পর্শী, সত্য সংবর্ধক অথবা সত্যজাত, তখন এই সব বিশেষণ পদগুলি এমন কোন রহস্যবাদী ঋষিকবির উক্তি বুঝিতে হইবে, যিনি নিখিল বস্তুর অন্তরালে বস্তুস্বরূপের মূলস্থিত সত্য চিন্তায় মগ্ন। ভৌতিক অগ্নি বা যজ্ঞীয় অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী জড় প্রকৃতির শক্তি ও সামর্থ্য ঋষির চিন্তার বিষয় নহে।

শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ 'বেদ ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থ অবলম্বনে বেদের যে তাৎপর্য নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সুগভীর রহস্যপূর্ণ। আচার্য সায়ণ আধিযাজ্ঞিক ভাব অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল ব্যাখ্যাকারই যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াছেন। যজ্ঞের তিনপ্রকার অর্থ; একটি পার্থিব যজ্ঞ, মন্ত্রপূত অগ্নিতে ঘৃত সমর্পণ। দ্বিতীয় অর্থ— জৈমিনি মুনি দেব গণের সকল কর্মাবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ভূমিকা হইতে যজ্ঞের তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাকে আধিদৈবিক বলা যায়। যজ্ঞের তৃতীয় ব্যাখ্যা হইল, এই বিশ্বে একটি যজ্ঞ চলিতেছে। পরমাত্মা বিশ্বযজ্ঞে নিরন্তর আপনাকে আহুতি দিতেছেন। এই তাৎপর্যাশ্রয়ে আত্মিক ব্যাখ্যা স্থিত। যাস্ক এই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আচার্য সায়ণ মনে করেন, বেদের মন্ত্রগুলি পার্থিব যজ্ঞের উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি স্বাধ্যায় করিলে এমত মনে হয় না। মনে হয় ঐগুলি অনাদি কাল ধরিয়া ব্যক্ত। পরবর্তীকালে তাহাদিগকে রক্ষা করার জন্য যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। যেমন —

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।।"(ঋ. ১/২২/২০)

"সেই বিষ্ণুর পরম পদ, যাকে সূরিগণ অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধি-কর্তা দ্রষ্টা ঋষিগণ সদাসর্বদা নির্বাধে দেখে থাকেন, তেমনি, যেমন কিনা দ্যুলোকে আলোর আকাশে চোখ মেলে দিলে নির্বাধে দেখা যায়।"

এই মন্ত্রটি কোন যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। একটি গভীর তত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। এই মূল্যবান্ মন্ত্রটি আমরা ভুলিয়া না যাই

এই জন্য ইহাকে আমাদের নিত্য আচমনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা কোন্ বেদের কোথায় আছে না জানিয়াই আমরা নিত্য উচ্চারণ করি। অর্থ চিন্তা করি না। অধিকাংশ মন্ত্রই এইভাবে আম্নাত।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।।" (ঋ.১০/১৯০/১-৩)

"প্রজ্জ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল, পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। ১। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন-রাত্রি সৃষ্টি করিলেন, সকল লোক দেখিতেছে। ২। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ৩।"

মূল তত্ত্ব দুইটি : ঋত ও সত্য। যাহার একটি হইল গতিরূপ আর অপরটি হইল স্থিতিরূপ। এই গতি ও স্থিতির সমাহারই নিখিল সৃষ্টি সংসার। সত্যের প্রবাহ রূপটি হইল এই গতি। ইহা সত্য বা স্থিতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে কখনও। সত্য বা স্থিতিই ঋতের পথানুসরণ করিয়া ঋজু গতি লাভ করিয়াছে। এক অখণ্ড সরল প্রবাহে যেন নিজেকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

এই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' মন্ত্র কয়টি সৃষ্টিসূক্তের। এই মন্ত্রত্রয়ের প্রয়োগ হয় সন্ধ্যাবন্দনার সময় অঘমর্ষণ কার্যে। অঘমর্ষণ কার্যটি হইল, হাতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাকের কাছে ধরিতে হইবে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে যত মালিন্য যেন বাহির হইয়া আসিতেছে এই ভাবনা মনে রাখিয়া সেই জল গণ্ডূষকে বাম পার্শ্বে আছাড় মারিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি করিতে হইবে উক্ত 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই সৃষ্টিসূক্তের মন্ত্র পাঠ করিয়া। এই প্রক্রিয়াটি নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় করিতে হয়। এই সৃষ্টিসূক্তের মন্ত্রের সংগে এই অঘমর্ষণ ক্রিয়ার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এই সূক্তটি ঐ অঘমর্ষণ কার্যের জন্য আম্নাত হয় নাই। পরে এই চমৎকার সূক্তটি চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অঘমর্ষণ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি সংহিতার মন্ত্রগুলি কোন কর্মের উদ্দেশ্যে লেখা হয় নাই, এই মন্ত্রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই কোন বিশেষ কর্মের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ঘটনাচক্রে এই মন্ত্রের ঋষির নাম অঘমর্ষণ, অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত অঘ বা পাপ দূর হইয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

'ত্রয়ী' নামের গূঢ় তাৎপর্য

বেদ চারিখানি, কিন্তু নাম 'ত্রয়ী'। গদ্য, পদ্য ও সঙ্গীতময় বলিয়া নাম ত্রয়ী, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কারণটি ভাসা ভাসা (superficial), গভীরার্থদ্যোতক নহে। কিছু নিগূঢ় কারণ মনে জাগে। বেদের প্রতি তিন প্রকার দৃষ্টি প্রদান করা যায়, যথা যজ্ঞদৃষ্টি, দৈবদৃষ্টি ও আত্মিক দৃষ্টি। এই কারণে ত্রয়ী নাম সার্থক হইতে পারে। এই তিন দৃষ্টির বিষয় পুনরায় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) **যজ্ঞদৃষ্টি**— এই বিশ্বজগৎ যেন এক বিরাট যজ্ঞ। বিশ্বের মূল কারণ আদিপুরুষ, তিনি নিজেকে ঐ যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। কেবল দিয়াছেন নহে, প্রতি মুহূর্তে দিতেছেন। পিতা হইতে পুত্রের জন্ম, ইহা একটি যজ্ঞ। এই যজ্ঞটি বস্তুত পিতা করেন না। পিতার ইচ্ছায় যদি পুত্র হইত তবে সকল ব্যক্তিই পুত্রবান্ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। পিতাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরমপুরুষ যখনই বীজ প্রদান করেন, তখনই পুত্র হয়। এই কথা শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন শ্রীগীতায়—"অহং বীজপ্রদঃ পিতা"। পৃথিবীর সব নর-নারীকে আমরা যে ভাই-বোন বলি, ইহা একটি ভাবের কথা নহে, মূল বীজপ্রদ ভগবান্ পিতা বলিয়াই ইহা সত্য।

একটি বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর বৃক্ষে রূপায়িত হয়, ইহা একটি যজ্ঞ। যজ্ঞের কর্তা শ্রীভগবান্। ফুল হইতে ফল হয়, ফলের মধ্যে বৃক্ষের মূল বীজটি পাওয়া যায়, এই ধারাবাহিকতা একটি যজ্ঞ। বস্তুতঃ ইহারা সকলই বিরাট যজ্ঞের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যজ্ঞ চলিতেছে অবিশ্রাম।

"অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।"
(গীতা, ৩/১৪-১৫)

এই যজ্ঞের হোতাও তিনি, আহুতির বস্তুও তিনি। তিনি নিজেকেই নিজে আহুতি দিতেছেন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা।।" (গীতা, ৪/২৪)

এই দৃষ্টিতে দেখাই যজ্ঞদৃষ্টি। গভীরভাবে বেদে প্রবেশ করিলে এই যজ্ঞদৃষ্টি লাভ হয়। এই দৃষ্টি যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক। বেদশাস্ত্র বিশেষ কি বলিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

(২) দৈবদৃষ্টি— বিশ্ব ব্যাপিয়া যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা সকলই এক বেদের প্রকাশময় রূপ। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ অর্থ জ্ঞান, বেদ নিখিল জ্ঞানভাণ্ডার। আধুনিক বিজ্ঞানের গণিতশাস্ত্র অঙ্ক পর্যন্ত সকলই বেদের প্রকাশময় রূপ। ধর্মজ্ঞানসাধন, ধর্মাধর্মজ্ঞাপক, ধর্মব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য বেদ। বিদ্ ধাতুর আর একটি অর্থ প্রকাশ। বেদের অর্থ প্রকাশময়তা। চক্ষু মেলিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখি একটি বিরাট আনন্দের প্রকাশ। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, আলোকময় প্রকাশ এবং এই আলোকময় প্রকাশ হইতে ফুল-ফল, বৃক্ষ-লতা, তৃণ-গুল্ম, পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রকাশমান হইতেছে। প্রতিটি প্রকাশই মনোহর, দেখিয়া চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। একটি ফুলের পাপড়িতে কতই না বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। ময়ূরের পালকে কত রংয়ের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্যময় প্রকাশ। একটি লতানো গাছ নিকটস্থ বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, কিন্তু সেখানেই থামিয়া নাই, একের পর এক বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যগ্র। কত প্রেমময় তাহার প্রকাশ। যেদিকে তাকাই একটি কারুণ্যের প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। ইহা সকলই বিশ্ব দেবতার প্রকাশ। একটি দেবতা লক্ষ কোটি রূপে অসংখ্য সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্যের পসরা লইয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সকল চক্ষু খুলিয়া দর্শন করা যায়। চক্ষু বন্ধ করিলে আমাদের ভিতরে দেখিতে পাই এক অন্য রাজ্য— কত স্নেহ, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের বিদ্যমানতা। কতই না অনুরাগ, আকর্ষণ, বৈরাগ্য, কারুণ্যের চিত্ত-চমৎকারী প্রকাশ। ধীরভাবে বিচার করিলে আন্তর রাজ্যে দেখিতে পাই কত বৈচিত্র্যময় ভাবের প্রকাশ। শ্রেষ্ঠ কবিগণ অন্তরের ভাবকে, আবেগকে, ভাবোচ্ছ্বাসকে শৃঙ্খলিত করিয়া কতই না সুমধুর ছন্দোময় বাক্যে, কবিতায়, বন্দনায়, সংগীতে প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসীর মনোহরণ করিতেছেন। মনোরাজ্যের মর্মনিঙ্গাড়ানো ভাব, অনুভব, কাব্যের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে যেন প্রকাশমান মধুর ঝরণা। এই অন্তর-বাহির সব লইয়াই যেন ভূমার আত্মপ্রকাশ। ভূমার বৈদিক নাম 'বৃহৎ'। এই বৃহৎ চক্ষু লইয়া বেদশাস্ত্রকে দেখাই দৈবদৃষ্টি।

যজ্ঞদৃষ্টি ও দৈবদৃষ্টির কথা বলা হইল, এখন আত্মিক দৃষ্টির কথা বলিব।

(৩) আত্মিক দৃষ্টি— আমরা সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মনে করি, দেহ-ইন্দ্রিয় জড় বস্তু এবং আত্মা চৈতন্য বস্তু। আমাদের মনের এইরূপ বিভাগ কৃত্রিম, বাস্তবিক সত্য নহে। আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়ে চিৎ-জ্যোতি

ঘুমন্ত, অব্যক্ত ও সুপ্ত। কথাটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বোধগম্য ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাইতেছে। এক খণ্ড লোহায় বা মাটির ঢেলায় আগুন লাগাইলে জ্বলিয়া উঠে না। একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে আগুন দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। ইহার কারণ শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে আগুন রহিয়াছে, জ্বলনোন্মুখ হইয়া আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, সূর্যের জ্যোতিঃরূপ বিরাট অগ্নির এক কণা কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া রাখিয়াছে। যে কোন কাষ্ঠ-খণ্ড কি সূর্যের কণা ধরিয়া রাখে নাই? যে কাষ্ঠ-খণ্ডে জলীয় অংশ বেশী, তাহা সূর্যের অগ্নি কণা ধরিয়া রাখিতে পারে না, সেই জন্য জ্বলে না। শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে জলীয় অংশ নাই বলিলেই চলে। আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়ে যে জলীয় অংশ অর্থাৎ পার্থিব কামনা বাসনা আছে, উহা যদি সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা চিৎ-জ্যোতির স্পর্শমাত্র জ্বলিয়া উঠিবে অর্থাৎ চৈতন্য-সত্তা প্রাপ্ত হইবে। শুষ্ক করিবার উপায় হইল ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ও শ্রীহরি শরণ। আমরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া মনে করি ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি। কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালনের কঠোরতা যে কিরূপ এবং উহার সীমা যে কত সুদূরপ্রসারী তাহা কবি কালিদাস উমার পতিলাভের জন্য তপস্যার বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন।

উমা দেবাদিদেব শিবকে লাভ করিবার মানসে তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ তপস্বিগণ তপস্যাকালে আহার প্রায় ত্যাগ করেন। বৃক্ষের গলিত পর্ণ (পাতা) মাত্র আহার করেন। উমা তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার এক নাম অপর্ণা।

"স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।।"

(কুমারসম্ভব, ৫/২৮)

"গাছের যে পাতাগুলি আপনা আপনি খসিয়া পড়ে, তাহার রস পান করিয়া জীবনধারণ করাই হইল তপস্যার চরম উৎকর্ষ, সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। উমা কিন্তু তাহাও গ্রহণ করিতেন না। স্বতশ্চ্যুত পাতাটি পর্যন্ত ছুঁইতেন না। এই কারণে সেই মঞ্জুভাষিণী উমাকে পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ অপর্ণা বলিয়া ডাকিতেন।"

এইরূপ কঠোর ত্যাগ ও সংযমে উমার দেহখানি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে এবং নিরন্তর 'শিব শিব' জপ করিতে করিতে তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয় শিবময় হইয়াছিল। শিবত্ব ছিল দেহের মধ্যেই, অনুকূল পরিবেশে তাহা জাগ্রত হইল। দেহ ও ইন্দ্রিয় মধ্যে যে শ্রীভগবানের গূঢ় স্বরূপ অনুভূত হয় তাহার সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/৩৬) —

"যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে।।"

—"যাঁহারা দোষ বুঝিয়া তাহা পরিহার করিতে পারেন, সেই বিদ্বান্‌গণ তত্ত্বদর্শনে অভিলাষী হইয়া দারুতে মন্থন-দণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে যেরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে যে ভগবানের গূঢ়স্বরূপ কর্ম ও কর্মফল দ্বারা প্রকটরূপে অনুভব করেন, সেই ভগবান্ পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।"

পুনশ্চ, শ্রীমদ্ভাগবতের ৭/৭/২১ শ্লোকে—

"ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত।"

"দেহরূপ ক্ষেত্রে আত্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ-চিন্তনাদি দ্বারা অধ্যাত্ম-বেত্তা পুরুষগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।"

উপরে কথিত তিন দৃষ্টি যখন সাধক লাভ করেন, ঐ তিন দৃষ্টি সাধকের মধ্যে একীভূত হয়, উহাদের পৃথক্‌ত্ব কিছু থাকে না, তখন বেদার্থ তাঁহার মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠে অর্থাৎ সাধক বেদমূর্তি হয়েন। ত্রয়ী নামের সার্থকতা এইখানে।

শ্রীঅমলেশ বলেন —"এই তিন দৃষ্টি যে এক, পরস্পর ক্রমান্বয়ী এবং পরিপূরক, সেকথা যাস্ক অতি চমৎকার ভাবে বলেছেন তাঁর বিখ্যাত নিরুক্তে। তিনি বলেছেন, এই তিনের সম্বন্ধ যেন ফুল আর ফলের মত।

"বেদকে যদি যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখি তাহলে যজ্ঞ ফুল এবং দেবতা তার ফল। আর বেদকে যদি দৈবদৃষ্টিতে দেখি, তাহলে দেবতা ফুল এবং অধ্যাত্ম তার ফল— যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা (নিরুক্ত, ১/২০)।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী)

এই তিন দৃষ্টি যাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই বেদবিদ্। বেদের যথার্থ অর্থ তিনিই পরিজ্ঞাত হয়েন।

বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে বেদের কাঠামো

মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ হইলেই ঋক্, গীত হইলেই সাম, তাহা ভিন্ন আর সব মন্ত্র যজুঃ। অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদের পরিপূরক। ঋক্ ও অথর্ব, বেদবিদ্যার উৎস।

সংহিতার উপর যে ব্যাখ্যান তাহা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের তিন ভাগ—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহার সঙ্গে যুক্ত আরণ্যক, অবশেষে উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ডের ধারক। উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের ধারক। আরণ্যক দুইয়ের মাঝামাঝি। ইতিহাস ও পুরাণকে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়াছেন পঞ্চমবেদ।

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়াই বেদ।

মন্ত্র বা সংহিতা

ঋক্ সংহিতাই চারিটি সংহিতার মধ্যে প্রাচীনতম। কারণ ঋক্‌সংহিতার বহু মন্ত্রই অন্যান্য তিন সংহিতায় উল্লেখ পাই। সামবেদ সংহিতার ৭৫টি নিজস্ব মন্ত্র ব্যতীত সকল মন্ত্রই ঋগ্‌বেদ সংহিতার অন্তর্গত। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় বা কৃষ্ণ যজুর্বেদে বহু ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র রহিয়াছে তেমনি শুক্ল যজুর্বেদেও বেশ কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র পাই। অথর্ববেদের শৌনক সংহিতায় ঋক্‌সংহিতার ১২০০ মন্ত্র আছে। শৌনকের চরণব্যূহ গ্রন্থে আছে — যজুর্বেদে মোট ১৯০০ ঋঙ্মন্ত্র আছে।

ঋক্‌সংহিতায় দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্ট হয়, মণ্ডল ভিত্তিক ও অষ্টক ভিত্তিক। প্রথম প্রকারে মণ্ডল অনুবাক্ সূক্ত ও ঋক্ — এইভাবে এবং দ্বিতীয় প্রকারে অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র — এইভাবে বিন্যস্ত। সমগ্র ঋগ্বেদে ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক্, ১০১৭ টি সূক্ত (শাকল শাখা মতে) এবং মন্ত্র সংখ্যা ১০,৫৫২ টি। বালখিল্য ঋষিগণ দৃষ্ট ১১টি সূক্ত সহ মোট সূক্তসংখ্যা ১০২৮ (বাস্কল শাখা মতে) এবং ১০,৬০০ টি ঋক্ মন্ত্র। সমগ্র ঋগ্বেদে ৪,৩২,০০০ অক্ষর আছে। বালখিল্য সূক্তগুলির ব্যাখ্যা সায়ণ করেন নাই এই হেতু উক্ত সূক্তগুলিকে মূল সূক্তমধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

ঋগ্বেদের ১০টি মণ্ডলের প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে; মধুচ্ছন্দা প্রমুখ বহু ঋষি আছেন। দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত ছয়জন ঋষি আছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব,

অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ। অষ্টম মণ্ডলে ১০৩টি সূক্ত, কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি প্রমুখ বহু ঋষি আছেন। নবম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত, মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি বহু ঋষি। দশম মণ্ডলে ১৯১টি, সূক্ত ত্রিত প্রমুখ বহু ঋষি। নবম মণ্ডলে একমাত্র দেবতা সোম। অন্য সকল মণ্ডলে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি বহু দেবতা। অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম —এই তিনজন হইলেন ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা।

বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সোমযাগ। নবম মণ্ডলকে সোম মণ্ডল বলা হয়, এই মণ্ডলে প্রত্যেক ঋষি বংশের সূক্ত আছে। তাহা ছাড়া কশ্যপ, অঙ্গিরা, ভৃগু ও কণ্ব ঋষি আছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক শাণ্ডিল্য ঋষি। অবশ্য সব ঋষিই মূলত অগ্নির উপাসক। অথর্ব নামা ঋষি অথর্ব বেদের প্রবর্তক। কশ্যপ সপ্তর্ষির অন্যতম।

বিশ্বামিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান সাবিত্রী মন্ত্র। ইহা গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলিয়া নাম গায়ত্রী। ঋগ্বেদে সাতটি ছন্দের প্রাধান্য। গায়ত্রী ছন্দ শ্রেষ্ঠতম। গায়ত্রী মন্ত্র ভারতবর্ষের দ্বিজাতির অবশ্য নিত্য জপনীয়। উপনয়ন কালে এই গায়ত্রী মন্ত্রই আচার্য কর্তৃক যজ্ঞসূত্র সহ প্রদত্ত হয়। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা কর্তৃক অগ্নিমন্ত্র দ্বারা বেদের আরম্ভ। তৃতীয় মণ্ডলে একটি মন্ত্র আছে; যথা— ''বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্' '(ঋ. ৩/৫৩/১২)। বাক্যটি যেন একটি ঘোষণা, বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মশক্তি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা মনে করি, আজও রক্ষা করিতেছেন। কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বিশ্বামিত্রের এবং বেদের আরম্ভ মন্ত্র বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা হইতে— এই দুই কারণে।

সংহিতার প্রথম সূক্তটি অগ্নিমন্ত্রের, পরবর্তী সূক্ত বায়ু ইন্দ্রবায়ু ও মিত্রাবরণ ও তৎপরবর্তী সূক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবতা — এই তিনটি সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। নৈরুক্তগণের মতে বেদের দেবগণ ত্রিস্থানগত:পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যু। অগ্নির স্থান পৃথিবী, বায়ুর ও ইন্দ্রের স্থান অন্তরিক্ষ এবং দ্যু স্থানের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

দশম মণ্ডলকে দুই ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ অন্যান্য মণ্ডলের মত। দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটি দার্শনিক সূক্ত আছে, যথা—পুরুষ সূক্ত, বিশ্বদেব সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, বেণ সূক্ত, দেবী বা বাক্ সূক্ত, রাত্রি সূক্ত, যজ্ঞ সূক্ত, শ্রদ্ধা সূক্ত ও নাসদীয় সূক্ত। এই শেষ ভাগের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সূক্ত অথর্ববেদের সূক্তজাতীয়। যথা — ওষধি প্রয়োগ, সপত্নী সাদন, অলক্ষ্মী সাদন, যক্ষ্মানাশন, ষষ্টায়ন ইত্যাদি। এই জাতীয় সূক্তের বিশেষ প্রকাশ অথর্ববেদে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ঋক্-সংহিতা সংকলন করা হইয়াছে যজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া। এই কথা যে ঠিক তাহা মনে হয় না।

আমরা মনে করি, ঋষিরা অধিকাংশ মন্ত্রই প্রকাশ করিয়াছেন

ভাবাবেশে। পরে ঋক্‌-সংহিতা সংকলনের সময় যজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংকলন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের কর্মকাণ্ড মন্ত্র অভিব্যক্তির উপলক্ষ্য। বহু সূক্তে দেখা যায় মন্ত্রসমূহ কবি মনের উদ্দীপনা। উহা যজ্ঞের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করিয়া নহে; মন্ত্রগুলি সংকলিত হইবার পরে স্মরণ রাখিবার সুবিধার জন্য কোন না কোন যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। মন্ত্রগুলি স্মরণ রাখিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ। ঋষি-সন্তানগণের কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনের জন্য বেদের খ্যাতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅনির্বাণজী বলেন —

"আলবেরুনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তখন তিনি কাশ্মীরে একটি সংহিতা প্রথম লিপিবদ্ধ হইতে দেখেন। ইহার পূর্বে মন্ত্র ঋষি-পরম্পরায় কণ্ঠে ছিল। এই সেদিন এক বৈদিক ব্রাহ্মণ অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ঋক্ সংহিতার অনুলোম-বিলোম ক্রমে যে কোন স্থান হইতে আবৃত্তি করিয়াই নয়, কোন্ পদ কোথায় আছে স্থানসূচী সহ তাহার উল্লেখ পর্যন্ত করেন।" (বেদ-মীমাংসা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৭)।

প্রসঙ্গত পারসিক ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ অবেস্তা'র কথা মনে হইতেছে। বেদের কথা বলিতে 'অবেস্তা'র কথা মনে পড়ে। কারণ, বেদ ও অবেস্তা গ্রন্থ দুইখানি যুগ যুগ ধরিয়া মহাকালের আঘাত সহ্য করিয়া বিশ্বের বহুলাংশে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিতরণ করিয়াছে। ইহারা বিভিন্ন যুগে ভারতে ও নানা দেশে রাজধর্মকে পরিচালন করিয়াছে। দুই গ্রন্থের অক্ষর ও বর্ণ প্রায় সমান। দুইগ্রন্থই কালের আঘাত হইতে রক্ষার জন্য যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত। দুই গ্রন্থেই অগ্নির উপাসনার প্রাধান্য, যজ্ঞ দুই ধর্মেই আছে। পারসিক ধর্মের আচার্যগণ মনে করেন, তাঁহাদের ধর্মের মূলও ভারতের আর্যধর্ম।

তথাপি অবেস্তাকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচানো যায় নাই। এই অবেস্তা গ্রন্থ চারিবার ভস্মীভূত হয়ঃ প্রথম, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক; দ্বিতীয়, খ্রীষ্টাব্দ ৬৪২ হইতে যখন পারস্যবাসীদের ব্যাপকভাবে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়; তৃতীয়, খলিফা আল মামুনের মৃত্যুর পর ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে; এবং চতুর্থ, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলীয়দের আক্রমণে। পুরোহিতগণের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া অবেস্তা পুনর্নির্মিত হয়। ইহাতে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বেদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে পারিত। বেদের মন্ত্রকারগণ লিখিয়া রাখেন নাই, অক্ষর ধরিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে স্মরণাতীত কাল হইতে বেদ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই কথাই কবি জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্রে' স্মরণীয় হইয়া আছে, "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।"

(বেদ ও অবেস্তার এই তুলনাত্মক অংশটুকু আমার পূজনীয় অধ্যাপক ৺অমরেশ্বর ঠাকুরের আত্মজ অনুজপ্রতিম শ্রীপরিতোষ ঠাকুরের একটি

প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।)

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্-সংহিতা হইতে পুনরুক্ত হইলেও সামবেদে সেইগুলি গানযুক্ত — ইহাই বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই সায়ণাচার্য ঋক্‌কে সামের কারণ ও আশ্রয় বলিয়াছেন। সায়ণ বলেন, "গীতিরূপা মন্ত্র সামানি।" ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে সপ্ত স্বর সংযোগে বিভিন্ন ছন্দে এবং বীণাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যে গান করা হইত তাহাই সাম আখ্যায় ভূষিত।

সামবেদের সহস্র শাখা ছিল ইহা কিংবদন্তী ও শাস্ত্রসমর্থিত। বর্তমানে রাণায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয় এই তিনটি শাখা পাওয়া গেলেও কৌথুমী শাখাই গুরুত্বে সর্বোত্তম। এই শাখায় সামবেদ সংহিতা আর্চিক ও উত্তরার্চিক এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। ঋক্ ও গানের সংগ্রহের নাম আর্চিক বা পূর্বার্চিক। পূর্বার্চিকে ৫৮৫টি ঋক্ বা স্তবক আছে। দ্বিতীয় বা উত্তরদিকে ৪০০ সাম আছে।

সামগানের সুরের বিধান বিষয়ক চারিটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, ঊহগান ও ঊহ্যগান। এই সামগানই আর্যসঙ্গীতের সৃষ্টির উৎসমূল। ঋক্ এবং সাম ব্যতীত যে মন্ত্রসমূহ তাহাই যজুঃ। ঋষি জৈমিনি বলেন, "শেষে যজুঃ শব্দঃ।" যজুঃ সংহিতায় অধিকাংশ মন্ত্রই নিজস্ব। বৈদিক যাগযজ্ঞের ক্ষেত্রে যজুর্বেদের প্রয়োজন অপরিহার্য। যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। কারণ তিনি 'অধ্বরং (যজ্ঞং) যুনক্তি ইতি (অধ্বরযুঃ) অধ্বর্যুঃ', অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকে রূপদান করেন তিনি অধ্বর্যু।

যজুর্বেদের দুই ভাগ : কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। ইহাদের প্রকৃত নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং বাজসনেয় সংহিতা। গুরু বৈশম্পায়ন তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কোনও গর্হিত কর্মের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া শিষ্যকে ত্যাগ করেন এবং প্রদত্ত সমস্ত বিদ্যা ফিরাইয়া দিতে বলেন। গুরুভক্ত যাজ্ঞবল্ক্য সকল অধীত বেদবিদ্যা উদ্‌গীরণ করিলে অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধরিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। উদগীর্ণ বস্তু অসাত্ত্বিক তাই ঐ বেদবিদ্যা কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা বা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে খ্যাত।

বাজসনেয় সংহিতার 'বাজ' অর্থ সূর্য রশ্মি বা অন্ন, 'সনি' অর্থ ধন-ঐশ্বর্য। সূর্যের শুভ্র কিরণ হইতে ঐশ্বর্যরূপ যে বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্লযজুর্বেদ।

যজুর্বেদের মধ্যে ১,৯০০ মন্ত্র ঋগ্বেদের অন্তর্গত, বাকি যজুর্বেদের নিজস্ব। এই বেদের পদসংখ্যা ১,৯২,০৯০ এবং অক্ষর ২,৫১,৮৬৮। বাক্য ১৯,৪৮৮। এই সংহিতাতেও কোনও মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইবার সুযোগ হয় না।

তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্বেদ ৭টি কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলি প্রপাঠক বা প্রশ্ন, অনুবাক এবং মন্ত্র এই পর্যায়ে বিন্যস্ত।

শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতায় সর্বমোট চল্লিশটি অধ্যায়। অধ্যায়গুলি আবার অনুবাক কণ্ডিকা এইভাবে বিন্যস্ত। এই সংহিতায় মোট ৪০টি অধ্যায়, ৩০৩টি অনুবাক ও ১৯১৫টি কণ্ডিকা।

অথর্ববেদ সংহিতা — ঋগ্‌বেদ হইতে অনেক মন্ত্রই এই বেদে সংগৃহীত আছে। অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধ্যে অধুনা শৌনক ও পিপ্পলাদ দুইটি শাখা পাই। এই বেদের সংহিতায় মোট ২০টি কাণ্ড। ইহার ভাষা ও ছন্দ অনেকাংশে ঋগ্বেদেরই অনুসারী। এই বেদে এমন বিষয় বর্ণিত যাহা অপর তিন বেদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা ও ভৈষজ বিদ্যায় এই বেদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শৌনক-শাখার প্রথম মন্ত্র "যে ত্রিষপ্তা পরিয়ন্তি বিভ্রতঃ।......."; এবং পৈপ্পলাদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্র, "ওঁ। শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি শ্রবন্তু নঃ।।" দ্বিজগণের সন্ধ্যা-উপাসনায় চারিটি বেদের প্রথম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। উহাতে "শং নো দেবীঃ"-এর উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্যে পৈপ্পলাদ সংহিতার গুরুত্ব অধিক ছিল।

ব্রাহ্মণ

ব্রহ্ম শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বৃহতের চেতনা বা বৃহতের শক্তি। মন্ত্রের চেতনা, মন্ত্রের শক্তি ও মন্ত্রের সাধনা — এই তিনটি বিষয়ই বেদের আলোচ্য। মন্ত্রের চেতনা ও শক্তির কথা সংহিতায়। সাধনার কথা ব্রাহ্মণে আলোচিত। মন্ত্রকে জীবনে প্রয়োগ করিতে হইলে সাধনা বা তপস্যার প্রয়োজন। প্রধানতঃ তদ্‌বিষয়ে আলোচনা ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞাদি বাহিরের উপকরণ দ্বারাও হয়, অন্তরের ভাব দিয়াও করা যায়। এই হেতু বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে কর্ম ও জ্ঞানের মিশ্রণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ছয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১। বিধি — বিশেষ বিশেষ কর্মানুসারে নির্দেশই বিধি।

২। অর্থবাদ — কর্মে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশে উৎসাহবর্ধক ব্যাখ্যাতিরিক্ত উক্তি। যেমন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে যজ্ঞকারী যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সাযুজ্য লাভ করে। এই কথা ঠিক আক্ষরিক সত্য নহে। অগ্নিহোত্র যাগে যজ্ঞ যজমানকে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্য লোভজনক বাক্য। ইহা অর্থবাদ। এই জাতীয় অর্থবাদ বাক্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বহু দৃষ্ট হয়। এই সকল বাক্যকে শুধু বেদবাদও কহে।

৩। নিন্দা — বিরোধী মতের সমালোচনা খণ্ডন ও পরিহার। যথা, "তৎ তথা ন হাতব্যং" — এই প্রকারে আহুতি দিবে না।

৪। প্রশংসা — স্তুতিবাক্য। যাঁহার স্তুতি সেই ক্রিয়ার অনুমোদন বুঝায়। ওই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রেরণা দান।

৫। পুরাকল্প — অতি প্রাচীনকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাদিগকে পুরাকল্প বলে। দেবাসুর যুদ্ধের বিবরণাদিও পুরাকল্প মধ্যে গৃহীত।

৬। পরকৃতি — পরের স্তুতি বা কার্যকে পরকৃতি বলে। যজ্ঞে অভিজ্ঞ খ্যাতনামা পুরোহিতগণের কীর্তি। প্রথিতযশা নৃপতিগণের যজ্ঞ দানাদি কার্যাবলীর বর্ণনাকেও পরকৃতি কহে।

চারিটি বেদের প্রত্যেকটির ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভিন্ন ভিন্ন আছে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ — ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ।
ঋগ্বেদের আরণ্যক — ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকি আরণ্যক।
ঋগ্বেদের উপনিষদ্ — ঐতরেয় উপনিষদ্ ও কৌষীতকি উপনিষদ্।

সামবেদের ব্রাহ্মণ — তাণ্ড্য ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।
সামবেদের আরণ্যক — ছান্দোগ্য আরণ্যক।
সামবেদের উপনিষদ্ — ছান্দোগ্য ও কেন উপনিষদ্।

কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ — তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণযজুর্বেদের আরণ্যক — তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
কৃষ্ণযজুর্বেদের উপনিষদ্ — কঠ, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষদ্।

শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ — শতপথ ব্রাহ্মণ।
শুক্লযজুর্বেদের আরণ্যক — বৃহদারণ্যক।
শুক্লযজুর্বেদের উপনিষদ্ — বৃহদারণ্যক ও ঈশ উপনিষদ্।

অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ — গোপথ ব্রাহ্মণ।
অথর্ববেদের আরণ্যক — নাই।
অথর্ববেদের উপনিষদ্ — প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ্।

বেদের শাখা

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির বাক্য শাখা সম্বন্ধে —

"একবিংশতিধা বহ্বৃচম্। একশতমধ্বর্যুশাখাঃ। সহস্রধা সামবেদঃ। নবধা আথর্বনম্।।"

ঋগ্বেদের ২১টি শাখা। যজুর্বেদের এক শত শাখা। সামবেদের সহস্রশাখা। অথর্ববেদের ৯টি শাখা। শাখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

চরণব্যূহ গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন — যজুর্বেদে ২৭টি, শুক্লযজুর্বেদে ২৬টি। শিষ্যপরম্পরায় শাখার বৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছে। অধ্যয়নভেদই শাখা-ভেদের কারণ। শাখাভেদে বেদ গ্রন্থের কোনও ভেদ হয় না বলিয়াই মাত্র

একটি শাখা ধৃত গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করিলেই বেদের ভাষ্য করা হইল বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নের ভেদ, আবৃত্তির ভেদ, ও উচ্চারণের ভেদই শাখাভেদের কারণ। মূল সংহিতা বেদের শাখাভেদের কারণ নহে।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী শাখা সম্বন্ধে বলিয়াছেন —

"অধ্যয়নভেদ এব শাখাভেদনিদানং ন তু গ্রন্থভেদ ইতি।
একৈকস্য বেদস্য অনেকশাখাভেদেঽপি তাত্ত্বিকভেদাভাবাৎ।"

অধ্যয়নভেদই শাখাভেদের কারণ; মূলগ্রন্থভেদ শাখাভেদের কারণ নহে। অধ্যয়নের ভেদ বলিতে পারায়ণের, উচ্চারণের, স্বরের, সুরের, জিহ্বা চালনা ও অঙ্গুলি চালনার পৃথক্ রীতি বুঝিতে হইবে। উদাহরণ যথা, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ। তাহার কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখা। মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তস্থ 'য'-এর উচ্চারণ বর্গীয় 'জ'-এর মত, মূর্ধন্য 'ণ'-এর উচ্চারণ 'খ'-এর মত এবং বিসর্গ উচ্চারণে অঙ্গুলি সঞ্চালন নিষিদ্ধ। মাধ্যন্দিন শাখায় মাত্র দুইটি স্বরের প্রয়োগ আছে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত। স্বরিতের প্রয়োগ নাই।

আরণ্যক

অরণ্যে উক্তমিতি আরণ্যকম্। যাহা অরণ্যে উক্ত হইয়াছে তাহা আরণ্যক। আরণ্যকে দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের রূপটি লইয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুগ্ধ, সমিধ্, কাষ্ঠ, ইত্যাদির প্রয়োজন। আরণ্যক শাস্ত্র বলেন, শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিধ্, সত্যই আহুতি, প্রজ্ঞাই আত্মা। ক্রিয়াবহুল বাহ্য যজ্ঞ আরণ্যকে লুপ্ত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞে আন্তরযাগে রূপান্তরিত হইয়াছে।

আরণ্যক অর্থ নিবিড় গভীর। ব্রহ্মতত্ত্ব অত্যন্ত নিবিড় ও দুরবগাহ্য। অরণ্য ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রে আছে তাহা আরণ্যক।

উপনিষৎ

আরণ্যকে যে অধ্যাত্ম বিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তাহারই পরাকাষ্ঠা। ব্রহ্ম প্রাপক পরাবিদ্যা উপনিষদ্। ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে উপনিষদ্ বুঝায়। এই হইল উপনিষদের মুখ্যার্থ। আর গৌণার্থ হইল সেই বিদ্যার আকর গ্রন্থরাজি। বেদের চরমজ্ঞান উপনিষদে রূপায়িত। উপনিষদের একটি নাম রহস্য অর্থাৎ নিভৃতে সঙ্গোপনে বিদ্যাদান হইল তাহার রহস্য। উপনিষদ্গুলি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

বেদের ভাষা

বেদের ভাষার নাম 'সংস্কৃত'। জগতের বহু মনীষী এই 'সংস্কৃত' শব্দ নিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন, আগে এক অসংস্কৃত ভাষা ছিল, পরে বৈয়াকরণেরা ইহাকে সংস্কৃত করেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ আগে ইহাই একমাত্র ভাষা ছিল। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়' সংস্কৃত শব্দটি প্রথম পাইতেছি। এখানে প্রাকৃত হইতে পৃথক্ দেখানোর জন্য সংস্কৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে বরাহের বৃহৎ সংহিতার বহু পূর্ব হইতেই ইহা প্রচলিত। পাণিনি ইহাকে ভাষা বলিয়াছেন।

অনেক ভাষাতেই শব্দ ও ধাতুর সংস্কার না করিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন, I go, We go, to Ram, from Ram, with Ram ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ধাতু ও শব্দগুলির উপরে কতকগুলি সংস্কার আরোপ না করিয়া বাক্যে বসানো যায় না। যেমন, গচ্ছামি, গচ্ছামঃ, রামং, রামাৎ, রামেণ, ইত্যাদি। এই সব সংস্কার বাধ্যতামূলক বলিয়া গোপথ-ব্রাহ্মণে ও অন্যত্র এই ভাষার আর এক নাম সংস্কৃত। শব্দ ও ক্রিয়াগুলি নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া লওয়া হয় বলিয়া এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইয়াছে।

বৈদিক স্বর

ঋগ্বেদ ছন্দে রচিত। কবিতা বা ছন্দ মাত্রই একটু রাগিণী করিয়া স্বরের উত্থান-পতন লক্ষ করিয়া পাঠ ও উচ্চারণ করিতে হয়। এইজন্য বৈদিক মন্ত্র ও বাক্যাদি লিখিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত উচ্চারণগুলি চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার বিধান। উদাত্ত স্বরের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা উচু, স্বরিত মাঝামাঝি ও অনুদাত্তের সর্বাপেক্ষা কম। উচ্চতা, নীচতা সূচিত করিতে অক্ষরের উপরে নীচে চিহ্ন দেওয়া হয়। অনুদাত্ত চিহ্নিত করিতে অক্ষরের নীচে শয়ান দাড়ি। স্বরিত চিহ্নিত করিতে অক্ষরের মাথায় খাড়া দাড়ি। উদাত্তস্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। এইরূপে পাঠের নাম সংহিতা পাঠ। পাঠের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা।

বৈদিক কার্যে যাঁহারা মন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই চিহ্ন না দিলে অসুবিধা বোধ করেন। কারণ অনেক স্থলে উদাত্ত অনুদাত্তের পরিবর্তনে তৎপুরুষ সমাস স্থলে বহুব্রীহি সমাস পর্যন্ত হইয়া যায়। এই সম্পর্কে একটি বিখ্যাত গল্প আছে।

ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিলে ত্বষ্টা আর একটি পুত্র চাহেন, যে ইন্দ্রকে বধ করিতে পারিবে। তিনি যে মন্ত্রে যজ্ঞ করিলেন তাহা হইল 'স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব'। তাহার অর্থ হইল, ''হে অগ্নিদেব! তোমার উদ্দেশ্যে এই হবিঃ প্রদান করিতেছি। হে পুত্র! তুমি ইন্দ্রশত্রুরূপে বর্ধিত হও।'' এখন 'ইন্দ্রশত্রুঃ' শব্দের অর্থ এই দুই প্রকারই হইতে পারে— (১) 'ইন্দ্রস্য শত্রুঃ', ইন্দ্রের ঘাতয়িতা (বধকর্তা), অথবা (২) 'ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য', ইন্দ্র যাহার ঘাতয়িতা (বধকর্তা)।

প্রথম স্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। তাহাতে উচ্চারণে 'ইন্দ্রশত্রুঃ'র অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে। আর দ্বিতীয় স্থলে বহুব্রীহি সমাস, সেখানে উচ্চারণে 'ইন্দ্রশত্রুঃ'র আদ্যস্বর উদাত্ত হইবে। ত্বষ্টার ঋত্বিক্ ভুলে বহুব্রীহির উচ্চারণ করিয়া ত্বষ্টার সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন। ইন্দ্র এই পুত্রকেও বধ করেন। তাই কথিত হয়—

> ''দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
> স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।''

—''মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরের বা বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে অথবা ভুল ব্যবহার দ্বারা ঠিক অর্থ প্রকাশিত না হইলে, যেমন 'ইন্দ্রশত্রুঃ' শব্দের স্বর

উচ্চারণের অপব্যবহারে ইন্দ্র, ত্বষ্টা পুত্রকে বিনাশ করিলেন, তেমনি এবংবিধ ভুলে উচ্চারিত বাঙ্ময় মন্ত্র বজ্ররূপে যজমানকে ধ্বংস করিয়া থাকে।''

সুতরাং, এমন মারাত্মক অর্থ বিভ্রাট যেখানে, সেখানে পাঠের একটি আদর্শ থাকা দরকার; প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিক একইভাবে উচ্চারণ ও অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং দেবনাগর অক্ষরে যখনই বেদের বাক্য ও মন্ত্র লিখা হয় তখন সর্বত্র (বিশেষ করিয়া মন্ত্রের ক্ষেত্রে) উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের চিহ্ন দিয়া লিখিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরের উচ্চারণসহ ছন্দ পাঠের বাধ্যবাধকতা নাই। এইজন্য এই গ্রন্থে স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হইল না। এই ত্রুটির জন্য ক্ষমার্থী।

বেদের বিবিধ পাঠবিধি

বেদ-সংহিতার মন্ত্রগুলির মধ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে কোন কিছু প্রক্ষিপ্ত না হয় বা মন্ত্রগুলির যাহাতে কোন বিকার না হয় তাহার জন্য ঋষিগণের যে প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় তাহাতে বিস্ময় জাগে। ঋষিরা সমগ্র সংহিতার অক্ষর সংখ্যা পর্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। এমনকি কোন অক্ষরের স্থলে অপর কোন অক্ষরও যাহাতে প্রতিস্থাপন করা না যায় তাহার জন্য তাঁহারা বেদমন্ত্রের নানাবিধ পাঠের প্রচলন করিয়াছেন।

প্রধানতঃ দুই প্রকারের পাঠ আছে— প্রকৃতি পাঠ ও বিকৃতি পাঠ। প্রকৃতি-পাঠ তিনপ্রকার— ১) সংহিতা পাঠ, ২) পদ পাঠ ও ৩) ক্রম পাঠ। আটটি বিকৃতি পাঠ যথা— ১। জটা, ২। মালা, ৩। শিখা, ৪। লেখা, ৫। ধ্বজ, ৬। দণ্ড, ৭। রথ এবং ৮। ঘন।

ব্যাড়িমুনির একটি শ্লোকে এ বিষয়ের দেখা মিলে—

"জটা-মালা-শিখা-লেখা-ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ।।"

এখানে তিনটি প্রকৃতি পাঠের ও একটি বিকৃতিপাঠের রূপ বলা যাইতেছে —

সংহিতা পাঠ— ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যে আকারে দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ পাঠকে সংহিতা পাঠ বলা হয়।

পদপাঠ— সংহিতা পাঠের পরই পদপাঠের প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব। কোন ঋঙ্‌মন্ত্রের প্রতিটি পদকে আলাদাভাবে সন্ধি ভাঙ্গিয়া এবং সমাসবদ্ধ পদকে সমাসবিহীন করিয়া পাঠ করিবার বিধি এই পাঠে।

যেমন —

"অগ্নিম্। ঈড়ে। পুরঃহিতম্।
যজ্ঞস্য। দেবম্। ঋত্বিজম্।
হোতারম্। রত্নঽধাতমম্।।"

ক্রমপাঠ (Step text) — ক্রমপাঠে একটি ঋকের দুইটি করিয়া পদ প্রতিবারে পঠিত হয় এবং শুরু ও শেষের পদ দুটি ছাড়া মাঝের সবকয়টি পদই দুইবার করিয়া পড়িতে হয়।

আক্ষরিক প্রতীকের সাহায্যে ক্রমপাঠের রূপ দাঁড়ায়—

এক দুই, দুই তিন, তিন চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় সাত, সাত আট, ইত্যাদি।

"অগ্নিম্ ঈড়ে। ঈড়ে পুরোহিতম্। পুরোহিতং যজ্ঞস্য। যজ্ঞস্য দেবম্। দেবম্ ঋত্বিজম্। ঋত্বিজং হোতারম্। হোতারম্ রত্নধাতমম্।।"

জটা পাঠ (Woven text)— আক্ষরিক প্রতীক দিয়া প্রকাশ করিলে জটাপাঠের ধরন এইরূপ হয়—

এক দুই, দুই এক, এক দুই, দুই তিন, তিন দুই, দুই তিন, তিন চার, চার তিন, তিন চার, চার পাঁচ, পাঁচ চার, চার পাঁচ, পাঁচ ছয়, ছয় পাঁচ, পাঁচ ছয় ইত্যাদি।

এই পাঠে প্রথম ও অন্তিম পদ দুইটি তিনবার করিয়া এবং মধ্যবর্তী পদগুলির প্রতিটি ছয়বার করিয়া বলিতে হয়।

আটপ্রকার বিকৃতি পাঠের মধ্যে কেবলমাত্র জটাপাঠের প্রকৃতিই বলা হইল — বাকীগুলি বেশ জটিল। উৎসাহী পাঠক যোগীরাজ বসুর 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থে বিস্তারিত পাইবেন।

বেদ ও বেদাঙ্গ

কোন ব্যক্তির নাম জানিলেই তাহাকে জানা হয় না। সকল জ্ঞাতব্য তথ্যের সহিত ব্যক্তিটিকে সর্বতোভাবে জানিলে তাহাকে ঠিক ঠিক জানা হয়। বেদের ছয়টি অঙ্গ — শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ছন্দ বেদের চরণ। কল্প বেদের হস্ত। জ্যোতিষ বেদের চক্ষু। নিরুক্ত বেদের কর্ণ। শিক্ষা বেদের নাসিকা। ব্যাকরণ বেদের মুখ। অঙ্গ ব্যতীত যেমন কোন অঙ্গধারীর পরিচয় হয় না, সেইরূপ বেদাঙ্গ না জানিলে বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব হয় না।

শিক্ষা (Phonetics)

বেদের স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও তাঁহাদের মাত্রাকে ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলে তবে ঠিক পড়া হয়। এই বিষয়গুলির আলোচনা ও প্রয়োগের বিধান যে গ্রন্থে লেখা আছে তাহার নাম শিক্ষা।

ইংরেজী ভাষায় A, B, C, D ইত্যাদি ছাব্বিশটি বর্ণ আছে। মনে হয় কোন মস্তিষ্কহীন ব্যক্তি এই ছাব্বিশটি বর্ণ হাতে করিয়া ছুড়িয়া মারিয়াছে। যেটি যেখানে খুশি পড়িয়া গিয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বর্ণ ছাব্বিশটি কেন, A-এর পরে B কেন, B-র পরে C কেন, ইহার কোন সদুত্তর, এই ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা কেহই দিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যুগে পাশ্চাত্ত্য, বিজ্ঞানে উন্নত জাতি। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাহাদের বর্ণমালা (Alphabets) অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক!

পক্ষান্তরে সংস্কৃত বর্ণমালার শৃঙ্খলায় যে বৈজ্ঞানিকতা রহিয়াছে তাহা দেখা যাউক —

বর্ণ-বিভাগ : ''অকারাদি-ক্ষকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্তিতা'' — অ-কার হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণমালা। এই বর্ণমালা দ্বিবিধা — স্বর ও ব্যঞ্জন। ''ব্যঞ্জনমন্বক্, স্বরঃ স্বয়ং রাজতে'' -- ব্যঞ্জনবর্ণ পরনির্ভরশীল, কিন্তু স্বরবর্ণ নিজেই উচ্চারিত হয়। স্বরবর্ণগুলি প্রধানতঃ চৌদ্দটি, যথা— অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ। দীর্ঘ ঌ-এর ব্যবহার বিশেষ নাই। এই স্বরবর্ণগুলি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে তিন প্রকার। যথা, **হ্রস্বস্বর** — অ ই উ ঋ ঌ। **দীর্ঘস্বর** — আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ। ইহা

ছাড়া আছে প্লুতস্বর। প্লুতস্বর লিখিতে কোন স্বতন্ত্র অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। দীর্ঘস্বরের পাশে ৩ লিখিয়া সেই বর্ণের প্লুতত্ব জ্ঞাপিত হয়; যথা, আ৩, ঈ৩, ঊ৩, ঋৃ৩, এ৩, ঐ৩, ও৩, ঔ৩ — এই আটটি প্লুতস্বর। হ্রস্বস্বরের অপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘস্বর; ইহা আরও দীর্ঘতর রূপে উচ্চারণ করিলে প্লুত হয়। দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্লুতস্বর ব্যবহৃত হয়। অতএব মোট স্বরবর্ণের সংখ্যা হইল ১৪ + ৮ (প্লুত) = ২২ টি।

"একমাত্রো ভবেদ্‌হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্।।"

অর্থাৎ, হ্রস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অর্ধমাত্রা হইয়া থাকে। হ্রস্বকে 'লঘু' এবং দীর্ঘকে 'গুরু'-ও বলা হয়।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ— এই কয়টিকে সমান এবং এ, ঐ, ও, ঔ — এই চারটিকে সন্ধ্যক্ষর বা যুক্তাক্ষর (Diphthong) বলে।

এখন ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগ দেখানো যাইতেছে —

ব্যঞ্জনবর্ণ মোট পঁয়ত্রিশটি : ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, য্ র্ ল্ ব্, শ্ ষ্ স্ হ্, ং ঃ।

মুখ্য ব্যঞ্জনবর্ণ ২৫টি। "কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ" — ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত এই ২৫টি স্পর্শবর্ণ। কণ্ঠোৎসারিত বায়ু, জিহ্বার দ্বারা মুখের পাঁচটি স্থান, যথা, কণ্ঠ, তালু, মূৰ্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠে পরস্পর স্পর্শ পাইয়া এই বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। উচ্চারণস্থান ভেদে ইহারা পাঁচটি বর্গ। যথা, ক-বর্গ — ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্; চ-বর্গ — চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্; ট-বর্গ — ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্; ত-বর্গ — ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ এবং প-বর্গ — প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। ইহা ছাড়া য্ র্ ল্ ব্ এই চারটি অন্তঃস্থবর্ণ (Intermediates), শ্ ষ্ স্ হ্ — ঊষ্মবর্ণ (Sibilants) এবং ং (অনুস্বার) ঃ (বিসর্গ) এই দুইটিকে অযোগবাহ বর্ণ বলে। (ক্ষ বর্ণটি বস্তুত স্বতন্ত্র একটি বর্ণ নহে। তাই পাণিনীয়েরা ইহাকে স্বতন্ত্রবর্ণ বলেন না। ক্ ও ষ্ সংযোগে ক্ষ বর্ণ।) অতএব মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা দাঁড়াইল — ২৫ + ৪ + ৪ + ২ = ৩৫।

এইবার সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান বলা যাইতেছে —

১। কণ্ঠ্য বর্ণ (Gutturals) — অ আ হ্ ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্।

২। তালব্য বর্ণ (Palatals) — ই ঈ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ য্ শ্।

৩। মূৰ্দ্ধন্য বর্ণ (Cerebrals) — ঋ ৠ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ র্ ষ্।

৪। দন্ত্য বর্ণ (Dentals) — ঌ ৡ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ ল্ স্।

৫। ওষ্ঠ্যবর্ণ (Labials) — উ ঊ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্।

৬। কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ (Gutturo-palatals) — এ ঐ।

৭। কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ (Gutturo - labials) — ও ঔ।

৮। দন্তৌষ্ঠ বর্ণ (Dento - labial) — অন্তঃস্থ ব-কার।

৯। অনুনাসিক বা নাসিক্যবর্ণ (Nasal) — ং (অনুস্বার)।

১০। অনুনাসিক বর্ণ (Nasals) — ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্। ইহারা জিহ্বামূল, তালু প্রভৃতির ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হওয়ায় ইহাদের অনুনাসিক বর্ণও বলে।

১১। আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ— ঃ (বিসর্গ)। আশ্রয়স্থানভাগী অর্থ, ইহা যখন যে স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণই ইহার উচ্চারণ-স্থান।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অন্যপ্রকার ভেদ আছে;যথা, "বর্গাণাং প্রথম-দ্বিতীয়াঃ শষসাশ্চাঘোষাঃ" — বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ ইহারা অঘোষবর্ণ। অন্যগুলি অর্থাৎ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্ ইহারা ঘোষবদ্ বা ঘোষবর্ণ। "বর্গাণাং প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চমা-যরলবাশ্চাল্পপ্রাণাঃ অন্যে মহাপ্রাণাঃ।" বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্-কে অল্পপ্রাণ এবং বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণ ও শ্ ষ্ স্ হ্-কে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে।

এই বর্ণমালাকে সাজাইলে দেখা যাইবে উচ্চারণের স্থান বিচার করিয়া কিভাবে বৈজ্ঞানিক সমাবেশ করা হইয়াছে। এই বর্ণমালা অন্ততঃ দশ হাজার বছরের প্রাচীন। এতকাল পূর্বে আর্য ঋষিরা বা বৈদিক ঋষিরা বর্ণের উচ্চারণ স্থান জানিতেন ও সেইভাবে বর্ণ বিন্যাস করিয়াছেন। ইহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই মাত্র এক শতাব্দী যাবৎ এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বর্ণমালার উচ্চারণের স্থান (Phonetics) লইয়া গবেষণা করিতেছেন। এই কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিলাম।

এই বর্ণমালা লইয়া বৈদিকশাস্ত্রে বিস্তর আলোচনা আছে, তাহার নাম শিক্ষা। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে তিনটি স্বরের লক্ষণ ও তাঁহার প্রয়োগ; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে তিনমাত্রার লক্ষণ ও প্রয়োগ শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক বেদের পৃথক্ শিক্ষা গ্রন্থ ছিল, এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য। সামবেদে নারদ-শিক্ষা, যজুর্বেদে যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা ও অথর্ববেদে মাণ্ডূক্য-শিক্ষা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত আছে। ঋগ্বেদের কোন শিক্ষা পাওয়া যায় না। এইজন্য পাণিনীয় শিক্ষাকেই ঋগ্বেদীয় শিক্ষা ধরা হয়।

কল্প

যাহার দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত হয় তাহা কল্প। কল্পিত অর্থ সমর্থিত। কল্প বা কল্পসূত্র তিন প্রকার : শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। বৈদিক ব্রাহ্মণ

গ্রন্থে যে সকল যাগ-যজ্ঞের কথা আছে তাহা লইয়া যে আলোচনা তাহাকে বলে শ্রৌত সূত্র। গৃহী লোকের কর্ম লইয়া যে যজ্ঞাদি তাহাকে বলে গৃহ্য সূত্র। আর ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধাদি লইয়া যে আলোচনা তাহা ধর্ম সূত্র।

নিরুক্ত (Etymology)

নিরুক্তগ্রন্থ যাস্ক মুনির লেখা। এই সম্বন্ধে অনেক কথা না বলিয়া সংক্ষেপে বলা চলে, নিরুক্ত বেদের অভিধান। যে কোন সাহিত্যে Dictionary-র যেই দান, বৈদিক সাহিত্যে নিরুক্তের সেই দান। যাস্কের নিরুক্ত ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। নির্—নিঃশেষরূপে বেদের মন্ত্রের পদসমূহের ব্যাখ্যা যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই নিরুক্ত। নিরুক্তের তিনটি ভাগ : নৈঘণ্টুক কাণ্ড, নৈগম কাণ্ড এবং দৈবত কাণ্ড।

প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড বা নিঘণ্টু। এই কাণ্ডে সমার্থক বা পর্যায় শব্দ (Synonyms) সন্নিবদ্ধ। যেমন পৃথিবীবাচক ২১টি শব্দ ও উষার ১৬টি নাম আছে ইহাতে। নৈগমকাণ্ডে বেদে প্রযুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি (Etymology), অর্থ, দৃষ্টান্ত ও মন্ত্রের বা মন্ত্রাংশের উল্লেখ আছে। এই কাণ্ডে একার্থবাচক (Synonyms) ও অনেকার্থবাচক এক শব্দ (Homonyms)-এর তালিকারও উল্লেখ আছে। দৈবতকাণ্ডে দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে মোট ১৭৭০ শব্দ আছে।

পরবর্তীকালে যে সকল অভিধান রচিত হইয়াছে, যেমন, 'অমর-কোষ', 'বৈজয়ন্তী', 'মেদিনী-কোষ' প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের উৎসও যাস্কের নিরুক্ত। নিরুক্ত বৈদিকসাহিত্যের পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিরুক্তকার যাস্কের কাল যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পূর্বে। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধের কথা আলোচনা করিয়া যাস্ক প্রশ্ন করিয়াছেন — "তৎ কো বৃত্রঃ?" কে এই বৃত্র? যাস্ক বলেন — "মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষাং চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে, তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি" — নিরুক্তেরা বলেন, 'বৃত্র হইল মেঘ। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ত্বষ্ট্রা নামক অসুরের পুত্র হইল এই বৃত্র।' যাস্ক যে বৃত্রকে মেঘ বলিতেছেন তাহার কারণও দিয়াছেন। তিনি বলেন — 'বজ্রবিদ্যুৎ ও জলের সংমিশ্রণেই বৃষ্টি হয়। বজ্রের হুঙ্কার, বিদ্যুতের চমক ও জলবর্ষণ সব মিশিয়া একটি যুদ্ধের মত মনে হয়, তাই বলা হয় ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিতেছেন।' বস্তুতঃ যাস্কের এই যে চিন্তা, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের চিন্তিত করে। খ্রীষ্টপূর্ব

হাজার বৎসর পূর্বেও আমাদের যাস্ক কত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন তাহা ভাবিতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন, অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নিরুক্ত গ্রন্থ না দেখা পর্যন্ত তাঁহাদের শব্দতত্ত্ব বা Etymology সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না।

একস্থানে যাস্ক সৌরবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন। চন্দ্র-সূর্যের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন — চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নাই, সূর্যের আলোকে চন্দ্র আলোকিত। "অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে .... আদিত্যোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।" সূর্যের আলোতে চন্দ্র আলোকিত, এই তত্ত্ব পাশ্চাত্ত্যের দান, এই কথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আজ হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্বেও যাস্ক এই তত্ত্ব জানিতেন।

ব্যাকরণ (Grammar)

ব্যাকরণকে বলা হয় শাস্ত্রের মুখ। মুখ না দেখিলে যেমন মানুষকে চেনা যায় না তেমনি ব্যাকরণ না জানিলে বেদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কৃত শব্দগুলি অব্যাকৃত থাকে। ব্যাকরণ তাহাকে ব্যাকৃত করে। এই জন্য তাহার নাম ব্যাকরণ। যেমন 'বৃক্ষাণাম্' — শব্দটি 'বৃক্ষ' শব্দের উত্তর 'আম্' বিভক্তি (ষষ্ঠী বহুবচনে) — বৃক্ষাণাম্। ইহার অর্থ বৃক্ষসকলের বা বৃক্ষগুলির। এই ব্যাকরণটুকু না বুঝিলে কিছুতেই বৃক্ষাণাম্ শব্দের অর্থ করা যাইবে না। প্রতিটি শব্দের উত্তর ২১টি সুপ্ বিভক্তি যোগ করা যাইতে পারে। ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও প্রায় প্রতিটি ধাতুর উত্তর মোট ১৮০টি বিভক্তিযুক্ত হইয়া ততগুলি রূপ হইতে পারে। এইসব জানা না থাকিলে বেদের ভাষার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। ইংরাজীতে ব্যাকরণের বেশী জটিলতা না থাকিলেও ব্যাকরণ ভিন্ন বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না।

যেমন An old book shop বলিলে দোকানের বইগুলি পুরাতন, নাকি দোকানটি পুরাতন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতে বিশেষ্য বিশেষণের সমান বিভক্তি থাকে। বেদেও বিশেষ্য-বিশেষণের এক বিভক্তি থাকে এবং উদাত্ত-অনুদাত্তের উচ্চারণেও প্রভেদ থাকে। সন্ধি, সমাস, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয়, কারক, বিভক্তি, ধাতুরূপ, শব্দরূপ প্রভৃতি না বুঝিলে কোন প্রকারেই সংস্কৃত ভাষার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। এইজন্য বেদপাঠের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অপরিহার্য। অন্য সাহিত্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে বৈদিকসাহিত্যে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

বৈদিকসাহিত্যকে রক্ষা করিতে হইলে ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন — "রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

ব্যাকরণের প্রধান পাঁচটি ভাগ : নামবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয় ও সমাস।

১। নামবিভক্তি — বস্তুবাচক ও বস্তুর বিশেষণ বাচক শব্দকে প্রাতিপদিক বা নাম বলে। এই নামের উত্তর সু-ঔ-জস্ প্রভৃতি যে একুশটি (সুবন্ত) বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদিগকে বলে নামবিভক্তি।

২। ক্রিয়াবিভক্তি — 'ভুবাদয়ঃ ধাতবঃ'। ভূ প্রভৃতি ধাতু। এই ধাতু সকলের উত্তর তি-তস্-অন্তি প্রভৃতি ১৮০টি (তিঙন্ত) বিভক্তি যোগ করিয়া যে বিবিধ ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাহাদের বলে ক্রিয়াবিভক্তি।

৩। কৃৎপ্রত্যয় — ধাতুর উত্তর যে তব্য, অনীয়র্, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয় তাহাদিগকে কৃৎপ্রত্যয় বলে।

৪। তদ্ধিতপ্রত্যয় — শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হয় তাহারা তদ্ধিত প্রত্যয়।

৫। সমাস — "একপদীভাবঃ সমাসঃ"। পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা বহুপদের যে একপদীভাব অর্থাৎ একটি শব্দ হইয়া যাওয়া, তাহাই সমাস। সমাস প্রধানত ছয় প্রকার — দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, কর্মধারয়, অব্যয়ীভাব ও দ্বিগু।

ইহা ছাড়াও ব্যাকরণের অন্যতম অঙ্গ 'কারক'। ইহার লক্ষণ "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্"। অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয় তাহাকে কারক বলে।

এইরূপে শব্দের প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, কারক, বিভক্তি, লোপ-আগম, বর্ণের বিকার, প্রভৃতি ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকিলে বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞান-আহরণ একেবারেই অসম্ভব।

ব্যাকরণ ও নিরুক্তের পার্থক্য এই যে — ব্যাকরণ শব্দনিষ্ঠ, ব্যাকরণের আলোচনা শব্দ লইয়া, আর নিরুক্ত অর্থনিষ্ঠ; নিরুক্তের আলোচনা অর্থ লইয়া।

ছন্দ (Metrics)

বেদে সাতটি মুখ্য ছন্দ আছে। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। বৈদিক ছন্দ অক্ষরভিত্তিক। এই ছন্দকে অক্ষর-ছন্দ বলা হয়। কারণ, একটি মন্ত্রের মোট অক্ষর সংখ্যা গুণিয়া তাহার ছন্দ নির্ণয় করা হয়। সাতটি বৈদিক ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে—

ছন্দ		অক্ষর
গায়ত্রী	—	২৪
উষ্ণিক্	—	২৮
অনুষ্টুপ্	—	৩২
বৃহতী	—	৩৬
পঙ্ক্তি	—	৪০
ত্রিষ্টুপ্	—	৪৪
জগতী	—	৪৮

সাধারণতঃ প্রতি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের চারিটি করিয়া পাদ থাকে এবং প্রতি পাদে অক্ষর সংখ্যা সাধারণতঃ সমান থাকে। যেমন অনুষ্টুপ্ ছন্দে মোট অক্ষর সংখ্যা বত্রিশ। অতএব চারি পাদের প্রতি পাদে আটটি করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই চারি পাদের বা চারি চরণের ব্যতিক্রম দুইটি ছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গায়ত্রী এবং পঙ্ক্তি। গায়ত্রী মন্ত্রে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া পাদ থাকে। প্রতি পাদে আটটি অক্ষর। কখনও কখনও চারিটি পাদ ও প্রতি পাদে ছয় (মোট চব্বিশ)টি অক্ষর দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ পঙ্ক্তি ছন্দের চারিচরণের প্রতিপাদে দশটি করিয়া অক্ষর; মোট চল্লিশ অক্ষর। কখনও কখনও পঙ্ক্তি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রে পাঁচটি পাদ এবং প্রতি পাদের আটটি করিয়া অক্ষরও দৃষ্ট হয়।

দ্বিজাতিগণ নিত্য যে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন তাহার আসল নাম সাবিত্রী মন্ত্র। কারণ, সবিতার স্তুতি ও ধ্যান সেই মন্ত্রে আছে। মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলিয়া গায়ত্রী নাম পাইয়াছে। গায়ত্রী ছন্দের নিয়মানুযায়ী চব্বিশটি অক্ষর সাবিত্রী মন্ত্রে থাকা উচিত, কিন্তু একটি অক্ষর কম আছে, মোট তেইশটি অক্ষর আছে। চব্বিশ সংখ্যা পূরণের জন্য পিঙ্গল ঋষি তাঁহার ছন্দঃসূত্রে সর্বত্র বিধান দিয়াছেন 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্' কথাটির 'বরেণ্যম্' পদটিকে 'বরেণিঅম্' পাঠ করিতে হইবে। তাহাতে এইপাদে আট অক্ষর এবং সর্বসমেত চব্বিশ অক্ষর হইবে।

জ্যোতিষ (Astronomy)

বৈদিক যজ্ঞাদি-কর্ম যথাযথ করিতে হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং কোন্ রাশি বা নক্ষত্রে চন্দ্র আছে ইহা না জানিলে বৈদিক কর্ম-অনুষ্ঠান অসম্ভব। বর্তমানকালেও হিন্দু-সমাজে উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ডে তিথিনক্ষত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। এই জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র অন্যতম বেদাঙ্গ। প্রাচীনকালে যাঁহারা জ্যোতিষ চর্চা করিতেন তাঁহাদের নিকট আর্যভট্টের 'সূর্য-সিদ্ধান্ত'

গ্রন্থখানি অপরিহার্য ছিল। আর্য ঋষিদের গ্রন্থে আকাশের নক্ষত্রাদির কথা যাহা লেখা আছে তাহা হইতে জানা যায়, হিন্দু জ্যোতিষতত্ত্ব খ্রীষ্টীয় অব্দের আরম্ভের অন্যূন ৩০০০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। বেদে জ্যোতিষতত্ত্বের কথা অনেক লিখিত আছে। ঋষিরা বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন। এই পৃথিবী, আকাশে যে নিরাধার শূন্যে আছে এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাও বেদমন্ত্র হইতে অনুমিত হয়। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বৈদিক পণ্ডিত মনিয়ের মনিয়ের উইলিয়মস্ তাঁহার *Indian Wisdom* নামক গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক গ্রন্থে ২৭টি নক্ষত্রের কথা উল্লেখ আছে। এই নক্ষত্রজ্ঞান যজ্ঞাদিতে অবশ্য জানা কর্তব্য। নক্ষত্র বলিতে এক বা একাধিক নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝাইতে পারে। যেমন কালপুরুষ (Orion)-এর কোমরে তিনটি নক্ষত্র যাহাকে ইষু-ত্রিখণ্ড বলে। পুনর্বসুতে দুইটি নক্ষত্র, পূর্বফাল্গুনীতে দুইটি নক্ষত্র, পূর্বাষাঢ়াতে দুইটি নক্ষত্র, ভরণী, মৃগশিরা, পুষ্যা, অনুরাধাতে তিনটি করিয়া নক্ষত্র আছে। কোন্ অংশে চন্দ্র বা সূর্য আছে ইহা তাঁহারা বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় চন্দ্র এবং সূর্য কোন্ নক্ষত্রে, কত অংশে আছে তাহা জানা প্রয়োজন হইত। শাস্ত্রবিহিত মতে যজ্ঞাদি হইলে তাহার যথাযথ ফল হইবে এই বিশ্বাস তাঁহাদের দৃঢ় ছিল। এইজন্য জ্যোতিষের আলোচনা না করিয়া কোন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইত না। এইজন্য এই জ্যোতিষ শাস্ত্র একটি বিশেষ বেদাঙ্গ।

স্বাধ্যায়

বেদপাঠকে বলা হয় স্বাধ্যায়। উপনয়নের পর শিক্ষার্থী গুরুগৃহে গমন করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — তিন বর্ণের উপনয়ন বিধান ছিল। সাবিত্রী মন্ত্রের সহিত ছাত্রের আধ্যাত্মিক নবজন্ম হইত। ছাত্র অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আচার্য সমীপে উপস্থিত হইত। ছাত্রকে বলা হইত ব্রহ্মচারী।

আমি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিতে চাই — ছাত্র এই নিবেদন করিলে গুরু তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিতেন — আজ হইতে তুমি ব্রহ্মচর্যের নিয়ম সকল পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে। তোমার করণীয় কর্তব্য — যজ্ঞকুণ্ডে সমিধ্ দান, আচার্যের আজ্ঞাধীন থাকা, দিবানিদ্রা ত্যাগ করা ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া।

ছাত্রজীবন একটি বিরাট তপস্যার জীবন ছিল। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বেদপাঠ করিতে হইত। নিত্য ভিক্ষা করিতে হইত, গুরুর আদেশমত গাভী পালন করিতে হইত। মাঠে মাঠে বন-জঙ্গলে গরুর সঙ্গে ঘুরিতে হইত। প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইত। প্রকৃতির সামান্যতম বস্তু হইতেও শিক্ষণীয় বিষয় তাহাকে শিক্ষা করিতে হইত।

ছাত্রদের মধ্যে দুই বিভাগ ছিল, উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করিত। নৈষ্ঠিক যাহারা, তাহারা চিরকৌমার্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই থাকিত। উত্তরকালে তাহারা ঋষি হইত। আচার্য বিনামূল্যে শিক্ষাদান করিতেন। শিক্ষার জন্য পিতামাতার এক কপর্দকও বেতন বা ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইত না। আচার্য ও শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল মধুর আন্তরিকতা পূর্ণ। শিষ্যেরা আচার্যকে পিতৃতুল্য ও আচার্যেরা ছাত্রকে পুত্রতুল্য মনে করিতেন। প্রতিদিন শিক্ষার আরম্ভে শিষ্য পাঠ করিত —

''সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।''

''ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের একত্রে বহন করুন। আমরা একত্রে জ্ঞান লাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে — শিক্ষা যেন আলোর

মত সুদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মধ্যে যেন কোন বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।"

শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন কালে তঁহাদের আচার্য উপদেশ দিতেন —"বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—

"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্।" তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ১/১১/১-৪

অনুবাদ : "আচার্য অন্তেবাসী অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিবেন — "তুমি সর্বদা সত্য বলিবে, ধর্মাচরণ করিবে, প্রমাদ-রহিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং আচার্যকে তাঁহার প্রিয়ধন প্রদানপূর্বক বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদবশতঃ কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদবশতঃ ধর্ম ত্যাগ করিও না। প্রমাদবশতঃ আরোগ্য ও নিপুণতা হারাইও না। প্রমাদবশতঃ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যবৃদ্ধি পরিত্যাগ করিও না। দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এবং মাতা পিতা প্রভৃতির সেবায় প্রমাদ করিও না। যেইরূপ বিদ্বান্দিগের সম্মান করিবে, সেইরূপ মাতা পিতা আচার্য এবং অতিথিরও সেবা সর্বদা করিতে হইবে। সত্যভাষণ প্রভৃতি অনিন্দিত পুণ্যকর্ম করিবে। ইহা ছাড়া মিথ্যাভাষণাদি কখনও করিবে না। আমাদের সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্মসঙ্গত কর্ম গ্রহণ করিবে এবং আমাদের পাপাচরণ কখনও গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ ও ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ, তঁহাদেরই সমীপে উপবেশন করিবে এবং তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। শোভনতার সহিত দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে। ভয়ের সহিত দান করিবে। প্রতিজ্ঞাবশতঃ দান করিবে। কর্ম, শীল, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কখনও কখনও সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারশীল, পক্ষপাতশূন্য, যোগী অথবা অযোগী কোমলচিত্ত ধর্মাভিলাষী এবং ধর্মাত্মারা যে ধর্মপথে

থাকেন তুমিও সেই পথে থাক। ইহাই আদেশ, ইহাই আজ্ঞা, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদোপনিষদ্ এবং ইহাই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বীয় আচরণকে সংশোধন করা কর্তব্য।"— (অনুবাদ, 'সত্যার্থ প্রকাশ', পৃঃ ৪৯-৫০)

ইহাকে বলা হইত সমাবর্তন উৎসব। আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানকালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সমাবর্তন শব্দ এখনও ব্যবহার হয়। শব্দটাই আছে, আর কিছুই নাই। সকলই কালগর্ভে বিলীন। কালে তো সবই বিলীন হইবে, সেই জন্য দুঃখ নাই। কিন্তু সেই স্মৃতিও যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাই অনুতাপের বিষয়। যদি সেই আদর্শের বিন্দুমাত্রও জাগরিত হইত সমাবর্তনকালে, তবুও কিছু লাভ হইত।

ঋষিত্ব

বেদের অন্তর্নিহিত কথা সত্য, ঋত ও বৃহৎ-এর মহান্ আদর্শ-স্বরূপতার সঙ্গে মহামিলন। অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা সাধক। তাঁহারা দেহের তপস্যা, বাঙ্ময় তপস্যা ও মানস তপস্যা কঠোরভাবে করিতে করিতে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। এই বিশুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা হইল ঋষিত্ব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ত্রিবিধ তপস্যার কথা শুনাইয়াছেন —

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।।" ১৭/১৪-১৬

"দেব, দ্বিজ, গুরু ও বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা— এই সকলকে শারীর তপস্যা বলে। যাহা কাহারও উদ্বেগকর হয় না, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর, এইরূপ বাক্য এবং যথাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস—এই সকলকে বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা বলে। চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্সংযম, আত্মসংযম বা মনঃসংযম এবং অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতারাহিত্য—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে।" ঋষি এই তপস্যায় সমুত্তীর্ণ।

ঋষির প্রধান যোগাভ্যাসটি কি তাহা বলিতেছি। বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় অর্থ কোন পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা বেদ-বেদান্ত গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে প্রথমেই বলা হইয়াছে। এই মন্ত্র যাঁহার কাছে প্রকটিত হইবে তাঁহারও অপৌরুষেয় হওয়া চাই। অপৌরুষেয় হওয়া অর্থ হইল পুরুষকর্তৃত্বহীন হওয়া। আমি কর্তা এই অভিমান সর্বতোভাবে বিদূরিত হইয়াছে যাঁহার তিনিই অপৌরুষেয় বাণী গ্রহণের যোগ্য। বেদার্থ তাঁহারই বুঝিবার কথা। আমরা তাহা নই বলিয়া বুদ্ধির সীমার মধ্যে শত ইঙ্গিত বুঝিলেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

অপৌরুষেয় — আমিত্বহীন হওয়ার অর্থ ক্ষুদ্র আমিত্বের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সত্যিকার আমিত্বের উপলব্ধি। তাহা যাঁহার হয় ঋষির কথা তিনিই বুঝেন। ঋষির বাক্যকে বলে 'সান্ধ্য ভাষা'। আলো-আঁধারি ভাষা। বেদের ঋষিদের বলে 'মরমীয়া' — ইংরেজী ভাষায় বলে 'Mystic'। তাঁহারা 'জ্যান্তে মরা'। যে আমিটি লইয়া সকলে জীবিত; সেই আমিটি তাঁহাদের মরিয়া গিয়াছে। সেই আমিটি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হইয়া বৃহৎ আমির সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লোক তাঁহাদের চিনিতে পারে না। নিন্দা করে, কুৎসা করে, গায়ে ধূলা দেয়, কখনও বদ্ধ পাগল ভাবে।

এক ঋষি বলিয়াছেন, ''অজ্ঞ লোক আমাকে দেখিলে সারমেয়র মত ঘেউ-ঘেউ করে,'' ''জম্ভয়তমভিতো রায়তঃ শুনো'' (ঋ.১/১৮২/৪)। ''আমাকে দেখিলে বলে, ঐ দুঃশাসনটা আসছে'' ''দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ'' (ঋ.১০/৩৩/১)। সাধনকালে ঋষির কষ্টের দুঃখের সীমা থাকে না। দুঃখের মধ্যে ঋষি অভিমানে দেবতাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন — ''তোমরা কি কর? কেন বসিয়া আছ?'' ''কিমত্র দস্রা কৃণুথঃ কিমা-সাথে'' (ঋ. ১/১৮২/৩)। ''এত বলবান্ পাপকে বিনাশ করা যায় না? আমি যদি তুমি হইতাম, তুমি যদি আমি হইতে, তোমাকে কখনও এমন পাপপূর্ণ অত্যাচারের মধ্যে ফেলিয়া দিতাম না।'' ঋষি হইবার পরেও দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন — ''ওগো বরুণ! তুমিই তো এই বসিষ্ঠকে নৌকায় বসাইয়া তাঁহাকে ঋষি করিয়াছিলে তোমার মহিমা দিয়া—এখন কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিলে? হে বরুণ! হে সুদক্ষ (সুক্ষত্র) 'মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়' (ঋ. ৭/৮৯/৪)। দয়া কর, দয়া কর।'' বসিষ্ঠ ঋষি বরুণের কাছে ক্ষমা চাহিতেছেন—''হে বরুণ, আমরা মনুষ্য, দেবতাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি অজ্ঞানতাবশতঃ, তোমার যে কর্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সব পাপপ্রযুক্ত, আমাদের হিংসা করিও না।''

ঋষি-জীবনে যে কত কষ্ট তাহা এই সব উক্তি হইতে বুঝা যায়। বসিষ্ঠের মত একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি এইসব কথা বলিতেছেন। 'ঋষ্' ধাতুর একটি অর্থ গতি। ঋষি ছুটিতেছেন অভিসারে — ছুটিতেছেন অসীম দুঃখ ভেদ করিয়া পরম জ্যোতি অভিমুখে। ঋষিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। এখন মুনি বলিতে কি বুঝায় তাহা কিছু বলিতেছি।

আমরা সাধারণ কথায় বলি 'মুনি-ঋষি'। কিন্তু 'মুনি' ও 'ঋষি' এক কথা নহে। মুনিরা যাহা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করেন তাহা লইয়া মনন করেন, বিচার করেন। মনে মনে ভাবনা করিয়া বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন কোন্ কোন্ কথায় সামঞ্জস্য আছে, কোন্ কোন্ কথায় সামঞ্জস্য নাই। সামঞ্জস্য না থাকিলে কি করিয়া সামঞ্জস্য করা যায়,

সামঞ্জস্য করার পক্ষে কি কি বাধা। সেই বাধাকে কি করিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায় ইত্যাদি বিচার ভাবনা করিয়া কোনও একটা সমন্বয়ে না আসিতে পারা পর্যন্ত মুনি বিরত হন না।

এই মন বুদ্ধির বিচারের পিছনে থাকে একটি অহঙ্কার। অহঙ্কার অর্থ গর্ব নহে। অহংকার অর্থ 'আমিত্ব', কর্তৃত্ব। এই কাজটি 'আমি' করিতেছি, বিচার করার কর্তৃত্ব আমার—এইরূপ মনন লইয়া যাঁহারা থাকেন তাঁহারা মুনি।

গৌতম একজন মুনি। তাঁহার মননের ফল ন্যায়দর্শন। কপিল একজন মুনি। তাঁহার মননের ফল সাংখ্যদর্শন। কণাদ একজন মুনি। তাঁহার মননের ফল বৈশেষিকদর্শন। জৈমিনি একজন মুনি। তাঁহার মননের ফল মীমাংসাদর্শন। পতঞ্জলি একজন মুনি। তিনি করিয়াছেন যোগদর্শন। বেদব্যাস একজন মুনি। উপনিষদের কথাগুলিকে লইয়া গভীর মনন করিয়া তিনি করিয়াছেন বেদান্তদর্শন।

ঋষিরা মনন, বিচার, বিশ্লেষণ করেন না। তাঁহারা শুধু দেখেন। 'ঋষ্' ধাতুটির অর্থই দেখা। দেখি তো চক্ষুষ্মান্ আমরা সকলেই। কিন্তু দেখার মত দেখি না। ঋষিরা অতি গভীরভাবে দেখেন। দেখিতে দেখিতে একটি বস্তুর সীমা পর্যন্ত দেখেন। সীমার একটি প্রতিশব্দ আছে সংস্কৃত ভাষায় 'ক্রান্ত'। ঋষিরা 'ক্রান্তদর্শী'। কবিরাও 'ক্রান্তদর্শী'। যাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া কবিতা লেখেন, আমরা তাঁহাদিগকেই 'কবি' বলি। ঘটনাক্রমে এইরূপ হইয়া গিয়াছে। কবি শব্দের অর্থ বলিয়াছি — ক্রান্তদর্শী। সকল ঋষিরাই কবি। কিন্তু সকল 'কবি'রাই ঋষি নহেন।

ভোরের বেলা সূর্য উঠে। আমরা সকলেই দেখি। কিন্তু ঋষি কবি কি রকম দেখেন? ঋষি দেখেন একখানি রক্তবর্ণ থালা। কি সুন্দর ধীরে ধীরে উঠিতেছে। উঠিতেছে আর দিব্যজ্যোতি ছড়াইতেছে। চারিদিকে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। সকল বনের পাখীগুলি কতপ্রকার মধুরশব্দ করিয়া মধুর গান গাহিতেছে। বাগানের ফুলের কলিগুলি কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল মানুষ জাগিয়া উঠিতেছে। পশুপাখীগুলিও উঠিতেছে। অনেক বৃক্ষ পাতা-বুজিয়া রাত্রে ঘুমায়, তাহারাও পাতার দরজা খুলিয়া জাগিতেছে। নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ, মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ, সকলই উদ্ভাসিত। আমি দেখিতেছি — আমার অন্তরটিও জাগিয়া উঠিয়াছে। কেমন স্বপ্নঘোরে ছিলাম — একেবারে সব যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সবগুলি কবি একবারে দেখেন। আমি যেমন বর্ণনা করিলাম একটির পর আর একটি, সেইরূপ দেখেন না। ঋষি সবটাই একবারে দেখেন। একটি বিরাট দর্শন (vision)। একটি ব্যাপক দর্শন। ঋষি বিস্ময়-বিমূঢ়।

একটি বিশাল অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি যেন একাকার হইয়া দেখিতেছেন। একটি বিরাট বরণীয় জ্যোতিঃপুঞ্জের সঙ্গে একাকার, একপ্রাণ হইয়াছেন ঋষি। বিশ্বপ্রসবিতার বরণীয় জ্যোতির বরেণ্য ভর্গ তাঁহার সম্মুখে একটি উজ্জ্বল অক্ষরের মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিল। মন্ত্রের তত্ত্ব, তথ্য ও সৌন্দর্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে তিনি একাত্ম। এক আশ্চর্য অনুভূতির দোলা লাগিল তাঁহার সমগ্র সত্তায়। ইহার নাম ঋষির দেখা। সকলই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, অথচ গভীর প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাই ঋষি। ঋষির নিজের সহিত একত্বলাভ করিয়া একটি অনন্ত দৃষ্টি। দ্রষ্টা ও দৃশ্য একাকার।

ঋষির দৃষ্টি অখণ্ড। আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, ভাসা ভাসা, খণ্ড খণ্ড। ঋষির দৃষ্টিই সৃষ্টি। কবিদেরও তাহাই। ঈশ্বরেরও তাহাই। ভাগবত ঈশ্বরকে আদি কবি বলিয়াছেন। এই সৃষ্টিতে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বেদমন্ত্রকে যাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহারাই ঋষি। 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতঃ', তাই বেদকে বলা হয় 'শ্রুতিঃ', 'revealed scripture' (শ্রীঅরবিন্দ)।

প্রসঙ্গতঃ বেদব্যাসকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুনি বলিয়াছেন ---- 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ'। কিন্তু গীতার একাদশ অধ্যায় ও পঞ্চদশ অধ্যায় পড়িলে তাঁহাকে ঋষি বলিতে হয়। তাই আমরা গীতাপাঠের আগে বলি ''ওঁ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদগীতামালামন্ত্রস্য শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মা দেবতা, ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ'' ইত্যাদি। ভাগবত বেদব্যাসকে অবতার মধ্যে গণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস একাধারে মুনি ও ঋষি। তাঁহার অনুভূতিও অদ্ভুত, বিশ্লেষণও অদ্ভুত।

ঋষিদের নামের তাৎপর্য

ঋষিদের নামগুলি কি সুন্দর! বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র, তাহার দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় ঋষি। এই ঋষির মহাদান নিখিল ব্রাহ্মণ সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া শিরে তুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নামটি সার্থক। এই স্থানে বিশ্ব শব্দ সর্বনাম। বেদে বিশ্বা = বিশ্বানি, অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব। বিশ্বামিত্র— বিশ্বা (= বিশ্বানি) + মিত্র। নিখিল বিশ্ব। নিখিল বিশ্ব মিত্র যাঁহার—'বিশ্বানি মিত্রাণি যস্য'। পাণিনি একটু অন্যপ্রকার বলিয়াছেন— 'মিত্রে চর্ষৌ' (পা. ৬/৩/১৩০)। মিত্র শব্দ পরে থাকিলে ঋষি বুঝাইতে বিশ্ব শব্দের অকার দীর্ঘ হয়। যাস্ক বলেন— 'বিশ্বামিত্রঃ সর্বমিত্রঃ' (নি.২/২৪)। নিজ জীবনের ধারাকে যিনি নিখিল বিশ্বের ধারার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন, তিনি 'বিশ্বামিত্র'। সংহিতায় মিত্র সূক্তটি (ঋ.৩/৫৯) বিশ্বামিত্রের। মিত্র অর্থ মিতা, সুহৃদ্। মিত্রের দুইটি দিক্ আছে, একটি ঐশ্বর্য ও একটি মাধুর্য। মিত্রের একটি অর্থ হইল সূর্য। সূর্য মহাজ্যোতির্ময় আলো। এইটি তাঁহার একটি ঐশ্বর্য। মিত্র—আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন অনিমেষ নয়নে— "অনিমিষাভি চষ্টে" (ঋ.৩/৫৯/১)। এই তাকাইয়া থাকা কেন —গভীরভাবে আমাদিগকে ভালবাসেন সেইজন্য। এইটি তঁহার অতুলনীয় মাধুর্য। মিত্রের উপাসক বিশ্বামিত্র। তাই তিনি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন মানুষের দিকে। বিশ্বামিত্রের উপর, তাঁহার লেখনীর উপর অনেক অত্যাচার করি, তিনি ভালবাসেন বলিয়া সব ক্ষমা করেন। "তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানাম্" (ঋ.৩/৩০/১)।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের মূল ঋষি— বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। যাঁহার ছন্দ মধুময় তিনি মধুচ্ছন্দা। যেমন পিতা, তেমন পুত্র। যিনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন মহর্ষি বেদব্যাস—তিনি মধুচ্ছন্দাকে সর্বাধিক সম্মান দিয়াছেন ঋগ্বেদের সর্বপ্রথমে তাঁহার অগ্নিমন্ত্রটি স্থাপন করিয়া। মধু—সোম, মধু—আনন্দ-ঘন চৈতন্য, বিষ্ণুর পাদপদ্ম এই মধুর উৎস। যিনি এই মধু-চৈতন্যে স্থিত হইয়া বাক্য উচ্চারণ করেন— তিনি মধুচ্ছন্দা, তিনি আনন্দের ঋষি। আনন্দের সিদ্ধ ঋষি।

ঋষির নাম 'অঙ্গিরা'। যাস্ক বলেন, অঙ্গারে অঙ্গিরা জাত হন, "অঙ্গারেষু অঙ্গিরা" (নিরুক্ত ৩)। আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছেন,

যাঁহার আর নিজের বলিতে কিছুই নাই, তিনি অঙ্গিরা। "দেবতারা আমাদের সকল অঙ্গের রস অর্থাৎ আনন্দসার নিয়ে আমাদের মুখে থাকেন। মুখের অপর নাম আস্য। তাই দেবতাদের নাম 'অয়াস্য' বা 'আঙ্গিরস'।" (বেদাঙ্গবর্ণ, পৃ. ৩২)।

ঋষির নাম 'ভৃগু'। ভৃগু কেন?— দুঃখে তাপে তপস্যায় ভাজা ভাজা হইয়াও যিনি দগ্ধ হন নাই তিনিই ভৃগু। ভৃগু অর্থ জ্ঞানসিদ্ধ, সিদ্ধজ্ঞানী।

মহা অধিকারী হইয়াও ঋষিদের দৈন্য অতুলনীয়। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ হইয়াও দৈন্যে বলিয়াছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"
(চৈতন্য-চরিতামৃত ৩/২০/৩২)

আমাকে তোমার পাদপদ্মের ধূলি বলিয়া মনে কর।

বেদের ঋষিবর্গের শ্রেষ্ঠ ঋষির অন্যতম ঋষি হইয়াও নিজের নাম বলিয়াছেন 'দীর্ঘতমা'। জন্ম হইতে এ পর্যন্ত বা পূর্ব জন্ম ধরিয়া আজ পর্যন্ত দীর্ঘকাল তমের মধ্যেই আছি— অবিদ্যার দ্বারা ঢাকা পড়িয়া আছি। অন্ধকারের জাল সরাইয়া দাও, চক্ষু আলো দিয়া ভরিয়া দাও। এই আর্তনাদ সাধকের। সাধক যত ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন, ততই দীনতা বাড়িতে থাকে।

এই অপূর্ণতার অনুভবে ঋষি অত্রির নাম 'সপ্তবধ্রি' (ঋ. ৮/৭৩/৯)। অর্থাৎ সাতটি দ্বার বধির যাঁহার। মুখমণ্ডলে ৭টি ছিদ্র—দুই কান, দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ— সবই যাঁহার বিফল, সেই সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণ মানুষ ঋষি 'সপ্তবধ্রি'। কি দীনতা!

পশু সংজ্ঞক 'গো' শব্দের আরেকটি অর্থ 'জ্যোতি'। ঋষির নাম 'গোতম' অর্থ উজ্জ্বলতম। 'গবিষ্ঠির' অর্থ আলোকময়— আকাশে চিরস্থির জ্যোতি।

কোথাও ঋষি ও তাঁহার দেবতার একই নাম। যথা— ঋ.১০/৯০ পুরুষ সূক্তের দেবতা পুরুষ, ঋষির নাম নারায়ণ। ১০/৫২ সূক্তে এবং ১০/৫৩ সূক্তে দেবগণ ঋষি, অগ্নি দেবতা। ১০/৮০ অগ্নি দেব, অগ্নি ঋষি। ১০/৮১ বিশ্বকর্মা দেবতা, বিশ্বকর্মা ঋষি। ১০/৮৩ মন্যু দেবতা, মন্যু ঋষি। ১০/৮৬ ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্র ঋষি। ১০/৯৫ পুরূরবা ও উর্বশী দেবতা, তাঁহারাই ঋষি। ১০/১১৯ নররূপী ইন্দ্র দেবতা, তিনিই ঋষি। ১০/১২৩ বেন দেবতা, বেন ঋষি। ১০/১৫১ সূক্তে শ্রদ্ধা দেবতা, শ্রদ্ধা ঋষি। ১/১৪০ অগ্নি দেবতা, অগ্নি ঋষি প্রভৃতি। ঋষি ও দেবতার একই নাম। এ বিষয়ে কেহ কেহ মনে করেন যে, নাম ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া একই নাম দিয়া রাখিয়াছেন। আমার সেইরূপ মনে হয় না। মনে হয়

আরাধ্য দেবতাকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন বলিয়া দেবতার নাম ও ঋষির নাম একই হইয়াছে। এইরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের অনেক ভক্তদের মধ্যে দুই জন ভক্তকে দেখিয়াছি অতীব ভজননিষ্ঠ। তাঁহাদের একজনের নাম 'জয়নিতাই', আর একজনের নাম 'জয়জয় মহাপ্রভু'। 'জয়নিতাই'-এর আসল নাম ছিল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি প্রথম যুগের 'গ্রাজুয়েট' ছিলেন—শিলং-এর একটি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। হঠাৎ তিনি নামে মাতোয়ারা হইয়া যান। নিতাই নিতাই বলিতে বলিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে নিতাইয়ের কথা পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে ভাসিতেন। সর্বদাই নাম জপ করিতে করিতে আহার করিতেন। আহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় নিতাই' ডাকিলে সাড়া দিতেন। ঐরূপ নিতাইনিষ্ঠ ভক্ত আর জীবনে দর্শন করি নাই।

আর একজন ভক্তের নাম ছিল শ্রীপুলিনবিহারী বসু। তিনি সবসময় 'জয়জয় মহাপ্রভু' উচ্চারণ করিতেন। তিনি উচ্চাঙ্গের কালোয়াত ছিলেন। অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন ও নানাধরণের রাগরাগিণীতে গান করিতে পারিতেন। তাঁহার সাধন ভজন ছিল গান। যে সময়ের যে রাগিণী, সেই রাগিণীতে গভীর ভক্তিমূলক গান বা হরিনাম কীর্তন করিতেন। কীর্তনের দ্বারা মহাপ্রভুর সুখবিধান করিতেন। ইহাই গৌরভজন মনে করিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া আরাধ্য দেবতা গৌরসুন্দর আনন্দলাভ করিতেছেন— ইহা গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুজগদ্বন্ধু কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে—"পুলুবাবুর মধুরভাব। মধুরভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রাণবল্লভ গৌরহরিকে গান শুনাইতেছেন।" তাঁহার নাম হইয়া গিয়াছিল 'জয়জয় মহাপ্রভু'। তাঁহার পূর্ব নাম সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি নিজেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুময় ছিলেন। বেদে ঋষির নাম দেবতার সঙ্গে একরূপ হওয়ার ঐরূপই কারণ মনে হয়।

ঋষির প্রার্থনা

সংহিতার অনেক মন্ত্রেই দেবগণের কাছে ধনরত্ন প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাতে ঋষিদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা যেন কমিয়া যাইতে চায়। তাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষ, নির্লোভ। তাঁহাদের এত ধনকামনা কেন, এইরূপ ভাবনা মনে উদয় হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে বেদে কতকগুলি রহস্যময় কথা আছে। বেদই তাহার নাম দিয়াছেন ''নিণ্যা বচাংসি''। উপরে থাকে একটা সাধারণ চিত্র, কিন্তু গভীরে লুকানো থাকে নিগূঢ় অর্থ। বেদই বলিয়াছেন, এই রহস্য বাক্যের অর্থ যাহারা জানে না, তাহারা বেদ পাঠ করিয়া কি করিবে? এই রহস্য বাক্যগুলি কি প্রকার তাহার একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন সধবা নারীকে আশীর্বাদ করিলেন, ''তোমার শাঁখা- সিন্দূর অক্ষয় হউক।'' এই আশীর্বাদ বাক্যের অর্থ, শাঁখা বা সিন্দূর শব্দের অর্থের মধ্যে নিহিত নহে। বাংলাদেশের পারিবারিক সংস্কার ও সংস্কৃতি যিনি জানেন না, তিনি ঐ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি আছে দিব্যকর্ণ আছে, তাঁহারাই মাত্র বেদের সকল রহস্য বাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এইরূপে বেদে যে ঋষিদের ধনরত্ন প্রার্থনা, তাহাও মাত্র শব্দার্থ-জ্ঞান দ্বারা বোধগম্য হইবার নহে। ঋষিরা মন্ত্রের দ্রষ্টা, তত্ত্ব-দ্রষ্টা। তত্ত্ব-দ্রষ্টা ঋষিদের মনে, মনের কোন গোপন কোণেও অর্থলালসা থাকিতে পারে না। থাকিলে তাঁহাদের অন্তরে সত্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইবে কিরূপে? আমরা অর্থলোভী, তাই চক্ষু দোষে অনেক ভুল দেখি। ঋষিরা নিশ্চয়ই অর্থলোভী নহেন, কিন্তু অর্থ প্রয়োজন হইতে পারে অপরের জন্য, যজমানের জন্য। কেননা, পৃথিবীর অন্য সকল নরনারীর তো অর্থের প্রয়োজন আছে। কখনও তাহাদের সুস্বাস্থ্য প্রয়োজন, দীর্ঘ আয়ু প্রয়োজন। তাহাদের জন্য ঋষিদের প্রার্থনা। যেমন প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র — ''অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্।।'' ধন চাহিয়াছেন, কিন্তু কাহার জন্য তাহার উল্লেখ নাই। বুঝিতে হইবে সকলের জন্য। যে ধন অগ্নি দিবেন তাহা যেন দিনে দিনে বর্ধমান হয়। তাহা যেন পুষ্টির কারণ হয়। যেন যশস্কর হয়। তাহা যেন

বিশিষ্ট কল্যাণকর্মে প্রেরণাদায়ক হয়।

ইহা পার্থিব ধনও বুঝাইতে পারে, অপার্থিব ভক্তিধনও বুঝাইতে পারে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র মতে, দেবতায় শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি হয়, ভক্তি বাড়িলে প্রেম হয়, প্রেম গাঢ় হইলে ঈশ্বরে মমত্ব-বুদ্ধি-যুক্ত অনুরাগ হয়। ইহা দিনে দিনে বর্ধমান, ''অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।'' হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে তাহা সকল মনুষ্যের উপকারের জন্য কল্যাণময় কর্মে প্রেরণা জাগায়। সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে আর একটি দৃষ্টান্ত, ঋ. ১/১৭/৩ মন্ত্রে ঋষি ইন্দ্র বরুণকে বলিতেছেন, ''সর্বতোভাবে আমাদের তৃপ্ত কর। আমরা তোমার নিকট সামীপ্য মুক্তি কামনা করি।'' মন্ত্রে 'রয়ি' শব্দ আছে। ঐ শব্দে পার্থিব ধন বুঝায় না। যজ্ঞকারিগণ দেবতার অতি নিকটবর্তিতা কামনা করিতেছেন। যে ধন তোমার অভিমত তাহাই দাও। একটু গভীরভাবে মন্ত্রগুলির দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, ঋষিরা নিজেদের জন্য কোন ধনরত্ন প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহাদের চাওয়া যজমানের জন্য। প্রায়শঃই বহুর জন্য বহুবচনে যাচ্ঞা। উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ 'আমাদের' শব্দ দ্বারা শুধু যজমান মাত্র নহে, এক জনপদবাসী, দেশবাসী, পৃথিবীবাসী সকলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন— ''সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ''। এইরূপ তাঁহাদের সকলের সঙ্গে একাত্মতা। মনে মনে জপ করিতে হইবে গায়ত্রী মন্ত্র। তাহার মধ্যে 'নঃ' এই বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ বিদ্যমান। সকলে সত্যদর্শন করুক, সকলে পরম ধনরত্নের অধিকারী হউক, ইহাই স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদের অন্তরের প্রার্থনা।

আর্যগণের সকল পূজার্চনাতেই পুরোহিতের প্রয়োজন। পুরোহিতেরা যাহা কিছু কামনা করেন সকলই যজমানের জন্য, সমাজের সকল নরনারীর জন্য। নিজের মঙ্গলের জন্য নহে। দুই প্রকারের ক্রিয়া আছে সংস্কৃত ব্যাকরণে আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী। যেখানে সংকল্প অপরের জন্য, সেখানে পরস্মৈপদী ক্রিয়ার ব্যবহার, এইরূপ ব্যাকরণের বিধান। ঋষিদের প্রার্থনায় অধিকাংশ স্থলেই পরস্মৈপদী ক্রিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ঋষিদের সমাধিস্থ বা ধ্যানস্থ অবস্থায় যেখানে 'আমাদের' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বিশ্ববাসীর জন্য।

দয়া, করুণা, পরার্থপরতা, ভজনে নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা, এই সব গুণ আমাদিগকে দান কর, যাহাতে অনুশীলন দ্বারা তোমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি।

'ধন' শব্দের অর্থ নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, ''ধিনোতীতি ধনং'', যাহা আনন্দদায়ক তাহাই ধন। যে দ্রব্যের মধ্যে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই রত্ন। বেদে রত্ন বলিতে আনন্দসম্পদ্। রত্ন মহামূল্যবান্ ধন, ক্ষুদ্র অহং চেতনা থেকে চেতনার বিপুলতার মধ্যে উত্তরণ। ক্ষুদ্রতা হইতে মহত্ত্বের

মধ্যে মুক্তি, ইহাই বেদের ধনরত্ন। ঋষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন, ''শাশ্বত অমৃত চেতনাই রত্ন।'' ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "One who holds felicity in abundance"। তিনি রত্নধা, তিনি রত্নের দাতা, রত্নের ধারক। বেদের সকল দেবতাই রত্নধা। রমণীয় ধনৈশ্বর্যের দাতা। সকলেরই রমণীয় আনন্দ দাতা। এই আনন্দ কেবল দৈহিক নহে; মনের আনন্দ, প্রাণের আনন্দও বুঝায়। বেদে রয়ি, রাধ, রায় প্রভৃতি শব্দ ধনবাচী। ইহাতে ঐহিক ঐশ্বর্য ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দুইই বুঝায়।

সুতরাং দেখা যায় বেদের ঋষি যেখানে ধন-রত্ন কামনা করেন তাহা প্রায়ই আধ্যাত্মিক ধন। যেখানে পার্থিব ধন বুঝায় তাহা বিশ্ববাসী জনসাধারণের জন্য। রত্নধা দেবতার রত্ন পাইতে হইলে ঘুমাইয়া থাকিলে মিলিবে না। ঋ. ১/৫৩/১ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, সুপ্ত ব্যক্তিদের ধন তিনি কাড়িয়া লইয়া যান। প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। ঋষি বলিয়াছেন ঋ. ৯/৮৬/১০ মন্ত্রে, দ্যুলোক ভূলোকের স্বধার আড়ালে ঐ রত্ন লুকানো আছে। তাহার জন্য সদা জাগ্রতচিত্ত সাধকের সাধনা চাই। ঋ. ৩/২৬/৩ মন্ত্রে ঋষি বিশ্বামিত্র বলেন— ''ধন তাঁহার জন্য, যিনি লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সদা আগ্রহী।'' অগ্নিদেব শুধু রত্নধা নহেন, তিনি 'রত্নধাতম', সর্বোৎকৃষ্ট রত্নের দাতা। ঋষি বামদেব বলেন, ''তাহা পাইতে হইলে প্রেম দিয়া অগ্নির পরিচর্যা করিতে হইবে''। প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন ঋ. ৯/১৭/৪ মন্ত্রে, ''সোম যখন আমাদের ধী-কে মার্জনা দ্বারা নির্মল করেন তখন সাধকের আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে রত্নের আবির্ভাব হয়।''

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ''অগ্নিদেবতা হইতেছেন পরব্রহ্মের তপঃশক্তি। অতি কঠোরভাবে পরম নিষ্ঠার সহিত তপস্যায় নিমগ্ন হইলে অগ্নির নিকট হইতে সেই পরম রত্নধন লাভ করা যায়।'' 'রত্নধাতম' শব্দের ব্যাখ্যানে শ্রীঅনির্বাণ বলেন — ''রত্ন অমৃতচেতনার দীপ্তি, উপনিষদের প্রজ্ঞানঘনতা।'' 'বেদমন্ত্র-মঞ্জরী' গ্রন্থে শ্রীঅমলেশ বলেন — ''দিব্য আনন্দ সম্পদ্ যে রত্ন তাই দিয়ে ঐশ্বর্যান্বিত সৃষ্টির সপ্তভুবন। সাত ভুবনে রয়েছে সাত রত্ন। আমাদের দেহের মধ্যে যে অখণ্ড দিব্য আনন্দ, তাকে ঋভুগণ করে তুললেন তিনভাগে, তিন আনন্দ — মনের আনন্দ, প্রাণের আনন্দ, দেহের আনন্দ। প্রতি লোকে তিনগুণ করে বর্ধিত হয়ে (৩ × ৭) একুশ রত্ন।'' (পৃ. ২২২)

ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের ১০৬ সূক্তে ৭টি মন্ত্র। ঋষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। তিনি প্রায় সকল দেবগণকে একবারে আহ্বান করিয়াছেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, মরুদ্গণ ও অদিতিকে আহ্বান করিয়া প্রতি মন্ত্রে এইটি গানের ধুয়ার মত বলিয়াছেন — ''বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন'', ''সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন

করুন। আমরা এতকাল যে পাপ করিয়াছি, তাহা সর্বতোভাবে দূর করুন। পরবর্তীকালে যেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে পারি। সকল দেবতা মিলিত হইয়া আমাদের সবাইকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।" সর্বত্রই বহুবচন। মনে হয় সকল নরনারীর জন্য এই প্রার্থনা।

'অংহ' শব্দের অর্থ 'বেদমন্ত্র-মঞ্জরী'কার বলেন — "অমঙ্গল, পাপ, দুঃখ, মনের সংকীর্ণতা, কৃপণতা, জীবনের যত দূর্দৈব, যত যন্ত্রণা। ঋষি ভরদ্বাজ ঋ. ৬/২/১১ মন্ত্রে প্রার্থনা করেছেন — আমাদের অন্তরে ও বাহিরে এই যত পাপ দুঃখ যন্ত্রণা, যত বাধা যত অপঘাত, সব যেন পার হয়ে যাই। তোমার রক্ষা বলে যেন উদ্ধার পাই।" (পৃ. ৩৫)

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে ৮ম মন্ত্রে গর্গ ঋষি বলিয়াছেন — "হে বিদ্বান্ ইন্দ্র, আমাদিগকে মহান্ লোকে লইয়া যাও। সুখস্বরূপ অভয়জ্যোতিতে স্বস্তিতে লইয়া যাও। আমরা স্থবির। তোমার মহান্ বাহুদ্বয়ের সমীপে থাকিব। ওই বাহুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিব। কারণ উহা দর্শনীয় ও শরণীয়।" দশম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে ৫ম মন্ত্রে ঋষিগণ ইন্দ্রকে বলিয়াছেন, "তোমার হস্তে বজ্র তুলিয়া দিলাম। এই বজ্রের তেজে সাধনার সব বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্জিত করো।" সাধনার বিরুদ্ধশক্তি অসুর বৃত্র। ইন্দ্র বৃত্রহন্তা। ইন্দ্র শুদ্ধ মনের প্রতীক। বজ্র বিশুদ্ধ মনের বিবেক জ্ঞান। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন — "বৃত্র অর্থ অজ্ঞান, 'আমি দেহ' এই বোধ। বজ্র—বিবেকজ্ঞান।"

ঋষিদের কয়েকটি প্রার্থনা স্মরণ করা যাইতেছে —

ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, "কেউ যদি অপরাধ করেন, তিনি তাহাকে দয়া করেন।" (ঋ. ৭/৮৬/৭)

"অরং দাসো ন মীলহুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি।।"

গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, "যিনি মহান্ অথবা নিকৃষ্ট পাপী উভয়েরই উপাসককে চির শক্তির দ্বারা বহন করেন তিনিই ইন্দ্র।"

"যোঽবরে বৃজনে বিশ্বথা বিভুর্মহামু রণ্বঃ শবসা ববক্ষিথ।"
(ঋ. ২/২৪/১১)

গৃৎসমদ ঋষি (ঋ. ২/২৬/৪) মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"যো অস্মৈ হবৈর্ঘৃতবদ্ভিরবিধৎ প্র তং প্রাচা নয়তি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
উরুষ্যতীমংহসো রক্ষতী রিষোংহোশ্চিদস্মা উরুচক্রিরদ্ভুতঃ।।"

"যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতাবিশিষ্ট হব্য দ্বারা পরিচর্যা করেন, ব্রহ্মণস্পতি তাঁহাকে প্রাচীন পথে নিয়ে যান, তাহাকে পাপ হতে রক্ষা করেন, শত্রু হতে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য হতে রক্ষা করেন। আশ্চর্যরূপে

ব্রহ্মণস্পতি তাঁর মহোপকার সাধন করেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বলেন, ভগবান্ সর্বভূতের সুহৃদ্। "সুহৃদং সর্বভূতানাম্" (৫/২৯)। এই সিদ্ধান্ত বেদ-সংহিতায়ও আছে। তিনি যে কেবল উপাসকদেরই বন্ধু, তাহা নহেন; তিনি সকলেরই বন্ধু। জগতের সর্বপ্রাণীরই বন্ধু। তাই বলা হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্ম "অস্য বন্ধুঃ" (এই জগৎ প্রপঞ্চেরই বন্ধু)। সংহিতায় ইন্দ্রকে কখনও কখনও মিত্র বলা হইয়াছে। "তিনি নবতর, কল্যাণতর মিত্র।" "মিত্রঃ নবীয়ান্"।

"অবিদদ্দক্ষং মিত্রো নবীয়ান্ পপানো দেবেভ্যো বস্যো অচৈৎ।"
(ঋ. ৬/৪৪/৭)

নরঋষি বলিয়াছেন, অগ্নি "বিশ্বজন্যাঃ"। (ঋ. ৬/৩৬/১)

অর্থাৎ, তিনি 'বিশ্বজন্য' 'বিশ্বমনা'। তিনি সকলের হিত চিন্তা করেন। তাই তিনি 'বিশ্বজন্য' 'বিশ্বমনা'। তিনি নিয়ত বিশ্বের সকলের হিত চিন্তা করেন।

যেহেতু দেবতা 'বিশ্বজন্য', সেই হেতু তাঁহার প্রিয়সখা হইতে অভিলাষী উপাসকও বিশ্বজন্য হইতে অভিলাষ করিতেন এবং ঐ প্রকার সুমতি প্রদানার্থ দেবতাকে প্রার্থনা করিতেন। ঋষি বসিষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন।

"ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবযাবো মতিং দাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ।।"
(ঋ. ৭/১০০/২)

— হে বিষ্ণু! তুমি আমাদিগকে বিশ্বজনীন নির্দোষ সুমতি দাও। সুষ্ঠু প্রাপ্তব্য ও বহুল অশ্বযুক্ত, বহুজনের আহ্লাদক ধনের সম্পর্ক যাহাতে আমাদের হয় তাহা কর।

ইহা অপেক্ষাও সুন্দর প্রার্থনা ঋ. ৩/৫৭/৬ মন্ত্রে। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন —

"যা তে অগ্নে পর্বতস্যেব ধারাসশ্চন্তী পীপয়দ্দেব চিত্রা।
তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাম্।।"
(ঋ. ৩/৫৭/৬)

এই মন্ত্র বেদে আছে জানিলে সাম্যবাদী কার্ল মার্ক্স উদ্ধৃতি দিতে পারিতেন। কারণ এইমন্ত্রে সমভাবে ধন বিতরণের কথা আছে। মন্ত্রটিতে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রটির তাৎপর্য এইরূপ,

"হে অগ্নি! হে বসু! হে জাতবেদা! তোমার বিচিত্র কর্ম, (কাহারও সহিত) সংগতি না করিয়া (অর্থাৎ কোন একে আসক্ত না থাকিয়া সমভাবে

সকলেরকে ধন) বৃদ্ধি করে, যেমন পর্বতের (বা মেঘের) ধারা সমভাবে সকলকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বজনীন সুমতি আমাদিগকে দাও।"

(স্বামী বিদ্যারণ্যকৃত অনুবাদ)

এইমন্ত্রে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, যাহাতে তিনি সর্বজনের হিতসাধন করিয়া সকলকে আহ্লাদিত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই ঋষি বিষ্ণুর নিকটে ধনও প্রার্থনা করিয়াছেন। কার্ল মার্ক্স প্রবর্তিত সাম্যবাদেরও মূল কথা সর্বজনের হিতসাধন।

''ঐ বিশ্বজন্য সুমতি বৈদিক ঋষিগণের কেহ কেহ বস্তুতই লাভ করিয়াছিলেন। এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি কণ্ব তাহা 'দোহন করিয়াছিলেন', অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার আরও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত— আয়াস্য অঙ্গিরস। তাঁহার মতি এতটা বিশ্বজনীন ছিল যে, তিনি 'বিশ্বজন্য আয়াস্য' নামে প্রখ্যাত হন। তিনি স্বয়ং ঐ প্রকারে নিজের নামোল্লেখ করিয়াছেন।'' (স্বামী বিদ্যারণ্য)

''ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।''
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উক্থমিন্দ্রায় শংসন্।।''
(ঋ. ১০/৬৭/১)

ঋষিদের প্রার্থনার কথা বলা হইল। তাঁহাদের স্তবের মধ্যে অন্তরের গভীর আকৃতিগুলি ব্যক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের একটি স্তবের কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে। এই স্তব পড়িলে বুঝা যাইবে আধ্যাত্মিকতার কত ঊর্ধ্বে তাঁহারা বিচরণ করিতেন এবং সর্বজীবের কল্যাণ কামনা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

''যন্মে ছিদ্রং চক্ষুযো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।
শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।।'' (শু. য. ৩৬/২)

''শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।।'' (শু. য. ৩৬/৯)

''দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।।''

ঋষি বলিতেছেন — ''আমার দৃষ্টির মধ্যে, আমার হৃদয়ে, আমার মনে, যেখানে যে ক্রটি আছে, যেখানে যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমার অন্তরাত্মার মহাবাক্ সে সমস্তই যেন ভরিয়া জুড়িয়া দেন।

সৃষ্টির যিনি কর্তা তাঁহার শান্তিতে আমার শান্তি হউক।

ইন্দ্রের প্রতিভায় বিশ্ব আলোকিত। ইন্দ্রই সকলের রাজা। তাঁহার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক জাগ্রতে ও স্বপ্নে, সুষুপ্তি ও তুরীয়ে— আমাদের দেহে

প্রাণে, আমাদের মন ও অন্তরাত্মায়— আমাদের পার্থিব জীবনে ও আমাদের অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানে।

শান্তিতে আমাদের সম্মিলন। শান্তিতে আমাদের অসীম প্রতিষ্ঠা, শান্তিতে আমাদের ক্ষাত্রবীর্য।

শান্তিতে আমাদের প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞার বাঙ্ময় প্রকাশ, শান্তির মধ্যে প্রসারিত আমাদের বিপুল বিসারী মহাবিক্রম।

প্রাণের বেগ আমাদের বহিয়া আনিবে শান্তিকে, জ্ঞানের শিখা জ্বালাইয়া দিবে শান্তিকে, আনন্দের ধারা তীব্র গর্জনে বর্ষণ করিবে শান্তিকে।

জ্ঞানের দিন সব আনিবে আমাদের শান্তি, অজ্ঞানের রাত্রি আনিবে শান্তি। হে মনের চিন্ময় শক্তি, হে প্রাণের তপোময় শক্তি, শান্তিকে তোমরা রক্ষা করিয়া ঋদ্ধ করিয়া চল। হে ইন্দ্র, হে বরুণ, শান্তির জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের সকল দান। হে ইন্দ্র! হে পূষন্! আনন্দ সম্পত্তি জয় করিতে আমরা চলিয়াছি, শান্তি হইয়া তাই আমাদের মধ্যে উদিত হও; হে ইন্দ্র! হে সোম! শান্তি হইয়া শক্তি হইয়া উদিত হও; আমরা যে অসীমের পথিক।

আমাদের প্রেরণা সকল সম্মুখে চলুক, তাই দেবতার শক্তিরাজী শান্তি মধ্যে ফুটিয়া যেন ওঠে, জীবনের ধারা সব শান্তির মধ্যে প্রবাহিত হউক, আমরা উহা পান করিব।

উপরে অন্তরাত্মার শান্তি, মধ্যে অন্তঃকরণে শান্তি, বাহিরে শরীরে শান্তি, আনন্দ অমৃতে শান্তি, স্বাস্থ্যে শান্তি, সুখে ভোগে শান্তি, সকল প্রবৃত্তিতে শান্তি, নিবৃত্তিতে শান্তি, সমস্তে শান্তি, শান্তিতেও শান্তি।''

''সেই শান্তি আমাতে আসুক।'' শ্রীঅরবিন্দের কৃপাধন্য নলিনীকান্তের ভাষায় আবার বলি — ''দীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহা তাহা আবার সংযুক্ত করিয়া দাও, মিলনের সাম্যের দৃষ্টি দিয়া সকল জিনিস দেখ তোমরা, মিলনের সাম্যের দৃষ্টি দিয়া আমরাও যেন দেখি সকল জিনিস।''

সত্যের বাধকই শত্রুতুল্য

ঋষিরা শত্রু-বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শত্রু কাহারা? শত্রুদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে পশু অপহারক, দস্যু, লুণ্ঠক বা বৃত্র নামে। বৃত্র হইল আলোকের আবরক। দস্যু লুণ্ঠক যাহারা তাহারা হইল সত্য আলোক ও সত্য জ্যোতির বিরোধী। তাহারা অন্ধ তামসের শক্তি। পঞ্চম মণ্ডলে একটি মন্ত্র আছে, তাহার অনুবাদ এইরূপ—''সত্যের দ্বারা আবৃত একটি সত্য আছে। সেখানে সূর্যদেবের অশ্বগুলিকে তাহারা বিমুক্ত

করিয়া দিয়াছে। একত্র দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সংখ্যায় দশশত। সেই এক ছিলেন। দেখিয়াছিলাম তাঁহাকে দেবগণের মধ্যে সর্বাধিক মহিমশালী।''

সংহিতার এই মন্ত্রটি লইয়া উপনিষদ্ কি তাৎপর্য করিয়াছেন দেখা যাউক—

''আচ্ছন্ন রহিয়াছে সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্র দিয়া, অপাবৃত কর তাহাকে। সত্যধর্মকে লইয়া আইস দৃষ্টির গোচর। হে পূষা! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! হে যম! হে সূর্য! হে প্রজাপতি-পুত্র! সংহত ও সুসজ্জিত কর তোমার কিরণজাল। দেখি তোমার কল্যাণতম জ্যোতিঃরূপখানি। তিনি, যিনি সেই এক পুরুষ, তিনিই আমি।'' ঈশোপনিষদের ১৫-১৬ মন্ত্র—

''হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।।'' ১৬

[ঈশোপনিষৎ শুক্ল যজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায়। উক্ত গ্রন্থের ৩৯তম অধ্যায় পর্যন্ত যজ্ঞকাণ্ড; এবং শেষ অধ্যায় (৪০তম) জ্ঞান কাণ্ড, যাহার আরম্ভ 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্র দিয়া এবং অন্তিম মন্ত্র 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ .....'। শুক্লযজুর্বেদের শেষ অধ্যায় 'ঈশাবাস্যম্.....' দিয়া আরম্ভ বলিয়া পরবর্তীকালে উহা 'ঈশোপনিষৎ' নামে ভিন্ন গ্রন্থ হইয়াছে, এবং ২/১টি ক্ষেত্রে মন্ত্রের ক্রমপরিবর্তন হইয়াছে।]

উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রে যে সব পরমজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বেদ-সংহিতায় তাহা নাই। মনে হয় এই বেদের সঙ্গে বেদান্তের সম্পর্ক কিছু নাই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য বেদের অর্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বেদান্ত মহাবৃক্ষের বীজের সন্ধান পাওয়া যাইবে বেদে নিহিত গুহ্যজ্ঞানের মধ্যে। গোপনীয় অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হইলে পাওয়া যাইবে সেই সত্যের সাক্ষাৎকার, জ্যোতির্ময় পরমাত্মার স্পর্শ ও অমৃতত্ব লাভের ঐকান্তিক লালসা। এই সত্য তত্ত্বগুলিকে কেন্দ্রে রাখিয়াই আবর্তিত হইতেছে বেদের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য।

আবরণের আড়ালে মূল তত্ত্ব

বাহিরের ছদ্ম আবরণের আড়ালে বেদের যে মূল তত্ত্ব রহস্যটি আছে, সেইটি অনেক গভীরতর, অনেক উচ্চতর তত্ত্ব। সেইটি আছে আমাদের মানবীয় বুদ্ধির গভীরে যে বোধি তাহাতে। সেই স্থলে স্থিত অমৃতময় ভূমি। প্রত্যেক জীবাত্মার আন্তর সন্ধান সেই পরমবস্তুর অভিমুখে। সেই পরমোজ্জ্বল পথটি আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য হইবে সেই পরম সত্যের পরমোজ্জ্বল ধাম। যাত্রা শেষে মিলিবে তাহাদের সন্নিকর্ষ। মর্ত্যভূমি হইতে অমৃততত্ত্বের দিকে জীবের অভিযান। তাহা সার্থক হইবে সেই স্থানে পৌঁছিয়া। বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে এই সিদ্ধান্তটি সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইবে। আর একটি কথা পরিষ্কার ভাবেই জানিতে হইবে : দুইটি ভূমি—একটি সর্বোচ্চ আর একটি সর্বনিম্ন। ঋষির ভাষায় একটি 'ঋতস্য সদনম্' (ঋ. ১/১৬৪/৪৭); আর একটি 'অনৃতস্য ভূরে' (ঋ. ৭/৬০/৫)। ঋতের সদনটি কি রূপ?— সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মময়। সেইটি সত্য, সেইটি মহাসত্য। সেইটি ঋত, সেইটি পূর্ণচিত্ত। সেইটি বৃহৎ, সেইটি ব্রহ্ম আনন্দঘন। সংহিতার সত্য, ঋত ও বৃহৎই বেদান্তের সচ্চিদানন্দঘন। সেইটিকে দেবযান বলা হইয়াছে। সেইটিই যথার্থ পন্থা। সেইটিই 'ঋতস্য পন্থা'। সেই পন্থাটিকে অনুসন্ধান করিয়া চলিতে হইবে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর শিষ্যরা বলিতেন যে, মানবজীবন দুইটি জগতের সহিত সম্বন্ধান্বিত। একটিকে বলা চলে অধ্যাত্মজগৎ, যেখানে ঊর্ধ্বতর সত্য সদা প্রতিষ্ঠিত। অপরটিকে বলা চলে দেহধারী জীবাত্মার জগৎ। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঊর্ধ্বতর জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়াছে নিম্নে অবর সত্য ও অবর চেতনার ভূমিতে।

বৈদিক ঋষিদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। কিন্তু তাঁহারা এই তত্ত্বটি অধিকতর বাস্তবরূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের যোগ ছিল অনুভূতি ও উপলব্ধি সিদ্ধ। তাঁহারা অবর সত্যের ভূমিকে বলিয়াছেন 'অনৃতস্য ভূরে'। আর পরম সত্য ভূমিকে বলিয়াছেন ''ঋতস্য সদনম্''। সেই দিব্য ধামের পথ 'ঋতস্য পন্থাঃ'। ইহা আমাদের অনুসন্ধেয়।

ঋষিদের আর একটি সিদ্ধান্ত মানব জীবন সুরাসুরের যুদ্ধ ক্ষেত্র, যাহা আমাদর সকল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় — দেবাসুরের যুদ্ধ। প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরও

লিখিয়াছেন, "চারিবেদকে যুদ্ধ কহে।" সেখানে সত্যের শক্তি অন্ধকারের শক্তির সহিত সর্বদাই যুদ্ধরত। অন্ধকারের শক্তিদের নাম — বৃত্র, পণি ও দস্যুগণ। ইহারা সত্যের আবরক এবং অপহারক, কখনও ঋতস্য ধারার সহস্র প্রকার বাধক, মূর্ত তমোগুণ, সত্ত্বগুণের আবরণকারী। সকল প্রকারেই আত্মার ঊর্ধ্বগতির রোধক; সত্যের সহজ ধারার, সহজ প্রবাহের বাধক। এই বিরোধ উচ্ছেদ করিতে হইলে অন্ধকারের শক্তিকে পরাস্ত করিতে হইবে। এই যুদ্ধে জয় হইলে মহাসত্যের আবরণ উন্মোচন করিবে আমাদের মধ্যে। এইজন্য দেবতাদের সহায়তা প্রয়োজন। দেবতাদের আবাহন করিতে হইবে যজ্ঞে আহুতি দিয়া। এই জয়ের জন্যই যজ্ঞে ঘৃত অর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ অন্তর্যজ্ঞে আমাদের দেহ-মনঃ-প্রাণ, সর্বোপরি ক্ষুদ্র অহমিকাকে সমর্পণ করিতে হইবে। "সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে"— ঘৃতার্পণের এইটি রহস্যার্থ। এই ঘৃত আমাদের জীবনের সার। বস্তুত ইহা অসার। ইহা আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার বা অহমিকা, উহাকে অর্পণ করিতে হইবে। ঘৃতকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আমাদের নিত্য অহঙ্কার যজ্ঞে ভস্মীভূত হইবে। যজ্ঞে ঘৃতদান আত্ম সমর্পণের প্রতীক।

যা কিছু আমাদের স্বকীয়, আমার বলিয়া যাহা কিছু জড়াইয়া ধরিয়াছি সব কিছু সমর্পণ করিতে হইবে পরম সত্যের নিকট। তাহা হইলে দিব্য স্বার্থে দিব্য জ্যোতি অবতরণ করিবে। আমাদের জীবনযাত্রা তীর্থযাত্রাও বটে, যুদ্ধযাত্রাও বটে। তীর্থযাত্রা দেবাভিমুখী। অগ্নি আমাদের অগ্রণী বা নেতা। অগ্নির দূত আমাদের আত্মসমর্পণ লইয়া পৌঁছান পরমদেবতার চরণে এবং কৃপা লইয়া আসে আমাদের অন্তঃসত্তার গভীরে।

এই তীর্থযাত্রায় অগ্নি আমাদের পুরোধা বা পুরোহিত। বেদের প্রথম মন্ত্র এই পুরোহিতের স্তুতি করিয়াছেন। এই তীর্থ-যাত্রার প্রান্তভূমিতে তিনিই উপবিষ্ট 'রত্নধাতম' রূপে। এই তীর্থ-যাত্রার পথে আমাদের তপস্যা, আমাদের আর্তি পৌঁছাইয়াছেন দেবশক্তির দুয়ারে—আর দেবশক্তির পুণ্য কৃপাশীর্বাদ লইয়া আসেন আমাদের হৃদয়পুরে।

"চারিবেদকে যুদ্ধ কহে"— বন্ধুবাণীর তাৎপর্য

আমার গুরুদেব শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাঁহার আচার্য চম্পটী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভু ত্রিকালগ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন, 'চারি বেদকে যুদ্ধ কহে' এই কথাটির তাৎপর্য কি? রামায়ণ-মহাভারত প্রধানতঃ যুদ্ধেরই কথা। বেদে তো কোন যুদ্ধের কথা নাই, তবে যুদ্ধ বলিলেন কেন?"

চম্পটী ঠাকুর উত্তর দিলেন, প্রভুর ঐ কথার অর্থ আমিও ভাল করিয়া বুঝি না। তোমার এই প্রশ্ন একদিন রমেশও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; না বুঝিয়াও আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। রমেশ শিক্ষিত যুবক। সে যে আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছিল, ইহাতে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আমার ব্যাখ্যা ভুল হয় নাই। গোঁজামিল হইলে রমেশ মানিয়া লইত না, তর্ক করিত। রমেশকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই আজ তোমাকে বলিব।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলি, একদিন রমেশ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু, বেদ পড়িলে কি হয়?" প্রভু বলিয়াছিলেন, "বেদ পড়িলে ভেদ থাকে না।"

কথাটি মূল্যবান্। ভেদজ্ঞানই জীবন পথে যুদ্ধ। ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে গেলে যুদ্ধ বিরতি। বেদের যুদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্রের যুদ্ধ নহে। কোন ভৌগোলিক স্থানে; যেমন লঙ্কায় বা কুরুক্ষেত্রে ঘটিত যুদ্ধ নহে। যুদ্ধ আছে ভাব রাজ্যে, মানস ভূমিতে আরাধ্যের প্রাধান্য নির্ণয়ে।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন অপরজনকে পরাজিত করিয়া নিজেকে কোন কিছুর কর্তৃত্বের আসনে বসাইতে চায়, বেদের যুদ্ধটিও সেইরূপ একটি সর্বোপরি সবাতিশায়ী প্রভুত্ব লইয়া। ভৌম যুদ্ধে থাকে দুই পক্ষ। বেদের যুদ্ধে চারি পাঁচ প্রধান পক্ষ। জয় পরাজয়ও কৌতুকাবহ। কখনও মনে হইবে এই পক্ষ জয়ী, কখনও মনে হইবে ঐ পক্ষ জয়ী। শেষটায় দেখা যাইবে সকলেই সমান জয়ী। উপসংহারে মনে হয় যুদ্ধটি একটি মল্লদের কৃত্রিম যুদ্ধ (mock fight)-এর মত।

অন্য দশখানা গ্রন্থের মত বেদ একখানি গ্রন্থ নহে। উহা আগাগোড়া ঋষিদৃষ্টি। দ্রষ্টা ঋষি একজন নহেন, অনেক। তাঁহাদের কথা গভীরার্থদ্যোতক। ভাসা ভাসা পড়িলে বেদ বুঝাই যায় না। নিবিড়ভাবে

মনোনিবেশ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। বেদ বলিতে প্রধানতঃ বেদের মন্ত্র ও সংহিতা ভাগ। বেদের মন্ত্রগুলি এক একটি সূক্তে বিধৃত। বেদে অনেক ঋষির অনেক সূক্ত সংকলিত। বেদের সারাংশ হইল বেদান্ত বা উপনিষৎ।

বেদের সর্বোপরি আরাধ্য বস্তু পরব্রহ্ম। বেদান্ত-সূত্র এই সারাৎসার কথাটি লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। সংহিতা ভাগে ইহা লইয়া যুদ্ধ চলিয়াছে। যুদ্ধ বিরতি বা সমাধানের বীজও সূক্ত মধ্যে নিহিত আছে। সেই বীজ লইয়াই বেদান্ত।

যুদ্ধটি কি রূপ তাহা শোনো। অগ্নিমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলেন, অগ্নিই পরব্রহ্ম। অগ্নি শব্দের অর্থ হইল অগ্রণী, সর্বাগ্রে যিনি দিশারী। সকলের পুরোভাগে তাঁহার স্থান, তাই তিনি পুরোহিত। তিনি পাবক, সকলকে পবিত্র করেন। তিনি জাতবেদা, সকলের আগে তাঁহার প্রকাশ, তাই তিনি সকলকে জানেন। অগ্নিই পরব্রহ্ম।

যাঁহারা বায়ু মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাঁহারা বলেন, বায়ু পরব্রহ্ম। অগ্নিও কি প্রজ্বলিত হইতে পারে বায়ু ব্যতীত? অগ্নি না হইলেও দুই-চারদিন বাঁচা যায়। বায়ু ছাড়া একটি মুহূর্তও জীবন ধারণ করা যায় না। মানুষের জীবনের সাতটি স্তর, আর সারা বিশ্ব মধ্যে সাতটি ভুবন — এই ৭ × ৭ = ৪৯ ভাগে বিভক্ত হইয়া বায়ু বিশ্বসংসারকে রক্ষা করেন। সুতরাং বায়ুই পরব্রহ্ম।

যে ঋষি ইন্দ্র ভাবনাময় তিনি বলেন, ইন্দ্র যে দেবরাজ তাহা কে না জানে? ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত বহির্জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটির সম্বন্ধ। এই পাঁচটি বিষয় স্থিত আছে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূতে। সুতরাং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপর ইন্দ্রের রাজত্ব। ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রই পরমৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম। বেদে যুদ্ধ নাই বলিয়াছি — তবে ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কথা বেদে আছে। ইন্দ্র সেই যুদ্ধে জয়ী।

যাঁহারা বরুণ দেবতার ধ্যানে নিবিষ্ট তাঁহারা বলেন, বরুণই পরব্রহ্ম। বরুণ জলাধিপতি। সমুদ্রের উপর তাঁহার একাধিপত্য, অসীম প্রভাব। সমুদ্র সাতটি, যেমন জলের সমুদ্র, প্রাণের সমুদ্র, আলোর সমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্র আছে। সর্বোপরি বরুণ রাজাধিরাজ। এই বিশ্ব প্রথম জলময় ছিল, এই জলের পরিচালক বরুণ। যখন জল ছিল না, তখন ছিল অন্ধকার। বরুণ অন্ধকারেরও সম্রাট্। বিশ্বের সর্ববিধ শৃঙ্খলা রক্ষায় লৌকিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব বরুণের। সুতরাং বরুণই পরব্রহ্ম।

যে ঋষিগণ সবিতা দেবতার চৈতন্যে স্থিত তাঁহারা বলেন, বিশ্বের

সকলই সূর্য হইতে — সূর্যই সবিতা। সবিতা অর্থই হইল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী শক্তি। ব্রাহ্মণগণের অবশ্য-জপনীয় বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা সবিতা। সবিতার বরণীয় ভর্গই ধ্যেয়। সুতরাং সবিতাই পরব্রহ্ম।

এই সবই যুদ্ধ। ভাবরাজ্যের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সমাপ্তি হইল কখন? যখন ঋষি ঘোষণা করিলেন, "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। "পরম সৎ বস্তু একটিই। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নানা নামে অভিহিত করেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ এক জনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।" যুদ্ধে সকলেরই জয় হইল। বেদের সংহিতা অংশে এই যুদ্ধের প্রবলতা দেখিয়া প্রভু বোধ হয় বেদকে যুদ্ধ কহিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তোমাকে ভাগবতীয় রসের একটি লীলা শুনাইব।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ। এখন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন শ্রীরাধা নিকটবর্তী কদম্ব বনের মধ্য হইতে বাঁশীর শব্দ শুনিলেন। ঐ শব্দ এতই মধুময় যে তাহা শ্রীরাধার মনঃপ্রাণ চুরি করিয়া নিল। তিনি মনে মনে ঐ বাঁশীর বাদককে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। বাঁশীবাদককে ভালবাসিয়া ফেলিলেন।

আর একদিন একজন বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া আপন মনে গান করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে 'শ্যাম' এই নামটি শুনিলেন শ্রীরাধা। নামটি তাঁহার কাছে এতই মধুময় লাগিল যে, তিনি পাগলের মত হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে বা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনঃপ্রাণ।" ঐ শ্যামনামা পুরুষটিকে শ্রীরাধা মনে মনে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। মানসে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রায় সর্বদাই ধীরে ধীরে শ্যাম শ্যাম জপ করিয়া আনন্দে ভাসিতেন।

আবার আর একদিন যমুনার ঘাটে কলসী লইয়া জল আনিতে গিয়া একটু দূর হইতে একজন পরম সুন্দর কিশোরকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা রূপ দেখিয়া শ্রীরাধা আকুল হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, এমন রূপের মানুষ জগতে আর নাই। তিনি সেই রূপের কিশোরটিকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। এই অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠিলে শ্রীরাধা সখী বিশাখাকে বলিলেন, তুই তো সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে পারিস্। ঐ কিশোর যখন যমুনার তীরে বেড়ায় তখন তুই নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া তাঁহারা একখানা চিত্র অঙ্কন করিতে পারিস্? শ্রীরাধার নির্দেশে বিশাখা শ্যামের নিকটে যাইয়া চিত্রকরের নয়ন দিয়া রূপখানি দেখিয়া একখানি পট অঙ্কন করিলেন। চিত্রপটখানি হাতে ধরিয়া

শ্রীরাধা নিজ বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর ব্যাকুল হইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই চিত্র দেখিয়া তোর তো পরম আনন্দ হইবার কথা। তা অমনভাবে কাঁদিতেছিস্ কেন?" শ্রীরাধা বলিলেন, "আমার নারী জীবনে ধিক্কার, তাই কাঁদিতেছি। আমি তিনজন পুরুষকে ভালবাসিয়াছি। একথা বলিতেও লজ্জা হয়। তোরা মরমী সখী, তাই বলি। কদম্ববন মধ্য হইতে যাঁহার বাঁশী শুনিয়াছি, সেই বাঁশীবাদককে আমি ভালবাসিয়াছি। বৈষ্ণব মুখে 'শ্যাম' নামটি শোনা অবধি ঐ নামের মানুষটিকে ভালবাসিয়াছি। শ্যাম শ্যাম জপ করিতে আমার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। এখন এই চিত্রপট দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। এই চিত্রপট যাঁহার, তাঁহাকে সবখানি মনঃপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। এখন আমার উপায় কি? এক নারী যদি তিন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার নারী জীবন ধিক্কৃত। এই ধিক্কৃত জীবন লইয়া আর বাঁচিব না। আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়।"

শ্রীরাধারাণীর কথা শুনিয়া সখীগণ সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। যাঁহার নাম শ্যাম, তিনিই কদম্ববনের বংশীবাদক; আর যমুনার তীরে যাঁহাকে দেখিয়াছিস্, যাঁহার এই চিত্রপট, তিনি ঐ একই ব্যক্তি। এই তিনজন বস্তুত একজন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা শান্ত হইলেন।

বেদের এক ঋষি গভীর অনুভূতি লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্বাণ্যেতানি নামানি কর্মতঃ", বেদের দেবগণের বিভিন্ন নাম বিভিন্ন কর্ম হইতে হইয়াছে। একজনেরই নানা নাম। শ্রীকৃষ্ণের যেমন অষ্টোত্তর-শত নাম, শ্রীবিষ্ণুর যেমন সহস্রনাম-স্তোত্র, সেইরূপ এক ব্রহ্মই বহু প্রকারে বহু নামে কথিত। বেদের আন্তর রাজ্যের তথাকথিত যুদ্ধ থামিয়া আসিল। পরব্রহ্ম এক। বেদান্ত কহিলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই এক কিন্তু বহুকে পরিত্যাগ করিল না। বহুকে লইয়াই এক হইল। অথবা আরও সত্য কথা, বহুত্বে একত্বে একাকার হইল। একই বহু, বহুই এক।

রামায়ণ মহাভারতের মত অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধও বেদে আছে। সেই যুদ্ধ বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র। বৃত্র হইল আবরিকা শক্তি। সত্যকে, জ্ঞানকে ও তত্ত্বকে, বৃত্র আবৃত করিয়া রাখে। এই আবরণ দূর করা ক্ষুদ্র মানুষের কার্য নহে। ইন্দ্র পরব্রহ্মই। তিনি এই মায়া দুর করেন তাঁহার কৃপাশক্তি দ্বারা, শুধু উপস্থিতি দ্বারা। তাঁহার কৃপাশক্তি ছাড়া মানুষের সাধ্য নাই ঐ মায়ার আবরণ দূর করে। "যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাই মায়ার অধিকার।"

সমগ্র বেদ মুখ্যতঃ দুইটি তত্ত্বকথা আমাদিগকে জানাইতে চাহেন : (১) পরব্রহ্ম কি বস্তু ও (২) তাঁহাকে পাইবার উপায় কি। বেদে এ দুইটিই যুদ্ধময়। বহুর মধ্যে দিয়া একত্বের উদ্ধার, ইহাও যুদ্ধ। আর মায়ার অন্ধকারের আবরণ কাটাইয়া সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানা — তাঁহারা জন্য উপাসনা করাও এক ভয়ানক যুদ্ধ। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চলে। সাধন-ভজন একটি কঠিনতম সমর। মনে হয় এই দুইটির দিকে লক্ষ করিয়া প্রভু বেদকে যুদ্ধ বলিয়াছেন; বলিয়াছেন, "বেদ পড়িলে ভেদ থাকে না"। যখন আমরা ভেদ বুদ্ধি রহিত হই, তখন যুদ্ধে আমরা জয়ী।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি

বেদ যেমন সৃষ্টির আদিমূলে তেজকে স্থাপন করিয়াছেন, বর্তমান বিজ্ঞানও পরমাণুকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ইলেকট্রনে পৌঁছিয়াছে। ঐ ইলেকট্রন তেজোবিন্দু বা শক্তিবিন্দু ছাড়া আর কিছু নহে। এই শক্তিকে অগ্নি বলিলে অনেক সমাধান হয়। ইহা হইবে আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। যদি আধ্যাত্মিক চিন্তা করি তাহা হইলে 'সত্যং', 'ঋতং', 'বৃহৎ', এই সকল বিশেষণের একটি সুষ্ঠু অর্থ হইতে পারে। একটি গভীরতম অর্থের ভাবনা না করিলে কোন সূক্তকেই জ্ঞানগম্য করা সম্ভব নহে। একটি শক্তিবিন্দু বা ইলেকট্রনের মধ্যে যে কত অসীম শক্তি লুক্কায়িত আছে, বর্তমান জড়-বিজ্ঞান তাহা আবিষ্কার করিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শক্তিকে যদি অগ্নির শক্তিরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে উপনিষদের 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' অর্থাৎ অণুতে অনন্ত সত্তার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি। এই শক্তিবিন্দু এখন আর পরমাণুর মত নিয়ন্ত্রিত (determined) নহে। তাহার মধ্যে free will আছে— চিৎকণা আছে। বিজ্ঞান ইহা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে আধিভৌতিক জগৎ আধ্যাত্মিক সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

বেদে তিনপ্রকারের অর্থের কথা বলিয়াছি। ইহা প্রাচীনদের সম্মত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। বর্তমানে দেখা যায় অনেক মনীষী ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে বেদ-ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভৌগোলিক অর্থের বিচার দিয়া অনেক গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। লোকমান্য তিলক মহোদয় জ্যোতিষিক অর্থে বেদের অনেক তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে প্রত্যগাত্মানন্দ স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ম্যাক্সমূলর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মূলতঃ সায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলর ঋগ্বেদ মূল ও পদপাঠসহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সায়ণ ভাষ্য সমেত প্রথম দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রণ করেন। Willson প্রমুখ পণ্ডিতগণ সায়ণ-ভাষ্যানুসারী তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

করেন এবং মূল ও পদপাঠসহ তাহা বঙ্গাক্ষরে প্রথম প্রকাশ করেন। ৺দুর্গাদাস লাহিড়ীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সমগ্র বেদের বঙ্গাক্ষরে মূল, পদপাঠ, সায়ণভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বহুখণ্ডে প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া পরপর কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ *On the Veda* নামে ঋঙ্‌মন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ অংশের (বিশেষতঃ অগ্নি-সূক্তের) ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে উক্তগ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া Secret of the Veda নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বেদ বুঝাইতে *Life Divine* লিখিয়াছেন, 'সাবিত্রী' মহাকাব্য প্রভৃতি লিখিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদে পরপর দশটি মণ্ডলের একটানা অর্থ করেন নাই। শ্রীঅনির্বাণ তিনখণ্ড 'বেদ-মীমাংসা'য় বেদের বহু তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু ঋক্-সংহিতার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করেন নাই। (শ্রীঅনির্বাণ ঋগ্বেদের সংহিতার তৃতীয়মণ্ডলের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু তাহা ছাপা হয় নাই। 'বেদার্থ-মনন' এই শিরোনামে উহা অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীপরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত 'বেদ-বিচার' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায়।)

শ্রীঅরবিন্দ বেদ বুঝাইতে সাবিত্রী লিখিয়াছেন। এখন সাবিত্রী বুঝাইতে চার-পাঁচখানি গ্রন্থ হইয়াছে। তবুও সাবিত্রী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় নাই। কারণ, সাবিত্রী ইংরেজী ভাষার চমৎকারিত্ব আর বিষয়বস্তু ও রূপকের মহাগম্ভীরতা। ঐ গ্রন্থ যথার্থ ভাষান্তরিত করা দুরূহ বলিয়া বাংলাভাষাভাষীরা বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীঅনির্বাণ তিনখণ্ড বেদমীমাংসায় বেদের বহু তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু একটি মণ্ডলেরও ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করেন নাই।

ইহা উক্ত মনীষীদের সমালোচনা নহে, আমরা যাহারা বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প জানি, তাহারা, শ্রেষ্ঠদের নিকট যাহা আশা করি, অথচ আশা করিয়া পাই না, তাহাই বলা মাত্র।

পুরাণের দৃষ্টি

পণ্ডিতেরা বলেন— "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"। অর্থাৎ, বেদের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা। ভারতবর্ষের ইতিহাস সমূহের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ১৮টি পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শ্রীজীব গোস্বামী 'পুরাণ' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন— "পুরা অপি নব"। অর্থাৎ, কথা পুরাতন, কিন্তু উহা নিত্য নবায়মান। বেদ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে একটি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি।

"ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তমাঃ।
বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি।।"

এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে মহাকবি কালিদাসের সহায়তা লইতেছি। মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থগুলির অন্যতম 'কুমারসম্ভব'। এই গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে হিমালয়ের বর্ণনা দ্বারা। বর্ণনার দ্বিতীয় শ্লোক—

"যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং, মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ, পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্।।"

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ—"অপরাপর পর্বত সকল ঐ হিমালয়কে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া, দোহন দক্ষ সুমেরু-গিরির সাক্ষাতে পৃথুরাজের আজ্ঞানুসারে গো-রূপধারিণী ধরিত্রী হইতে দ্যুতিমান্ রত্ন ও ঔষধিরাজি দোহন করিয়াছিল।"

এই বঙ্গানুবাদ পড়িয়াও ছাত্রগণ বিষয়টির তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। অনেক অধ্যাপকও বুঝাইতে পারেন না। টীকাকার মল্লিনাথও খুব ভাল করিয়া বলেন নাই। এই শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ১৪—১৮ এই পাঁচটি অধ্যায়ে পৃথুরাজার কথা বর্ণিত আছে। তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে এই পাঁচটি অধ্যায়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ধ্রুব মহারাজের ভক্তিময় কাহিনী সকলেরই জানা আছে। ধ্রুবের বংশে দশম পুরুষে পৃথু রাজার জন্ম। পৃথু রাজার মহিমা বর্ণন ভাগবতে প্রচুর

আছে। তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই —"শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাস মুনি।।" এই পৃথু রাজার রাজত্বকালে এক প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে অন্নবস্ত্রের অভাবই নয়— সকল রকম নৈতিক সদ্‌গুণরাশিরও অভাব হইয়াছিল। এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষের কারণ কি জানিবার জন্য পৃথু রাজা গভীরভাবে ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, পৃথিবী সকল বস্তুই আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথু রাজা পৃথিবীর উপর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া গাভীরূপ ধারণ করিয়া পলায়নপরা হইলেন। পৃথুরাজ ধনুর্বাণ হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কেন পৃথিবী এইরূপ সকল শস্য সম্পদ্ ধন রত্ন ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লুকাইয়া রাখিয়া রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলেন। গাভীরূপা ধরণী কহিলেন—"আপনি তো জানেন, আপনার পিতা বেণ খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। রাজা রাজগুণ হইতে ভ্রষ্ট হইলে সমস্ত প্রজামণ্ডলী বিপথগামী হয়। তখন আমি সব কল্যাণময় সম্পদ্ লুকাইয়া ফেলি।" পৃথুরাজ বলিলেন, "এখন সকল কল্যাণময় দ্রব্য তোমাকে বাহির করিতে হইবে।" ধরণী কহিলেন, "আমি এখন গোরূপা। আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনকারী ও দোহনের উপকরণ জোগাড় করুন। যাহা যাহা সম্পদ্ আছে আমি সব প্রদান করিব।"

পূর্বোক্ত ভাগবতের শ্লোকে (৪/১৮/১৪) বলিয়াছেন, ঋষিরা তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয় পাত্রে বেদের দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়— ঋষিরা এই দেহ-ইন্দ্রিয়কে উপেক্ষা করেন নাই। ঋষিরা সংসারত্যাগী তপস্বী ছিলেন না, তাঁহারা মনে করিতেন, দেহ ও আত্মা লইয়া যেমন একটি গোটা মানুষ, তেমনি এ দুয়েরই চাই পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা ও সম্যক্ সিদ্ধি। ব্যাবহারিক জীবনের পূর্ণতাকে বলিতেন 'লোকসিদ্ধি'। বেদের মধ্যে এই লোকসিদ্ধি ও আত্মসিদ্ধির সার্থক সমন্বয়।

লোকসিদ্ধি ও আত্মসিদ্ধির সমন্বয়

এই পার্থিব জীবনকে ত্যাগ করিয়া নহে, এই বাস্তব জীবনকে ধরিয়া তাহার ভিতর দিয়াই বৈদিক ঋষির সাধনা। তথাপি প্রশ্ন জাগে, প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়, মনঃপ্রাণের দ্বারা কি করিয়া সাধনা চলিতে পারে? এই সম্বন্ধে ঋষিদের উত্তর এই : সত্যসত্যই আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মনঃপ্রাণ প্রকৃতির বিকারজ ও মলিন। ইহাদিগকে উজ্জ্বল অপ্রাকৃত করিয়া তুলিতে হইবে। কি করিয়া প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করা যায় তাহা বলিতেছি।

আমাদের মধ্যে একটি পুরুষ আছে — তাহা মিথ্যা কাল্পনিক ব্যর্থ

অহঙ্কারযুক্ত। এই মিথ্যা অহঙ্কারের দ্বারা দেহইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ যতক্ষণ পরিচালিত ততক্ষণ তাহা তমোময়, মলিন। এই মিথ্যা পুরুষকারকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সাধক অপরিমেয় ভূমিতে আরোহণ করেন। তখন তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ অপ্রাকৃত হয়। তখনই অপৌরুষেয় বাণী তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত হয়েন।

বৃহস্পতি বৎস

ভাগবতের মন্ত্র বলিলেন, গোরূপা গাভীকে দোহন করিলেন ঋষিরা। বৎস হইলেন বৃহস্পতি। গিরিগণ বৎস করিয়াছেন হিমালয়কে। ইহাতে বুঝা যায়, হিমালয় পর্বতশ্রেষ্ঠ। সেইরূপ বৃহস্পতি, ঋষিগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা বৎস করিয়াছেন। সুতরাং বৃহস্পতিকে আর একটু ভাল করিয়া চিনিতে হইবে।

ঋষিরা বেদমন্ত্র বাণীর উদ্‌গাতা। সুতরাং বৃহস্পতি সর্বপ্রধান উদ্‌গাতা, ইহা সহজেই বুঝা গেল।

ঋক্‌-সংহিতা বলিয়াছেন ৪/৫০/৪ মন্ত্রে—

"বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্‌।"

এই জ্যোতি বুঝাইয়াছেন বৃহস্পতির প্রজ্ঞার দিক্‌। মন্ত্রে ব্রহ্মা যখন বাণীময় হয়েন তখন তিনি মূর্ত বৃহস্পতি।

যাস্ক বলেন, বৃহস্পতি অন্তরিক্ষ স্থানের দেবতা। অন্তরিক্ষ মন্ত্র-জগতের স্থান। সাধুদের হৃদয়ও অন্তরিক্ষ। সাধুদের হৃদয়কন্দরেই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে বৃহস্পতি দ্যুস্থানের দেবতা। অন্তরাত্মার দিব্য বাঙ্ময় পুরুষই বৃহস্পতি।

চেতনার বিস্ফারণে অবিদ্যার আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্ধকার দূর হয়, গূঢ় জ্যোতির প্রকাশ হয়। চিৎ শক্তির এই বিচ্ছুরণের যিনি অধীশ্বর তিনি 'ব্রহ্মণস্পতি', 'বৃহস্পতি' বা 'বাচস্পতি'। ঋষি বামদেব বৃহস্পতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন (ঋ. ৪/৫০সূক্ত) — বৃহস্পতি মহাবলে ত্রিভুবন ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই গেল বৃহস্পতির কথা। গোরূপা পৃথিবীর দোহন কার্যের তিনি হইলেন গোবৎস।

"অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া বাক্য, মন ও শ্রোত্র এই সকল ইন্দ্রিয় রূপ পাত্রে পবিত্র বেদময় দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকের তাৎপর্য আলোচনীয়।

শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া তাঁহাদের দেহ-মন-প্রাণরূপ পাত্রে অতি পবিত্র বেদময় দুগ্ধ দোহন করিলেন। (ভা. ৪/১৮/১৪) টীকায় শ্রীধর লিখিয়াছেন — "দেবীং পৃথ্বীং বাঙ্মনঃশ্রবণৈর্বেদগ্রহণাদিন্দ্রিয়াণাং পাত্রত্বম্‌।।"

যাহা ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন তাহার অর্থ —

"পৃথিবী যেমন সাক্ষাৎ গোমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, তেমন তাঁহার দোহনেও দুগ্ধই নির্গত হইয়াছিল, তবে (দেবতাদের দোহন কালে) তাহা যে বেদময় হইয়াছিল, ইহা সেই দুগ্ধস্পর্শমাত্রে তৎক্ষণাৎ বেদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া; বেদগণের আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র— বাক্য, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়; সেই সকল স্থানে ঐ দুগ্ধ সেক করায় বেদ আবির্ভূত হন বলিয়া ঐ স্থান গুলিকেই পাত্র বলা হইয়াছে।" (শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী কৃত 'শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী' টীকা, পৃ. ১৬০৫, ২য় সংস্করণ।)

পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুঃ

তখন পৃথু রাজার উপদেশমত সকল শ্রেণীর দোগ্ধাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বৎস করিয়া পৃথিবী হইতে নিজ নিজ পাত্রে ইচ্ছানুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছিলেন। চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে। কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি—

"দেবতারা ইন্দ্রকে বৎস করিয়া স্বর্ণময় পাত্রে অমৃত, মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি ও দৈহিক শক্তিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। মুনিগণ বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া বাক্য, মন ও স্তোত্র, এই সকল ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পবিত্র বেদময় দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

"সিদ্ধগণ কপিলকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া আকাশরূপ পাত্রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। পশুগণ রুদ্রের বাহন বৃষকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণাদিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল।

"বৃক্ষগণ বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া বিভিন্ন প্রকার রসরূপ দুগ্ধ এবং পর্বতগণ হিমালয়কে বৎস করিয়া নিজ নিজ সানুদেশে বহুপ্রকার ধাতুদ্রব্যরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল।"

"বটবৎসাশ্চ তরবঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ।
গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানাধাতূন্ স্বসানুষু।।"(ভা. ৪/১৮/২৫)

পূর্বোক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় পাদ অবলম্বন করিয়াই কবি কালিদাস হিমালয় বর্ণনার প্রারম্ভে "যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।

দোহনের ফল বেদশাস্ত্র

এখানে বেদের প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য যে শ্লোক, তাহার বর্ণনা এইরূপ —

ঋষিদের অনুভূতি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষজ কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত।

অপৌরুষেয় ঋষির অপ্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-মনে অপৌরুষেয় মন্ত্র বাণী সহজ-ভাবেই প্রকটিত। কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহা দানেরই যোগ্য করে।"

কবি বলিতেছেন— অযাচিত মহাদান পাঁচটি— বাহিরে আলোক ও আকাশ, আর আমাতে তনু, মন ও প্রাণ। আমরা সকলেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ দ্বারা আকাশ আলো দেখি। কিন্তু এই দেখা প্রাকৃত। অহঙ্কারের মত কর্তৃত্বাভিমান হইতে ঋষিরা মুক্ত। তাই তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন অপ্রাকৃত আকাশ-বাতাসকে প্রত্যক্ষ করে।

যে উপায়ে ঋষিদের দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ অপ্রাকৃত হইত তাহারই নাম 'আত্মযজ্ঞ'। এই আত্মযজ্ঞের প্রধান সহায় দেবতা অগ্নি। অগ্নি তাই প্রধান পুরোহিত। অগ্নির তাপই তপস্যার প্রতীক। এই তপস্যার অগ্নিময় পথে সাধক অগ্রসর হয়েন। দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ যখন অপ্রাকৃত হয়, অপৌরুষেয় হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়। তখন শুদ্ধ মনে দেবতা ইন্দ্রের দর্শন হয়। তখন ঋষির চিদাকাশে সূর্যের উদয় হয়। সত্যের, জ্ঞানের, পূর্ণের দেবতা হইলেন সূর্য। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য বাহিরে অন্তরিক্ষের মত ঋষির অন্তর-আকাশ উদ্ভাসিত করেন। তাহার পর ঋষির অন্তরে বাহিরে জাগে আনন্দের রসধারা। এই রসধারাই সোম৺সোম পানে হয় চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসারতা। এই প্রসারতার দেবতা বরুণ। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বরুণ— "Lord of wideness"। এই বৃহতের সঙ্গে আছেন মাধুর্য ও প্রেমের দেবতা মিত্র। মিত্র-বরুণের উদয়ে হয় সামঞ্জস্য ও সৌমনস্য। ঋষির আত্মযজ্ঞের সাধনাকে ধরিয়া রাখেন পিতার মত স্বর্গ, আর নিম্নে মাতার মত পৃথিবী। তখন ঋষি বলিয়া উঠেন—"দৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।" (ঋ. ১/১৬৪/৩৩)

অপৌরুষেয় যোগীর অন্তরের গভীরতম দেশে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র; এই বেদমন্ত্রকে ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন—

"The high aspiring song of humanity, the lyrical epic of the soul."

ঋগ্বেদ সংহিতা ও সাত্বত সংহিতা

সৎ শব্দে সত্ত্বমূর্তি ভগবান্। তিনি যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা সাত্বত। 'সাত্বত' শব্দের অর্থ ভক্ত। 'সাত্বত সংহিতা' ভাগবতের আর এক নাম। ভাগবত প্রধানতঃ ভক্তদের গ্রন্থ। জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ধ্যান, তপস্যার কথা থাকিলেও ভাগবত মুখ্যতঃ শ্রীভগবানের কথা। ভাগবতে ভগবানের পরিচয় পরিষ্কার— "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। মূলতঃ ভাগবত কৃষ্ণকথাময়। বেদ সংহিতায় এই কৃষ্ণকথা কিছু পাওয়া যায় কিনা বা কতটুকু আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাই আলোচনার বিষয়।

দ্বাদশটি স্কন্ধময় ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ দশম স্কন্ধ। এই দশম স্কন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। এই রাসলীলা পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত। তাঁহার নাম "রাসপঞ্চাধ্যায়"। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা মাধুর্যের লীলা বর্ণিত আছে। এই বর্ণনার শেষ শ্লোকে গ্রন্থের বক্তা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন — এই বিষ্ণুর ক্রীড়া সকল অর্থাৎ লীলা, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন ও বর্ণন করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করেন। তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম বিদূরিত হইয়া যায়।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।"

(ভা. ১০/৩৩/৪০)

এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বিষ্ণুর ক্রীড়া অভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিয়া শুকদেবকে বলিলেন (ভা. ১০/১/২) — "বীষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ"। কৃষ্ণতে ও বিষ্ণুতে কোনও ভেদবুদ্ধি নাই বলিয়াই এই কথা বলিতে পারিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভেদ। বেদ-সংহিতায় বিষ্ণুর কথা অনেক আছে। সুতরাং বেদে কৃষ্ণকথা আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর কোন ভক্তকে শ্রীমুখে বলিয়াছেন —

"গৌণ মুখ্য বৃত্তি বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে।।"

এই কথা পড়িয়া প্রথমে আশ্চর্যান্বিত হই। বেদে কৃষ্ণ কথা কই? কিন্তু আমরা যখন বুঝিলাম কৃষ্ণ আর বিষ্ণু একই, তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। তবে মহাপ্রভু বলিয়াছেন— কেবল কৃষ্ণকথা বলাই বেদের প্রতিজ্ঞা। এই কথাটি কি করিয়া ঠিক হয় তাহা চিন্তার বিষয়।

বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রমুখ বহু দেবতার কথা আছে। তাহা হইলে বেদ শুধু কৃষ্ণকথাই বলিয়াছেন ইহা কি রূপে হয়? বেদ যত দেবতাদেরই নাম করুন, দেবতা যে একজন, তাহা বহু প্রকারে বলিয়াছেন 'একং সৎ', 'একং তৎ', প্রভৃতির মাধ্যমে। 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' এই কথাটিতে জোর দিয়া বলিয়াছেন — সেই একেরই বহু নাম। বিপ্রেরা তাঁহাকে ডাকেন বহু নামে। ইহা খুব দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, একটি সদ্‌বস্তুর তপঃশক্তি ও জ্যোতি অগ্নি। তাঁহার ঐশ্বর্যময় পরাক্রমশক্তি ও রাজোচিত মহিমাই ইন্দ্র। বিশ্ব আবরিকা মহাশক্তি বরুণ। এইরূপ সমস্ত দেবতাগণই পরম সত্তার এক একটি অংশপ্রকাশ। মূল হইলেন বিষ্ণু। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

ঋক্-সংহিতায় বিষ্ণুসূক্তের সংখ্যা খুব কম, মাত্র তিনটি। তদ্ভিন্ন অন্য দেবতার সূক্ত মধ্যে কয়েক স্থানে বিষ্ণু দেবতার কথা দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের দেবতা বিষ্ণু, ঋষি দীর্ঘতমা, ইহাতে মাত্র ছয়টি মন্ত্র। পরবর্তী ১৫৫ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্রের দেবতা বিষ্ণু। ১৫৬ সূক্তের দেবতাও বিষ্ণু। ছয়টি মন্ত্র, ঋষি দীর্ঘতমা। ইহা ছাড়া প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি, দেবতা অশ্বিদ্বয়। এই সূক্তে ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ মন্ত্রে বিষ্ণুর মহিমা আম্নাত হইয়াছে। এই কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

দীর্ঘতমা ঋষি বিষ্ণুর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ঋ. ১/১৫৪/৫ মন্ত্রে —

"তদন্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।"

চেতনার ঊর্ধ্বায়ন ও দিব্য রূপান্তরের প্রতীক হইল মধু। পঞ্চামৃতের চতুর্থ অমৃত মধু। বৈদিক ঋষিদের কাছে এই মধু হইল স্বর্গের পীযূষধারা — "দিবঃ পীযূষমুত্তমম্" "মধুমত্তমম্" (ঋ. ৯/৫১/২)। সমস্ত জ্ঞান ও সাধনার যে ঘনীভূত রূপ, যে অন্তরতম তত্ত্ব, তাহাকে ঋষিরা বলিয়াছেন মধুবিদ্যা। সোম দেবতার প্রসাদ যে অমরত্ব তাঁহাকেই বলা হইয়াছে 'মধু চেতনা'। সাধকের জীবনে এবং তাঁহার সাধনায় এই দিব্য আনন্দ মধুচেতনাই অন্তর্গূঢ় হইয়া রহিয়াছে। বেদে সোমকে বলা হইয়াছে 'মধ্বদ'। উপনিষদে এই 'মধ্বদ' হইলেন জীবের জীবাত্মা। মানুষের অন্তরতম চৈত্যপুরুষ, যিনি মধুস্বাদী পিপ্পলাদ—"য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।", (কঠোপনিষৎ, ২/১/৫) পরম বিষ্ণুকে তাই বলা হইয়াছে,

তিনি "মাধবো মধুঃ" (মহাভারত)।

ঋগ্বেদে ৯/১১৪ সূক্তে ও এই বেদের অন্যত্রও পাই এই সোম, এই মধু চেতনা, এই দিব্য আনন্দেরই আরাধনা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও দিয়াছেন এই মধুবিদ্যার ইঙ্গিত।

"এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু।" "এই ধর্ম সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই ধর্মের মধু।"

এই সত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই সত্যের মধু।।

এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু, এই সর্বভূত মানবজাতির মধু।।"

"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ
পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। ...."
"অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু ....।।
ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু ....।।
ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য
মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু.....।।"

(বৃহদারণ্যক, ২/৫/১, ১১-১৩)

এই দ্যুলোক ও ভূলোকের পরিমণ্ডলে যত দেবগণ তাঁহারা সকলেই দিব্য আনন্দ বহন করিয়া চলেন। সব কিছুকেই মধুময় অমৃতময় করিয়া তুলেন। গোতম ঋষির সেই বিখ্যাত মন্ত্র—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।"

(ঋ. ১/৯০/৬-৮)

"এই বাতাস মধুময়। বিপুল প্রাণের প্রসার যে সিন্ধুনিচয়, ঋতকাম সত্যের সাধকের কাছে মধু ক্ষরণ করে। মধুময় এই শ্যাম বনানী। মধুময় হোক আমাদের রাত্রি ও উষা, এই পার্থিব লোক মধুময়। এই দ্যুলোক আমাদের পিতা, তিনি মধুময়। মধুমান বনস্পতি, মধুমান সূর্য। মধুমতী হোক যত ধেনু। অর্থাৎ আমাদের চেতনা অমৃতময় হোক।"

"ঋষির প্রার্থনায় এই যে বাতাস, সিন্ধু, বনস্পতি, সূর্য, পৃথিবী, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরেও, একই সঙ্গে অধিভূত ও অধ্যাত্ম।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৯৩)

বেদে ইন্দ্র দেবরাজ। বেদে ইন্দ্রের সূক্ত সবচেয়ে বেশী। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেন্দ্র, গোকুলের রাজা। বৈদিক সমর-দেবতা ইন্দ্রের বীরত্ব, কৃষ্ণের গোকুলের প্রথম জীবনের সঙ্গে মিলিয়াছে। সংহিতায় অসুর বধের জন্য ইন্দ্র যে'রূপ বিখ্যাত, গোকুলে কৃষ্ণ সেইরূপ অঘাসুর বকাসুর বধ

করিয়া বিখ্যাত। ইন্দ্র বধ করিয়াছেন বৃত্রকে, কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন শম্বরাসুরকে। ইন্দ্র কালোপম দৈত্যকে বিনাশ করিয়া সত্য-সুন্দর গতি মুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিয়া যমুনার জল পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রের স্বরূপটি মিলিয়া গিয়াছে কৃষ্ণের প্রথম জীবনের সঙ্গে। ইন্দ্র বিষ্ণু একই। তাই বৈষ্ণবেরা বলেন—

"বিষ্ণুদ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুর সংহার।"

অতএব কংস শিশুপাল বধের ক্ষেত্রে বিষ্ণুই সেই ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

বেদে নববিধা ভক্তির প্রসঙ্গ

এই সাত্বত-সংহিতায় বা ভাগবতে বিষ্ণুর ভজন পথ নববিধা ভক্তি। এই নববিধ পথ সকল বৈষ্ণবেরাই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নববিধ ভজন সম্বন্ধে ভাগবতের বিখ্যাত উক্তি —

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।" (ভাঃ, ৭/৫/২৩)

শ্লোকটি প্রহ্লাদের উক্তি। শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন — "পাদসেবনং পরিচর্যা, অর্চনং পূজা, দাস্যং কর্মার্পণম্ সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি, আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণম্ যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সম্পৎ তচ্চিন্তাবর্জনমিত্যর্থঃ।" ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বৈষ্ণবের প্রাণধন এই নব-লক্ষণাত্মিকা ভক্তির কথা জগতে ঘোষণা করিলেন ও নিজ পিতাকে বলিলেন, "শ্রীহরির নাম রূপ গুণ লীলা মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ, শ্রীহরির নামকীর্তন, তাঁহার নাম স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্যভাব এবং শ্রীভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন — এই নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্বিষয়িনী চেষ্টার নামই ভক্তি।" ভাগবতীয় ভক্তির সম্বন্ধে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন দ্বিমত নাই। মতভেদ না থাকার কারণ কি? কারণ, এই নববিধা ভক্তির প্রত্যেকটি বেদোক্ত, বেদ-সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

ভক্তি শব্দটি 'ভজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "ভক্তম্-অভক্তম অবঃ" (ঋ. ১/১২৭/৫) সায়ণভাষ্য— "অগ্নয়ঃ ভক্তম্ সেবমানম্ অভক্তম্ অসেবমানং চ রক্ষন্তি।" বেদে 'ভক্তয়ে' শব্দ আছে (ঋ. ৮/২৭/১১)। ভক্তিশব্দ ৪র্থীর ১বচনে, অর্থাৎ ভক্তির জন্য এই অর্থে। বেদে 'পূজনম্' শব্দও আছে ('সাথী পূজনম্,' ঋ. ৮/১৭/১২)। দীর্ঘতমা ঋষি ঋ. ১/১৫৬/৩ মন্ত্রে বলিতেছেন — "মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।" "হে বিষ্ণু, তুমি মহানুভব। তোমার সুমতি আমরা ভজন করি।" অর্থাৎ, তোমার সুমতি লাভার্থ তোমাকে ভজনা করি।

কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋষি ঋ. ৫/৪৪/১২ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "যদীং গণং ভজতে সুপ্রযাবভিঃ।" পঞ্চ ঋষি সুমিশ্রিত হব্য ও স্তোত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণকে ভজনা করেন।

বিবস্বানের পুত্র মনু ঋষি ঋ. ৮/২৭/১১ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"ইদা হি ব উপস্তুতিমিদা বামস্য ভক্তয়ে।"

"হে বিশ্বদেবগণ! নমঃ দ্বারা পুণ্যকারী আমি এখনই তোমাদের ভক্তি করিবার জন্য স্তব করিব।"

দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি ঋ. ১/১২৭/৫ মন্ত্রের শেষে ভক্ত ও অভক্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন —

"ভক্তমভক্তমবো ব্যন্তো অজরা অগ্নয়ো ব্যন্তো অজরাঃ।।"

অর্থাৎ, "অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝিয়া উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করিয়া অজর হয়েন।"

ভক্তির প্রথম অবস্থার নাম 'শ্রদ্ধা'। 'আদৌ শ্রদ্ধা'। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার কথা বেদে অনেকবার পাওয়া যায়।

বামদেব ঋষি অগ্নিসূক্তে বলেন (ঋ. ৪/১/৭), অগ্নিদেব দেন আধ্যাত্মিক রত্ন ঐশ্বর্যাদি, কৃষ্ণভক্তদের দেন আয়ু ও যৌবন। দ্যুভক্তকে দেন ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। বেদে পৃথক একটি শ্রদ্ধা সূক্তই আছে (ঋ. ১০/১৫১)। সেখানে শ্রদ্ধা দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি ঋ. ১/৫৫/৫ মন্ত্রে ইন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা করার কথা বলিয়াছেন 'শ্রদ্দধাতি' এই ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিয়া। শ্রদ্ধা অর্থ যাস্ক বলেন — সত্যে যাঁহার প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত সত্য দিয়া যাহা গড়া, তাহাই শ্রদ্ধা। "শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা-নাৎ। তস্যা এষা ভবতি" (নিরুক্ত, ৯/৩০)। 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ সত্য — সত্য শ্রদ্ধায় নিহিত আছে। শাস্ত্রে যে অবিচলিত বুদ্ধি, তাহারই অধিদেবতা শ্রদ্ধা। শ্রৎ ধাতুর অর্থ অন্যভাবে আশ্রয়, বিরাম ও বিশ্রাম। পরম সত্যে যাহার স্থিতি, পরম সত্যে যাহার বিশ্রাম, তাহাই শ্রদ্ধা। ঋষিরা বলিয়াছেন — "শ্রদ্ধয়া সত্যমশ্নুতে"। শ্রদ্ধা দ্বারাই সত্য পাওয়া যায়। "শ্রদ্ধয়া দেবো দেবত্বমশ্নুতে।" শ্রদ্ধা দ্বারাই দেব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধা ও সত্য একটি উত্তম মিথুন। যে এই মিথুন দ্বারা মানসে অগ্নিহোত্র করেন, তিনি স্বর্গলোক জয় করেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭/১০) শ্রদ্ধার মত আর একটি শব্দ আছে 'অদ্ধা'। এই শব্দ বেদসংহিতায় আছে, ভাগবতে আছে। ভাগবতে অদ্ধাকে ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৩৩শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ভক্তি দ্বারা ভগবানে অদ্ধা বা রতি লাভ হয়। অদ্ধা অর্থ পরাভক্তি।

ঋগ্বেদে উক্ত ১০/১৫১ সূক্তে দেবতাও শ্রদ্ধা, ঋষিও শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা এই সূক্তে আছে।

"শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ"। (ঋ. ১০/১৫১/৫)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন — শ্রদ্ধা বেদান্তের মহামন্ত্র।

ভাগবত শাস্ত্রে নববিধা ভক্তির উৎসও যে ঋক্-সংহিতা, তাহা দেখানো যাইতেছে—

(১) শ্রবণ—শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা বেদের নাম হইতে ব্যক্ত। বেদের অপর নাম শ্রুতি। পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রতি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিখ্যাত উক্তি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্।।" (বৃহ. উপ. ৪/৫/৬)

(২) কীর্তন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি —

"সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।" ৯/১৪

সংযতেন্দ্রিয় দৃঢ়ব্রত সাধকগণ অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক আমার (ভগবানের) নাম, নমস্কারাদি উপাসনা করেন।

মন্ত্রসমূহে অনেক স্তুতি আছে। এই স্তুতিগুলিই কীর্তনীয়।

অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি বলিয়াছেন ঋ. ১/৫১/১৩ মন্ত্রে —

"বিশ্বেৎ তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা।"

ইন্দ্রের সমস্ত গুণ কর্ম আমরা এই যজ্ঞে প্রকৃষ্ট রূপে কীর্তন করিব।

ভাগবত শাস্ত্রে কীর্তন করাকে 'গৃণন্' বলা হইয়াছে।

যাস্ক বলেন — 'গৃণাতেঃ স্তুতিকর্মণঃ'। ইহাতেও বুঝা যায় স্তুতি করাই কীর্তন করা।

দীর্ঘতমা ঋষি ঋ. ১/১৫৪/৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন— শ্রীবিষ্ণুর পদে মধুর উৎস আছে। যাঁহারা তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাকথা কীর্তন করিয়া আনন্দ-পূর্ণ হয়েন, ইহকালে পরকালে তাঁহারা আনন্দপূর্ণ থাকেন। তিনি ভক্তের বন্ধু।

'গৃ' ধাতুর প্রয়োগ নানাস্থানে বেদে দৃষ্ট হয়।

(৩) স্মরণ — ঠিক "স্মরণ" শব্দটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে (১/১২/১) যে, "ভগবান্ রুদ্র স্মর্যাতে ন দৃশ্যতে"। অর্থাৎ, "মনুষ্য তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে, চোখে দেখিতে সমর্থ নহে।" ভগবান্ গীতায় স্মরণাঙ্গের কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

(৪) পাদসেবন — ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৯ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে দৃষ্ট হয়, ভরদ্বাজ ঋষি কর্তৃক ইন্দ্রের পাদসেবনের কথা। ঋষি স্বয়ং বলিতেছেন ইন্দ্রকে — "শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষুর্ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান্।"

— "হে ইন্দ্র! ঐশ্বর্য লাভার্থে ভরদ্বাজ তোমার পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করছেন।"

(৫) অর্চন — দেবতার অর্চনার কথা বেদে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। সব্য আঙ্গিরস ঋষি ইন্দ্রকে অর্চনা করিতে বারবার উপদেশ দিয়াছেন।

"ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চত।" (ঋ. ১/৫১/১)

— ভোগার্থ, মেধাবী ইন্দ্রকে অর্চনা কর।'

"অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে"। (ঋ. ১/৫৪/২)

— শক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান্ ইন্দ্রকে অর্চনা কর।

কণ্ব গোত্রের মেধাতিথি ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্রকে গায়ত্রী দ্বারা অর্চনা কর— "প্রাস্মৈ গায়ত্রমর্চত"।

নিঘণ্টু মতে অর্চতি, গায়তি, গৃণাতি, স্তৌতি, রৌতি, পূজয়তি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ 'অর্চতি কর্মাণঃ'। এই সব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংহিতায় বহুল দৃষ্ট হয়।

৬। বন্দন — দেবতাকে বন্দনা করার বিষয়ও বেদে পাওয়া যায়। এইজন্য দেবতাকে বন্দ্য, বন্দ্যাস, আর বন্দনাকারীকে বন্দারু, বন্দ্যমান ও বন্দিতা বলা হয়।

উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ঋ.১/১৪/২ মন্ত্রে বলিয়াছেন — হে অগ্নি! কেহ কেহ তোমাকে হিংসা করে। কেহ কেহ স্তুতি করে। আমি তোমার বন্দারু। তোমার রূপকে বন্দনা করি। "বন্দারু স্তে তন্বং বন্দে অগ্নে।"

কণ্ব ঋষি ঋ. ১/৩৮/১৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "বন্দস্ব মারুতং গণং" — মরুদ্‌গণকে বন্দনা কর।

পাণিনি মতে "বদি অভিবাদন-স্তুত্যোঃ"। বন্দনা পদে অভিবাদন ও স্তুতি দুইই বুঝায়। অভিবাদন অর্থ নম্রতা পূর্বক নমস্কার। উভয় অর্থেই সংহিতায় বন্দনা করা পদ পাওয়া যায়।

মহর্ষি বসিষ্ঠ বরুণদেবকে বলিতেছেন, ঋ. ৭/৮৬/৭ মন্ত্রে —

"অরং দাসো ন মীড়্হুষে"।

— নিষ্পাপ হইয়া আমি কামসমূহের রচয়িতা বরুণদেবকে পরিচর্যা করিব, যেমন দাস প্রভুকে করে।

(৭) দাস্য — দাস্য ভক্তির কথা ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে পাই। মন্ত্রের দ্রষ্টা বসিষ্ঠ ঋষি — দেবতা বরুণ।

"অরং দাসো ন মীড়্হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ।

অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি।।"

অর্থাৎ, "অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্যাপ্তরূপে পরিচর্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আচার্যদেব আমাদের জ্ঞানদান করুন। প্রাজ্ঞতর দেব স্তোত্রকে ধনার্থে প্রেরণ করুন।"

(৮) সখ্য — দেবতা দূরে নহেন, উপাসকের অতি নিকটে।

দেবতার সঙ্গে ঋষির মুখ্য সম্বন্ধ সখ্যের। সখ্যের সুন্দর একটি চিত্র আছে আঙ্গিরসের একটি সূক্তে। ঋষি বলিতেছেন — "হে অগ্নি! তোমার সখ্যে আমরা যেন শত্রুহীন হইতে পারি।" "অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

১ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের এক হইতে ১০টি মন্ত্রে ঐ একটি ধ্রুবপদ।

তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না। দেবতার সঙ্গে যে মানুষের সখ্য-সম্বন্ধ তাহা ব্যক্তিগত। দেব সম্পর্কে এই ধারা ক্রমশঃ গভীর হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম ভাবনা ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিদৈবত ভাবনা বিশ্বগত। বিশ্বভাবনায় অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অধিদৈবতদৃষ্টি একত্রে একসঙ্গে চলে। বেদমন্ত্রে দেখা যায় ব্যক্তিকে ছাপাইয়া বিশ্ব বড় হইয়া উঠিয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্র জপ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই শেষ পাদে মম (আমার) না হইয়া 'নঃ' (অস্মাকং আমাদের) উক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত সখ্য ভাবের মন্ত্রে অহং না হইয়া বয়ং হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অগণিত। আমি সবিতার বরণীয় ভর্গকে ধ্যান করি। একা আমার জন্য নহে, সকলের জন্য আমি। আমি তখন বিশ্ববাসী, সকল মানুষের প্রতিভূ। দেবতাদের আবাহন করিয়া ঋষি যেন বলেন, "তুমি আমার, তুমি সারা বিশ্বের অন্তর্যামী। তুমি বিশ্বে আছ, থাক। আমি চাই তোমাকে। বিশ্ব হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান থাক।"

(৯) আত্মনিবেদন — আত্মনিবেদন অর্থ শরণাগতি গ্রহণ। ইহার আভাসও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। গর্গ, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহু উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা।।"

"হে ইন্দ্র, আমরা তোমার দর্শনীয় বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকিব।" ইন্দ্রের বরেণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকা অর্থ হইল, তাঁহাকে আত্মনিবেদন করা। (ঋ. ৬/৪৭/৮)

কেবল নববিধা ভক্তির কথাই নহে, ভাগবতের পঞ্চবিধ রসের প্রসঙ্গও বেদে দৃষ্ট হয়।

বেদে পঞ্চরসের আভাস

ঋগ্বেদের প্রথমে অগ্নিসূক্তের নবম বা শেষ মন্ত্রে মধুচ্ছন্দা ঋষি অগ্নিদেবকে বলিতেছেন — "হে দেব! আমাদের মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের নিকট বাস কর। কিভাবে? — পিতা-পুত্র পরস্পর যেমন অনায়াস লব্ধ সেইভাবে।" এই পারিবারিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর। এই সম্পর্কেই ভালবাসা হয়। সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হইলেই সেই ভালবাসাকে বলে রতি। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি— এই পাঁচ

রতির কথা বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

চিত্তে রতি জন্মিলেই রসের আস্বাদন হয়। অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে, বেদে শুধু যাগযজ্ঞের কথা আছে আর আছে শুষ্ক জ্ঞানের কথা। বেদের সংহিতা পাঠ করিলেই এই ধারণা দূর হইয়া যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, প্রত্যেক ভাবেরই প্রসঙ্গ বীজাকারে বেদশাস্ত্রে বিদ্যমান আছে।

দাস্যরতি — মহর্ষি বসিষ্ঠ, ইন্দ্র ও বরুণকে বলিতেছেন — "অরং দাসো ন মীড়্হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ।" (ঋ. ৭/৮৬/৭) আমি নিষ্পাপ হইয়া জগতের নেতা ও কামনা সমূহের বর্ষয়িতা বরুণদেবকে পর্যাপ্ত (পরিব্যাপ্ত) করিব, যেমন দাস তাহার প্রভুকে করে।

কোথাও একটি ভাব, কোথাও একাধিক ভাব। ত্রিত ঋষি অগ্নিদেবকে বলিতেছেন ঋ. ১০/৭/৩ মন্ত্রে — অগ্নিকে পিতা ও পরমাত্মীয় মনে করি। অগ্নি ভ্রাতা ও চিরকালের বন্ধু। শ্রীঅমলেশ 'মর্ত্যেষু অমৃত' গ্রন্থে বলেন — "রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।" (ঋ. ৪/১/৩) আমোদিত হয়ে আমাদের দুঃখ নাশ করে' (দস্ম) আমোদিত কর। 'রং' হল অগ্নির বীজমন্ত্র। তারই মধ্যে আনন্দ। 'রংহ্য' আনন্দ ধারা। একই শব্দের মধ্যে অগ্নি এবং সোম। এইভাবে বামদেবের বাক্‌রীতির মধ্যে শব্দের বহু ব্যঞ্জনা। বন্ধুর মত আমোদিত হয়ে তুমি এস, আমাদের দুঃখ ব্যথা দূর কর (দস্ম), আমাদের আমোদিত কর। এ যেন প্রিয় বন্ধু হাসতে হাসতে আমাদের চোখের জল মুছিয়ে আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। বামদেবের কাছে অগ্নি প্রিয় সখার মত — "সখে সখায়মভ্য আ ববৃৎসু আশুং ন"(ঋ. ৪/১/৩)

বন্ধু তুমি, বন্ধুর কাছে শীঘ্র এসে তাকে জড়িয়ে ধর (ববৃৎসু)। আমাদের দুঃখ দূর করে সুখবিধান কর (শম্ কৃধি অস্মভ্যং দস্ম শং কৃধি — ঋ. ৪/১/৩)। এই কবিত্বের তুলনা হয় না। তাঁর কাছে দেবতা অগ্নি যে মানুষের মতই বন্ধু (নৃবৎসখা — ঋ. ৪/২/৫), তিনি স্নেহশীল প্রেমপূর্ণ (সিম্বিদানঃ — ঋ. ৪/২/৬) হয়ে আমাদের প্রতিপালন করেন (জভরৎ — ঋ. ৪/২/৬)।" (পৃ. ২৪) ইহা বৈদিক বাঙ্ময়ে সুব্যক্ত।

বেদমন্ত্রে সখ্য রসের কথাই অধিক। শ্রীঅনির্বাণ বলেন — "সখ্য রতিই হইল মূলভাব, তাহা হইতে অন্যান্য ভাবের বিস্তার। বৈষ্ণবের ভাষায়, 'ভাটায় দাস্য, উজানে বাৎসল্য আর গভীরে মাধুর্য।"

বেদে যে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রধান তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত — "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" (মুণ্ডক উপ. ৩/১/১)

একই বৃক্ষে দুইটি সোনার পাখী। তাহাদের সম্বন্ধ সখ্য। ইহার অনুবাদ, শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী রচিত একটি গানে —

"জীবাত্মা পরমাত্মা দুটি সোনার পাখী মুখোমুখী।
আনন্দে অমৃত ফল একে খায় আনে দেখি সুখী।।"

অনেক ঋষিই উপাস্যকে সখা মনে করিতেন। বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি. ঋ. ৬/৪৫/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা।।"
"সেই যুবা ইন্দ্র আমাদের সখা।"

আবার ঋ. ৬/৪৫/৭ মন্ত্রে বলিতেছেন, "সখায়মৃগ্মিয়ম্। গাং ন দোহসে হুবে।।" সখা অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি দোহনার্থ গাভীকে যেমন গোপালক আহ্বান করে। কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি ঋ. ৮/৪৫/১ মন্ত্রে বালয়াছেন —

"যেযামিন্দ্রো যুবা সখা" — সেই যুবা ইন্দ্র আমাদের সখা।

অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে ধ্রুব পদের মত বলিতেছেন — "মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে।"

ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

গৃৎসমদ ঋষি ঋ. ২/১৮/৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন— "ন ম ইন্দ্রেণ সখ্যং বি যোষৎ"।

— তাঁহার ঋযি আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন. ইন্দ্রের সহিত সখ্য যেন কখনও না যায়, যেন সততই থাকে।

দেবাতিথি ঋষি ঋ. ৮/৪/৭ মন্ত্রে বলিতেছেন - "মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।" তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। সেই কারণেই বোধ হয় ঋষিরা, সতত ইন্দ্রের সখ্য বর্তমান থাকুক এই আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

ঋষি আঙ্গিরস কুৎস রচিত প্রথম মণ্ডলের একটি উপমণ্ডল ৯৪ হইতে ১১৫ সংখ্যক সূক্ত —

"সুভদ্র হও আমাদের প্রবুদ্ধ মননের সঙ্গমে। হে অগ্নি! তোমার সখ্যে আমরা যেন আবিষ্ট হতে পারি। যাঁহার জন্য তুমি যজন কর, সে হয় সিদ্ধ অজাতশত্রু। সে বাঁচে শান্তিতে। সুবীর্যের নিধান। সে উপচে পড়ছে; তাঁহাকে ছাইতে পারে না ক্লিষ্টতা। হে অগ্নি, তোমার সখ্যে আমরা যেন আবিষ্ট হই। তোমার বন্ধুত্বে আমরা হিংসিত হব না।"

"হে অগ্নি, যাঁহার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। সে উৎপীড়িত না হইয়া বাস করে, মহাবীর্য ধারণ করিয়া বর্ধিত হয় এবং দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমরা যেন পারি তোমায় সমিদ্ধ করিতে। তাহার জন্য সিদ্ধ কর আমাদের ধ্যানচিত্ততা। তোমার মধ্যে আহুত হবিকে সম্ভোগ করেন দেবতারা। তুমি সেই আদিত্য দেবকে বহিয়া আন। আমরা যে উতলা তাঁদের তরে। হে অগ্নি। তোমার সখ্যে আমরা

যেন অরিষ্টনেমি হইতে পারি" (বেদ-মীমাংসা,' পৃ. ৩৯০)।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তিন রস লইয়া ভাগবতীয় রসের লীলা। ভগবানের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ ঘটে এই তিন রসে। ভাগবত পাঁচটি রসের কথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ তিনটি রসের আস্বাদন হয়। শান্ত ও দাস্য রসে রসাস্বাদন হয় না। কারণ, শান্তরসে কোন সম্বন্ধ হয় না, তুমি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, এই মাত্র সম্বন্ধে রস হয় না। স্রষ্টা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে এত দূরত্ব যে, তাহাদের সম্ভ্রম বুদ্ধি এত প্রবল যে, প্রীতিময় রসের উদয় হয় না।

দাস্যরসে তুমি প্রভু, আমি দাস — এই সম্পর্কও সম্ভ্রমযুক্ত, নৈকট্যের অভাব। পায়ের তলায় বসিয়া পাদুকা পরানো যায় মাত্র; কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া ধরা যায় না, এবং তাহা না হইলে রস জীবন্ত হয় না। স্নেহপ্রীতিতে জীবন মন দ্রবীভূত হইলে রসের আস্বাদন হয়। এই আস্বাদন হয় তিনটি রসে। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে রস অনুভববেদ্য হয়। রস থাকিলেই অনুভববেদ্য হয় না। ইক্ষুদণ্ডে রস আছে, কিন্তু ইক্ষুদণ্ডের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইলে রস আস্বাদিত হয় না। ইক্ষুর উপরের শক্ত ত্বক্‌টি ফেলিয়া দিয়া মুখে পুরিয়া দন্ত দ্বারা চর্বণ করিলেই রস আস্বাদ্যমান হয়।

সখ্য রসে সম্পর্কটি গাঢ় হয়। অভিন্নমনন হয়। অভিন্নমনন অর্থ ভেদশূন্যতা। তুমি আমি একই, তুমি বড়ও নহ, ছোটও নহ। তুমি আমি সমান। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখারা কৃষ্ণকে বলিতেছেন— "তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম।" এই মমত্ববুদ্ধি বা অভিন্ন-মনন শান্তরস বা দাস্যরসে হয় না, সখ্য ও মধুরেই হয়।

অগ্নির এই তিন রস-সম্বন্ধের কথা বৈদিক আম্নায়েও দৃষ্ট হয়। সখ্য রসের কথা কুৎস ঋষি কথিত ১/৯৪ সূক্তের ১৪টি মন্ত্রের শেষেই গানের ধ্রুবপদের মত পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।

"অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।"

গৃৎসমদ ঋষি দ্বিতীয় মণ্ডলের ১/৯ মন্ত্রে বলিতেছেন —

"ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেহবিধত্ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ।।"

"হে অগ্নি ! লোকে যজ্ঞ দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাদের শরীর দীপ্ত করে দাও। যে তোমার পরিচর্যা করে তুমি তার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হয়ে পালন কর।"

মধুর রসের সম্বন্ধের কথা বহু স্থানে ঋঙ্‌মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঋ.৮/৯১ সূক্তের ঋষি অপালা। অপালা মহর্ষি অত্রির কন্যা। অপালা দুষ্ট

চর্মরোগগ্রস্তা হয়েন। শেষে পতিপরিত্যক্তা যুবতী অপালা আপন বধূ-হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়া ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলেন। পিতার আশ্রমে সাংসারিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের ভক্তিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার অনুরাগী হয়েন। অপালার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

একদিন অপালা জল আহরণার্থ কলসী লইয়া সুন্দর জলাশয়ের তীরে গমন করেন। মুগ্ধ প্রিয়তম ইন্দ্রকে সোমলতার রস দ্বারা আপ্যায়িত করেন। ইন্দ্র অপালার মুখ হইতে সোমরস পান করেন। অনন্তর ইন্দ্রের ইচ্ছায় অপালার অঙ্গের দুষ্ট চর্মরোগ দূরীভূত হইল ও তিনি অনবদ্যাঙ্গী হইলেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তে ৪র্থ মন্ত্রে ঋষি অপালার উক্তি —

"কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করৎ কুবিন্নো বস্যসস্করৎ।
কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ।।"

"হে ইন্দ্র, বহুবার আমাদের সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদের বহুসংখ্যক করুন। তিনি আমাদের অনেকবার ধনবান্ করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এখানে এসেছি, আমরা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হব।"

"অসৌ য এষি বীরকো গৃহংগৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্‌থিনম্।।"
(ঋ. ৮/৯১/২)

ইন্দ্র তাঁহার দন্ত দ্বারা অভিষুত সোমপান করিয়া তাঁহাকে নিজ পথে আকর্ষণ করিয়া সকল দোষ অপনয়ন করিলেন।

হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যূপের ছিদ্রে তিনবার, নিষ্কর্ষণ দ্বারা শোধন করিয়া অপালাকে সূর্যসমান চর্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে।

ইন্দ্র অপালার মুখ হইতে সোমরস পান করিয়াছিলেন, ইহা কান্তা রসের একটি উৎকৃষ্ট রূপ।

বৈষ্ণব ভজনের বিধিমার্গ ও রাগমার্গ দুইটি পথ। এই উভয় মার্গই বিবিধা ভক্তির পথের প্রকৃষ্ট সাধন। রাগমার্গীয় ভজনের কথা প্রধানতঃ গৌড়ীয় দার্শনিকগণেরই দান। ইহার উৎস অবশ্যই ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণের আসল কাজটি কি?

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আসল কাজটি কি? গৌড়ীয় দার্শনিকেরা বলেন, নররূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কাজটি হইল রসাস্বাদন।

"প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।"

— চৈতন্যচরিতামৃত

তাঁহার নিজের ভিতরে যে অনন্ত রস আছে তাহা নিজে নিজে অনুভব করা যায় না। নিজের রসস্বরূপতা বুঝাইবার জন্য আরও একটি সত্তার প্রয়োজন। সেই রস-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ব্রজের রমণীদের মধ্যে। আর রসিকশেখররূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই রস-সত্তা আস্বাদনের জন্য।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দার্শনিকেরা তাঁহাদের বিচার আরম্ভ করিয়াছেন উপনিষদের বাক্য হইতে। "রসো বৈ সঃ"—এই সব কথা তো আছেই, রসিকজনেরা যুক্তি দিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া বলেন — পরমপুরুষ তাঁহার জ্যোতির্লোকে একা একা বসিয়া আর সুখ পাইতেছিলেন না। কারণ, একা একা কি সুখ পাওয়া যায়? "স বৈ নৈব রেমে, যস্মাদ্ একাকী ন রমতে।" তিনি তাই আপন স্বরূপস্থিত রস আস্বাদন করিতে দুই হইলেন, স্বামী হইলেন, স্ত্রী হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বামী-স্ত্রী এই দ্বৈত রসাস্বাদনের ভূমিকাও ম্লান হইয়া গিয়াছে। দার্শনিকেরা বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের মধ্যে যে বৈধতা আছে, যে নিয়ম আছে, এক-পত্নীকতার মধ্যে যে ব্রত আছে, তাহা কখনও পরম-ঈশ্বরকে তৃপ্ত করিতে পারে না। সেই প্রেমে যে তৃপ্তি, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র-অবতারেই। অতএব চরম রসাস্বাদনের জন্য চাই পরম প্রেম, যে প্রেমের মধ্যে সতত বার্যমাণতা আছে, যে প্রেম সমস্ত সামাজিক শৃঙ্খল, বাধা নিয়ম অতিক্রম করিয়া পরম-কান্তের দিকে ধাবিত হয়, সেই প্রেম আস্বাদনের উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যভূমিতে অবতরণ ঘটিয়াছে। তাঁহাকে প্রাণকান্তরূপে লাভ করিতে যে প্রতিপদে অশেষ প্রকার বাধা এই বাধার বিদ্যমানতাকে বলা হয় বার্যমানতা। পরিবারিক বাধা, সামাজিক বাধা, লৌকিক বাধা ও শাস্ত্রীয় বাধা ইত্যাদি বার্যমানতা হেতু অনুরাগের নিবিড়তা বর্ধিত হয়।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণতে ও বিষ্ণুতে কিছু ভেদ করা হইয়াছে। সে কথা পরে বলিব। কিছু ভেদ হওয়া সত্ত্বেও নিখিল বৈষ্ণবগণ নিজেদের বৈষ্ণব নাম ত্যাগ করেন নাই। বৈষ্ণব শব্দটি বিষ্ণু হইতে আসিয়াছে। যাঁহারা ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণ শব্দ অবলম্বনে কোন নামকরণ করেন নাই।

বিষ্ণু ইন্দ্র একই। একথা বহু বৈদিক সূক্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম উপেন্দ্র। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সংগে ইন্দ্রের একটা দ্বন্দ্বের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরির পূজা প্রবর্তন করেন। ইহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজবাসীর উপর প্রবল ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতরূপ

আঘাত করিয়া ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ বা যুদ্ধ করেন নাই। শুধু তাঁহার প্রবল আক্রমণকে গোবর্দ্ধন দ্বারা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও অক্ষমতাবশত ইন্দ্র রণে ভঙ্গ দেন ও নিজের অপরাধ বুঝিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলি সংকেতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূজা বন্ধ করার জন্য ইন্দ্রের ক্রোধ হওয়া উচিত একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি। নির্দোষ ব্রজবাসী নরনারী ও গাভী বৎসগণ কোন অন্যায় করেন নাই। তাঁহাদের উপর অত্যাচার করা নিতান্ত অন্যায়। ইন্দ্র দেবরাজ, তাঁহার হাতে অনেক শক্তি ন্যস্ত আছে। সেই শক্তিগুলিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার কোন অধিকার তাঁহার নাই। যেরূপ ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ইন্দ্র করিয়াছেন তাহা প্রলয়কালের উপযুক্ত। ব্রজবাসীদের শাসিত করার জন্য কোনক্রমেই ঐসব অস্ত্রসম্ভার প্রয়োগ উচিত হয় নাই ইন্দ্রের। ইন্দ্র তাঁহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া গোমাতা সুরভির সহিত একত্রে আসিয়া কৃষ্ণের অভিষেক করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই একটি ঘটনা ছাড়া ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের কোন দ্বন্দ্বের সংবাদ নাই। দুইয়ে সম্পূর্ণ মিলন হইয়া গেল। ইন্দ্রই বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণ এই বিষ্ণুশক্তির দ্বারা সমস্ত অশুভনাশক কার্য করিয়াছেন।

মহাভারতের ব্যাসকূটের মত শ্রীল কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতেও ব্যাসকূট আছে। তাহার মধ্যে একটি —

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর।।" (মধ্য, ৮/২০১)

এই শ্লোকে 'আদি' শব্দটি ব্যাসকূট। কারণ, শ্রীবৃন্দাবনে রসিকশেখর কৃষ্ণ। তিনি শান্তরসের অথবা দাস্যরসের গোচর নহেন। দাস্যের পর সখ্যরস, তাহার পর বাৎসল্য, এই সকল রসেরও গোচর নহেন। বাৎসল্যের পর মধুর। সেই মধুর রসের গোচরও তিনি নহেন। তাহা হইলে তিনি কাহার গোচর? 'আদি' শব্দের মধ্যে এই রহস্য গুপ্ত আছে। মধুর রস দুই প্রকার— স্বকীয়া মধুর ও পরকীয়া মধুর। রামায়ণের সীতা, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ও দ্বারকার অষ্ট মহিষী— ইঁহাদের সকলেরই স্বকীয়া মধুর ভাব। কারণ, ইঁহারা স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা। লক্ষ্মী বিবাহিতা না হইলেও নিত্যকালই কৃষ্ণের পত্নীরূপে বিরাজিতা। পরকীয়া রস বলিতে ব্রজগোপীগণের ভালবাসাই বুঝায়। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ইহাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীত। শ্রীকৃষ্ণই এই মধুর রতির বিষয়াবলম্বন।

এই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন কথার আভাস বা ইঙ্গিত ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় কিনা ইহা অনুসন্ধেয়। এই কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য একটি শব্দ

লইয়া। সেই শব্দটি হইল 'জার'। রসিকশেখর কৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের পতি নহেন, তিনি উপপতি। উপপতি শব্দটি একটু ভদ্র, কিন্তু 'জার' শব্দটি ভদ্রজনোচিত নহে। ইহা অশ্লীল শব্দতুল্য; সাহিত্যে পরিত্যক্ত। কিন্তু এমন সুপবিত্র গ্রন্থ ভাগবতে এই শব্দটি আছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে। জার হইতে জারজ শব্দটি আসিয়াছে। এই শব্দটি কোনও প্রকারে ব্যবহার চলে। কিন্তু জারজ শব্দটি যে জার হইতে আসিয়াছে তাহা অনেকেই জানে না। ভদ্র ভাষায় ইহাকে অবৈধ-সন্তান বলে। এই অসুন্দর ও সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় জার শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে —

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।।" (ভা. ১০/২৯/১১)

এই শব্দটি অন্য শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে আছে —

"অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূন্
প্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ।" (ঋ. ৯/৯৬/২৩)

একবার নহে, এইরূপ কয়েকবার জার শব্দ নবম মণ্ডলে উচ্চারিত হইয়াছে। এই ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

"অভি গাবো অনূষত যোষা জারমিব প্রিয়ম্।" (ঋ. ৯/৩২/৫)

নবম মণ্ডলটি সোম সম্বন্ধে। সোম সম্বন্ধে অগণিত কথা। কথাগুলির মুখোশ মাত্র দেখা যায়। অন্তরের কথা গুহাহিত। পবমান সোম পরম দেবতা। সোমের অব্যক্ত স্বরূপ জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণ। ইনি সোমলোকের সত্য পুরুষ। ইনি নিত্যলোকের পুরুষ।

পূর্ণতম এই সোম্যপুরুষকে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। তাহার মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতির ভেদাভেদ অন্বিত। এক তৈলে দুইটি শিখার মত। এক বৃন্তে দুইটি পুষ্পের মত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "ন সো রমণ, না হাম রমণী।" ভক্ত সাধক দেখেন ধ্যাননেত্রে, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত আছে কিনা।

বিষ্ণুর পরমপদ মধুর উৎস একথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সংহিতায় সূর্য ও সোমের অভিন্নতা দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেকে 'রসাত্মক সোম' বলিয়াছেন।

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।"

সোম পুরুষ-চন্দ্র, পুরুস্পৃহ। সোমের রূপ সকলের স্পৃহনীয়। ঋষি খুব আদর করিয়া সোমকে বলিয়াছেন— 'হরিশ্চন্দ্র' (ঋ. ৯/৬৬/২৫-২৬)।

"পবমানস্য জঙ্‌ঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত"।

"পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্‌গণঃ।।"

'হরিশ্চন্দ্র' অর্থ বাংলায় 'সোনার-চাঁদ'। চাঁদে কেবল আলোর স্নিগ্ধতা ও সুশীতলতা মাত্র নহে, চন্দ্রে আছে আনন্দের উৎস। কবি কালিদাস বলিয়াছেন — 'প্রহ্লাদনাৎ চন্দ্রঃ'। চিদাকাশের পূর্ণচন্দ্রকে সবাই চায়। বৈষ্ণব মহাজনের পদ শুনুন —

"জলদ পরম কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাই সয়।।"

সোম ভাগবতের অমৃত ধারার প্রতীক, ভাগবতে অমৃতঘন মূর্তিই শ্রীকৃষ্ণ।

ঋষি তাঁহাকে আদরের ধন বলিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন ? কারণ, তিনি প্রয়স্বান্। প্রয়সে স্থিত। আমার মধ্যে প্রেম জাগাইবেন বলিয়াই নিহিত হইয়াছেন এই আধারে। সংহিতার সোমের সঙ্গে প্রয় বা প্রেমের বিশেষ সম্পর্ক।

"পিবা সুতস্যান্ধসো অভিপ্রয়ঃ।।" (ঋ. ৫/৫১/৫)
"নিম্নং ন যন্তি সিন্ধবোঽভি প্রয়ঃ।" (ঋ. ৫/৫১/৭)

সোমের আর একটি পরিচয় — রস, "সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ।" (ঋ. ৮/৩/২০)

"এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ।
য ইন্দুর্বারমাবিশৎ।।" (ঋ. ৯/৩৮/৫)।

উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি "রসো বৈ সঃ।" গীতার উক্তি "সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ"। আনন্দ ব্রহ্মই সোম। আনন্দব্রহ্মের কামই জগতের বিসৃষ্টির হেতু। নাসদীয় সূক্তে—

"কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"
(ঋ. ১০/১২৯/৪)

সোমের আর একটি পরিচয় 'গোবিন্দু'। ইন্দু শব্দ সোমেরই আর এক নাম।

"চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি।।"
(ঋ. ৯/৯৬/১৯)

৯/৬২ সূক্তের ১৯ মন্ত্রে বলিয়াছেন, গোবিন্দু সোম্যপুরুষ গোগণের মধ্যে শূরের মত দাঁড়াইয়া আছেন — "শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি।।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩/১৭/৬ মন্ত্রে পাই —

"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণ-

সংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ।।"

— ঘোর অঙ্গিরা ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। এই তত্ত্ব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। ঋষি বলিয়াছিলেন মৃত্যুকালে মানব এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে :

'অক্ষিতমসি' — তুমি অক্ষয়, 'অচ্যুতমসি' — তুমি অচ্যুত; এবং 'প্রাণ-সংশিতমসি' — তুমি প্রাণসংশিত। সংশিত অর্থ — প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্বে সঞ্জীবিত।

অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ — এই তিনটি সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ ও ভাগবতের কৃষ্ণ এক হইতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কারণ, গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে অর্জুনকে বলিয়াছেন — "বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।"

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন —

"Krishna is the eternal personality of Ananda because of him all creation is possible, because of his play, because of his delight, because of his sweetness."

"Krishna is the supreme eternal, infinite, immortal, self-play, self issuing, self-manifestation, self-finding."

মনে হয় ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ভাষা সবই 'নিণ্যা বচাংসি'-র মধ্যে। ইহার মর্ম উদঘাটন আমার দুঃসাধ্য। কারাগারে কৃষ্ণদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কিছু রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ।

"সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিংষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন।।
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাব্ণামিচ্ছৃণ্বন্‌তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ।।" (ঋ. ১০/৮৫/৩-৪)

ঋষি বেণু সোমের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলিয়াছেন (ঋ. ১০/৮৯/৬)—

"ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ।"

সোমের অনন্ত মহিমা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গও অনুধাবন করিতে পারে না। পর্বত ইহার মহিমা স্পর্শ করিতে পারে না। সোমধারা আত্মার অন্তর্নিহিত দিব্য আনন্দ। সোমরস হইতেছে তুরীয়ানন্দ, অমৃতত্ব — আনন্দ অমৃতম্।

সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রসপান করিয়া মানুষ মনে করে যে সে সোম পান করিল। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ যে সোমকে জানেন, তাহা কেহ পান করিতে পারে না। সোমলতা পেষণে কেবল পাষাণেরই শব্দ পায়, কিন্তু

যথার্থ সোমকে পাওয়া যায় না।

সোম সম্বন্ধে শ্রীঅমলেশ বলেন —

"চিন্ময় আলোকে উদ্ভাসিত যে আনন্দ ধারা সাধকের সত্তায় নেমে আসে দেবতার আশীর্বাদ হয়ে, প্রসাদ হয়ে, তাই হল সোম।"

সোম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ *On the Veda* গ্রন্থে বলেছেন— "illumined Ananda that descends from above." (p. 349) ..... "Soma, the ambrosial wine of the Veda, wine of delight or wine of immortality." (p. 420)।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Soma plant symbolises, the element behind all senses, activities and their enjoyment which yield the divine essence."

কেহ কেহ বলেন, "অপাম সোমমমৃতা"; সোমপানে অমৃতময় হইব।

ঋষি সোমের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন —

"যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ।।" হে রস, তোমার যে শিবতম রূপ, আমাদের তাহার ভাগী কর। রসের দুইটি রূপ — অশিব রূপ ও শিবতম রূপ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সতত পরাঙ্‌মুখ; তাহাদিগকে প্রত্যঙ্‌মুখী করিতে হইবে। নাভির নীচে যে রস তাহা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য। সোম অল্পতম। শিরে সোম শিবতম, সহস্রারচ্যুত অমৃত। রসচেতনা ঊর্ধ্বগামী হইলেই সোম হয়েন পবমান।

ঋগ্বেদে সম্পূর্ণ নবম মণ্ডলে যে সোমের কথা বলা হইয়াছে সেই সোম বস্তুত এই অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

বৈদিক রূপক 'গাবঃ' অর্থ গোযূথ; বাঁধা আছে ব্রজে। 'বৃজ্' ধাতুর অর্থ মোচড়ানো, মোড় ঘুরানো। অবিদ্যার আবরণে চিৎ জ্যোতি আবৃত। চিৎশক্তি জড় হইয়া আছেন মোড় ঘুরিয়া। অবিদ্যা তাহাকে মোচড়াইয়া দিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন অন্তর্মুখী হইবে, যিনি 'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে' সতত বিরাজমান, তিনি যখন বাঁশীর আকর্ষণে গোযূথ আনিবেন অন্ধকার হইতে সূর্যরশ্মিতে সূর্য-সুতা কালিন্দীর তীরে, তখন জীবন হইবে অমৃতময়। ব্রজ হইবে নন্দ ব্রজ, আনন্দঘন বৃন্দাবন।

ঋগ্বেদ ৯/২২/৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "ত্বং সোম পণিভ্য আ বসু গব্যানি ধারয়ঃ।" হে সোম, তুমি পণিদের নিকট হইতে গোযূথ ছিনাইয়া আন। গোবৃন্দকে যিনি সতত আকর্ষণ করেন নিজাভিমুখে, তিনি গোবিন্দ। ঋ. ৯/৯৬/১৯ মন্ত্রে 'গোবিন্দুঃ' শব্দ আছে।

গীতা যখন বলেন, "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ" — কন্দর্প প্রাকৃত জগতে অন্ধতম কাম; আর যখন "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" — রসানন্দঘন পরব্রহ্ম যখন ব্রহ্মযোনি-রমমাণ তখন তাহা নির্মল ভাস্বর

বিশুদ্ধ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্বর।" কমু ধাতুর ও প্রীঙ্ ধাতুর প্রায় একই অর্থ — প্রীতি বিধান।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।" চৈতন্য-চরিতামৃত।

প্রীতি ইচ্ছার কেন্দ্র যখন দেহেন্দ্রিয়-যুক্ত আত্মা, তখন তাহা কাম; আর কেন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণ, নিয়ত বংশীরবে এই ব্রজপ্রেমের মহাদাতা মহাপ্রভু, আকর্ষণকারী সর্বেন্দ্রিয়াকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ — তখন তাহা ব্রজপ্রেম। মনে হয় প্রেমের substitute কথাটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানিতেন না, তাহার ভাল বাংলা শব্দ বোধ হয় খুঁজিয়া পান নাই। যদি বলিতেন ঊর্ধ্বায়িন বা ঊর্ধ্বস্রোতা তাহা হইলে তাঁহার কথাটি আরও ভাল বুঝিতাম। শ্রীশুকদেবের ভাষায় "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ", ইহার ব্যাখ্যানও এখন করিব না। এই সব রসের প্রসঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিস্তর। অনেকের ধারণা ইহা বেদে নাই। ইহা ভুল। সব রসের প্রসঙ্গই বেদে আছে। এমনকি পরকীয়া রসের কথাও বেদে আছে তাহা অপালার দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো হইয়াছে।

স্বামী বিদ্যারণ্যজী বলেন, বৈদিক ধর্মকে ভাগবত ধর্ম বলা যায়। কেননা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যে ধর্মের উপাস্য পরম দেবতা ভগবান্, উহাই ভাগবত ধর্ম। বৈদিক দেবোপাসনা বস্তুতঃ ভগবানেরই উপাসনা। অতএব বৈদিক ধর্মও ভাগবতধর্ম।

প্রেমদানের উপায় হরি নাম

পূর্বে বলিয়াছি ব্রজপ্রেমের মহাদাতা শ্রীগৌরহরি। কি করিয়া যে তিনি আমাদের মধ্যে প্রেম প্রবেশ করাইয়াছেন শ্রীগৌরহরির মুখে তাহা খুব ভাল করিয়া শুনিয়াছি। গৌরহরির কাজই হইল প্রেমদান। এই প্রেম দান করেন তিনি হরিনামের দ্বারা। হরিনামের তাৎপর্য তিনি নিজের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

"হরিনামের বহু অর্থ — দুই মুখ্যতম।
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।।"

প্রেম দিয়া মন হরণের কথায় — ব্রজরসের আস্বাদক ও দাতা ইহা সুস্পষ্ট।

এই প্রেম দান করিয়া মন হরণ করেন বলিয়াই হরিনামের এত বৈশিষ্ট্য। প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর হরিনাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরি নাম। হরি বলিলে সবই বলা হয়।" মহাপ্রভু

'হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম', এই তিনটি নাম দিয়া গাঁথা একটা মালা জগৎকে দান করিয়াছেন। ভগবদ্‌ভক্তগণের ভজনের এই শ্রেষ্ঠ নামটি —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।"

মহাপ্রভু এই নামটি জপ করিতে বলিয়াছেন। প্রভুজগদ্বন্ধু এই নামকে উচ্চৈঃস্বরে গভীরনাদে গাহিতেও বলিয়াছেন —

"গাওরে গভীরনাদে হরে কৃষ্ণ নাম।"

এই নামমালার মধ্যে 'কৃষ্ণ' নাম চারি বার, 'রাম' নাম চারি বার, ও 'হরি' নাম আট বার। তিনটি নাম অভিন্ন হইলেও হরিনাম আট বার থাকায় হরি নামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। মহাপ্রভু জীবকে হরিনাম দিতে আসিয়াছেন; কৃষ্ণনাম বা রামনাম দিতে আসিয়াছেন, ইহা লোকে বলে না।

"হরের্নামৈব কেবলম্"। শিক্ষাষ্টকেও মহাপ্রভু বলিয়াছেন — "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" এইরূপে সর্বত্রই হরিনামটির মূল্য বেশী দেন নাই কি ? নিজ মুখে যখন নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখনও হরিনামের অর্থ গভীরতম। কৃষ্ণ নামের অর্থ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি।।"

এই 'হরি'নামটি ঋগ্বেদের সোমমণ্ডলে অর্থাৎ নবম মণ্ডলে পাঁচবার আছে — ৩৮/২, ৩৮/৬, ৩৯/৬, ১০১/১৫ এবং ১০১/১৬ মন্ত্রে। অন্য কোন নাম খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সুতরাং গৌরসুন্দরের অন্তরের কথাও বেদে বিকশিত সংকীর্তিত।

'হরি' শব্দ অশ্বকেও বুঝায়। যখন অশ্ব বা ঘোড়াকে বুঝায় তখন দ্বিবচন বা বহুবচন থাকে। 'হরি' বলিতে হরিদ্‌বর্ণও বুঝায়। তখন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গে একবচনে 'হরি' শব্দ থাকিলে তাহা পরম দেবতা হরিকে বুঝায়। প্রায়শঃ এইরূপ দৃষ্ট হয়।

প্রেম দিয়া মন হরণ করেন বলিয়াই হরিনামের শ্রেষ্ঠত্ব।

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।"

(মহাভারত, স্বর্গারোহণপর্ব, ৬/২৯)

সমগ্র ভাগবত বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব হরি-কীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলিয়াছেন —

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

(ভা. ১২/৩/৫২)

অতঃপর শুকদেব ভাগবতের সবশেষে এই শ্লোক বলিয়াছেন —

"নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।" ১২/১৩/২৩

সংহিতায় রাম শব্দ নাই বলিয়াছি, কিন্তু রামের শক্তি সীতার নাম আছে — ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে ৬ষ্ঠ মন্ত্রে বামদেব ঋষি বলিতেছেন —

"অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি।।"

সীতা শুধু জনকরাজারই কন্যা নহেন, তিনি আদ্যাশক্তিশালিনী। আদ্যাস্তোত্রে বলা হইয়াছে — "রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী"।

ঋগ্বেদ সংহিতায় কৃষ্ণনাম পাওয়া না গেলেও রাধানামের উল্লেখ পাওয়া যায়। (ঋ. ৪/২৪/২, ঋ. ৫/৪০/৭, ঋ. ১০/২৯/৭) গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন —

"Radha is the personification of the absolute love for the Divine. Gopies are the embodiment of spiritual passion extra-ordinary by their extremeness of love, personal devotion, unreserved self-giving. Golok is evidently a world of love and Beauty and Ananda full of spiritual light, the flute is the call of Divine."

শ্রীমান্ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—কথাটি শুধু মহামূল্যবান্ নহে, মহাগম্ভীরার্থদ্যোতকও বটে।

বৈদিক ঋষিরা পরোক্ষপ্রিয়, কোন কথাই সহজে বলেন না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলেন। তাই বলা হয় সান্ধ্য-ভাষা। কিছু আলো কিছু অন্ধকার-বিশিষ্ট কথা। কিন্তু হরিকথায় সান্ধ্য-ভাষা প্রায় আলোর ভাষা হইয়া গিয়াছে। লুকানো ঠাকুর ধরা পড়িয়া গিয়াছেন এমত মনে হয়।

বেদে নাম-মাহাত্ম্য

ঋক্‌সংহিতা ও সাত্বত সংহিতা আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বৈষ্ণবদিগের নববিধা ভক্তি ও পঞ্চরসের সাধনার কথা আলোচনা করিয়াছি। এই সকল আশ্চর্যজনক কথা নহে। মহাপ্রভুর দান যে হরিনামের কথা এবং তার অসীম মাহাত্ম্যের কথা যে বেদ বলিয়াছেন ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। মহাপ্রভুর দানকে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ, বৈরাগীদের কতকগুলি অবান্তর কথা বলিয়া মনে করেন। মহাপ্রভু যে কিছুই অবৈদিক বলেন নাই, তাহাই আমাদের বক্তব্য।

ঋগ্বেদ-সংহিতা ও সাত্তত সংহিতার নিবন্ধের উপসংহারে বেদেও নাম-মাহাত্ম্যের কথা আছে ইহা প্রকৃষ্টভাবে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অগণিত গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ' একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী — ইঁহাদের দুইজনেরই শ্রীহস্তের স্পর্শ আছে। এই শ্রীগ্রন্থের দিগ্‌দর্শিনীনামা একটি টীকাও সনাতন গোস্বামী রচনা করিয়াছেন। পরে শ্রীজীব গোস্বামীও অতি নিপুণতা সহকারে একটি সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি এই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের একাদশ বিলাসের ২৭৪ ও ২৭৫ অঙ্ক চিহ্নিত অংশদ্বয়ে বেদের দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'শ্রুতয়শ্চ' বলিয়া এই প্রমাণ দিয়াছেন। দীর্ঘতমা ঋষি ও ভৃগু গোত্রীয় প্রয়োগ ঋষির মন্ত্র দুইটি যথাক্রমে বলা হইতেছে।

ওঁ "আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।।" ওঁ তৎ সদিত্যাদি।। (ঋ. ১/১৫৬/৩)

এই মন্ত্রটির শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যা "হে বিষ্ণো! তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্) তস্মাৎ অস্য (নাম্নঃ) আ (ঈষদপি) জানন্ত (ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ, তথাপি) বিবিক্তিন্ (ব্রুবাণাঃ, কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণা) সুমতিং (তদ্বিষয়াং বিদ্যাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ) যতঃ ওঁ তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃসিদ্ধম্) ইতি।" —শ্রীজীব।

তাৎপর্য এই : হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ, সুতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যগ্‌রূপে না জানিয়া, সামান্য কিছুমাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই ফলে আমরা তোমা বিষয়িনী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু ইহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয় মন্ত্র —

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ "পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবঃ শ্রব আপন্নমৃক্তম্। নামানি চিদ্ দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াংতে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।।" (ঋ. ৬/১/৪)

"হে পরমপূজ্য! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি; কারণ, ঐ শ্রীচরণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্তগণ যশ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে; অন্য কথা কি, যাঁহারা ঐ শ্রীপাদপদ্ম নির্বাচনের জন্য বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর কীর্তনে উহার অবধারণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে, তাঁহারা সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামাশ্রয় করিয়া থাকেন।"

বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্যের অন্যতম শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন'-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড "বেদে নাম মাহাত্ম্য" এই শিরোনামায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ দিবার সময় তিনি লিখিয়াছেন, এই বঙ্গানুবাদ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকানুযায়ী শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নের। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নাম উচ্চারণ করার উদ্দেশ্য, ইহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় —

"দীক্ষা-পুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।।" (মধ্য, ১৫/১০৮)

এই উক্তির সঙ্গে বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা ও ভৃগুগোত্রীয় প্রয়োগ ঋষির উক্তির সম্পূর্ণ একবাক্যতা বিস্ময়কর।

এই বেদোক্ত নাম-মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়াই আমরা "ঋগ্বেদ-সংহিতা ও সাত্বত সংহিতা" প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

বৈদিক সাহিত্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বেদান্তশাস্ত্রে তিনটি প্রস্থান — শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান ও ন্যায় প্রস্থান। একটি কথাই তিনভাবে বলা। শ্রুতিতে বলিয়াছেন সর্বজনীনভাবে; স্মৃতিতে বলিয়াছেন সেই কথাকেই কোন বিশেষ ঘটনার স্থলে, কোন বিশেষ প্রিয় ভক্তদের; আর ন্যায় প্রস্থানে বলিয়াছেন সেই কথাই যুক্তি বিচারের দ্বারা।

যখন বলি, ''সদা সত্য বলিবে''; ইহা সর্বজনীন কথা। ইহা শ্রুতির কথার মত। যদি বলা হয়, ''অর্জুন! কখনও সত্য ভ্রষ্ট হইবে না,'' ইহা কোন ব্যক্তির, কোন বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ ঘটনার স্থলে বলা। ইহা স্মৃতির মত কথা। যদি বলি, ''জগতে সত্যই একমাত্র দাঁড়াইয়া থাকে, মিথ্যা কখনও দাঁড়াইতে পারে না। মিথ্যাও কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে পারে সত্যের আবরণে; যেইমাত্র সত্যের আবরণ খসিয়া যায়, সেই মাত্র মিথ্যা উবিয়া যায়'' — ইহা যুক্তি বিচারের দ্বারা বলা। তিন মুখে যদি একই কথা পাই, তাহা হইলে আমরা সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হই। ইহাই বৈষ্ণবীয় ভাষায়— ''সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য।''

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় যে সকল হৃদয়গ্রাহী উপদেশ পাওয়া যায়, বেদ-সংহিতায়ও তাহা প্রায় সকলই সিদ্ধান্ত আকারে পাওয়া যায়। গীতার সব কথাই সুন্দর, কোনও কোনও কথা সর্বজনপ্রাণস্পর্শী।

(১) গীতার একটি প্রধান সংবাদ শ্রীভগবানের অবতারবাদ। ঋগ্বেদ সংহিতায়ও ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভগবান্ যখন যেই রূপ ইচ্ছা, তখন সেই রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখনও কখনও কোন বিশেষ কার্য সাধনার্থ তিনি মনুষ্য কিংবা অপর কোন জাগতিক প্রাণিরূপে সাধারণভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাকে অবতারবাদ কহে। পুরাণে এই অবতারবাদ বিস্তর আলোচিত হইয়াছে। ভাগবত শাস্ত্র, অবতার অসংখ্য হইতে পারেন বলিয়াছেন।

অবতারবাদের বীজ বেদেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১/৫১-৫৭ সূক্ত সমূহের দ্রষ্টা অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সব্য ঋষি। মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্রসম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রের উপাসনা করেন, ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার

পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রেরই নাম সব্য। সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে তৃতীয় মণ্ডলে আছে— "অঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্যপুত্রমিচ্ছন্‌নভ্যধায়ং সব্য ইতীন্দ্র এবাস্য পুত্রোঽজায়ত।"

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমণের উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুবার আছে। "ত্রেধা নি দধে পদম্‌" (ঋ. ১/২২/১৭) — তিন পায়ে বিশ্ব আক্রমণের কথা বলা হইয়াছে। এই বাক্যে বামনাবতারের কথা বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭/১/৫/১) মতে বরাহ অবতারের মূলে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই।

(২) গীতায় আছে 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'। (৭/১৯) এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত ভগবান্‌ই। সহজ কথায় সবই ভগবান্‌। ঋগ্বেদ-সংহিতায় সপ্তম মণ্ডলের ৯৮ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন —

"তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎ পশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ।।"

"প্রাচীনগণের হিতকারক এ সমগ্র বিশ্ব, যে বিশ্বকে তুমি সূর্যতেজের দ্বারা প্রকাশ কর, সেই বিশ্বজগৎ তোমারই। গো সমূহের মধ্যে তুমিই গোপতি। তোমার বস্তুসমূহই আমরা উপভোগ করিতেছি।" আচার্য শৌনক বলিয়াছেন — হে পুরুষবর। বিশ্বের যাহা কিছু সকলই তোমার পৌরুষ, "সর্বমেব তু পৌরুষম্‌"।

(৩) গীতায় আছে ভক্তের অর্পিত দ্রব্য ভগবান্‌ গ্রহণ করেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ৯/২৬

"যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাঁহার সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।"

ঋ. ১/১৪৮/২ মন্ত্রে দীর্ঘতমা ঋষি অগ্নি দেবতাকে বলিতেছেন —

"দদানমিন্ন দদভন্ত মন্মাগ্নির্বরূথং মম তস্য চাকন্‌।
জুষন্ত বিশ্বান্যস্য কর্মোপস্তুতিং ভরমাণস্য কারোঃ।।"

"ভক্তের মননীয় দান অর্থাৎ ভক্তকর্তৃক আন্তরিকভাবে প্রদত্ত বস্তু মননীয় মনে করিয়া দেবতা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করেন না, বরং অতিশয় কামনা করেন। সমস্তই সেবন করেন।"

(৪) গীতায় উক্ত আছে, ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।" ৫/১০

"যে মুমুক্ষু কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে

সকল কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, পাপ পুণ্য সেইরূপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

ঋক্-সংহিতায় ১/১৩৬/৫ মন্ত্রে পরুচ্ছেপ ঋষি মিত্রাবরুণকে বলিতেছেন —

"যো মিত্রায় বরুণায়াবিধজ্জনোঽনর্বাণং
তং পরি পাতো অংহসো দাশ্বাংসং মর্তমংহসঃ।
তমর্যমাভি রক্ষত্যৃজূয়ন্তমনু ব্রতম্।
উর্কথৈর্য এনোঃ পরিভূষতি ব্রতং স্তোমৈরাভূষতি ব্রতম্।।"

যে জন মিত্র-বরুণকে কর্ম সমর্পণ করে, সেই অণর্বা অর্থাৎ অনন্যাশ্রিত ভক্তকে তিনি সর্ব পাপ হইতে রক্ষা করেন।

(৫) গীতার বাণী— ঈশ্বরে শরণাগত হইলে মানুষ পরাশান্তি লাভ করেন।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।" ১৮/৬২

"হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও চিরন্তন স্থান লাভ করিবে।"

ঋক্-সংহিতায় ৫/৪২/১১ মন্ত্রে অত্রি ঋষি বলিয়াছেন —

"যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্"।

"মহান্ সৌমনসের জন্য রুদ্রকে যজন কর।"

ঋক্-সংহিতায় ১/৭৬/২ মন্ত্রে গৌতম ঋষি বলিয়াছেন —

"যজা মহে সৌমনসায় দেবান্", অর্থাৎ মহান্ সৌমনসের জন্য দেবগণকে যজন কর। মহান্ সৌমনস শব্দের অর্থ চিত্তের পরাশান্তি। ঋষির ভাষায় বুঝা যায়, তিনি এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বলিয়াছেন। মনে হয় যে, পরাশান্তির জন্যই যজনের কথা বলিয়াছেন। যজন না করিলে শান্তি হইবে না। সুমনস্ শব্দের তাৎপর্য অভিধান মতে — মহামনা, উদারচিত্ত, প্রীত। সুমনস্ শব্দ হইতে সৌমনস শব্দ জাত।

(৬) গীতায় উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়ের মত চালাইতেছেন।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতাঁাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।" ১৮/৬১

"জগতে সমস্ত প্রাণিগণকে, সর্বব্যাপারকে ভগবান্ পরিচালনা করেন। মুখ্য কর্তৃত্ব তাঁহারই। একমাত্র তিনিই প্রকৃত স্বতন্ত্র কর্তা।" ঋক্সংহিতায় ২/২৮/৬ মন্ত্রে কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি বরুণদেবতাকে বলিতেছেন —

"নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে।"

তোমার শক্তি ব্যতীত কেহ চোখের পলক ফেলিতে সমর্থ হয় না।

(৭) শরণাগতি : গীতায় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন — "মামেকং শরণং ব্রজ"।

বেদ-সংহিতায়ও শরণাগতির কথা পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন —

"উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা।।"

(ঋ. ৬/৪৭/৮)

"হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান্, তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও। হে ইন্দ্র! আমরা স্থবির, তোমার দর্শনীয়, মহান্ এবং শরণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকিব।"

ইন্দ্রের শরণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকা অবশ্যই ইন্দ্রের শরণাগত হওয়া।

(৮) গীতার সপ্তদশ অধ্যায়টির নাম 'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ"। শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান্ কর্তৃক মুক্তকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত। বলা হইয়াছে "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" (১৭/৩)। ঋগ্বেদেও শ্রদ্ধা অসীম গুরুত্বের সহিত আপন স্থান করিয়া লইয়াছে — তাই দেখি শ্রদ্ধা নামে একটি সম্পূর্ণ সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। (ঋ. ১০/১৫১)।

(৯) গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকণ্ঠে গীত উপদেশ বাণী, আর বেদও কোন কবি-সাহিত্যিক, মুনি-ঋষি বা দেব-গন্ধর্ব রচিত শাস্ত্র নহে — অপৌরুষেয়। নিত্য সনাতন চির-শাশ্বত সত্য জ্ঞানই বেদ। বেদ পরমপুরুষের অযত্নপ্রসূত স্বতঃনির্গত নিঃশ্বসিত বাক্য। অনেক প্রাজ্ঞজনই বলেন, নিঃশ্বাস অর্থ ঈশ্বর কর্তৃক চেষ্টাব্যতীত স্বতঃ উদ্‌ঘোষিত উক্তি। বেদ যাহাকে পরা বাক্ বলিয়াছেন তাহা মূলতঃ ঈশ্বর বাক্যই। ফলে গীতাও বেদ ভিন্ন কিছু নহে — একই পরম পুরুষ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে।

(১০) গীতার নাম 'গীতা' হইবার কারণ শ্রীভগবানের কণ্ঠে ইহা প্রথম গীত বা উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া। আবার সাম-বেদকেও বলা হয় 'গান' অর্থাৎ গীতা। সাম-বেদ সুর সংযোগে পঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই ইহাকেও গীতা বলিতে আপত্তি নাই — এই দৃষ্টিতে বেদ ও গীতা সমপর্যায়ভুক্ত।

সর্বোপরি বলিতে হয় গীতা শ্রবণে অর্জুনের অজ্ঞান-মোহ অন্ধকার দূর হইয়াছিল। অর্জুন বলিয়াছিলেন — "মোহোঽয়ং বিগত মম"। বেদপাঠেও আমরা অজ্ঞান মোহান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া থাকি। "নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতঃ" (ঋ. ১/৭২/১) — অর্থাৎ আমাদের অন্তরে তিনি (অগ্নি) শাশ্বত জ্ঞান-দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি সৃজন করেন।

এইরূপে বেদ ও গীতার পরস্পর আলোচনা করিয়া উভয়ের মধ্যে বহু একবাক্যতা দেখানো যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় উভয়ই এক পরম সত্যের দিশারী, মানব-কল্যাণদ চিরশাশ্বত শাস্ত্ররত্ন। এই উভয়শাস্ত্রই যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে মহাভারত স্মৃতিপ্রস্থান। গীতা মহাভারতান্তর্গত বলিয়া গীতাও স্মৃতিপ্রস্থান শাস্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধে দেখিলাম স্মৃতি গীতা সর্বাংশেই শ্রুতি তথা বেদের অনুগামী।

বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র

স্মরণের জন্যই স্মৃতিশাস্ত্র।

স্মৃতিকারদের মধ্যে মনু সর্বোপরি বিরাজিত। মনু একজন নহেন। চতুর্দশ মন্বন্তরে ১৪ জন মনুর কথা উল্লিখিত আছে। বেদের অসংখ্য শাখা। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণও বেদের সকল শাখা অধিগত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তাঁহারা বেদজ্ঞ বহু পণ্ডিতের সঙ্গে বেদশাস্ত্র আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই আলোচিত বেদ-শাখাগুলি স্মরণ করিয়া অনুষ্ঠানযোগ্য বিহিত কর্মগুলি আচার্যগণ স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দেশগুলি স্মৃতি পরম্পরায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

স্মৃতিকারগণের কর্তব্য ছিল দুইটি —

এক, ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করা। এই সমন্বয় দৈহিক বলপ্রয়োগ দ্বারা নহে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ। যুক্তির মূল কথা হইল : শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানগুলির মধ্যে যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে শ্রুতিই প্রাধান্য পাইবে অর্থাৎ শ্রুতির সিদ্ধান্তকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্মৃতির বিধানসকল শ্রুতি অনুসারী হইবে।

দুই, স্মৃতিকারদের যথাবিহিত কর্তব্য হইতেছে, যে-সকল অবৈদিক বা বেদবিরুদ্ধ ধারা বৈদিক সমাজে অনুপ্রবেশ করতঃ প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয়, সুনিপুণ যুক্তি দ্বারা তাহাদের খণ্ডন করতঃ ও অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ পূর্বক বৈদিক ধারার পবিত্রতা, অখণ্ডতা ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা। বৈদিক ধর্ম ও মতাদর্শের উপর আঘাত আসিয়াছে বারংবার, অন্ততঃ চার-পাঁচবার যে বিরুদ্ধ মতবাদের আক্রমণ ঘটিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। যেমন —

(ক) **তন্ত্রধারা** — তন্ত্রশাস্ত্র অনেক ক্ষেত্রে বেদকে সমর্থন করিয়াছে, বেদের দোহাই দিয়াছে, কিন্তু বেদের স্বতঃপ্রমাণতা স্বীকার করে নাই। তন্ত্রের বীরাচার ও পঞ্চ মকার সাধনা সহজ নহে, অনেক ক্ষেত্রে সাধকের পতন ঘটায়। অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী, স্বল্পশক্তির অধিকারী ব্যক্তির হস্তে উহার পবিত্রতা নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ প্রবঞ্চিত হয়। দেখা যায়, এক সময় তাঁহারাই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে। বৈদিকধারা নষ্টপ্রায় হইতে বসে। ঐ সকল অবৈধ বিধান বেদ স্বীকার করিয়া লন নাই। সেইকালে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ উহাদের দোষত্রুটি, সমাজ-জীবনে অপকারিতা, অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করত বৈদিক ধারাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(খ) **বৌদ্ধধর্মমত** — বেদ ও ঈশ্বর বিরোধী। বৌদ্ধমতের ব্যাপক প্রচার ও প্রভাবে হিন্দুধর্ম একসময় লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজা অশোকের বৌদ্ধধর্মমত গ্রহণ ও উহার প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগে এবং রাজা হর্ষবর্ধনের সবিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধমত ব্যাপকভাবে ভারতের জনসাধারণ গ্রহণ করিতে থাকে। এই ধর্মমতের মূল কথা—সকল মানব-জীবনেই দুঃখের মর্মান্তিক অনুভূতি আছে। দুঃখকে চিরতরে দূর করা সম্ভব নির্বাণলাভে। সুনির্দিষ্ট কতকগুলি শীল বা আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে নির্বাণলাভ হইবে। সেইজন্য কোন ঈশ্বরের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। বৌদ্ধধর্মমতের সর্বব্যাপী প্রভাব আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের জ্ঞানগর্ভ যুক্তির নিকট খর্ব হইয়া যায়। বিশেষত ঐ সময় স্মৃতিকারগণের বেদানুগত্যময় বিচক্ষণতাপূর্ণ যুক্তিতে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় এবং হিন্দুধর্মের বিজয়ধ্বজা সর্বোপরি বিরাজিত হয়। বৌদ্ধধর্মমতের জন্মস্থান ভারতভূমি হইতে ঐ ধর্মমত একরূপ নির্বাসিত হয়।

(গ) **জৈনধর্মমত**— জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম জৈনধর্মমত। 'জিন' অর্থ জয়ী, যিনি রাগদ্বেষাদি ও কামশত্রুকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জিন। জিনকে অর্হৎ বা তীর্থঙ্করও বলা হয়। জৈনধর্মমতে বেদের প্রামাণ্য এবং ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না। এইজন্য ঈশ্বরের অবতারও নাই। তীর্থঙ্করগণ দেবতার ন্যায় পূজ্য, কিন্তু তাঁহারাও জীব, জীবন্মুক্ত জীব। জৈনমতে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। অনাদিকাল হইতে বিশ্ব আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মার মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষই নির্বাণ। নির্বাণ লাভ হইলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না। হিংসা, অসত্য, চৌর্য, মৈথুন, পরিগ্রহ বা বিষয়াসক্তি কর্মবন্ধনের হেতু। মোক্ষলাভের উপায় সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র সংগঠন। জৈনধর্মমতের প্রবর্তক বেদবিরোধী এক ঋষভদেব। শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। জৈনধর্মমতের প্রভাব সমাজে ব্যাপক নহে। মীমাংসক ও স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ জৈনমতের অসম্পূর্ণতা ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

(ঘ) **ইসলামমত**—ইসলাম মতের আঘাত হিন্দুধর্মের উপর অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক। মুসলমানদের প্রধান অবলম্বন তাহাদের বাহুবল। ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ও নিজেদের মধ্যে একত্ব ও সংহতির অভাবের ফলে এদেশে বারংবার ঘটিয়াছে মুসলমান আক্রমণ। পরিশেষে মুসলমান রাজত্বের হইয়াছে প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের সম্পদ্ লুণ্ঠন, হিন্দুমন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ, হিন্দুরমণী হরণ ও বিবাহ, বহুবিবাহ ধর্মানুমোদিত ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মুসলমানের বিশ্বাস ইত্যাদি ভারতে হয়তো মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। হিন্দুধর্মের দোষত্রুটি উল্লেখ

করিয়া ইসলাম ধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণের কোন প্রচেষ্টা তাহাদের ছিল না। হিন্দুধর্মের উপর তাহাদের আঘাত মুখ্যত বহিরঙ্গ।

হিন্দুধর্মের উপর সর্বশেষ ও সর্বাতিশায়ী আঘাত আসিয়াছিল ইংরাজগণের এদেশে আগমনে। এদেশে তাহাদের আগমন ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে। বাণিজ্যিক স্বার্থে রাজ্যজয়, স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য বিনাশে রাজশক্তি প্রয়োগ, শিক্ষা ও ধর্মক্ষেত্রে সংস্কার করিয়া বিদেশী শিক্ষা ও খ্রীস্টান ধর্ম প্রবর্তনে মিশনারীগণের স্কুল, কলেজ, বড় বড় গির্জার প্রতিষ্ঠা ও নানারূপ সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে আকৃষ্ট করার প্রয়াস প্রথমদিকে খুবই কার্যকরী হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা-ধর্ম সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ ঘটিয়াছিল তাহাই বহুলাংশে জাতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, প্রভু জগদ্বন্ধু, শ্রীঅরবিন্দ ও আরও অসংখ্য মহামানবের আবির্ভাব হেতু আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। ইংরাজগণ শেষ ও চরম আঘাত হানিয়া গেল ভারত ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া অযুক্তিকর একটি নূতন মুসলমান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়া।

তন্ত্রধারা, বৌদ্ধ ও জৈনমত এবং ইসলাম প্রভৃতি মতবাদের আক্রমণে যখন হিন্দু ধর্ম-সমাজ বিপর্যস্ত, সেইকালে বহু স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্গণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আমাদের সৌভাগ্যবশে। তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন হিন্দু সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি। আমরা অন্তত ঊনিশ-কুড়ি জন স্মৃতিশাস্ত্রকারের নাম উল্লেখ করিতে পারি; যথা — মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ। এই সকল নাম দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা বৈদিক ঋষি। বস্তুতঃ তাহা নহে। স্মৃতিকারগণ বৈদিক ঋষিগণের নাম ব্যবহারের মাধ্যমে স্মৃতির উপদেশগুলির বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য আরোপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকল উপদেশ বেদানুগত। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের নিরসন করত অবৈদিক মতবাদগুলি হইতে বৈদিকধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন।

ইঁহারা ছাড়া, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জীমূতবাহন, বলদেব ভট্ট, শ্রীনাথ, গোবিন্দানন্দ, মৈথিলী চন্দ্রেশ্বর, কুল্লুক ভট্ট, শূলপাণি, হলায়ুধ, রঘুনন্দন, প্রভৃতি। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার; যথা — গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। শ্মশানকার্য, শ্রাদ্ধাদি, অশৌচপালন ও সপিণ্ডকরণ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ও তাঁহারা বিধিবদ্ধ করত হিন্দু সদাচার, সৎসংস্কার দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

চারি বর্ণ — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চারি আশ্রম — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, সমাজ ও ব্যক্তিজীবন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ করিয়া মানবজীবনের সর্বস্তরে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার মূলে ছিল স্মৃতিকারদের সুবিন্যস্ত বিধিব্যবস্থা। এই বর্ণাশ্রম ধর্মপালনে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন —

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎতত্তোষকারণম্।।" (বিষ্ণুপুরাণ)

পুরুষ বর্ণাশ্রম আচারবান্ হইয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন, সেই আরাধনা ভিন্ন বিষ্ণুর সন্তোষ বিধানের অন্য কোন পথ নাই। রঘুবংশ কাব্যে কবি কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় মনুর সময় হইতে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হওয়ায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুশৃঙ্খলা, শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—

"রেখামামপি ক্ষুন্নাদা মনোর্বর্ত্মণঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।।" (রঘুবংশ, ১/১৭)

অনুবাদ — শিক্ষিত সারথির রথচক্র যেমন অগ্রনেমি হইতে রেখামাত্রও লঙ্ঘন করে না, সুশাসনকর্তা দিলীপরাজের শাসনগুণে প্রজাবৃন্দও সেইরূপ মনুর সময় হইতে আচরিত নীতিপথ বিন্দুমাত্র অতিক্রম করে নাই।

বর্ণাশ্রম ধর্মের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান, সমাজদেহে বেকারত্ব কি তাহা কেহ জানিত না। যোগ্যতা অনুসারে উপার্জন কম বেশী হইতে পারে, কিন্তু কেহই কর্মহীন হইত না।

বিরুদ্ধ ধর্ম বা মতবাদ হইতে রক্ষার জন্য প্রয়োজন নিজধর্মকে শ্রদ্ধা করা ও শক্ত ভিত্তিতে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্মবিধি, আচরণগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। হিন্দুর দেব-দেবীর পূজার্চনা, মন্ত্রতন্ত্র, শ্রীদুর্গা পূজায় মহালয়া হইতে বিসর্জন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও সংস্থাপন স্মার্তগণের প্রধান কীর্তি।

আজ পূজার্চনা, মন্ত্রতন্ত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণের প্রতি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আস্থাহীনতা ও অশ্রদ্ধা। উহার ফল দেখা যায়, ব্যক্তি-সমাজ-পারিবারিক জীবন বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিপূর্ণ। আজিকার দিনে প্রয়োজন ছিল রঘুনন্দনের মত একজন বলিষ্ঠ স্মার্তধর্মের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তেমন কেহ জন্মান নাই।

উপরে উল্লিখিত স্মার্তগণ একটি বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন, বৈদিক বিধান অনুসারে বর্ণ-আশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুসমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করা। এই হেতু বেদ-বিচিন্তন গ্রন্থে স্মৃতিশাস্ত্র ও তাহার প্রণেতৃগণের উল্লেখ করা হইল।

বৈদিক সাহিত্য ও তন্ত্র

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে দুইটি ধারা বিদ্যমান আছে, বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও উপনিষদ্। তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা ভগবদ্গীতায়। তান্ত্রিক ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী চণ্ডীতে।

বেদের অপর নাম নিগম, আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। নিগম আর আগম শব্দ দুইটির অর্থ একই, যাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত হইয়াছে বা আসিয়াছে। উভয়ই নিখিল জ্ঞানভাণ্ডার। বেদ ঋষির দৃষ্টিতে অপৌরুষেয় অর্থাৎ যাহা কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। ঋষিগণের অনুভব এই যে, সত্য কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না। যাহা কোন সময়ে সৃষ্ট বা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অনিত্য ও অসত্য। যাহা সত্য তাহা চিরকালই বিদ্যমান তাহার অভাব ত্রিকালে কখনও হয় না। শ্রীগীতা বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২/১৬) অসতের বিদ্যমানতা নাই ও সদ্বস্তুর কখনও অভাব হয় না। সত্যের স্রষ্টা নাই, থাকিতে পারে না। সত্যের আছে দ্রষ্টা বা স্মর্ত্তা। সত্যের দর্শন হয়, সত্যের স্মরণ হয়, সত্য সৃষ্ট হয় না কখনও। যেহেতু তন্ত্র ও বেদ উভয়ই সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার সেই কারণেই তাহারা অপৌরুষেয়। অধিকাংশ তন্ত্রেরই শিব বক্তা এবং পার্বতী শ্রোতা। আদি পিতা বলিতেছেন ও আদি মাতা শ্রবণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অপৌরুষেয় তত্ত্বই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা অপৌরুষেয়, তাহার উৎপত্তি কাল বয়স নির্ধারণের চেষ্টা অর্থহীন। বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বয়স নির্ধারণের প্রভূত চেষ্টা বর্তমানে দৃষ্ট হয়। আর্যঋষির দৃষ্টিতে ইহা নিরর্থক। গাছ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে গাছের জন্ম। গাছ আগে, না বীজ আগে, এই প্রশ্নের যেমন সমাধান নাই, সত্যের স্রষ্টা কে, বা কবে সৃষ্ট হইল, তাহারও সেইরূপ সমাধান নাই।

বৈদিক ধর্ম-সাহিত্যে যে সকল পরম'সত্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতিতে ধরা পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে যেটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা এই : "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "একং সৎ" ও "একং তৎ"। অর্থাৎ পরম তত্ত্ববস্তু এক এবং অদ্বিতীয় বা দ্বিতীয়রহিত।

বৈদিক ধারা ব্যতীত ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অপর যে ধারাটি পরমোজ্জ্বল তাহা তন্ত্রের। ইদানীং কালে এই ধারাকে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা ও শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখ।

তিনশতের অধিক তন্ত্র গ্রন্থ আছে। ইহাদের নির্যাস হইল সপ্তশতী চণ্ডী গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্যের সম্পদ্ চণ্ডীগ্রন্থেও বিদ্যমান। মা মহামায়া আপন স্বরূপ অসুরাধিপতি শুম্ভকে লক্ষ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন —

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

অর্থাৎ, এই জগতে আমি একাই আছি। আমার দ্বিতীয় আর কে আছে? আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

অসুরগণের সঙ্গে মায়ের যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধে শর্ত হইল, যিনি মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, মা তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। মহাপরাক্রমশালী অসুর-সেনাপতিগণ নিধন হইলে অসুররাজ শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখে, বহু মূর্তি মায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। যেমন বারাহী, নারসিংহী, চামুণ্ডা, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, ইত্যাদি। উহা দেখিয়া অসুররাজ শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল — "ওরে বলদর্পে দর্পিতা দুষ্টা দুর্গা, তুই অহংকার করিস্ না, কারণ তুই অতীব মানবতী হইয়াও অন্য দেবীদের বলের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিস্।"

"বলাবলেপ-দুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী।।" (চণ্ডী, ১০/৩)

তখন দেবী বলিলেন, "আমি তো জগতে একাই, আমার কেহ দ্বিতীয় নাই। ওরে দুষ্ট! দেখ — ইহারা আমার বিভূতি, আবার আমাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে।"

তৎক্ষণে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সমস্ত দেবীই সেই দেবীর দেহে লয় হইলেন এবং এক অম্বিকাই অসুরের সম্মুখে রহিলেন।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা।। (চণ্ডী,১০/৬)

দেবী বলিলেন — "আমি নিজ বিভূতির প্রভাবে যে সকল মূর্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা সবই প্রতিসংহার করিলাম, এক্ষণে আমি একাই আছি। তুই স্থির হ।"

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।" (চণ্ডী, ১০/৮)

শ্রুতিতে যাহা শাশ্বত বাক্যরূপে প্রকাশিত, চণ্ডীরূপ স্মৃতিগ্রন্থে তাহার অভিনব প্রকটন (Demonstration)। ইহাতে বেদবাক্যের সঙ্গে

তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিরাট একতা প্রদর্শিত হইল। "একং সৎ" "একং তৎ" — এই তত্ত্বকথা সংহিতায় নানাস্থানে আম্নাত হইয়াছে।

সামবেদের কেনোপনিষদের কথা বলিতেছি। কেনোপনিষদের প্রথম দুই খণ্ডের বক্তব্য বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়া ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আছে হৈমবতী উমার উপাখ্যান। "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্" (৩/১২)— ইহার অর্থ হইল, ইন্দ্র সেই মহাশূন্যেই চলিতে চলিতে একটি স্ত্রী মূর্তির দেখা পাইলেন, যিনি বহুশোভমানা উমা হৈমবতী।

কেনোপনিষদে যে স্ত্রী মূর্তিকে আমরা পাই, তন্ত্রে যিনি পরমারাধ্যা, সেই হৈমবতী মহাশক্তি, বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। বৈদিক সাহিত্য ও তন্ত্রের সাহিত্যের মধ্যে একটি একতার রূপ প্রকাশিত হইল। ঋক্‌ত সংহিতায় ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী দেবীর আর এক নাম বাগ্‌তা দেবী। ইঁহারা যুগনদ্ধ, মিথুন।

এই বাগ্ - দেবীর একটি সূক্ত ঋগ্বেদে আছে। এই সূক্তটি সপ্তশতী চণ্ডী পাঠের পূর্বে অবশ্যই পাঠ্য। আচার্য সায়ণ বলেন, এই বাক্‌সূক্তে বা দেবীসূক্তে বাগ্ ও দেবী নিজে বেদান্তবেদ্য পরমাত্মার স্তুতিতে তন্ত্রপ্রতিপাদ্য পরাশক্তিও স্তুত হইয়াছেন। সুতরাং তন্ত্রোক্ত পরাশক্তি ও বেদোক্ত পরমাত্মা অভিন্ন। দেবীসূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি-অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।"

অনুবাদ — "আমি রুদ্রগণের সহিত, বসুগণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্যগণ সহ এবং বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। আমি মিত্র-বরুণ উভয়কে ভরণ করি, আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে এবং অশ্বিনীদ্বয়কে পালন করি"। ('বৈদিক সাহিত্য সংকলন', শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়)

এই দেবীসূক্তে ঋষি বাগ্ দেবী পরমাত্মা দেবতা। ঋষি এখানে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন। দ্রষ্ট্রী ঋষি হইলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। দেবতা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ঋষির নামানুসারে এই সূক্তটিকে বাক্ সূক্তও বলা হয়। আত্মস্তুতি বলিয়া স্তুতিটি আধ্যাত্মিক।

এই মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে অনুভব হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে মহাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ঋষিকন্যাকে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে স্বকীয় পরমস্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থে প্রবেশ করিবার জন্য এই সূক্ত তোরণ-স্বরূপ। যে সকল তত্ত্ব চণ্ডী গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় বীজাকারে এই দেবীসূক্তে বিরাজমান।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেন যে, এই দেবীসূক্তে বাগ্‌দেবী নিজে

পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বেদ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্তুতিতে তন্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তি স্তুত হইয়াছেন।

এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই সূক্তটি জপ করিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন "স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।।" (চণ্ডী, ১৩/৯) এই বৈদিক সূক্তটির জপ দ্বারা তন্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তির অর্চনা ও সাক্ষাৎকার হইল। এই জন্য এই সূক্ত, দুইটি ধারার মিলন সূত্র বলা চলে।

অনেক বিশিষ্ট তন্ত্র নিজেদের সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, কুলার্ণব বেদের সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং বেদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত "তস্মাৎ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কুলাত্মকং প্রিয়ে।" প্রপঞ্চসার ও অন্যান্য তন্ত্রে বৈদিক মহাবাক্য, যথা 'সোহহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। মেরুতন্ত্রে বলা হইয়াছে, মন্ত্র যেমন বেদের অংশ, তন্ত্রও তেমন বেদের অংশ।

মনুসংহিতার বিখ্যাত ভাষ্যকার কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন — শ্রুতি দ্বিবিধ: বৈদিক ও তান্ত্রিক — "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি-কীর্তিতা।" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রটি মহানির্বাণতন্ত্র (৭ম, ১৮) মতে তান্ত্রিক কুলাচার-এর পরমলক্ষ্য, যাহার উপলব্ধিকে প্রপঞ্চসার তন্ত্র (১৯ অধ্যায়) পঞ্চম বা তুরীয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের আরাধ্য দেবতা মহাদেব। মহাদেব ও রুদ্রকে কখনও কখনও পৃথক্ জ্ঞান করা হইয়াছে; কিন্তু সংহিতায় ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাতে আর্য-অনার্য উভয়ের মধ্যেই রুদ্র দেবতার পূজা ও উপাসনা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আর্য ও অনার্য উভয়েই মিশিয়া গিয়াছে।

শুক্লযজুর্বেদের ১৬শ অধ্যায়টি রুদ্রাধ্যায়, এই রুদ্রাধ্যায়ে শতরুদ্রিয় নামক হোমমন্ত্র বলা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রটি —

"নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুত তে নমঃ।।"

অর্থাৎ, "হে দুঃখনাশক জ্ঞানপ্রদ রুদ্র, তোমার ক্রোধের উদ্দেশ্যে নমস্কার, তোমার বাণ ও বাহুযুগলকে নমস্কার করি।"

শেষ মন্ত্রটি হইতেছে — "নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্ন-মিষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ। তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃডয়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ।।"

"পৃথিবীতে যে রুদ্রগণ আছেন, অন্নই যাঁদের বাণতুল্য আয়ুধ, তাঁদের প্রতি নমস্কার। তাঁদের উদ্দেশে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্ধ্বদিকে অঞ্জলি বদ্ধ করে নমস্কার করছি। সে রুদ্রগণ আমাদের রক্ষা করুন ও সুখ দিন। তাঁরা যে পুরুষের দ্বেষ করেন, আমরা যাদের দ্বেষ করি ও আমাদের যারা দ্বেষ করে, রুদ্রদের মুখে তাদের স্থাপন করছি।"

রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে বৈদিক ধারা ও তন্ত্রধারার মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে বলিয়া বুঝা যায় না। অথর্ববেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হইয়াছে। (অথর্ব, ৭/৮৭/১)

অথর্ববেদই তন্ত্রবিদ্যার উৎস বলিয়া মনে করেন অনেক পণ্ডিত । অথর্ববেদে আমরা ব্রহ্মোপদেশও পাই এবং বহু তুক্‌তাকের বিধান পাই। তন্ত্রের ষট্‌কর্মের আদিরূপ আমরা অথর্ববেদে পাই। তন্ত্রের যন্ত্ররচনা, বৈদিক বেদী রচনার অনুরূপ। এই দিক্ দিয়াও বেদের সঙ্গে তন্ত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

জ্ঞান দ্বিবিধ— দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে— জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয়। দর্শনের কার্য জ্ঞাতার তত্ত্বানুসন্ধান। বিজ্ঞানের কার্য জ্ঞেয় বস্তুর তথ্যানুসন্ধান। আমি ফুলটি দেখিতেছি। 'আমি কে'— ইহা লইয়া গবেষণা দার্শনিকের কার্য। আর ফুলটির উপাদান কি, ইহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য।

দর্শন সংশ্লেষাত্মক (synthetic).আর বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক (analytic)। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে, আর বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডিত জগতের দিকে। দর্শন দেখে সামগ্রিকভাবে, বিজ্ঞান দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে। সমস্ত বাগানটি একসঙ্গে দেখা দার্শনিক দৃষ্টি, আর প্রত্যেকটি গাছ পৃথক্ করিয়া দেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক।

তান্ত্রিকগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহাদের সাধনার ফলে ভারতে বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান সাধনায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের দান যে কতদূর উন্নততর ছিল তাহা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *History of Hindu Chemistry* ও মহামনীষী ব্রজেন শীল মহাশয়ের *Positive Science of Hindus* গ্রন্থদ্বয়ে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্র শব্দের অর্থ— যে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য তথ্যনিরূপণ (Systematic Scientific Study)। যেমন শল্যতন্ত্র বা surgery হইতেছে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। দেহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সুশ্রুত সংহিতার দান পাশ্চাত্ত্য দেশীয় অধুনাতম গ্রে সাহেবের Anatomy হইতে

কোন অংশে হীন নহে। পাশ্চত্ত্য পণ্ডিতগণ অষ্টাদশ শতকে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা শল্য চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতের কাছে ঋণী। পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান এখনও তন্ত্রাচার্যগণের সূক্ষ্মদেহ বিষয়ক গভীর বিশ্লেষণের নিকটবর্তী হইতে পারে নাই। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের স্বপ্নের অতীত।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে তন্ত্রের বহু অবদান রহিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে অবদান, উহার মূলে তন্ত্রশাস্ত্র।

পরিবর্তনশীল যাহা তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য। যাহা অপরিবর্তনীয় তাহা বেদ-বেদান্তের আলোচ্য। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল, সুতরাং জাগতিক তন্ত্রের আলোচনার বিষয়। সাধারণ মানবের নিকট মল, মূত্র, থুৎকারাদি ঘৃণার বস্তু, কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকের নিকট উহার মূল্য কম নয়, কারণ উহা ব্যাধির বিষয়ে সত্য নিরূপণে সাহায্য করে। লিঙ্গ যোনি ইত্যাদির আলোচনা সাধারণের কাছে অশ্লীল, কিন্তু তন্ত্র-বিজ্ঞানীর নিকট উহা অমূল্য, কারণ উহা সৃষ্টি-রহস্যের গভীর মূলদেশের সংবাদ দেয়।

দর্শনের আলোচনার বিষয় নিত্য, শাশ্বত বস্তু। ব্রহ্ম, আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তু দেশকালের সীমার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এই দেশকালাতীত সত্তা কেমন করিয়া দেশকালের মধ্যে ধরা পড়িল ইহা দার্শনিকের ধ্যানের বিষয়। আর দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবর্তনশীল বস্তুর মূল রহস্য অনুসন্ধানে তন্ত্র-বিজ্ঞান ও দার্শনিক অনুধ্যানের নিকটবর্তী। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে বেদান্তদর্শন জগদতীত তত্ত্ববস্তু লইয়া জগতের মধ্যে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। আর তন্ত্রবিজ্ঞান জাগতিক বহু বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বলাভের প্রয়াসী হন। কেবল অখণ্ড বা সামগ্রিক জ্ঞান পূর্ণ নহে, আবার কেবল খণ্ডের বা অংশের জ্ঞানও চরম নহে। জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয় যখন উহা খণ্ড ও অখণ্ড উভয় প্রকার অনুভূতি দান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টি ও তন্ত্রের বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গি এক পূর্ণ সত্যানুভূতির পক্ষে অপরিহার্য। একটি পাখীর দুইটি ডানার মত যেন এক অনন্ত সত্যের দুইটি দিক্। তন্ত্র ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক।

তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য, তত্ত্বসিদ্ধান্তকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে রূপদান করা। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়া এই

প্রয়াস। বহুবিধ-আনুষ্ঠানাদির আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্র পূর্ণ। সত্যকে জীবনের মধ্যে আনিতে হইলে অনুষ্ঠান ব্যতীত উপায় নাই। কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরই ইহার সবকিছু নয়; চিত্তের আবেগ, অভীপ্সা, সহৃদয় আকৃতি প্রভৃতি ভাবময় বস্তুও অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্লীন। তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও গভীর সঙ্কেত ইহার সহিত যুক্ত আছে যাহা ধরা পড়ে না। ক্রোড়স্থিত শিশুর প্রচণ্ড স্নেহময়ী জননীর একটি চুম্বনের মাধুর্য যেমন মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের বিশ্লেষণ দ্বারা লাভ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তি-পূতচিত্তে ইষ্টদেবের চরণে একটি সচন্দন পুষ্প নিবেদন কেবল উপাচারগুলির বিশ্লেষণে পর্যাপ্ত হয় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বহুপ্রাচীন কাল হইতে বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তসকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিতেছে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞ ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য। যজ্ঞ বেদের দান, আর পূজা তন্ত্রের। বেদ ও তন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

পাশ্চাত্ত্যদেশে বৈজ্ঞানিকেরা দার্শনিক আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছেন। তাঁহারা সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে একত্র করিয়া ও বিজ্ঞানগুলিকে একত্র করিয়া একটি দার্শনিক দৃষ্টিলাভ (unity of the sciences)-এর প্রয়াসী। প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে; কারণ বর্তমান বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য দর্শনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অধ্যাত্মদর্শনের বাইবেলের সিদ্ধান্ত, যেমন ছয় দিনে ভগবান্ এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, আদম ও ইভ আদি মানব মানবী, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে চায় না। কারণ বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে—এই বিশ্বসৃষ্টি বহু কোটি বর্ষ লাগিয়াছে, ক্রমবিবর্তনের নীতি অনুসারে (theory of evolution) বানর হইতে মানুষের জন্ম, আদম ও ইভ হইতে নহে ইত্যাদি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই অসামঞ্জস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্কৃতিকে দুর্বল করিতেছে। ইহাদের প্রয়াসের ফলস্বরূপ বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতা (Philosophy of the scientists) প্রভৃতি আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে গড়িয়া উঠিতেছে। স্যার জেম্‌স্ জিনস্ সাহেবের *The Mysterious Universe, The Universe Around us,* এডিংটন সাহেবের *The Nature of the Physical World* এবং আইনস্টাইন সাহেবের God প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতার ফল লক্ষ্য করা যায়। শুধু খণ্ডের আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল খণ্ড মিলিয়া কোন অখণ্ডের সংবাদ বহন করিয়া আনে কি না, তাহা বুঝিবার প্রয়াসই এই

বৈজ্ঞানিকের দার্শনিকতা। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকতার ক্রমঃপ্রসার Howking প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পুস্তকেও লক্ষ্য করা যায় (*A Brief History of Time*)।পদার্থবিজ্ঞানী 'ফ্রিজপ কাপ্‌রা' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে (*Tao of Physics*) ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

ভারতীয় তন্ত্রবিজ্ঞান প্রাচীন কালে অনুরূপ কার্য করিয়াছে। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক হইলেও এবং বস্তু বিশ্লেষণে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকিলেও সব মিলিয়া একটি একত্বের বা অখণ্ড সত্তার সন্ধান মিলে কিনা তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছে তন্ত্রবিজ্ঞান। ফলে তন্ত্রের একটি নিজস্ব দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্ত্রদর্শন বেদান্তদর্শন-এর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। একের মধ্যে অপরের পূর্ণতা সন্ধান পাইয়াছে। ছোটখাটো বিরোধ ও বিভেদ ঘটিলেও উহা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নাই।

বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ, তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শক্তিবাদ। বেদশাস্ত্রের নির্যাস ভগবদ্‌গীতা, তন্ত্রশাস্ত্রের নির্যাস সপ্তশতী চণ্ডী। এতদ্‌ভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও পরিণামে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছে। বেদ ও তন্ত্রের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন জাতির জীবনে মহা গৌরবের দ্যোতক। পাশ্চাত্ত্য দেশে যে বহুবিধ অশান্তি, যাহার প্রভাবে প্রাচ্যও আজ বিড়ম্বিত, তাহার বাহিক কারণ যাহা হউক, পরমার্থিক কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ। পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মদর্শন দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর ও আত্মার তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বরহস্য তন্ন তন্ন করিয়াও জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোনো সন্ধান পায় নাই। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বহির্ভূত উহাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন আজ ম্রিয়মাণ। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আমরা ভারতবাসীও আজ অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ভারতীয় ঋষি, বেদ ও তন্ত্রের, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মিলন ঘটাইয়া সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে অমৃতের সন্ধান দিয়াছেন উহা আজও অমর হইয়া আছে। যুগে যুগে শত সহস্র আঘাত ও বিপর্যয় হইতে উহা জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিয়াছে। সেই দিকে গভীর ভাবে দৃষ্টি দিয়া জীবনের বন্ধুর পথে মুখ ফিরাইয়া চলিতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা। না হইলে মহতী বিনষ্টি।

বৈদিক অনুষ্ঠান — যজ্ঞতত্ত্ব

বৈদিক অনুষ্ঠানের বহুবিধ অঙ্গ, তাহার মধ্যে যজ্ঞই প্রধান। যজ্ঞের প্রধান উপচার অগ্নি। অগ্নির বিষয় পৃথগ্‌ভাবে সবিস্তারে বলা হইবে। যজ্ঞের প্রসঙ্গে এখন কিছু বলা প্রয়োজন:

প্রতি জীবেই অগ্নি আছেন, আছেন ঘুমাইয়া। পূজা, আরাধনায় তিনি জাগ্রত হয়েন। তখন জীবের অন্তরে জাগে পরমপুরুষের সহিত মিলনের তীব্র লালসা। অগ্নিতে তাপ আছে, আর আছে আলো। তাপ পরব্রহ্মের তপঃশক্তি, আলো তাঁহার জ্ঞানশক্তি।

আমাদের অন্তরের নিদ্রিত-অগ্নি জাগ্রত হইলে চলিয়া যায় সকল পথের বাধা, দূর হয় জীবনের ক্ষুদ্রতা। অন্তরে জাগে এক বিশাল ব্যাপকতা। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি দূরে যায়, বিশ্বের সকলকে আপন করিয়া লইতে সাধ জাগে। যিনি সকল জীবনের জীবন, তাঁহার সন্ধানলাভে পূর্ণতা আসে জীবনে।

বেদের সর্বপ্রথম সূক্ত 'অগ্নি'। সূক্তটির দ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দাঃ, ছন্দ গায়ত্রী। গায়ত্রী চব্বিশ-অক্ষর ছন্দ, তিন পাদ, প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর। যজ্ঞে অত্যাবশ্যক বস্তু অগ্নি। সূক্তটি অগ্নির স্তব।

ঘৃত যুক্ত করিয়া অগ্নিতে আহুতিদানই যজ্ঞ। যজ্ঞ করিয়া আমাদের লাভ কী? এই সম্বন্ধে শ্রীগীতা গ্রন্থে শ্রীভগবানের উক্তি —

> "দেবান্ ভাবয়তাহনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
> পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।" ৩/১১

শ্রীভগবান্ সকল মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন — "তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে সম্বর্ধনা কর, দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন। এইরূপে পরস্পরের সম্বর্ধনাদ্বারা পরস্পর মঙ্গললাভ করিবে।"

দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যত্যাগ বা উৎসর্গ করা হয়, তাহার ফল দেবতায় সাযুজ্য। এই সাযুজ্য ঘটিলে শ্রেয়োলাভ হয়। শ্রেয় কি? বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে নিজ জীবনের ছন্দের মিলন বা একাকারিত্ব। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

বেদের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে — অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, অগ্নি যজ্ঞের হোতা, অগ্নি দীপ্তিমান্, অগ্নি যজ্ঞের ঋত্বিক্, দিব্য ঋত্বিক্, অগ্নি রত্নধারী, উৎকৃষ্ট রত্নদাতা। ইহাদের প্রত্যেক শব্দই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

প্রারম্ভে প্রাথমিক ব্যাখ্যা করিতেছি। অগ্নিকে ঋত্বিক্ কেন বলা হইল? 'ঋতু' হইতে ঋত্বিক্ শব্দ। ঋতুর রহস্য না জানিলে তিনি ঋত্বিক্ হইতে পারিবেন না। ঋতু শব্দটি উপলক্ষণ — ঋতু বলিতে বর্ষাদি ঋতু, অগ্রহায়ণাদি মাস, পূর্ণিমা - অমাবস্যাদি তিথি, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ও যজ্ঞের কাল বুঝায়। যিনি ঋতুর তত্ত্ব জানেন, গীতার ভাষায় তিনি অহোরাত্রবিদ্ বা অহর্বিদ্। বেদেও অহর্বিদ্ শব্দ আছে (অহর্বিদঃ, ঋ. ২।২।২)। কোন্ সময়ে কোন্ যজ্ঞ করণীয় ইহা যিনি জানেন, তিনি ঋত্বিক্। অগ্নি ঋত্বিক্, নিজেই নিজের যজ্ঞ করেন। বস্তুত যজ্ঞ আমরা করি না, আমাদের মধ্য দিয়া তিনিই আহুতি দেন। তাঁহার কৃপায় আমাদের হৃদয়ে জাগে আকূতি। আকুতির ফলে আসে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আমাদের প্রবর্তিত করে যজ্ঞকর্মে। যজ্ঞ হয় ভিতরে ও বাহিরে। বাহিরের যজ্ঞ যজ্ঞবেদীতে, অন্তরের যজ্ঞ হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

যজ্ঞের অর্থ হইল মানব তাহার আপন সত্তার মধ্যে যাহা ধারণ করে তাহা দিব্যপ্রকৃতির নিকট প্রদান করা। ইহার ফলস্বরূপ দেবগণের প্রভূত প্রসাদলাভে তাহার মনুষ্যত্ব সমৃদ্ধতর হয়। যজ্ঞ হইল একপ্রকার যাত্রা বা অগ্রগতি।

যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ হইল সমিধ্ কাষ্ঠে দিব্য শিখার প্রজ্জ্বলন। ঘৃত ও সোম মদিরার নিবেদন এবং পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ। ঘৃত বলিতে সাধারণত আমরা বুঝি দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন বলকারী সুখাদ্য। কিন্তু ঘৃতের যে একটি তাৎপর্যময় গভীর অর্থ আছে, তাহা আমরা ভাবি না বা বুঝি না। ঋষিরা যোগ্যজনকে তাহা জানাইয়াছেন। 'ঘৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ঘৃত। 'ঘৃ' অর্থ দীপ্ত করা এবং দীপ্ত হওয়াও বটে। সায়ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন — "ধিয়ং ঘৃতাচীম্" — ইহার সহজ অর্থ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় বুদ্ধি। ঘৃত অর্থ দীপ্তি, ইহা বাহিরের আলোক মাত্র নহে, অন্তরের জ্যোতি। অগ্নি হইলেন 'ঘৃতাচীম্', জ্যোতির্ময়-ভাবনায় যাঁহার আনন্দ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Take joy in the luminous thought"।

ঘৃত আমাদের নির্মল চেতনা। তাহা আমরা দেবতাদের তরে উৎসর্গ করি। অগ্নি তাহা কেবল দেবতাদের হাতে পৌঁছাইয়া দেন না; অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত, দেবতারা যাহা আমাদের প্রদান করেন তাহাও লইয়া আসেন আমাদের সমীপে। দেবতারা প্রদান করেন তাঁহাদের শুভ আশীর্বাদ, কল্যাণময় প্রসাদ, যাহাতে ঘটে সকল দুঃখের চির অবসান।

"প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" (গীতা, ২/৬৫)

সুতরাং যজ্ঞের আসল অর্থ পাওয়া গেল — মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে ঘৃত সমর্পণ। এখন মন্ত্রের কথা একটু বলা প্রয়োজন। মন্ত্র হইল সত্যের মনন দীপ্তি প্রকাশিকা চিদাবিষ্ট বাণী, যাহা আন্তরপুরুষ হইতে

উত্থিত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে গঠিত ও মনের দ্বারা রূপায়িত হয়। এই মন্ত্র শুদ্ধ-হৃদয় ঋষিদের চিত্তে স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়।

যজ্ঞে ঘৃত ও মন্ত্রের কথা হইল। এই সকল ছাড়া যজ্ঞে অপর প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে 'সমিধ্'। সমিধ্ এক টুকরা কাঠ, লম্বায় এক বিঘৎ, বুড়া আঙ্গুলের মত মোটা — পলাশ, অশ্বত্থ অথবা যজ্ঞডুমুর গাছের কাঠ। ইহা হইল যজ্ঞবেদীর যজ্ঞের সমিধ্, আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে যজ্ঞ তাহার সমিধ্ হইল চিত্তের লালসা, পরমদেবতাকে পাইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা লোলুপতা। এই লোলুপতা জাগিলে সাধ জাগে ভাবগ্রাহী শ্রীভগবানের আনন্দসেবায় জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া রাখিতে। সমিধ্-অগ্নি হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া তোলে উষার আলো। উষার আলো একটি সংকেত। কিসের সংকেত? এখনই সূর্য উদিত হইয়া আলোকের প্লাবন আনিবেন। সেই প্লাবনের সঙ্কেত আছে মন্ত্রে — 'অগ্নিমীলে'। ঈল্ ধাতুর কার্য হইল ঈলন্। ঈলন্ তিন প্রকার — বাক্য দ্বারা স্তবন, ঘৃত দ্বারা বর্ধন ও নমঃ দ্বারা পূজন।

ঈলিত অগ্নি পবমান সোমের সহায়তায় চিত্তে আনন্দের ধারা আনিয়া দেন। ঈলনের পর অগ্নির আধান। 'আধান' পদে স্থাপন বুঝায়। তিনি ছিলেন অন্তরে ঘুমন্ত, তাঁহাকে চেতনার পুরোভাগে স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। তাই অগ্নি জীবনযজ্ঞে পুরোহিত। আমাদের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রাপথের তিনি দিশারী। অগ্নি সর্বদাই ঊর্ধ্বশিখ। তাঁহাকে পুরোভাগে রাখি দিশারীরূপে, তাই তিনি পুরোহিত। তিনি আমাদের আত্মজ্যোতিকে বিশ্বজ্যোতিতে পরিণত করিবার জন্য ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন।

যজ্ঞ কেবলমাত্র বাহিরের অনুষ্ঠান নহে। বাহির ও অন্তর উভয় ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান যুগপৎ সংঘটিত হয়। যজ্ঞ অন্তরে বিদ্যার সাধনা এবং তাহার মূলে রহিয়াছে 'ধী'। 'ধী' দেবতার আশীর্বাদ। দেবতা বরেণ্য। আমাদের শুধু তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যখন আমরা তাঁহাকে অন্তর দিয়া বরণ করি, তিনি হইয়া উঠেন আনন্দে উচ্ছল। যজ্ঞের ফলে আমাদের দেবজন্ম। তিনি তখন গীতার ভাষায় আমাদের বীজপ্রদ পিতা। তিনি পিতা হইয়া জন্ম দেন, হোতা হইয়া পরিপালন করেন। পরিপালন করেন রত্নদ্বারা। 'রত্ন' হইল অমৃত চেতনার অনির্বাণ দীপ্তি।

উপনিষদের ভাষায় রত্ন হইতেছে 'প্রজ্ঞামযতা,' দর্শনের ভাষায় 'মুক্তি', আর বৈষ্ণবের ভাষায় 'প্রেম-ভক্তি'। অগ্নির আর এক নাম 'পাবক'। অগ্নিমন্ত্র স্মরণ-মনন করিয়া আমরাও পাবক হই। অন্তর বাহির পবিত্র হয়। ''ইন্ধনকে আত্মসাৎ করে অগ্নি তাকে অগ্নিময় করে তোলেন, যেমন মুনিদের উদ্দীপ্ত চেতনা মানুষকে দেবত্বে রূপান্তরিত করে ধরে''

(বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃষ্ঠা, ১৬)। তেমনি পাবনের ঈলনে আমরাও পাবকত্ব লাভ করি।

দেবতার উদ্দেশ্যে দান হইল যজ্ঞ। দেবতাকে প্রিয় জানিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার কোন প্রিয়বস্তু দান হইল যজ্ঞ। প্রিয়বস্তুর প্রতীক হইল ঘৃত। জীবন-দুগ্ধের সার হইল ঘৃত। ঘৃত অর্থ আলো, জীবনের আলো।

ঐ দান সোজাসুজি (direct) আমার হাত হইতে দেবতা গ্রহণ করিবেন না। অগ্নির মাধ্যমে (medium) দান করিতে হইবে। অগ্নি হইলেন দেবতাগণের মুখ। ঐ মুখ দিয়াই দেবতাগণ গ্রহণ করেন, ভোগ করেন। এই হেতু সকল দেবতা হইতে অগ্নির বৈশিষ্ট্য অধিক। অগ্নির এই কাজ অপর কেহ করিতে পারেন না। বেদে বহু অগ্নি-সূক্ত আছে। অগ্নির উপাসনা অতি প্রাচীন। ভারত ব্যতীত পারস্য, মিশর, গ্রীস ও রোম দেশে প্রাচীনকালে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল। অগ্নিবাচক Latin শব্দ Ignis, শ্লাভোনিক ভাষায় অগ্নি হইতেছে Ogni, প্রায় একই শব্দ। গ্রীস দেশের পৌরাণিক কাহিনী — Prometheus স্বর্গ হইতে অগ্নিকে মর্ত্যে আনিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে অগ্নির জন্ম দ্যুলোকে, মাতরিশ্বা তাঁহাকে লইয়া আসেন মর্ত্যে। বেদে অগ্নির বহু নামের একটি প্রমন্থ। এই নামের সঙ্গে গ্রীস্ প্রমিথিউস্ নামের খুবই সাদৃশ্য। উচ্চারণ ও অর্থের সাদৃশ্য বিশেষ চিন্তনীয়। অগ্নিপূজা কত ব্যাপক!

অন্ধকার পৃথিবীতে যেদিন প্রথম অগ্নি দেখা গেল, সেই দিন মানব ও মানবেতর সকল জীবগণের যে কী আনন্দ, তাহা আজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ঋ. ১০/১২৯ নাসদীয় সূক্তে প্রথম অন্ধকারের আভাস আছে। অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।" বীজের মধ্যে যে অপ্রকাশিত গাছ থাকে তাহাও অন্ধকারে। মাতৃকুক্ষিতে যে সন্তান থাকে, সেও অন্ধকারে থাকে। অনন্ত বীজের এই আদিম অন্ধকার বরুণের অধিকারে। অন্ধকার দুই প্রকার — একটি গতিহীন স্থির, অপরটি গতিশীল। এই গতিশীল আঁধারের আড়ালে যাহা আছে তাহা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা লাগিয়াই আছে।

একটি সিন্দুকের মধ্যে যে অন্ধকার উহা প্রথম প্রকারের, সিন্দুকের দ্রব্যগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঐ আঁধারের সরিয়া যাইবার কোন প্রবণতা নাই। আর অমাবস্যা রাতের যে অন্ধকার সে সর্বদাই সরিতেছে। তাহার মধ্যে যাহা ঢাকা ছিল তাহা সর্বদা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই তাহার স্বভাব। গতিহীন অন্ধকার আবরক, গতিশীল অন্ধকার সংবরক। যাহা আছে তাহার গর্ভে সকলই সংবরণ করিয়া রাখিয়াছে, ক্রমে ধীরে, অতি ধীরে ব্যক্ত করিবার জন্য। অনন্ত বিশ্ব যে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই অন্ধকার সংবরক। তাহার আড়ালে যে শক্যতা

(Potentiality) তাহা সর্বদাই প্রকাশের অপেক্ষায়। এই মহা অন্ধকারের অধিপতি বরুণ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, বরুণ অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা। 'বৃ' ধাতুর অর্থ আবরণ করা। আলোর শক্তি মিত্র, আর অন্ধকারের শক্তি বরুণ। জগৎময় সর্বত্র মিত্র-বরুণের কার্য চলিতেছে। এই মিত্র-বরুণের আর এক রূপ অগ্নিযোম। এই নিখিল জগৎ অগ্নিষোমীয়।

সূর্যের আর এক নাম মিত্র। সূর্য ও অগ্নি, একই বস্তু। তাই মিত্রই অগ্নি। আর বরুণকে পৌরাণিকেরা জলাধিপতি করিয়াছেন, ইহা নিরর্থক নহে। বেদেও বরুণ জলাধিপতি সমুদ্র। জলই জীবন, জলের সারভাগ জীবনের সারাংশ হইল সোম বা আনন্দ। এক ভূমিতে যাহা মিত্র-বরুণ, আর এক ভূমিতে তাহা অগ্নি-সোম।

পুরাণকারেরা বলেন, অগ্নির পত্নী স্বাহা। অগ্নির দাহিকাশক্তিই স্বাহা। স্বাহা হইল যজ্ঞের আকুতি, আর স্বধা হইল আরাধ্য দেবতার সম্মতি। উপরের সম্মতি না হইলে নিচের আকুতি বা আস্পৃহা জাগে না। সাধনার ফলে করুণা, আরও সঠিক কথা, করুণা সিঞ্চনে সাধনার অঙ্কুর। স্বাহা মন্ত্রে আত্মোৎসর্গ। স্ব অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত, স্বর্গত; আহ অর্থাৎ আহ্বান, আবাহন, সমর্পণ। তাই স্বাহা অগ্নির সহধর্মিণী। ব্যাকরণ মতে চতুর্থী বিভক্তি হইল দাতৃত্ব। অগ্নির সম্পদ্ ছিল, দাতৃত্ব ছিল না। স্বাহা যুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাতৃত্বের উদয় হইল। চতুর্থী বিভক্তি তাহার দ্যোতক — 'অগ্নয়ে স্বাহা'।

অগ্নি নিখিল প্রাণময় জগতের তেজঃশক্তি। তাই অগ্নির আর এক নাম 'জাতবেদাঃ', বিদ্যার জন্মদাতা বা জ্ঞানযুক্ত হইয়াই জাত। অগ্নি একটি পাবক বা পবিত্রকারী সেতু, মানবত্ব ও দেবত্বের মধ্যস্থলে। অগ্নি পৃথিবীর নাভি, অমৃতেরও নাভি। (ঋ. ৩/১৮/৪)

বেদে যজ্ঞকে বলা হইয়াছে পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তুলাভের নিশ্চিত উপায়। সুতরাং সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩-২-১-৪)। যজ্ঞের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপিত হয় মানুষ ও দেবতায়, স্বর্গ ও পৃথিবীতে, দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুতে। যজ্ঞের মাধ্যমে যাজ্ঞিক, যজ্ঞের পুরোহিত, দেবতা এবং স্বর্গ — একে অন্যের নিকটবর্তী হয়। যজ্ঞ পরমপ্রাপ্তির সহায়ক। যজ্ঞ মানুষকে লইয়া যায় উত্তাল জলতরঙ্গ পার করিয়া এক অনাবিল শান্তির তটে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১-৩-২)।

দেবতারা চাহেন আহুতি, পুরোহিতেরা চাহেন যজ্ঞের দক্ষিণা এবং যজ্ঞকারী যজ্ঞের মাধ্যমে আশা করেন পার্থিব সমৃদ্ধি এবং স্বর্গীয় আশীর্বাদ। সেইজন্য 'শতপথ ব্রাহ্মণ' যজ্ঞকে বলেন — সর্বজীব ও সর্ব দেবতার আত্মা। যেহেতু যজ্ঞেই পৃথিবী রক্ষিত হয়, সেইহেতু যজ্ঞকে বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। ইহা মহাজাগতিক কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে

সাহায্য করে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩-৯-৫-৫)। বেদে মহাজাগতিক ক্রিয়াপ্রণালীকে বলা হয় ঋতম্, যাহার অর্থ হইল, 'সত্য'। যজ্ঞের উৎসই ঋতম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১-৩-৪-১৬)। আবার ঈশ্বরভক্তি লাভের প্রকৃষ্ট পথই যজ্ঞ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১-৫-২)।

'ব্রাহ্মণ' এই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন যে, একই জীবনে মানুষের তিনবার জন্ম হয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় জন্ম হয় উপনয়নে — দ্বিজত্বলাভে। তৃতীয় জন্ম হয় তখনই যখন মানুষ কোনও যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণে উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম না বলিয়া যজ্ঞকেই দ্বিতীয় জন্ম বলিয়াছেন। মৃত্যুকে তাঁহারা বলিতেছেন তৃতীয় জন্ম। কারণ, মৃত্যু বলিতে এখানে বুঝানো হইয়াছে স্বর্গরাজ্যে জন্ম। জাগতিক মৃত্যুর পর আত্মা তাহার পার্থিব সবকিছু ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় অমরত্বের জগতে এবং সেইখানে তাঁহার যজ্ঞলব্ধ পুণ্যের ফলে দেবতাদের নিত্যসঙ্গী হইয়া বাস করে। যজ্ঞকারী তখন জীবনের এক নূতন অবস্থা লাভ করেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে তৃতীয় জন্ম (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১-২-১-১)। যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই নবজন্ম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (১-১-৩)।

গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে, ঠিক একইভাবে দিব্যজীবন লাভের জন্য যজ্ঞকারীকেও নানাবিধ কষ্টভোগের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হয়। ইহাই নবজন্ম। সুতরাং যজ্ঞ শুধু পার্থিব ও অপার্থিব লাভই আনিয়া দেয় না, যজ্ঞকারীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়, জীবনটাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এইভাবে যজ্ঞের মাধ্যমে সাধক দিব্য জীবনের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহাকে আরাধনার জন্য যজ্ঞকারী যজ্ঞ করিয়া থাকেন, যজ্ঞের ফলে তিনি সেই ঈপ্সিত বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারই আকারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই জগতে বাস করেন। এই তিন প্রকারের মিলনকে বলা হইয়াছে — সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য।

শুধু মরণশীল জীবই নহে, দেবতারাও স্বর্গীয় মর্যাদা এবং মহিমা লাভ করিয়াছেন যজ্ঞের মাধ্যমে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১-৫-১-৬)। দেবতারা যেহেতু অমর, যজ্ঞকারীরাও অমরত্বলাভ করিয়া থাকেন, দেবতাদের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১-৫-২)।

যজ্ঞকারীর মত যজ্ঞ নিজেও দেবতা এবং মিলিত হয়েন যজ্ঞকারীর সহিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, কৌষীতকি ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ একই সুরে বলিয়াছেন — যজ্ঞই বিষ্ণু ('যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ', শতপথ ব্রাহ্মণ, ১-৭-১-১২); যজ্ঞই অগ্নি। বিষ্ণুকে বলা হয় 'যজ্ঞ-ঈশ্বর', 'যজ্ঞ-ভৃক্ত', 'যজ্ঞধান', 'যজ্ঞবাহন', 'যজ্ঞবীর্য', 'যজ্ঞসার' ও 'যজ্ঞভৃৎ'।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই এই যজ্ঞাদির তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন বেদশাস্ত্র শুধু প্রকৃতির পূজা, আর আর্যদ্বারা দ্রাবিড় ভারতের আক্রমণের কবিত্বময় বিবরণ।

বেদজ্ঞ ঋষির নিকট যজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। বেদের মধ্যে একটি যুদ্ধের ব্যাপার আছে, উহা জীবনযুদ্ধ। সপ্তশতী চণ্ডী বলিয়াছেন —

"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।"

শতবর্ষ অর্থাৎ মানবের পূর্ণ আয়ুষ্কাল, সারাজীবন ধরিয়াই দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। এই দেবাসুরের যুদ্ধ আলো-অন্ধকারের যুদ্ধ, সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ; গীতার ভাষায় দৈব ও আসুরিক সম্পদের যুদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কি বুঝিতেন তাহার একটি রূপরেখা মাত্র প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন যে, এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জ্যোতি ও অন্ধকারের, সত্য ও অসত্যের, বিদ্যা ও অবিদ্যার, মৃত্যু ও অমৃতত্বের মধ্যে। ইহা মূলত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের মধ্যে সংগ্রাম। বেদের কেন্দ্রীয় ভাবনা হইল অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্যের জয়সাধন এবং সত্যের দ্বারা অমৃতত্বের জয়সাধন।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইল পরতর বা দিব্য সত্তা জয় করা এবং ইহার সহিত অবর বা মানুষী অস্তিত্বকে অধিকার করা। ইহাকে দিব্য সত্তায় পরিণত করা।

যজ্ঞের এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমার কথা নহে, বর্তমান যুগের ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীঅনির্বাণ প্রমুখ মনীষিগণের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি। যজ্ঞের আর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। ঋষি নারায়ণ দৃষ্ট বেদের পুরুষসূক্তে (ঋ. ১০/৯০)।

যজ্ঞই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উৎস। সেই প্রথম যজ্ঞ যিনি করিয়াছিলেন, সেই পরমদেবতা 'পুরুষ'। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত বা সৃষ্টিস্তোত্রে এই মহাজাগতিক যজ্ঞের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (ঋগ্বেদ, ১০/৯০)। সৃষ্টির পূর্বে প্রথম যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই কারণে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার কিছু ছিল না; সুতরাং স্রষ্টা বা পুরুষ নিজেকেই আহুতি দিলেন ঐ যজ্ঞে। ঐ যজ্ঞের ঘৃত হইলেন তিনি স্বয়ং। চারিবেদ, চারিবর্ণ, গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণী সমেত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয় হইল সেই প্রথমপুরুষের আত্মাহুতির ফলে। তাঁহার দেহের বিভিন্ন বস্তু রূপ পাইল তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে। ব্রাহ্মণের উদয় হইল তাঁহার মুখগহ্বর হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র। তাঁহার মন হইতে চন্দ্রের সৃষ্টি, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র এবং অগ্নি, এবং শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইল। তাঁহার

নাভিদেশ হইতে আকাশ, মস্তক হইতে মহাকাশ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং কান হইতে সৃষ্ট হইল গতি। এই প্রকারে যজ্ঞ হইল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উৎস।

প্রথম যজ্ঞকে বলা হইয়াছে পুরুষযজ্ঞ। ইহার দুইটি কারণ — প্রথমতঃ, পুরুষ সম্পন্ন করিয়াছিলেন যজ্ঞ। তিনিই ছিলেন যজমান। দ্বিতীয়ত, তিনিই ছিলেন আহুতির বস্তু (পশু)। সুতরাং মূল কথা হইল এই যে, পুরুষ নিজেই নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া সৃষ্টি করিলেন এই বিশ্বসংসার। যজ্ঞের মাধ্যমে প্রথম পুরুষই হইলেন বিশ্বসৃষ্টির কারণ। জগতের দৃশ্য বা অদৃশ্য প্রতিটি বস্তুই তাঁহার প্রকাশ। পুরুষ, যিনি যজ্ঞের পূর্বে ছিলেন এক ও অবিভক্ত, যজ্ঞ সম্পাদনের পরে হইলেন বহু। উপনিষদেও একই চিন্তা ধ্বনিত হইয়াছে। এক বস্তু হইলেন বহু, পুনরায় এক হইলেন। পুরুষের প্রথম যজ্ঞ হইতে সব কিছু সৃষ্টি, আবার এই যজ্ঞের ফলে সৃষ্ট আহার্যের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ বাঁচিল। বাঁচিয়া আবার সেই মানুষই দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য যজ্ঞ করিয়া এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিয়া তাঁহারই সহিত মিলিত হইল। এই মিলনে মানুষ আবার যথাস্থানে ফিরিয়া গেল।

পুরুষ কর্তৃক যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যাপারটি অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও বিচার করা যাইতে পারে। স্রষ্টা নিজেই যজমান, আবার নিজেই আহুতির বস্তু; তিনি নিজেই নিজেকে আহুতি দিলেন। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যজ্ঞের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন আত্মবলিদান। যজমান আত্মাহুতিতে অসমর্থ বিবেচনায় পশুকে আহুতি দেওয়া হয়। কোন যজ্ঞে যজমানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। তখন যজমান ভাবনা করেন যে, তাহার পূর্বের দেহ জ্বলিয়া গিয়াছে। তিনি ঈপ্সিত দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে ঋষিদের সশরীরে যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

> ''সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
> দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।'' (ঋ. ১০/৯০/১৫)

শ্রীঅমলেশ তাঁহার ''মর্তেষু অমৃত'' গ্রন্থে যজ্ঞপুরুষ প্রসঙ্গে বলেন —এই যজ্ঞপুরুষের সাতটি আসন অর্থাৎ বেদের সপ্তছন্দে তাঁর আসন পাতা, অথবা সপ্তলোকে তাঁর যজ্ঞাসন বিস্তৃত। এই বিশ্বযজ্ঞের 'পরিধয়ঃ', বেদী বা আশ্রয় তিনটি, দেহে মনে প্রাণে এই তিন স্তরে, অথবা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে বিস্তৃত তাঁর যজ্ঞের বেদী ধুরি বা আশ্রয়। সপ্তভুবন জুড়ে বিশ্বদেবতার দেবযজ্ঞ, তাতে দেহ-মনঃ-প্রাণের তিন তিনটি আহুতি স্বরূপ তিনটি করে সমিধ্ করা হয়েছে। তাই তিন গুণিত সাত এই নিয়ে বিরাট্ যজ্ঞ পুরুষ। দেবগণ যে বিশ্বযজ্ঞকে বিস্তৃত করলেন তাতে বিধৃত

করলেন সেই পুরুষকে, সেই ভূমাপুরুষই পশুম্। প্রজাপতির যজ্ঞদৃষ্টিই পশুম্।"

শ্রীঅমলেশ পশু শব্দের সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন— "পশু শব্দ পশ্ ধাতু থেকে, অর্থ দেখা। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, অগ্নি পশুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন প্রজাপতি তা দেখলেন, 'প্রজাপতি এতম্ অপশ্যত অস্মাদ্ বৈ তে পশবঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬-২-১-৪); যাস্ক ঋষি তাই অর্থ করেছেন, "পশু পশ্যতেঃ" (নিরুক্ত, ৩/১৬)। পশ্ ধাতুর আর একটি অর্থ হল বন্ধন; পাশ, পাশবদ্ধ, যে বাঁধা আছে সেই পশু, এই বিশ্বযজ্ঞে স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ বাঁধা রয়েছেন তাই সেই অর্থেও তিনি পশুম্। তিনি যজ্ঞদৃষ্টি, তিনি যজ্ঞবদ্ধ।" (মর্ত্যেষু অমৃত, পৃ. ৮০)

পশু তিনিই, যিনি 'সর্বান্ পশ্যতি অবিশেষেণ' — সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন।

যজ্ঞবেদী

ঋগ্বেদে ৩য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋকে উপদেশ করিতেছেন —

"ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা।"

বৈদিক-সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী বা কুণ্ডের নাম যে 'দক্ষ-তনয়া' ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। যজ্ঞবেদীতে অগ্নি থাকিত বলিয়া অথবা দক্ষতনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিক যুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নহেন। কেননা রুদ্র শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তাহা ছাড়া শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় রুদ্র সর্ব পশুপতি উগ্র অশনি ভব মহাদেব ও ঈশান—এই অষ্ট মূর্তির নাম পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষকন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির সহিত বেদী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিবদুর্গার বিবাহ ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিভাইয়া রাখিতেন; সেই সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোন অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদী রক্ষা করিতেন।

"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতাম্।"

যজমান জ্যোতিষ্মতী, সম্পূর্ণলক্ষণা ও স্বর্গপ্রদায়িনী বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ঋষিরা এই বেদী বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবি প্রভৃতি দানের প্রয়োজন হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ দক্ষকন্যার উপর পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন। অগ্নির নামানুসারে ইহাকে 'হব্যবাহনী' বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০/১৮৮/৩) ঈরিত হইয়াছে --

"যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ।
তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু।।"

অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্তি আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশদিক্ দুর্গার দশহাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকিতেন। একজন যজ্ঞের সূচনা করেন। তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ-স্বরূপ। মূর্তিমান বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্ত্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন। আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁহার চারি হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও যজমান, এই চার হাত। দুর্গার পক্ষে এইগুলি ঠিক খাটে।

যজ্ঞ ও পশুবলি

কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।।" ৯

এই শ্লোকটি পড়িলে মনে হয় শ্রুতি-উক্ত যজ্ঞে এত পশু বধ হইত যে, তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এই কথাটি কবির উক্তি। ইহা অতিশয়োক্তি, ঐতিহাসিক নহে। যজ্ঞে পশুবধ হইত, তবে তাহা খুব সংযমের সহিত। যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা বধ করা যাইত না। সংহিতায় কতকগুলি সূক্ত আছে, তাহার নাম আপ্রীসূক্ত। ঐ

সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি ও তাঁহার বিভূতিসমূহ। ('আপ্রীদেবগণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) পশুযাগে বিনিয়োগ। যে ব্যক্তি যজমান তাঁহাকে বলে আহিতাগ্নি। তাঁহার অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞে পশুবধ। তাহা বছরে ছয়বার করার সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে মাত্র একটি পশুবলি হইত। আর একটি বিশিষ্ট যজ্ঞ আছে সোমযাগ। তাহাতে একাধিক পশুবধ হইলেও সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। ইচ্ছামত বাড়াইবার উপায় ছিল না। অধিকন্তু সোমযাগ খুব জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। সকলের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হইত না।

বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি সম্বন্ধে একটি সংযম ছিল। জয়দেবের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী। এই সময় তান্ত্রিকমতের বেশ প্রাধান্য ছিল। তান্ত্রিকদের শক্তিপূজায় পশুবধ বেশী হইত। তাহার মধ্যেও অনেক নিয়ম ছিল। তথাপি ঐ সময় তান্ত্রিক যজ্ঞাদি দেখিয়া জয়দেব বেদনাযুক্ত হইয়া হয়তো বুদ্ধদেবের সম্বন্ধেও উহা আরোপ করিয়াছেন। বেদেতে পশু ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। পশু প্রমত্ত কিন্তু বশ্য। পশু দেবতার বাহন হইবার যোগ্য। এই যোগ্যতাকে সার্থক করিতে হইলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া তাহাকে চিন্ময় হইতে হইবে। আমার প্রাণটিই পশু, আমাদের ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার নিত্য দহনই অগ্নি। আমার আত্মাই দেবতা, সমিদ্ধ চেতনার সংবেগে ইন্দ্রিয় পশুরূপে রূপান্তর — পশুযাগের এই মূল তাৎপর্য। বৈদিক ঋষিরা পশুযাগ বলিতে ইহাই বুঝিতেন। বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎ প্রাপ্তির তীব্র লালসার দ্বারা চিন্ময় করিয়া লওয়াই পশুযাগ। ইহা যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা যখন-তখন নিরীহ পশুযাগের ব্যবস্থা করিতেন না।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চণ্ডী। চণ্ডীতে দুর্গামাতার পূজার কথা আছে। পূজার পূজক ছিলেন সমাধি বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সুরথ রাজা। ব্যবস্থাপক ছিলেন মেধস্ ঋষি। পূজায় রক্ত লাগে। এই রক্ত সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য নিজের বুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

"দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।" (চণ্ডী, ১৩/১১)

অর্থাৎ নিজগাত্র হইতে বহির্গত রক্ত দ্বারা রঞ্জিত। ইহাতে বুঝা যায়, যাঁহারা শাস্ত্রীয় ভাবে পূজা করিতেন, তাঁহারা নিরীহ পশু বধ করিয়া রক্ত দিতেন না, নিজ দেহ হইতে বাহির করিয়া রক্ত দিতেন। বর্তমানে তমোময় যুগে যখন-তখন পশুবলি হয়, তাহা তন্ত্রের যুগে ছিল না, বৈদিক যুগে তো ছিলই না। সুতরাং যজ্ঞে বহু পশুবধ হইত — এই উক্তি নিরর্থক। 'বলি' শব্দের সহজ স্বাভাবিক অর্থ উপহার; বধ সাধন নহে।

যজ্ঞে আহুতি

"ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৃর্জনয়ত স্বধাভিঃ।
বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্।।"
(ঋ. ১/৯৫/৪)

অনুবাদ — "অন্তর্হিত অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে? সেই অগ্নি পুত্র হইয়াও তাঁহার মাতাদের জন্মদান করেন। মহৎ, মেধাবী ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হন।"

"বৎসো মাতৃর্জনয়ত স্বধাভিঃ"— সায়ণাচার্য মনে করেন, বৈদ্যুতাগ্নি মেঘরূপ পুত্র হইয়াও আবার বৃষ্টি-জলের কারণ হইয়া থাকেন। পার্থিব অগ্নিকেই হব্য প্রদান করা হয়। তাহা সূক্ষ্ম ভাবে আদিত্যমণ্ডলে যাইয়া বৃষ্টি করে। কথাটি বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। সেই কারণে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

অগ্নি জলের গর্ভ অর্থাৎ পুত্রস্থানীয়, এই কথা বেদের বহু মন্ত্রে বলা হইয়াছে। আবার এই কথাও আছে যে, অগ্নি জলের গর্ভ রচনা করে।

"গর্ভো যো অপাং, গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং, গর্ভশ্চরথাম্।
অদ্রৌ চিদস্মা, অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো, অমৃতঃ স্বাধীঃ।।"
(ঋ. ১/৭০/২)

অর্থাৎ, "যে অগ্নি জলের মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাকে কি যজ্ঞগৃহে, কি পর্বতের উপরে লোকে হব্য প্রদান করে? প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কাজ করেন, অমর অগ্নিও সেইরূপ আমাদের হিতকর কার্য সম্পাদন করেন।"

অগ্নি যখন অন্তর্হিতভাবে থাকেন তখন তিনি আছেন সর্বভূতে। অগ্নি জলের গর্ভে বাস করেন, আবার জলকে উৎপাদন করেন। এই কথা শ্রুতি বলেন, কেন?

"ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সং পৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ।
কবির্বুধ্নং পরিমর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব।।"
(ঋ. ১/৯৫/৮)

অর্থাৎ, "যখন অগ্নি অন্তরিক্ষে গমনশীল জল দ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন তিনি সর্বলোকের ধারক ও মেধাবী হয়েন। ঐ অগ্নি সকল জলের মূলীভূত অন্তরিক্ষ তেজদ্বারা আচ্ছাদন করেন।"

কোন দ্রব্যের দানা বা ক্ষুদ্রাংশ (particle) যদি কিঞ্চিৎ তড়িৎ শক্তি, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক (positive or negative) আধান বহন করিয়া বেড়ায়, তখন সেই চার্জ-বিশিষ্ট কণাকে 'ion' বলা হয়। কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের কণাগুলি যদি ইলেকট্রিক চার্জ বহন করে তবে তাহা আয়োনাইজ্‌ড (ionised) হইয়াছে বলি।

কোন গ্যাস (gas) ionised হইলে কিরূপ দাঁড়াইবে? ঐ গ্যাস অর্থাৎ তড়িৎ পরিবাহক বস্তু conductor of electricity তে রূপান্তরিত হইবে। এক্‌স্-রে (X-Ray) বা আলট্রা ভায়োলেট রে (Ultra Violate Ray)-এর সম্পাতে গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলি তড়িৎ পরিবাহক হইবে। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন হইতে জানেন, ionised

gas ইলেক্‌ট্রিসিটি পরিবাহক (conductor of electricity)। অগ্নিশিখায় দ্রব্য পুড়িয়া gas হইয়া উঠিলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলি তড়িৎশক্তির বাহক হইয়া উঠে। 'ion' আকাশে ধূলি রেণু পাইলে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসে।

অগ্নিতে ঘি ঢালিয়া যজ্ঞ করিলে কি লাভ হয়? তাহার উত্তরে আমাদের শাস্ত্র বলেন—

"অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাদ্ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।।"

যজ্ঞাগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃত প্রদান করিলে ধোঁয়া (ধূম) উত্থিত হইয়া সূর্যলোকে পৌঁছায় ও সেখানে গিয়া বৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং সেই বৃষ্টির ফলে ধরণী যথাকালে শস্যশালিনী হয়। দেশ যজ্ঞশূন্য হইলে যথাকালে বৃষ্টি হয় না। শস্যাদি উৎপন্নের ক্ষেত্রে বিশেষ বিঘ্ন দেখা দেয়। এই কথাই এখানে আলোচ্য।

ধরুন, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল। তাহার কতকাংশ গ্যাস (gas) হইয়া নির্গত হয় ও উপরে উঠে। তীব্র তাপ বা রাসায়নিক সংযোগ ঘটিবার কোন অভাব সেখানে হয় না। তাহা হইলে কি ঘটিবে? সেই ঘৃত দ্রব্যের gas তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ ionised হইয়া উঠিবে। অগ্নিশিখা ছড়াইয়া অনেক দূর উঠিলেও কণাগুলি তড়িৎশক্তি-বিহীন হইবে না। ঐ আয়ন (ion) গুলি ধূলিকণা ও ধূমকণার সঙ্গে জোট বাঁধিয়া অনেক উপরে উঠিয়া যায়। তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট কণাগুলি নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান থাকে।

বেদবাক্য বিশ্বাস করুন, আর না করুন, বিজ্ঞানীদের অভিমত এই, তড়িৎবাহী কণাগুলি (charged particles) উপরে উঠিয়া বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাইয়া মেঘে পরিণত করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

যজ্ঞে ঘৃত কেন ঢালি, কেন সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করি—ইহার একটি প্রাসঙ্গিকতা বা যৌক্তিকতা পাওয়া গেল। এই কথা ঠিক যে, যজ্ঞে ঘৃতাহুতি মেঘ রচনা করিয়া বৃষ্টি ঘটাইতে পারে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল, অগ্নির যে বিদ্যুদ্‌রূপ অর্থাৎ ionised রূপ, তাহা কেমন করিয়া জলের গর্ভ রচনা করে। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতিগুলি আদিত্যমণ্ডলে যায় কিরূপে, অগ্নিশিখায় হুত দ্রব্য কিরূপে ionised হয়? তাহার কণাগুলির কতকাংশ ধনাত্মক (positive), কতক ঋণাত্মক (negative) তড়িৎরূপ প্রাপ্ত হয় বুঝা গেল। সূর্যের চার্জ পসিটিভ, সে চার্জের মাত্রা ও voltage ভয়ানক। তাই সূর্য নেগেটিভ তড়িৎকণাগুলিকে অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলিকে নিজের

দিকে টানিয়া লয়। অতএব অগ্নিতে প্রদত্ত পদার্থেরও নেগেটিভ তড়িৎকণাগুলির আদিত্য-অভিসার করিবার কথা, ইহা নিশ্চিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতা গ্রন্থে দ্বিধাহীন কণ্ঠে এই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।" ৩/১৪

প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি।

বেদ ও গীতা শাস্ত্র যজ্ঞ হইতে মেঘ ও মেঘ হইতে বৃষ্টি সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কুসংস্কার বলিয়া মনে করা ভ্রমপ্রসূত। কারণ যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, ইহা এক অর্থে ঠিক, যেহেতু জলীয় বাষ্প ও যজ্ঞীয় বাষ্প উভয়েই মেঘ। যজ্ঞের ধূমে মেঘ, ও দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া বৃষ্টি প্রদান একই কথা। যজ্ঞের উদ্ভব কর্ম হইতে। ঋত্বিক্ ও যজমানের কর্মবিশেষ যজ্ঞ। কর্মপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্তিত হইয়া জগৎকে চালাইতেছে। যজ্ঞাদি কর্ম না করিলে সৃষ্টি রক্ষিত হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত।

ইন্দ্রের সঙ্গে বর্ষণের সম্বন্ধ। সূর্যকিরণ পৃথিবী হইতে সোম অর্থাৎ জল টানিয়া লইলে উহা বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থান করে, বেদে এইরূপ মন্ত্রও আছে। ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্রবিদ্যুৎ সেই জল বা সোমকে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ঋষি-কবির দৃষ্টিতে ইন্দ্র সেই সোম পান করেন ইন্দ্রকে সোমপায়ী বা সোমপা বলা হইয়াছে বিষয়ে বহু মন্ত্র আছে; একটি উদাহরণ ঋ. ১/৪/২।

যজ্ঞের প্রকারভেদ

যজ্ঞের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ অনেক প্রকার। কয়েকটি বিশিষ্ট যজ্ঞের রূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) হোম যাগ— সূর্য ও অগ্নি যজ্ঞের দেবতা। প্রভাতে সূর্যকে ও সন্ধ্যায় অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি দিতে হয়। এই যজ্ঞের আর এক নাম দর্বী হোম। দর্বী শব্দের অর্থ হাতা। হাতার সাহায্যে হোমকুণ্ডে আহুতি অর্পণ করা হয়। এই যজ্ঞের প্রকৃতি অগ্নিহোত্র। বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের প্রত্যহ অগ্নিযাগ করিতে হইত। ব্রাহ্মণগণের ইহা পুরোহিত দ্বারা করিবার নিয়ম নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইতে পারিত। ব্রাহ্মণের যাবজ্জীবন প্রত্যহ সস্ত্রীক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হইত, "ব্রাহ্মণোঽহরহঃ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ।"

কখন কোন্ সময় হোম হইবে সেই সম্বন্ধে দুই শাখার দুই মত। বহবৃচ্ শাখার ব্রাহ্মণগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করেন এবং তৈত্তিরীয় শাখার

ব্রাহ্মণগণ উদয়ের পরে হোম করেন। উভয় শাখাই সূর্যোদয়ের পূর্বে গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি সংগ্রহ পূর্বক অগ্নিহোত্রের হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করেন।

(২) **ইষ্টিযাগ**— এই যজ্ঞের প্রকৃতি দর্শপৌর্ণমাস। দর্শ অর্থ অমাবস্যা। পৌর্ণমাসী অর্থ পূর্ণিমা। এই যজ্ঞে চারজন পুরোহিত প্রয়োজন — হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীধ্র ও ব্রহ্মা। পুরোহিতদিগের যাঁহার যাহা কর্তব্য নির্দিষ্ট। ইষ্টিযাগের সমাপ্তি কালে অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ নামক আহুতি অগ্নিদেবতাকে অর্পণ করিতে হয়। পুরোহিতগণ যজ্ঞের আহুতির অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই ইড়া ভক্ষণ। যজ্ঞের আহুতির অবশিষ্ট দ্রব্যাদি যেমন দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত হয় ইড়া। ধান্য অথবা যব দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত হয়। আমাদের হিন্দুদের যেমন কোনও দেবতা অর্চনার পরে প্রসাদ ভক্ষণ নিয়ম, ইড়া ভক্ষণ তদ্রূপ কার্য।

(৩) **সোমযাগ**— এই যজ্ঞের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। এই যাগে সোমলতার রস মুখ্য আহুতি। প্রতি বৎসর বসন্ত ঋতুতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। সোমলতার অভাবে পূতিকার লতা ব্যবহার করা হয়। বরুণ ও অগ্নি এই ইষ্ট যাগের দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমে এই যাগের বিস্তারিত বর্ণনা উপলব্ধ হয়। প্রতিবৎসর বসন্ত ঋতুতে স্ত্রীসহ ত্রিবর্ণেরই যজমান এই সোমযাগ করিবেন। যজমান ব্যতীত এই যাগে মোট ১৬জন ঋত্বিক্ লাগে। যজ্ঞের প্রথম দিনেই যজমান ঋত্বিক্ বরণ করিবেন। এই যজ্ঞে শূদ্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যজ্ঞের প্রধান দ্রব্য সোমলতা শূদ্রের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইত গাভী বৎসাদির বিনিময়ে।

(৪) **সত্রযাগ**— সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে সত্রযজ্ঞের কাল ও অনুষ্ঠানস্বরূপ লিপিবদ্ধ পাই। এই সত্রযজ্ঞের প্রকৃতি হইল গবাময়ন যজ্ঞ। এই যাগ করিতে ৩৬১ দিন লাগে। যে যজ্ঞ একদিনে সম্পন্ন হয় তাহা 'একাহ'। একদিনের বেশি সময় অথচ দ্বাদশ দিনের কম সময় লাগে তাহা 'অহীন' যজ্ঞ। সত্রযজ্ঞ কখন-কখন একবর্ষব্যাপী, দশবর্ষব্যাপী, শতবর্ষব্যাপী, এমনকি সহস্র-বৎসরব্যাপীও হয়। দ্বাদশ দিনের অধিক সময়ব্যাপী উক্ত সকল যজ্ঞগুলিই সত্রযাগের অন্তর্গত। এই জন্যই, গবাময়ন সত্রযাগের অন্তর্গত।

(৫) **রাজকীয় যাগযজ্ঞ**— পূর্বোক্ত চারপ্রকার যজ্ঞ ব্যতীত কতকগুলি যজ্ঞ হইত রাজতন্ত্রের স্বার্থে। তন্মধ্যে রাজসূয়, বাজপেয় অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি যজ্ঞই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সম্পাদিত হইত। যেমন, "রাজসূয়েন রাজা ভবতি, বাজপেয়েন সম্রাড় ভবতি, অশ্বমেধেন সার্বভৌমো ভবতি।" অর্থাৎ

রাজসূয় যজ্ঞ করিলে রাজা, বাজপেয় যজ্ঞে সম্রাট্ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে সার্বভৌম নৃপতি হওয়া যায়।

যজ্ঞে মাতৃজাতির অধিকার

ঈশ্বর এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির চরিতার্থতা ও পূর্ণতা, নারী ও পুরুষের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে। বৈদিক যজ্ঞের ব্যাপারে নারীর কি স্থান বা ভুমিকা ছিল তাহা জানা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীসমাজ মর্যাদার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। বৈদিকশাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈদিকভাবনায় স্ত্রী-পুরুষের বিবাহবন্ধনকে অতি পবিত্র মিলনরূপে গণ্য করা হয়। পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় স্ত্রীর সাহচর্য ব্যতিরেকে। শতপথ ব্রাহ্মণের ঘোষণা — স্ত্রী হইলেন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, স্ত্রীলাভেই পুরুষের জীবন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সমাজে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদাসম্পন্ন, সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রী ব্যতিরেকে বৈদিক যজ্ঞ সম্ভব নহে। যজমান ও যজমানপত্নী, উভয়ে মিলিত হইয়াছেন যজ্ঞের আহুতি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে গোপবালকগণ কর্তৃক অন্নভিক্ষালীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীদের আদেশ করিতেছেন যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য। কারণ ব্রাহ্মণদের আঙ্গিরস যজ্ঞে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে মিলিতভাবে যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। পত্নী শব্দের অর্থ পালয়িত্রী, যিনি যজ্ঞক্রিয়ায় স্বামীকে সাহায্য করেন। পাণিনি সূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে (পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে — পা. ৪/১/৩৩)। ইহার তাৎপর্য, পত্নী ভিন্ন যজ্ঞ হয় না। পত্নীহীনের আহুতি ভগবান্ গ্রহণ করেন না। তাই যজ্ঞের পূর্ণতার জন্য পত্নীকে ধরা হয় যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫-২-১-৪)। যজমানের স্ত্রীর অধিকার আছে যজ্ঞবেদীতে উপবেশনের। স্ত্রীদের যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিবার ও বসিবার অধিকার বেদে স্বীকৃত।

প্রতি যজ্ঞের এক বিশেষ অঙ্গকে বলা হইত পত্নী-সংযাজ, যাহাতে যজমানপত্নীকে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত এবং তৎসম্পর্কীয় কিছু ধর্মীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইত। সুতরাং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার পূর্ণতা বিধানে বিবাহকে অতি পবিত্র বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করা হইত। স্ত্রীকে কখনও দাসী বা অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হইত না; বরং তাহাকে ধর্মীয় আচরণের সহায়ক, প্রিয়বন্ধু, বিশ্বস্ত সখা এবং পথপ্রদর্শক বলিয়া মর্যাদা দেওয়া হইত। স্ত্রীজাতিকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কারণ স্ত্রীকে বলা হইত শ্রী বা লাবণ্যের দেবী

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১-৪-৩-২)।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে —সত্যই পুরুষ, বিশ্বাসই নারী; মনই স্বামী, স্ত্রী বাক্‌শক্তি; যেখানে স্বামী, সেখানেই স্ত্রী (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২-৪-২-৬)। সত্য ও বিশ্বাস যেমন একই সঙ্গে চলে, মন এবং বাক্‌শক্তি যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ঠিক একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র জাগতিক নহে, ইহার বহু ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত।

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, বিশেষতঃ মাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থেই নারীদের একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে —নারীর সতীত্বকে অমূল্য সম্পদ্‌রূপে গণ্য করা হইত। সতীত্ব রক্ষার্থে নারীরা ছিলেন সদাই সচেতন। গৃহকর্মে তাঁহারা ছিলেন তৎপর এবং কর্তব্যপরায়ণ। চারুকলায় নারীদের ভূমিকা ছিল সবার উপরে। সামগানের দায়িত্ব ছিল নারীদেরই উপর।

বৈদিকসাহিত্য অনুধাবন করিলে বহু উচ্চশিক্ষিতা নারীর সংবাদ পাওয়া যায়। বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা প্রভৃতি নারীর উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। গার্গীর মত বিদুষী নারী এবং মৈত্রেয়ীর মতো সাধিকার সংবাদ পাওয়া যায় উপনিষদে। যজ্ঞস্থলীতে স্ত্রীকেও বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার মত জ্ঞান নারীদের ছিল। উচ্চ বর্ণের নারীরা সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন এবং বেদপাঠও করিতেন।

বৈদিক যুগে নারীরা অধিষ্ঠিতা ছিলেন দেবীর আসনে। তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন; ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা, ছিলেন মর্যাদা সম্পন্না।

শৌনককৃত বৃহদ্দেবতায় বেদের নারী-ঋষিদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। যথা —

> "ঘোষা গোধা বিশ্ববারা অপালোপনিষন্নিষৎ।
> ব্রহ্মজায়া জুহূর্নাম অগস্ত্যস্য স্বসাদিতিঃ।।
> ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা সোমশোর্বশী।
> লোপামুদ্রা চ নদ্যশ্চ যমী নারী চ শশ্বতী।।
> শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
> রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ।।" ২/৮২-৮৪

ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষদ্ নিষদ্, ব্রহ্মজায়া যাঁহার নাম জুহু, অগস্ত্যের ভগিনী, অদিতি, ইন্দ্রাণী এবং ইন্দ্রের মাতা, সরমা, সোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, আর নদীসমূহ, যমী, তথা পত্নী শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাচ্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রী, সূর্যা এবং সাবিত্রী—

ইঁহারা সকলেই ঋষি বা ব্রহ্মবাদিনী।

ঋগ্বেদের মহিলা ঋষিগণের একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে—

(১) ১ম মণ্ডল ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা।

(২) ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্ত, দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা।

(৩) ৮ম মণ্ডলের ৯৬ সূক্ত, দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অত্রিকন্যা অপালা।

(৪) ১০ম মণ্ডলের ৪০ সূক্ত, দেবতা অশ্বিনীদ্বয়, ঋষি কক্ষীবান্-কন্যা ঘোষা।

(৫) ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত (বিবাহ সূক্ত), ঋষি সাবিত্রী কন্যা সূর্যা।

(৬) ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত, দেবতা আত্মা, ঋষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্।

(৭) ১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্ত, দেবতা সপত্নী বাধম, ঋষি ইন্দ্রাণী।

(৮) ১০ম মণ্ডলের ১৫১ সূক্ত, দেবতা শ্রদ্ধা, ঋষি শ্রদ্ধা।

(৯) ১০ম মণ্ডলের ১৮৯ সূক্ত, দেবতা ও ঋষি সার্পরাজ্ঞী।

নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চনায় বেদমাতা

নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চনায় বেদ হইতেছেন আমাদের মাতা।

যথা — "শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর! ভবানেব শরণম্।।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতধৃত মুনিবাক্য, মধ্য, ২২/৬)

"হে মুরারি! সবার মাতৃস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া, আপনার আরাধন-বিধি উপদেশ করেন; স্মৃতি ভগিনীস্বরূপা হইয়া সেইরূপ উপদেশ করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর (মুরারি)! আপনি যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।"

শাস্ত্রজ্ঞ অনেকেই বেদকে মাতৃজ্ঞান করেন। বর্তমানে আমরা অনেকেই মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কারণ আমরা আত্মভোলা বাঙ্গালী জাতি। বাঙ্গালী আমরা বেদশাস্ত্রে পরাঙ্মুখ। বেদ আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বেদ-বহির্মুখ জাতির বাঁচিয়া থাকাই বিড়ম্বনা। আমাদের মরিয়া যাওয়ার কথা। তবে যে আমরা মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাই নাই, তাহার কারণ বেদমাতা অপরিসীম করুণাময়ী। এতই বাৎসল্যময়ী যে, তিনি যে আমাদের কথা ভুলিয়া যান নাই তাহার প্রমাণ— আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনা ও পূজার্চনায় এবং দশবিধ মাঙ্গলিক কর্মে যে সকল মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি, তাহার অধিকাংশই বেদের। আমরা না জানিয়া না বুঝিয়া নিত্যই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করি। উচ্চারণ নিশ্চয় শুদ্ধ হয় না, কিন্তু উচ্চারণ যে করি তাহাতে সংশয় নাই। বেদমাতা আমাদের উচ্চারণের অশুদ্ধি ক্ষমার চক্ষে দেখেন। সকল মাতাই শিশুর উচ্চারণের অক্ষমতা বা দোষ ক্ষমা করেন। বেদমাতা সেইরূপ আমাদের সকল অক্ষমতা, দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা যে মন্ত্র বলি তাহা কোন্ বেদের কোন্ স্থানে আছে, কিছুই জানি না। কোন্ বেদের, কোন্ ঋষির মন্ত্র তাহা না জানিয়া উচ্চারণে প্রত্যবায়

বা পাপ হয়। মনে হয় বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে বেদমাতা প্রত্যবায় গ্রহণ করেন না, ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেন। সেই বলেই আমরা বাঁচিয়া আছি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) যে কোন পবিত্র কার্যের প্রারম্ভে স্বস্তিবচন পাঠ করিতে হয়। স্বস্তিবচন আমরা প্রায়ই বলি বা শুনি। যেমন—

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পাতির্দধাতু।।"

(ঋ. ১/৮৯/৬)

এই মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্বেদের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের ঊনবিংশ মন্ত্র। ইহা অতি প্রাঞ্জল, অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। এই স্বস্তিবচন সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় সংহিতায়ও পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান।

(২) প্রত্যেক্ পূজার কালে একটি ঘট স্থাপন করিতে হয়। বিধি এই, ভূমিতে হস্ত রাখিয়া পাঠ করিতে হইবে—

"ওঁ উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।।"

(ঋ. ১/১৮৫/৬)

ধান্যে হস্ত নিয়া পাঠ করিবেন —

"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্‌থিনম্।
ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।।" (ঋ. ৩/৫২/১)

ঘটে হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন —

"ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি।
দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি।।"

(ঋ. ১০/৩২/৯)

ফলে হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন—

"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।।" (ঋ. ১০/৯৭/১৫)

ইহা ছাড়া জল স্পর্শ করিয়া এবং স্থিরীকরণের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে। এইগুলিও ঋগ্বেদীয় মন্ত্র; ইহা ব্যতীত সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় পৃথক্ মন্ত্র আছে, এই সকল মন্ত্র তৎ তৎ বেদোক্ত।

(৩) ঘটস্থাপনের পর সংকল্প বাক্য পাঠ করিতে হয়। ঋগ্বেদের সংকল্প বাক্য এইরূপ—

"ওঁ যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রানীমহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।।" (ঋগ্বেদ, ২/৩২/৮)

অন্য বেদেরও সংকল্প বাক্য আছে।

(৪) শালগ্রাম অর্চনায় ও বিষ্ণু পূজায় অত্যাবশ্যক মন্ত্র—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।" (ঋ. ১০/৯০/১)

(৫) সান্ধ্য-বন্দনায় পাঁচটি প্রধান অঙ্গ। যথা — (ক) আচমন, (খ) মার্জন, (গ) প্রাণায়াম্, (ঘ) অঘমর্ষণ ও (ঙ) সূর্যোপস্থাপন।

(ক) আচমন মন্ত্র —

"ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।।" (ঋ. ১/২২/২০)

(খ) মার্জনের মন্ত্র —

"ওঁ শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবাঃ নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ।।" (অথর্ব, ১/৬/৪)

(গ) প্রাণায়াম মন্ত্র —

"ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।
ওঁ আপজ্যোতি রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ।" (ঋ. ৩/৬২/১০)

(ঘ) অঘমর্ষণ মন্ত্র —

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।।"
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।।" (ঋ. ১০/১৯০/১-৩)

(ঙ) সূর্যোপস্থাপন মন্ত্র—

"ওঁ উদু ত ং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবম্।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।।" (ঋ. ১/৫০/১)

(৬) অন্নপ্রাশনের মন্ত্র —

"ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
প্র-প্র দাতারং তারিষ ঊর্জনো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে।।"
(শুক্ল যজুর্বেদ, ১১/৮৩)

(৭) বিবাহের মন্ত্র —

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।"
(ঋ. ১০/৮৫/৪৭)

(৮) শ্রাদ্ধকর্মের মন্ত্র —

"কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।" (ঋ. ৪/৩১/১)

(৯) প্রত্যেক্ শুভকর্মের পরে একটি ক্ষুদ্র যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। ঐ যজ্ঞের প্রায় প্রত্যেক্‌টি মন্ত্রই বেদোক্ত।

(১০) দুর্গাপূজান্তে প্রতিমা বিসর্জনের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যজমান পুত্র-কন্যাদি ও আত্মীয়-স্বজনসহ উপবেশন করেন। পুরোহিত ঠাকুর বরাহদন্ত প্রভৃতি নানা দ্রব্য হস্তে ধারণ করত মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যেকের কপালে স্পর্শ করান। এই কার্যটির নাম প্রশস্তি বন্দন। ইহার প্রত্যেক্ মন্ত্রই বেদোক্ত।

পুনঃ বলি, আমরা বেদের মন্ত্র ভুলিয়া গেলেও বেদমাতার করুণায় বাঁচিয়া আছি। অশেষ প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও অন্য ধর্ম কর্তৃক ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং উপরন্তু তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চরম অবহেলাতেও আমরা মরি নাই, হিন্দু পরিচয়ে জীবনধারণ করিতেছি। ইহা যে সম্ভব হইয়াছে তাহা একমাত্র বেদমাতা ও ঋষির কৃপাবলে। দশটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায়, বেদমাতা আমাদের অসীম স্নেহে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

সংহিতায় ঔপনিষদ তত্ত্বের বীজ

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, দর্শনের আরম্ভ হয় বিস্ময়ের বোধ হইতে। এই জগৎটাকে যাঁহারা গতানুগতিকভাবে দেখেন তাঁহারা দার্শনিক হয়েন না, শ্রেষ্ঠ কবি বা ঋষিও হয়েন না। এই জগতের দিকে তাকাইলে যাঁহাদের মনে একটি বিস্ময়ের অনুভূতি (feelings of wonder) জাগে তাঁহারাই হয়েন দার্শনিক। গীতার ভাষায় (২/২৯)—

"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।"

এই বিশ্বটিকে কেহ আশ্চর্যবৎ মনে করে, কেহ আশ্চর্যবৎ শোনে, কেহ পরম বিস্ময়ের বস্তু মনে করে; ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেহ অবগত নহে। যাহা দেখে, শোনে, ভাবে — সবই আশ্চর্য মনে হয়। এই বিস্ময়ের বোধ বৈদিক ঋষির চিত্তে কিরূপভাবে জাগিয়াছিল তাহা বলিতেছি।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।"
(ঋ. ১০/১২৯/৬)

ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন — এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের সত্তা কিরূপ ছিল? বিশ্বকার্য প্রবর্তিত হইতে কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়াছিল? তখন কিছুই ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। যাহা নাই তাহাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, সুদূরপ্রসারী ব্যোমও ছিল না। অন্ধকারের পরে গাঢ় অন্ধকার আবৃত ছিল। কে, কাহাকে কিরূপে আবরণ করিয়াছিল, ইহার উত্তর কে দিবে? দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তো সৃষ্টির পরে হইয়াছেন, কিরূপে বলিবেন? কে-ই বা প্রকৃত জানে? কে-ই বা বর্ণনা করিবে, কোথা হইতে হইল নানা সৃষ্টি? কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, না করেন নাই? কেহ যদি প্রভুস্বরূপ পরমধামে থাকেন, হয়তো তিনি বলিতে পারেন। অথবা হয়তো তিনিও বলিতে পারেন না। দুধ যদি দই হইয়া যায়, তবে কি সে বুঝিতে পারে, কেমন করিয়া সে দই হইল? সৃষ্টিটা যদি স্রষ্টার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া গিয়া থাকে তবে সে কিরূপে বলিবে এই সৃষ্টিরহস্য? এইসব গভীরতম চিন্তায় বৈদিক ঋষির চিত্ত ভরপুর। অন্তর বাহিরে কোথাও কোন উত্তরের সন্ধান না পাইয়া কেবল নীরবে অনুসন্ধান। এইস্থান হইতেই দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ। এইজাতীয় চিন্তা যাঁহার মনে জাগে না তিনি মস্ত বড় স্কলার হইতে পারেন কিন্তু

দার্শনিক নহেন। স্কলারদের সম্পদ্ সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি। দার্শনিকদের সম্পদ্ সুগভীর অনুভূতি বা বোধি। এইরূপ চিন্তা করিতে ভাসিয়া উঠিল বিশ্বের একটিই শক্তি। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অনুভূতির ফলে পৃথক্ পৃথক্ মনে হয়।

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" এই মন্ত্রই বেদান্তশাস্ত্রের বীজ।

ব্রহ্ম (Brahma)

বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মের পরিচয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ।।" ১/১/২ 'জন্মাদি' — জন্ম, স্থিতি ও লয়। 'অস্য' এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের। 'যতঃ' — যাহা হইতে। যাহা হইতে এই দৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে — তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের এই পরিচয় তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্পষ্ট। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"

শ্রুতিতে অন্যত্র আরও সংক্ষেপে আছে — 'তজ্জলানিতি' অর্থাৎ তজ্জ, তল্ল, তদ্ অন্। তাহাতে জাত, তাহাতে লয় প্রাপ্ত ও তাহাতে প্রাণবন্ত (অনিতি প্রাণিতি জীবন্তি)। তৎ + (জ + ল + অন্) = তজ্জলান্।

ব্রহ্মের এই পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও দৃষ্ট হয়।

এই অর্থেই ব্রহ্ম শব্দ শ্রুতিতে ও বেদান্ত-সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় ব্রহ্ম শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায় না।

সংহিতায় পাঁচ-ছয়টি স্থানে পরিচয় দিয়াছেন। ঋ. ২/১২/১৪ মন্ত্রে—

"যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।"

ঋ. ৩/৩৪/১ মন্ত্রে—

"ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্ রোদসী উভে।।"

ঋ. ৭/১৯/১১ মন্ত্রে —

"নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব।"

ঋ. ১/৩১/১৮ মন্ত্রে—

"এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যৎ তে চকৃমা বিদা বা।"

ঋ. ১/৪৭/২ মন্ত্রে—

"কন্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃন্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃণুতং হবম্।।"

ঋ. ১/৮৮/৪ মন্ত্রে—

"ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ।"

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে ব্রহ্মশব্দের ব্যঞ্জনার বিস্ফারণ। স্পষ্ট ব্রহ্ম দেবতাকে বাড়ায়। দেবতা অধিদৈবত দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে

চিন্ময়। সুতরাং দেবতার বৃহৎ কি, তাহা বুঝিতে পারি আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ দিয়া। চেতনার বিস্ফারণে অবিদ্যার আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্ধকার দূর হয়, গূঢ় জ্যোতির প্রকাশ হয়। 'বৃহ্' 'ব্রহ্মন্'-এর আদিরূপ। অনুরূপ আর একটি শব্দ আছে 'বৃহৎ'। একটি মন্ত্রাংশ আছে 'ঋতং বৃহৎ'। বৃহৎ হইল 'বৃহ'-এর অধিদৈবত রূপ। বৃহও ব্রহ্ম—বৃহৎও ব্রহ্ম। দেবর্ষি নারদের ভাষায় বলিতে গেলে মন্ত্রবিদের ব্রহ্ম আর আত্মবিদের ব্রহ্ম এক নহে। এই প্রভেদের বিষয় পরের যুগে বোঝানো হইয়াছে 'শব্দব্রহ্ম' আর 'পরব্রহ্ম' এই দুইটি সংজ্ঞা . ব্যবহার করিয়া। ঋগ্বেদের 'ব্রহ্ম' মুখ্যতঃ শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম সেখানে 'বৃহৎ' বিশেষ করিয়া 'ঋতং বৃহৎ'। ঋ. ১/৭৫/৫ ও ঋ ৯/৫৬/১ মন্ত্রে উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদেতে বৃহৎ এর অন্য পরিচয় হইল 'একো দেবঃ', 'একং সৎ', 'একং তৎ' ইত্যাদি। উপনিষদে তাহার সংজ্ঞা 'বৃহৎ' না হইয়া ব্রহ্ম হইল। সংহিতার শব্দব্রহ্ম উপনিষদে পরব্রহ্মে রূপান্তরিত হইল কি করিয়া? ব্রহ্ম-সংহিতায় সাধন, আর উপনিষদে সাধ্য। তাৎপর্যের এই পরিবর্তন হইল কোন্ সূত্র ধরিয়া — ইহা গভীর গবেষণার বিষয়।

উপরে যে কথা বলা হইল সবই শ্রীঅনির্বাণের ভাব অবলম্বনে। ইন্দ্রের সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়া তিনি পাদটীকায় আলোচনা করিয়াছেন। (বেদমীমাংসা, পৃষ্ঠা, ৬৩৫) প্রশ্নটিও অনির্বাণ তুলিয়াছেন, কিন্তু উত্তরটি দিতে পারেন নাই। আমার মনে হয় একটি উত্তর দিয়াছেন, "শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্মের মধ্যে সেতু হচ্ছেন ব্রহ্মা।" উত্তরটি খুব সুস্পষ্ট নহে।

বস্তুতঃ শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম একই। শব্দব্রহ্মাতে যিনি নিষ্ণাত, পরব্রহ্ম তাঁহারই অনুভবে ব্যক্ত। বাইবেল গ্রন্থে সুস্পষ্ট, "The Word Was God "। বৈষ্ণবাচার্য্যদের 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ', নাম ও নামীর অভিন্নতা ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশক। প্রভু জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন — "হরি শব্দ উচ্চারণ হরিপুরুষ উদয়।" হরিশব্দ মন্ত্রব্রহ্ম, হরিপুরুষ পরব্রহ্ম।

সংহিতার ব্রহ্মই ঔপনিষদ ব্রহ্ম। অভিন্নতা শাশ্বত।

সংহিতায় সাহিত্য সম্পৎ

বৈদিক বাঙ্‌ময়ে দেবগণের বিষয়ে ও যজ্ঞাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা তো আছেই, তাহা ছাড়া আরও বহু বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উচ্চপরিণত সাহিত্যের বহু সম্পৎ তাহার মধ্যে আছে। উপমা রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের সুষ্ঠু উপস্থাপনে তৎকালে সাহিত্যচর্চা যে কত উন্নত ছিল তাহা অতি সহজে অনুমান করা যায়।

আমরা বাঙালীরা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের উচ্চারণ জানি না বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিবার সাহস নাই। তাই বেদসাহিত্যের অলঙ্কারগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও আমরা অনেকেই নিত্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি, তবু তাহার মধ্যে যে কত সুন্দর উপমা আছে তাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না।

সংহিতার ভাষা যে কতখানি পরিণত সাহিত্য, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) "এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।
অপ দ্বেযো বাধমানা তমাংস্যুষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ।।"
(ঋ. ৫/৮০/৫)।

মন্ত্রটিতে ঋষি সত্যশ্রবা, দেবতা উষা। সমস্ত সূক্তের বর্ণনাই গৌরবোজ্জ্বল মাধুর্যমণ্ডিত। বিশেষ করিয়া যাহা উক্ত মন্ত্রটিতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনা অতি চিত্তাকর্ষক।

উষার উদয় হইতেছে তাহার বর্ণনা। সম্মুখে উষা উদিতা। সদ্যস্নান হইতে উত্থিতা একটি সুবেশা রমণীর মত। চিরযৌবনা উষা নিজের অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশ করিতেছেন।

ঋগ্বেদের ৮/৫ সূক্তের ঋষি কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি। দেবতা অশ্বিদ্বয়।

(২) ঋষি প্রভাতকালীন অশ্বিদ্বয়ের উদয়ের বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বাকাশ লোহিতবর্ণ। এই কথাটি বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন, অশ্বিদ্বয়ের রথখানি দেখ। রথের সারথি স্বর্ণবর্ণ। অশ্বগুলি স্বর্ণবর্ণ, অশ্বের বল্গাগুলি স্বর্ণবর্ণ। রথের দুইটি চাকাও স্বর্ণবর্ণ। আকাশটি লালিম বলিয়া অশ্বিনীকুমারের রথের বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। ঋষি যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না।

"হিরণ্যয়ী বাং রভিরীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ।
উভা চক্রা হিরণ্যয়া।।" (ঋ. ৮/৫/২৯)

(৩) ঋগ্বেদের ১/১১৬ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে প্রভাতে উষার উদয়ের বর্ণনা করিতেছেন —

উষার উদয় হইলে বিশ্ববাসী নরনারী পশুপক্ষী সকল প্রাণী জাগিয়া উঠে। এই কথাটি ঋষি কবি বলিয়াছেন — "উষা গৃহিণীর মত। গৃহিণী ভোরে সকলের আগে উঠেন। তাহারপর বাড়ীর সব লোককে ডাকিয়া জাগান।" ঘরোয়া দৃষ্টান্তে কি অপূর্ব কাব্য!

(৪) ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ৬৫ সূক্তের দেবতা সোম, ঋষি ভৃগুর বর্ণনা। ১ম মন্ত্র—

সেইকালে দুই হাতে দশ আঙ্গুলের দ্বারা নিঙ্গাড়াইয়া সোমলতার রস বাহির করা হইত। ঋষি কবির ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন — "দশটি আঙ্গুল যেন দশ বোন; সোম রস যেন তাহাদের স্বামী; সবাই মিলিয়া স্বামীর অঙ্গ সেবা করিতেছে।" কি অভিনব কাব্যিক কল্পনা!

"হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীযুবঃ।।"

(৫) দীর্ঘতমা ঋষি বিশ্বদেবগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২০শ মন্ত্রে বলিতেছেন — এই জগতে জীবাত্মা পরমাত্মা দুই তত্ত্ব আছে। তাহার মধ্যে জীবাত্মা নিজ কর্মফল ভোগ করে। পরমাত্মা শুধু দ্রষ্টা, তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন। এই দার্শনিক তত্ত্বরহস্যটি দুইটি পাখীর রূপকে কি সুন্দর করিয়া বলিতেছেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি।।"

ইহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ছাড়া আর কি বলিব?

(৬) অঙ্গিরা পুত্র কুৎস ঋষি ঋগ্বেদের ১/১১৫/১-২ মন্ত্রে সূর্যের উদয়ের বর্ণনা দিতেছেন —

সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার উদয় হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ সূর্য উদয় হইয়াছে, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।"

"মানুষ যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেরূপ দীপ্তিমতী উষার পশ্চাতে আসিতেছেন; এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মানুষগণ বহুযুগ প্রচলিত যজ্ঞকর্ম বিস্তার করেন, সুফলার্থ কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করেন।"

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।

যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্।।''

সূর্যকে বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সকলের আত্মা বলা এক গভীর কাব্যানুভূতি। আর তৎপর সূর্য উষার পিছনে ধাবমান, এই রসাল কাব্য বর্তমানযুগের সাহিত্যেও আদরণীয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তটিতে আছে উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন।

উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনী সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। এই কাহিনী অবলম্বনে কবি কালিদাস 'বিক্রমোর্বশীয়' নামে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। উর্বশী পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। পুরূরবা তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিতেছেন — উর্বশী কিছুতেই শুনিতেছেন না। পুরূরবা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতেছেন, ''তুমি যাহাকে ভালবাসিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ, তাহার মৃত্যু হউক।'' উর্বশী পুরূরবাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, ''জানেন তো, স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। ''ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।।'' ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। এই অলঙ্কার যে কোন সাহিত্যে প্রশংসনীয়।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৭১ সূক্তে বৃহস্পতি ঋষি ৪র্থ মন্ত্রে বলিতেছেন, বেদ খুব দুরূহ গ্রন্থ, বেদে প্রবেশ করা কঠিন। বেদ আপনার রহস্য কথা যার তার কাছে প্রকাশ করেন না। উপযুক্ত লোক পাইলেই প্রকাশ করেন। এই কথাটি কি সুন্দর সাহিত্যের ভাষায় বলিয়াছেন —

''উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।।''

সুন্দরী সতী রমণী আপনাকে সুন্দর মনোহারী বেশের দ্বারা সুসজ্জিত রাখে একমাত্র নিজ স্বামীর নিকট নিজ দেহ উন্মুক্ত করেন। যেখানে সেখানে আবরণ মুক্ত হন না।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। ইহাকে স্মৃতি প্রস্থান বলে। গীতা হইতে দুই চারটি উপমার উল্লেখ করিতেছি। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ শ্লোক —

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।''

''মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে,

সেইরূপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ ধারণ করে। ইহার মধ্যে দুঃখ করার কিছু নাই।'' কি সহজ সরল সর্বজনবোধ্য দৃষ্টান্ত!

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোক —

''যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।''

''সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইলে ছোট পুকুরে ডোবায় মানুষের যে প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বেদের কর্মকাণ্ডের ততটুকু প্রয়োজন। ভূমার সঙ্গে মিলনের আনন্দ যিনি পাইয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণিক আনন্দে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।'' সহজ দৃষ্টান্ত, অথচ গভীর অর্থপ্রদ।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক —

''যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।''

''মন যাঁহার ধীর স্থির, তাঁহার অবস্থাটি কেমন—বাতাস শূন্য স্থানে নিস্পন্দ প্রদীপ শিখার মত।'' স্থির মনের অবস্থা যে কিরূপ একটি সহজ দৃষ্টান্তে সকলেই বুঝিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রথম 'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্' হইতে তিনটি শ্লোকে একটি সুন্দর উপমা—

''ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা,
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।''

আমার মনে হয় এই বৃক্ষটি মানুষের দেহ। আমাদের দেহের মূল মাথায়, অর্থাৎ ঊর্ধ্বে। এইটি আমার দেহ এই সম্বন্ধটি ছেদন করিতে হইবে অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা। দৃষ্টান্তটি গভীর জ্ঞান-গর্ভ, অথচ চমৎকার। অসঙ্গ অর্থ non-attached।

বেদে অবতারবাদ

সকল শাস্ত্রের স্বীকৃত সত্য শ্রীভগবান্ নিত্য, শাশ্বত, চিন্ময় ও অপরিণামী। তিনি এই অনিত্য, অসত্য, জড় ও পরিণামী অর্থাৎ সতত পরিবর্তনশীল জগৎ সংসারে আসেন কি? জন্ম-মৃত্যুময় মানব সমাজে তিনি অবতীর্ণ হন কি? যিনি নিত্য তাঁহার জন্ম-মৃত্যু আমরা কল্পনা করিতে পারি কি? এই মর্ত্যে মানবের ঘরে মানব-রূপে তাঁহার আবির্ভাবকে সাধারণত আমরা 'অবতার' বলি। অবতারবাদ বেদে আছে কিনা বা বেদ ইহা সমর্থন করেন কিনা, ইহাই আমাদের আলোচনার বস্তু।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের অবতারত্ব প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। স্বয়ং ভগবান্ তিনি অর্জুনকে বলিলেন তাঁহার আগমনের কারণ---

> ''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'' (গীতা, ৪/৭-৮)

যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময় দেহধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

এই প্রসঙ্গে জন্মান্তরবাদও যে সত্য, তাহার উল্লেখ করিলেন, বলিলেন—''হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, তুমি জান না। অর্থাৎ আমি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বশ নহি, সেজন্য আমার সর্বজ্ঞত্ব কখনও লুপ্ত হয় না। তুমি মায়ার বশীভূত, অবিদ্যা-অজ্ঞান আচ্ছন্ন বলিয়া পূর্বজন্মের কথা তোমার স্মরণ নাই।''

> ''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
> তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।'' (গীতা, ৪/৫)

জন্মহীনের জন্মের পিছনে যে রহস্য, তাহা হইতেছে নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন পূর্বক নিজ মায়া অর্থাৎ যোগমায়ার সহায়ে এই জগতে তাঁহার আগমন সম্ভব হয়—''প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।'' (গীতা, ৪/৬)।

শ্রীভগবানের এতাদৃশ স্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও কিছু ধর্মপথের আচার্য অবতারবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর, তিনি মানুষ হইয়া আসিতে পারেন না। বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, যাঁহাদের অবতার বলা হয়, তাঁহারা বস্তুতঃ মানুষই। তাঁহাদের মহিমা এতই বিশাল, ব্যক্তিত্ব এতই সুমহান্ যে, সাধারণ মানুষ তাঁহাদের পূজার বেদীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বসান। তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বে, অপরিসীম শৌর্য-বীর্য দর্শনে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিত। Hero-worship কথাটি আসিয়াছে ইহা হইতে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ শঙ্কর, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি মানুষ ছিলেন, পূজিত হইতেছেন ঈশ্বররূপে।

বেদে দুই প্রকার দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ দেবতা, তাঁহাদের বলা হয় আজানদেব। আর যাঁহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া প্রভূত পুণ্যকর্মের ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কর্মদেব। বেদে উল্লেখ আছে বহু দেবতার—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, প্রভৃতি। কর্মদেবগণ হইতেছেন ঋভু-গণ (ঋভু, বিভু ও বাজ) এবং অশ্বিদেবতাযুগল। ইঁহারা মনুষ্য হইতে দেবতা হইয়াছেন। বিবস্বান্ ও সরণ্যু (ঋ. ৫/৭৫/৩ ও ১/৪৬/২)-র মতে তাঁহারা রুদ্র ও সিন্ধুর যুগল তনয়। বেদ ইঁহাদের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উপরে উল্লিখিত Hero worship এর স্বীকৃতি।

ভগবানের অবতারত্ব খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মমত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের অভিমত, ভগবান্ কখনও নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া মানুষ হইয়া আসিতে পারেন না। খ্রীষ্টানগণ যিশুখ্রীষ্টকে ঠিক অবতার বলেন না; ঈশ্বর-তুল্য মনে করেন। খ্রীষ্টানধর্মের পরিভাষাটি হইল ঈশ্বরেব পুত্র (Son of God)। এইরূপ পরিভাষা বেদশাস্ত্রের কোথাও নাই। পুত্রের প্রকাশ (emanation) হয় পিতা হইতে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মমত ইহা স্বীকার করিতে রাজি নহে, বিশেষ প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। যীশু বলিয়াছেন — "I and my father are one"। এই oneness (একত্ব) কি কর্মের ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত সাদৃশ্য, নাকি অন্য কোন রূপে তাহা বলা কঠিন।

গীতা গ্রন্থে ভগবান্ বলিয়াছেন— মানুষ সাধনার ফলে আমার (কৃষ্ণের) স্বধর্ম অর্থাৎ ভগবত্ত্ব লাভ করিতে পারে (মম সাধর্ম্যমাগতাঃ)। আমাদের শাস্ত্র বেদব্যাসকে ভগবানের অবতার বলিয়াছেন।

ইসলাম মত, খ্রীষ্টান ও হিন্দুধর্মের কঠোর সমালোচক। এই মতানুসারে ঈশ্বর কাহারও পুত্র হন নাই বা কাহাকেও পুত্র করেন নাই। প্রথমটিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন, এবং দ্বিতীয়টিতে যীশু ঈশ্বরের

পুত্র ইহা অস্বীকার করা হইয়াছে। হজরত মহম্মদকে অবতার বলা হয় নাই, প্রেরিত পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম (রসুল) পুরুষ। হিন্দুধর্মের অংশাবতারের অনুরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের কোন অংশত্ব ইসলাম মতে স্বীকার করা হয় না; ঈশ্বরের অংশ হয় না, তিনি অখণ্ড। আর মহম্মদ হইতেছেন শেষ প্রেরিত পুরুষ; আর কেহ আসিবেন না। ইহাতে গীতার উক্তি 'যুগে যুগে আসেন' অস্বীকার করা হইল। ইসলাম মতে চারি জন খলিফার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রায় ঈশ্বরতুল্য। আর কোন খলিফা ভবিষ্যতে আসিবেন না। ইসলাম মতের একটি শাখা মনে করেন— প্রেরিত পুরুষ আরও আছেন এবং আসিবেন। ইমাম মেহেদী, বাহারুল্লা বলেন —যাহারা এইরূপ কথা বলে, গোঁড়া মুসলমান তাহাদের মুসলমান বলিয়াই স্বীকার করেন না।

বুদ্ধদেব, ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, বেদের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন নাই, নীরব থাকিয়াছেন। এইজন্য তিনি নাস্তিকের মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবকে অবতার স্থলে বসানো হইয়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দুরাও বৌদ্ধদের সহায়ক হইয়াছিলেন। হিন্দুরাও তাঁহাকে অবতারের মধ্যে গণনা করেন। ইহাতে মনে হয়, যেখানে ভক্তিরই প্রাধান্য, সেখানে ভক্তির পাত্র ঈশ্বরে উন্নীত বা পর্যবসিত হন। ইসলাম ধর্মমতে ও দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ পীরদের সমাধিস্থানে অর্থাৎ পীরের দরগায় তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা substitute রূপেই ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হন, হিন্দুদের মন্দিরে দেবতার মর্যাদার অনুরূপে। আজমীড় শরিফ (ভারত), শাহ জালালের দরগা (সিলেট, বাংলাদেশ) সারা ভারতে তথা ভারতের বাহিরে মুসলমান রাজ্যগুলির নিকট ঈশ্বরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদেরও বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু ঐ শরিফ। বৌদ্ধদের বা মুসলমানদের দেখা যাইতেছে অবতারবাদ স্বীকৃতির দ্বারদেশে।

ঋগ্‌বেদে অবতারবাদ স্বীকৃতির অনুরূপ একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মধুচ্ছন্দা ঋষি ইন্দ্রকে কৌশিক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কৌশিক কুশিকের পুত্র। আচার্য কাত্যায়ন 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে তৃতীয় মণ্ডলে ইন্দ্রকে কৌশিক বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। কৌশিক নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রতুল্য পুত্র কামনা করিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। তপস্যাকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করেন—

"কুশিকস্‌ত্বৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্যং চচার তস্যৈন্দ্র এব গাথী পুত্রোজ্জে"—ইষিরথতনয় কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করেন। ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার গাথী নামক পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি মধুচ্ছন্দা ঐ গাথীর পৌত্র ও বিশ্বামিত্রপুত্র। ঈশ্বরাবতার না

মানিলেও উহা স্বীকৃতির সমান। এই প্রকার দৃষ্টান্ত একাধিক আছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হইবে না যে, বেদ অবতারবাদ স্বীকার না করিলেও, বিরোধী নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ৩২ হইতে ৪৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজ পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কারাগারে দেবকী-বসুদেবকে বলিতেছেন— "স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি (দেবকী) পৃশ্নি ও পিতা (বসুদেব), সুতপারূপে জন্মিয়াছিলে এবং আমাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দেবপরিমাণে বারো হাজার বছর কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলে। আমি নারায়ণস্বরূপে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বর চাহিতে বলিলে তোমরা, আমার মত পুত্র চাহিয়াছিলে। আমি পৃশ্নি-পুত্ররূপে আসিয়াছিলাম। পরজন্মে তোমরা অদিতি-কশ্যপরূপে আসিয়াছিলে, আমি উপেন্দ্র (বামন) রূপে তোমাদের পুত্র হই। বর্তমান জন্মে পুনরায় তোমাদের (বসুদেব-দেবকীর) পুত্র হইয়া আসিয়াছি।" অবতার গ্রহণের উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট।

অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে আচার্য শঙ্কর ও মধুসূদন সরস্বতী নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও দুইজনই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদে কোন ইঙ্গিত না পাইলে স্বীকার করিতে পারিতেন না। আমরা যে বেদে সেইরূপ কিছু পাই না, তাহার একটি কারণ হইতে পারে আচার্য শঙ্করের পরবর্তীকালে বহু বেদ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঈশ্বরের অবতারত্বের বিষয়ে আচার্য শঙ্কর বলেন—ঈশ্বর মায়াবলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ গ্রহণ করেন— "স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্" (১/১/২০, সূত্রভাষ্য)। তিনি দেহবানের মত প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দেহাত্মবাদের অতীত। ব্রহ্ম পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। দেহবানের মত হইলেন অর্থাৎ 'অংশেন অবতীর্ণ' এই কথা বুঝিতে হইবে।

বিশুদ্ধ অদ্বৈতমতের সাধক আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর মধ্যে অপরিসীম বিদ্যাবত্তা ও হৃদয়ের অতুলনীয় প্রসারতার মণি-কাঞ্চন যোগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নহে। (জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ) ইত্যাদি অদ্বৈতমত বিরুদ্ধ সকল সমালোচনা হইতে রক্ষা করত এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য সকল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্যগণ শ্রুতিকে প্রামাণ্য হিসাবে সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। মধুসূদন অনুমান প্রমাণবলে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। তিনি বেদান্তরাজ্যের সার্বভৌম, চিন্তাশীলের

চক্রবর্তী ও মীমাংসকের শিরোমণি, উহা তদানীন্তন সর্বভারতীয় পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। অথচ মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোনরূপ গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

> ''বংশী-বিভূষিত-করাৎ নবনীরদাভাৎ
> পীতাম্বরাদরুণ-বিম্ব-ফলাধরোষ্ঠাৎ।
> পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
> কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।''

মৎকৃত ভাবানুবাদ —

> বংশীকর-পীতাম্বর- বারিদ বরণ।
> বিম্বাধর-মনোহর নলিননয়ন।।
> চন্দ্রমুখ-চিত-সুখ গোপীচিত চোর।
> কৃষ্ণ হ'তে পরতত্ত্ব জ্ঞাত নহে মোর।।

অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধসাধক পরমপ্রাজ্ঞ আচার্য মধুসূদন সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব (সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু) বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন নাই। ঈশ্বরের মর্ত্যধামে অবতরণ বা অবতারবাদ তিনি নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বেদ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের অবতারবাদ স্বীকৃতিতে কোন বাধা নাই দেখা যাইতেছে। বৈষ্ণব মার্গের সাধনার ধারার ভিত্তিই অবতারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতের আচার্যগণ সকলেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ। বৈষ্ণব আচার্যগণের লেখনীতে বেদ-বিরোধী বিষয় বিন্দুমাত্র স্থান পায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে অপরিসীম মর্যাদা তাহা বেদ-বৃক্ষের ফল বলিয়া। ''নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্''। অবতারবাদ বেদ-সিদ্ধান্ত অনুসারী বলিয়া মর্যাদাপ্রাপ্ত। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসংহিতা, প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অবতারবাদের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, অবতারবাদ বেদ-বিরোধী নহে।

বৈদিক বাঙ্ময়ে শক্তিপূজা

বাংলাদেশ শক্তির দেশ একথা বলা যায়। ভারতবর্ষে একান্নটি শক্তিপীঠ আছে। বাংলা-ভারতে কত যে দেবীপূজা আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি প্রশ্ন, বেদে মাতৃপূজা আছে কি না। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি এবং লেখায় পাইয়াছি যে, বেদে শক্তিপূজার প্রসঙ্গ নাই। বৈদিক ঋষিরা বহুদেবতার কথা বলিয়াছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বিদ্যুৎ, পর্জন্য, যম, মাতরিশ্বা, ইত্যাদি বহু দেবতা। তাহার মধ্যে কোথাও কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ইত্যাদির নাম দৃষ্ট হয় না— এ কথা ঠিক নহে। অদিতির কথা বেদে বিখ্যাত। অদিতি সকল দেবগণের মাতা, দেবগণের আদিত্য এই নাম তাহার এক বিশেষ প্রমাণ। তাঁহার কথা আর এক প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা হইবে।

উষা এক বিশিষ্টা দেবী। তিনি মাতৃস্বরূপিণী। তাঁহার রূপে গুণে মাধুর্যে ঋষিরা মুগ্ধ। উষাদেবী কোথাও কন্যা, কোথাও পত্নী, কোথাও মাতা। নারীজীবনে যতগুলি দিক্ আছে উষার মধ্যে ঋষিগণ সকলই দেখিয়াছেন। তাহা ভিন্ন সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মোহিনী প্রভৃতির গুণ বর্ণনার বহু উক্তি আছে। অগস্ত্য ঋষি বলেন, সরস্বতী জীবের অহং-কেন্দ্রিক ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, বিশ্ববিধৃত করেন চেতনায়। শক্তিতে তিনি উচ্ছল। ভক্তদের করেন তিনি কৃপা-শক্তিতে সিঞ্চিত। ইলাদেবীকে বলা হইয়াছে দিব্য-শ্রুতি। তিনি সাধককে বীরের মতন শক্তিমান্ করেন, তিনি অপরাজিতা। সাধকেরা সর্বত্র অপরাজেয়।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সরস্বতী ইলা ভারতীদেবী সিদ্ধ করেন।

সর্বোপরি দেবীসূক্ত। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবী এই সূক্তের দ্রষ্ট্রী। তিনি মন্ত্রের দেবতার সঙ্গে একীভূত। সূক্তটি এত মূল্যবান্ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠক্রমে বহু বছর পূর্বেই অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। মেধস্ ঋষির আদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য মায়ের অর্চনা করেন। এই অর্চনায় দেবী সাক্ষাৎকার হয়। পূজার জন্য মন্ত্র কি ছিল? চণ্ডীগ্রন্থ স্পষ্টভাষায় কহিয়াছেন যে, ''দেবীসূক্তং পর জপন্''। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত দেবীসূক্ত ''অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি'' ইত্যাদি।

উষা দেবীর কথা কত বলিব? সাধকের মনে জ্ঞানের আলোকে স্থায়ী সঙ্গীতেই উষার আগমন। দেবী উষার সঙ্গে সূর্যের অর্থাৎ সত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বরুণ যিনি বিশ্বরচনার প্রবর্তক, তাঁহার সঙ্গে উষার অঙ্গাঙ্গী ভাব। উষা দেবীকে দেখিলেই দেখা হয় না, তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে দর্শন করিয়াছেন কে? যিনি দিব্যদর্শী, ভক্তি ও প্রেম সাগরে একেবারে নিমজ্জিত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই উষা দেবীর স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। (ঋ. ১/৯১/১১)

ঋষি বসিষ্ঠ বলেন, আমরা হইব উষামায়ের নিকট ছেলের মতন। (ঋ. ৭/৮১/৪) উষামায়ের ধ্যানে ব্যষ্টিমানব বিশ্বমানব হইয়া যায়। তিনি সর্বরূপা। এই মহাশক্তি পুরাণী শক্তি-পুরাণী স্বরূপেই ঋত-চিৎ।

শ্রীঅনির্বাণ বলেন, "বেদে ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা উষাদেবীর বর্ণনায় চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা। জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা — নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি উষার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। আমাদের যেমন উমা মেনকার কন্যা, শিবজায়া, গণেশ জননী, তদ্রূপ। জ্যোতির অনুসন্ধানই জীবের মোক্ষসাধনা। সেই অনুসন্ধানের প্রথমপর্বে উষা উর্বশী— বৃহদ্দিবা, যাহার জন্য পুরূরবার নিয়ত কান্না, সেই অনুসন্ধানের সমাপ্তি পরম প্রাপ্তিতে। সেই উষা মাতা বৃহদ্দিবা। বৃহদ্দিবার অর্থ বৃহতের আলো।

পরমতত্ত্বের বিন্দুমাত্র ভেদ নাই। তাহা হইলে হরি পরমতত্ত্ব, দুর্গা পরমতত্ত্ব, শিব পরমতত্ত্ব — এইসব কথার পার্থক্য কোথায় থাকে? চণ্ডীতে ঋষি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন— "মহামায়া হরে শক্তিঃ।" শক্তি ও শক্তিমানে যে ভেদ নাই এইসব প্রমাণ করিতে হয় না, এতই সহজ কথা। পরমতত্ত্ব কালের আবর্তনের ঊর্ধ্বে। এমত অবস্থায় শক্তিবাদের কথা বেদে নাই কি করিয়া বলা চলে?

উপরি উক্ত তত্ত্বের বোধসৌকর্যার্থে নিম্নে বেদের কয়েকজন দেবীর উদ্দেশ্যে আম্নাত কয়েকটি ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। মন্ত্রগুলির অনুবাদ 'ঋগ্বেদে শক্তিসাধনা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

দেবমাতা অদিতি —

"ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি।।" (ঋ. ১০/৭২/৪)

"পৃথিবী হতে বৃক্ষ এবং চতুর্দিকের হয়েছিল উৎপত্তি, অদিতি হতে দক্ষের হয়েছিল জন্ম এবং দক্ষকে ঘিরে অদিতি।।"

"অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ বা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ।।" (ঋঃ ১০/৭২/৫)

"অদিতি, হে দক্ষ, তোমার দুহিতা যিনি দিয়েছিলেন জন্ম দেবগণকে এবং কল্যাণীয় অমর বন্ধুগণকে।।"

দেবী উষা —

"দ্যুতদ্যামানং বৃহতীমৃতেন ঋতাবরীমরুণপ্সুং বিভাতীম্।
দেবীমুষসং স্বরাবহন্তীং প্রতি বিপ্রাসো মতিভির্জরন্তে।।"

(ঋ. ৫/৮০/১)

"দীপ্তগমন, বৃহৎসত্যে ঋতম্ভরা, অরুণ কিরণমালিনী, প্রথিতভাস্বরা, স্বর্গলোকপ্রকাশিকা দেবী উষাকে, দ্রষ্টৃগণ শুদ্ধমননে করেন অনুধ্যান।।"

"এষা জনং দর্শতা বোধয়ন্তী সুগান্ পথঃ কৃণ্বতী যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাম্।।"

(ঋ.৫/৮০/২)

"এই দ্রষ্টা জনগণকে করেন প্রবুদ্ধ, সুগম করেন পথ এবং যান সম্মুখে, বৃহৎ যাত্রীকা, বিশ্বব্যাপ্তা উষা, দিবসের পুরোভাগ সাথে লয়ে জ্যোতিঃ।"

দেবী সরস্বতী —

"ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি।।" (ঋ. ২/৪১/১৮)

"কর সানন্দে গ্রহণ এই মন্ত্রমালা, ওগো ঋদ্ধিপূর্ণা সরস্বতী, দেবগণ মাঝে প্রিয় তব মন্ত্ররাজি যাহা, ওগো ঋতম্ভরা, গৃৎসমদ কুলঋষিগণ তাহাতেই করে তব পূজা।।"

"আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।"
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু।"

(ঋ. ৩/৪/৮)

"ভারতী তাঁর কাব্যগাথা ও ইলা সখীসহ এবং অগ্নি, দেব মনুষ্যগণসহ, সরস্বতী তাঁর বাক্‌সহ — এই দেবীত্রয় এসে করুন উপবেশন আমাদের এই কুশে।।"

দেবী সরমা —

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড় দূরে হ্যধ্বা জগুরিং পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি।।"

(ঋ. ১০/১০৮/১)

"কি অভিলাষে, ওগো সরমা, তোমার এখানে আগমন — সম্মুখে দূরে পথ দুঃসাধ্য ও দুর্গম, আমাদের কাছে কি-ই বা নিহিত— কি কারণেই বা তোমার এই পরিভ্রমণ (ঘোরাঘুরি), পৃথিবীর নাদকৃৎ এই মধু বারিরাশি কিভাবেই বা হবে পার?"

সুতরাং বেদে শক্তিপূজা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কালীমাতার কথা একটু বিশেষভাবে ভিন্ন প্রবন্ধে বলা যাইতেছে।

বেদে কালীমাতার সঙ্কেত

বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার কথা কোথায় কোথায় আছে ইহাই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অনেক পণ্ডিতলোকের ধারণা কালী বৈদিক দেবতা নহে। বেদ খুলিলে অগ্নিসূক্ত ইন্দ্রসূক্ত বরুণসূক্ত। সোমসূক্ত আদিত্য-সূক্ত — এইরূপ বহু সূক্ত দৃষ্ট হয়। দশটি মণ্ডল আছে বেদে। তাহাতে ১০২৮ টি সূক্ত আছে। ইহাতে কালী নামে কোন সূক্ত নাই।

ঋগ্বেদ ছাড়া আরও তিনখানি বেদ আছে। তাহার মধ্যেও অনেক সূক্ত আছে, কিন্তু কোথাও কালী নামে কোন সূক্ত দৃষ্ট হয় না। এইজন্য অনেকের ধারণা, কালী বৈদিক দেবতা নহে। কালী অনার্য দেবতা বা লৌকিক দেবতা। আর্যজাতির একটি স্বভাব ছিল, যেখানে যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত বস্তু পাওয়া যায় তাহাকেই তাঁহাদের নিজেদের ব্যাপক ঔদার্য ফলে একাকার করিয়া লওয়া। এই কথাটিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় গর্বের সহিত বলিয়াছেন —

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা।
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।।
হেথায় আর্য হেথায় অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।।"

আর্য জাতির স্বভাব এখনও বিরাজমান। তাই হয়তো আর্যরা কোন কালের কোন অনার্যগণের দেবতা কালীকে মিশাইয়া লইয়াছে। কালীমাতার মূর্তিটির দিকে তাকাইয়া দেখুন — লোলজিহ্বা, বিকটদর্শন, গলায় নরমুণ্ডের মালা, রক্তপানে উন্মত্তা, বিবসনা, স্বামীর বক্ষে দণ্ডায়মানা এবং দর্শনমাত্রেই ভীতি উৎপাদনকারী। এইরূপ কোন দেবতার মূর্তি বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সাধারণতঃ ইহা আর্যতের গোষ্ঠীর কোন দেবতা বলিয়া মনে হয়।

বহু বহু শতাব্দী পূর্বে আর্যরা কালীমাতার মূর্তি দেবতার গোষ্ঠী (Pantheon)-এর ভিতর মিশাইয়া লইয়াছেন। এই ভাবনা অধুনাকাল পর্যন্ত আছে। প্রাচীন আর্যরা আকাশের তারা গুলির সংখ্যা তেত্রিশ কোটি মনে করিতেন এবং প্রত্যেক তারাকেই দেবতা মনে করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার ভাবনা করিত। এতগুলি দেবতা গোষ্ঠীর ভিতর দু'একটি যোগ

বা বিয়োগ দিলে কিছু ক্ষতি হইত না। এইজন্য কালীকে দেবগোষ্ঠীর ভিতর অন্তর্ভুক্তিতে কোন ক্ষতি হয় নাই। এখনও আমরা সুবচনী, সন্তোষী প্রভৃতি দেবতাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছি এবং বেদের বিশিষ্ট দেবতা ইন্দ্র বরুণদিগের পূজা বাদ দিতেছি। কালীর সম্বন্ধেও এইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

আমরা মনে করি কালী বৈদিক দেবতা। বৈদিক শাস্ত্রে কালীর নাম অতি সম্মানের সহিত উক্ত হইয়াছে। বেদের অন্ত্যভাগে অর্থাৎ উপনিষদে এবং গীতা-মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই কালীর নাম উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীঅরবিন্দের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল এই কথা সর্বজনবিদিত। তিনি নিজ বক্তৃতায় ও লেখনীতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যে কালীমাতার দর্শন হইয়াছিল ইহা অনেকেই জানেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার রাজনৈতিক গোপনীয় চিঠিপত্রে বিপ্লবীদের কাছে নিজের নামের স্বাক্ষর স্থলে 'কালী' নাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে তাহার নাম 'ভবানী ভারতী'। এই নামটি সম্ভবত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী মন্দিরের অনুকরণে। কাব্যখানি সংস্কৃতে লেখা। গ্রন্থখানির চতুর্থ শ্লোকেতে লিখিয়াছেন —

> "সুখং মৃদাবাস্তরণে শয়ানং সুখানি ভোগান্ বসু চিন্তয়ন্তম্।
> পস্পর্শ ভীমেন করেণ বক্ষঃ প্রত্যক্ষমক্লোশচ বভূব কালী।।"৪

উহার বঙ্গানুবাদ এই হইতে পারে —

"মহাসুখে কোমল শয্যায় শুয়ে যখন সুখ, ভোগ ও ঐশ্বর্যের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম তখন কালী তাঁর কর দিয়ে আমায় স্পর্শ করলেন। তিনি হাতটি রাখলেন আমার বুকে। তারপর চোখের সম্মুখেই তাঁর আবির্ভাব হল।।"

শ্রীঅরবিন্দ গবেষক শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায় কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন—

> "বিলাসের মোহে মুগ্ধ মগ্ন মহাসুখে
> সুকোমল শয্যাপরে আছিনু শয়ান।
> সহসা টুটিল নিদ্রা
> ভীমহস্তা অকস্মাৎ বক্ষস্থলে রাখি'
> আবির্ভূতা কালী মোর নয়ন সম্মুখে।।" ('বর্তিকা' পত্রিকা)

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করিতেন যে মায়ের যত শাস্ত্রমূর্তি আমাদের শাস্ত্রে আছে; যেমন, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি, ইঁহাদের সকলের মূল কালীমাতা। মনে হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও মায়ের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়াছেন। তাই বুঝি 'গীত বিতানে'র একটি কবিতায় মা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এইরূপে—

.... "ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী!" ....

মুণ্ডক শ্রুতির ১/২/৪ মন্ত্রে 'লেলায়মানা' শব্দ আছে। অনেক ভক্ত সাধক মনে করেন 'লেলায়তে' আর 'লীলায়তে' একই কথা। ইহাতে বুঝা যায় বিশ্ব সংসারটাই কালীমাতার লীলা, শক্তির বিকাশ। বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রীরাধাকে বলেন অন্তরঙ্গা শক্তি, এবং কালীকে বলেন বহিরঙ্গা শক্তি । অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন এই সংসারে মাতৃগণের দুইটি কাজ। একটি স্বামী-সেবা ও অপরটি সন্তান-পালন। যিনি সন্তান সেবায় সতত যুক্তা তিনি সন্তানসেবা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এই সন্তান প্রতিপালিকা শক্তিই বহিরঙ্গা শক্তি, স্বামী-সেবা পরায়ণ শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তি। ঐ দুইটি শক্তি একটি মূল শক্তির দুইটি রূপ বলা যাইতে পারে। একটি বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন একই সময়ে শীতল করিতে, তপ্ত করিতে পারে আবার আলোও দিতে পারে, সেইরূপ একই শক্তির ত্রিবিধ প্রকাশকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি বলিয়াছেন এইরূপ মনে হয়।

শ্রীভগবান্ যেমন ধরায় অবতার গ্রহণ করেন সেইরূপ মহাশক্তিও অবতার গ্রহণ করেন। পুরাণে মহাশক্তি প্রকটের কথা আছে। উমারূপে দুর্গারূপে আছে। ভাগবতশাস্ত্র অবতারের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়াছেন। বর্তমান যুগে শ্রীঅনির্বাণ একস্থানে মহাকালীর তিনটি অবতারের কথা বলিয়াছেন— শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা, শ্রীঅরবিন্দের মীরা এবং স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি ভক্তিমাতার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রভু জগদ্বন্ধু অনেক গান লিখিয়াছেন। সমস্ত গানেরই বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। অন্য কোন দেবদেবী সম্বন্ধে কোন লেখা পাওয়া যায় না। একটি বিশেষ লক্ষণীয়, কালীমাতা সম্বন্ধে একটি গান আছে। এই গানটিতে কালীমাতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন— তুমি এস, তুমি

আসিয়া ধ্বংস কার্য না করিয়া সর্বজীবের কল্যাণময় প্রেমের ডালি সাজাইয়া প্রেম বিতরণ কর। সর্বজীব প্রেমরসে উদ্ভাসিত হউক। ঐ গানের পদে তিনি বলিয়াছেন—

"তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হে,
তুমি গণপতি অংশুমালী।"

অংশুমালী অর্থ সূর্য। জগতে যতকিছু দেবদেবী কাজ করিতেছেন তাহার মূলও সূর্য। সুতরাং কালীকে মূলীভূতা দেবী বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু কোনস্থানে গমন করিলে পূর্বে যেখানে নর-নারী বাস করিয়াছেন, সেই ঘরে থাকিতেন না। কালীমাতার মন্দির পাইলে সেখানে থাকিতেন।

বেদে মাতৃশক্তির বহু মন্ত্র দেখানো হইল। শ্রীঅরবিন্দের একটি মাতৃ-মন্ত্র উদ্ধার করিয়া ও প্রভু জগদ্বন্ধুর একটি কালীর গান প্রকাশ করিয়া দেখানো হইল। এখন আমরা গীতা ও উপনিষদের উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করিব।

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন "পশ্য মে পার্থ" বলিয়া। অর্জুনও অতি মনোযোগ সহকারে দেখিতে থাকেন। বলেন "সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।" কিন্তু অতঃপর শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাকে ভয়ঙ্কর রূপ বিভূতি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন— অর্জুন আর তখন সখা কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন না। ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? বল। তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না।" (আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপ!) তখন শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।" (গীতা, ১১/৩২)

"আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে লোক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না।"

শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি এই শক্তি ও মুণ্ডক শ্রুতির কালী একই। তত্ত্বে লিঙ্গ ভেদ নাই, ভাষায় লিঙ্গভেদ আছে। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তিতে বিন্দুমাত্র ভেদ নাই; কিন্তু ভাষায় অগ্নি শব্দ পুংলিঙ্গ, দাহিকা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অথচ ইহারা বস্তুত দুইটি নহে। দাহিকা শক্তিই অগ্নি, পৃথক্ কিছু নহে। শ্রীভগবান্ নিজের পরিচয়ে বলিলেন, 'কালোঽস্মি'। এই 'অস্মি'

ক্রিয়াটিতে স্পষ্ট বুঝা গেল কালীতে ও আমাতে কোন পার্থক্য নাই। কার্যের পরিচয় দিলেন দুইটি — 'লোকক্ষয়কৃৎ' আর 'লোকান্ সমাহর্তুং'। 'সমাহর্তুং' অর্থ অনেকেই বলিয়াছেন 'সংহার করিতে'। 'লোকক্ষয়কৃৎ' শব্দেই সংহার অর্থ ব্যক্ত, আবার সংহার অর্থে 'সমাহর্তুং' কেন বলিবেন? শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক লিখিয়াছেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সম— হৃ + তুমুন্ করিয়া 'সমাহর্তুং', অর্থাৎ সংগৃহীত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এই অর্থ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। হাতে একটি কুষ্মাণ্ড লইয়া কোন রমণী যদি কোন লৌহাস্ত্র দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে তবে একদিকে একজন বলিবে কুষ্মাণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া বিনষ্ট করিতেছে— আবার অপর দিকে আর একজন বলিবে, তরকারী বানাইতেছে। বহুলোক খাইবে তাই কুষ্মাণ্ডকে আহারোপযোগী খাদ্যে পরিণত করিতেছে। দুইটি অর্থ নহে, ঐ কার্যে রত ব্যক্তিও বলিবে, আমি তরকারী বানাইতেছি। বানানো অর্থ তৈয়ারী করিতেছি। সুতরাং ক্ষয় করার সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্মাণ করার অর্থ আছে। শ্রীভগবান্ও 'লোকক্ষয়কৃৎ' ও 'লোকান্ সমাহর্তুং' এই দুইটি কথায় ধ্বংস করা ও নির্মাণ করা বলিয়াছেন। 'লোকসংগ্রহ' শব্দটি শ্রীভগবান্ গীতায় দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন (৩/২০, ৩/২৫)। লোকসংগ্রহের মধ্যে একটি ধ্বংস আছে আবার লোকধ্বংসের মধ্যেও লোকসংগ্রহ আছে — একটি কাজেরই দুইটি পিঠ। কথাটি আর একটু তলাইয়া বুঝা প্রয়োজন। 'লোকসংগ্রহ' অর্থ অনেকেই লোকশিক্ষা করিয়াছেন। স্কুল-কলেজের মাস্টার-অধ্যাপকেরা লোকশিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহারা লোকসংগ্রহ করেন না। দু'একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতে পারে। কাঠুরিয়া বনে গিয়াছে কাঠ সংগ্রহ করিতে। এই কাঠ সংগ্রহ অর্থই কতগুলি বৃক্ষের ডালপালা কাটিয়া তাহাদের রান্নাকার্যে ব্যবহারোপযোগী করা। তাহার কাষ্ঠ সংগ্রহের পিছনে বৃক্ষের ক্ষয় আছে। বৃক্ষগুলি রান্নার উপযোগী ছিল না, তাহা কাটিয়া সংগ্রহ করিয়া পাককার্যে ব্যবহারের উপযোগী করা হইল, তাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালন পূর্বক তণ্ডুল গোধূমাদি পাক করিয়া আহারোপযোগী করা হইল। আর বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ কার্যটি হইল ক্ষয়। এই দুইটি কাজে কোন পার্থক্য নাই, পৃথক্ কেবলমাত্র বলিবার ভঙ্গি বা ভাষায়। দুইটি বস্তুত একটি কাজের দুইটি রূপ। সেইরূপই একটি লোকক্ষয় অপরটি লোকসংগ্রহ। অথবা ধরা যাউক, একজন সেনাপতি এক গ্রামে ঢুকিয়া বাছিয়া একশত লোককে লইয়া চলিয়া গেল। অনেকে মনে করিল, এই লোকগুলি সৈনিকের হাতে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু সৈনিক পুরুষ একশত লোককে 'লেফট্ রাইট্' বলিয়া 'মার্চ' করা শিখাইয়া কতকগুলি

নিয়মানুবর্তিতা বা 'ডিসিপ্লিন' আয়ত্ত করা একদল যুগোপযোগী সৈন্যে তৈয়ারী করিল। গ্রামের লোকগুলি হইয়া গেল শেষ, আর সংগ্রহ হইল এক শক্তিশালী সৈন্যদলের। সংগ্রহের পেছনে একটি ক্ষয় আছে — তবে সেই ক্ষয়ের উদ্দেশ্য কল্যাণ। ধ্বংস করে যে কালশক্তি তাহার উদ্দেশ্য লোকসংগ্রহ। গীতার কালস্বরূপেরও এই তাৎপর্য। কালীমাতার মধ্যে এই দুইটি স্বরূপ আছে বলিয়াই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কালীমাতাকে প্রেমের ডালি লইয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মুণ্ডক শ্রুতিতে মহাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

''কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।।'' ১/২/৪

এখানেও কালী শব্দ স্পষ্টই আছে। এই মন্ত্রের অনেক ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন— ইহা অগ্নির সাতটি জিহ্বার বর্ণনা। এই ব্যাখ্যা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রটির তাৎপর্য কালশক্তির বর্ণনায়। এখানে কালশক্তি বা কালীর সাতটি বিশেষণ।

অথর্ববেদে কালসূক্তে বলিয়াছেন, ''কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ।'' (অ. ১৯/৫৪/৫) কালই নিখিল ভুবনকে অভিব্যক্ত করিতেছে। এই অভিব্যক্তিরই আপাত দুইটি বিরুদ্ধ কাজ, ক্ষয় বা ধ্বংস করা, এবং সংগ্রহ করা বিনাশ ও বিসৃষ্টি। কালীমাতার দুই বাম হাতে খড়্গমুণ্ড বিনাশের প্রতীক ও দুই ডানহাতে বরাভয়, সৃষ্টির প্রতীক। সুতরাং কালী, ও গীতার কালশক্তি অভিন্ন। বেদ আরও বলিয়াছেন (অথর্ব, ১৯/৫৩/৩)।

''পূর্ণঃ কুম্ভোহধি কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ।''

কাল 'পূর্ণ কুম্ভ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিখিল সৃষ্টি, কালের উপর স্থাপিত তাহাকেই আমরা বহুরূপে হইতে দেখি।

আমি এক আছি, বহু হইব ''একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়,'' সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। ''স ইদং সর্বং অসৃজত তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'' কিরূপে কি উপাদানে সৃষ্টি করিবেন? আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, ''তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'' এই কথাগুলি একই তত্ত্বকে লক্ষ্য করিতেছে। বেদের কালসূক্ত এই কথাটিকে নানা প্রকারে বলিয়াছেন। শ্রুতির এই কালী শব্দ সেই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যান।

ঋগ্বেদে রাত্রিসূক্ত নামে একটি খিল সূক্ত আছে। ''আ রাত্রি পার্থিবংরজ'' বলিয়া সেই উক্ত সূক্তটি আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে আছে—

''রাত্রিং প্র পদ্যে জননীং সর্বভূত নিবেশনীম্।

ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতঃ নিশাম্।।'' ৩

এই রাত্রিই কালী। দুর্গা শব্দেরও সাক্ষাৎ পাই দ্বাদশ মন্ত্রে—

"দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্র পদ্যে।
সুতরসি তরসে নমঃ।। সুতরসি তরসে নমঃ।।" ১২

এই রাত্রি সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি ভরদ্বাজ। ছন্দ — গায়ত্রী।

মুণ্ডক শ্রুতি এই মহাশক্তিকেই নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কালীর প্রথম বিশেষণ দিয়াছেন 'করালী'। করালী শব্দের একটি অর্থ কৃষ্ণ তুলসী। ইহাতে তাহার বর্ণটির কথা এবং পবিত্রকারিত্ব শক্তির কথা বলা হইয়াছে। করালী শব্দের আর একটি অর্থ ভীষণা মূর্তি। ভীষণা ও সৌম্যা মূলত একই।

দ্বিতীয় বিশেষণ দিয়াছেন 'মনোজবা'। যাহার বেগ মনের গতির মত। আধুনিক বিজ্ঞান জগতে দ্রুতগতিশীল বস্তুর মধ্যে আলোর গতিকেই সর্বোচ্চ বলিয়াছে। মনের গতি তাহাপেক্ষাও অধিক। অধিক বেগবান্ অর্থই একইকালে সর্বত্রব্যাপী। ইহাতে বুঝা গেল মনোজবা অর্থ সর্বব্যাপী।

তৎপরবর্তী বিশেষণ 'সুলোহিতা'। ভাগবতে ১১/২৩/৪৩ শ্লোকে বলিয়াছেন "শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি"। অর্থাৎ, যখন তিনি সর্বশুক্লা, তখনই তিনি গভীর কৃষ্ণবর্ণা।

চতুর্থ বিশেষণ দিয়াছেন 'সুধূম্রবর্ণা'। আগুনে আহুতি দিলে যে ধূম উদগত হয় তাহাকে হুতধূম বলে। মায়ের প্রসারিত জিহ্বায় সতত আহুতি অর্পিত হইয়াছে। সেই ধূমে সমাবৃত কণ্ঠকে সুধূম্রবর্ণা বলা হইতেছে।

পঞ্চম বিশেষণ দিয়াছেন 'স্ফুলিঙ্গিনী'। অগ্নির ক্ষুদ্রতম অংশকে স্ফুলিঙ্গ বলে। বিদ্যুতের সূক্ষ্মতম অংশ স্ফুলিঙ্গ। বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে, সূর্য হইতেই অবিরাম বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই বিদ্যুৎকণাগুলির কতকগুলি ফিরিয়া আসিতেছে, আর কতকগুলি কোন্ মহাকাশে মিলিয়া যাইতেছে বুঝা যায় না। এই বিদ্যুৎকণাগুলিকে ঋগ্বেদ-সংহিতা ধূলিকণা স্বরূপ 'পাংসুর' বলিয়াছেন। এই বিদ্যুৎ-কণাগুলিকেই কালীর বিশেষণে স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ বলা হইয়াছে। তাই মায়ের বিশেষণ দিয়াছেন স্ফুলিঙ্গিনী। অন্যত্র ইহার তাৎপর্য বলা হইয়াছে স্পন্দমানা শক্তির ঝলক।

পরবর্তী বিশেষণ 'বিশ্বরুচি'। বিশ্বরুচি শব্দের অর্থ দীপ্তিমহিমা। বিশ্বরুচি শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ রূঢ়পরিচ্ছদা। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন (ভা. ১০/১১/৩০) — গোপগোপীগণ শকটে চলিয়াছেন, তাঁহারা সব রূঢ়পরিচ্ছদা। অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। দুর্জ্ঞেয় শব্দের তাৎপর্য, রহস্য আবরণে সমাবৃত। শ্রীকৃষ্ণের রহস্যমহিমার দ্বারা গোপগোপিগণ আচ্ছাদিত। সুতরাং বিশ্বরুচি শব্দটির একটি তাৎপর্য হইল রহস্যময় আবরণ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই বিশেষণগুলিকে অগ্নিশিখার বিশেষণ করিয়াছেন। অগ্নিকে সপ্তজিহ্বা বলা হইয়াছে। বস্তুত এইসব বিশেষণগুলি কালশক্তি-স্বরূপিণী কালীর বিশেষণ।

সাধারণত মানুষের জিহ্বার দুইটি কাজ— খাদ্য রসাস্বাদন করা ও শব্দ উচ্চারণ করা। এই সৃষ্ট সংসারে যত কিছু দ্রব্য আছে মা সেই সকলেরই ভোক্তা, 'অত্তা চরাচরস্য'। এই চরাচরের তিনিই ভোক্তা। এই বিশ্ব সংসারটিকে মা ভোগ করিতেছেন তাঁহার মুক্ত জিহ্বার দ্বারা। দ্বিতীয় অর্থ — সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি বর্ণ আছে। শ্রীঅমলেশকৃত 'বেদাঙ্গবর্ণ' মতে ৫১টি বর্ণ। ল কার দুইটি। একটি অন্তস্থ ল, অপরটি তরল ল। ইহা বর্তমানে phonology সম্মত। আর ৫১টি বর্ণমালা আছে বলিয়াই সারা ভারতে শক্তির একান্নটি পীঠ আছে। এই তরল ল-কার কে স্বরবর্ণ বলা যায়। মায়ের গলায় একান্নটি নরমুণ্ড হইতেছে অক্ষরগুলি উচ্চারিত হইতেছে। মানবের দেহে সাতটি স্তর আছে। আজ্ঞা চক্রে দুটি বর্ণের দুটি স্তর। একটি নিম্নমুখী, একটি ঊর্ধ্বমুখী। কালীমায়ের দেহে সাতটি স্তর হইতে বর্ণগুলি উৎপন্ন হইতেছে। বর্ণ প্রতীক হইতেছে। অতীব গভীরভূমি হইতে ভাবনা করিলে মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রটি কালী মায়ের সম্পূর্ণ সত্তাটির দর্শন মিলিবে। সুতরাং শ্রুতিতে কালীমাতার বর্ণনা সুষ্ঠুরূপেই রহিয়াছে। শাস্ত্রে আছে "কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ কৃষ্ণা কলৌ জাগ্রতি পন্নগী।" কলিযুগে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণা অর্থাৎ কালী জাগ্রত। তবুও বর্তমান কালে দুর্গাপূজার জাঁকজমক বেশী দেখা যায়। কালী শব্দটি শ্রুতিতে যেমন আছে, তাহার স্বরূপটিও দার্শনিক তত্ত্বের মূর্তি। সমসাময়িক যুগে শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং সাধক কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা প্রমুখ মাতৃমন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কালীর বীজ 'ক্রীং', কৃষ্ণের বীজ 'ক্লীং' একই; শুধু র আর ল-এর প্রভেদ। পণ্ডিতেরা "র-লয়োরভেদঃ" বলিয়া থাকেন। ইহাতে দুইটি বীজ সমার্থক হইয়া যায়। ইহাতেও "কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ কৃষ্ণা ..." — এই বাক্যের সার্থকতা বুঝা যায়। এই বাক্যের 'পন্নগী' শব্দে সর্পভূষিতা মনসাদেবীকে বুঝায়। মনসাদেবীর কথা বেদে নাই একথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু একটি মন্ত্রে (ঋ. ১০/১৮৯/১) সার্পরাজ্ঞী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাসম্ভব এই সার্পরাজ্ঞীই মনসা। সার্পরাজ্ঞী প্রাণ-অপান বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন। যে ঋষির ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে তিনিই সার্পরাজ্ঞী ঋষি। মানুষ মাত্রের ভিতরেই একটি সর্পশক্তি আছে যেটিকে আমরা সাপের ফস্‌ফস্ করা বলি। তাহাকেই বৈদিক ভাষায় বলে হেসৌঃ। হ = আকাশ, স = সোম বা আনন্দ, ঔ = রুদ্র, ঃ (বিসর্গ) = বিসৃষ্টি। "আনন্দ-ঘন শূন্যতার মধ্যে বিসৃষ্টির

তীব্র এক আণবিক পরিস্পন্দ'' (শ্রীঅমলেশ)। মন্ত্র যখন শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় তখন তাহার মধ্যে একটি ফস্‌ফস্‌ শব্দ আছে। বৈদিক ঋষি চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, ''এই স্ফুরৎ প্রাণবায়ু শব্দের বা পদের মধ্যে থেকে যেন সাপের ফণার মত ফুঁসে ওঠে'' — 'পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরত্'' (ঋ. ১/৮৪/৮)। এই সার্পরাজ্ঞী ঋষির অনুভূতি হইতে আমাদের পৌরাণিক মনসাদেবীর প্রকাশ। কাহারও মতে ইনি হঠযোগে কুণ্ডলিনী। সুতরাং মনসাদেবীও অবৈদিক নহেন। বেদের আমরা কতটুকুই বা জানি। তাই কাহাকেও অবৈদিক বলিবার অধিকার আমাদের নাই। মনসামঙ্গল গ্রন্থে মনসা দেবী অযোনিসম্ভবা। শিবের মন হইতে জাতা। শিবের সর্পপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত।

দুইটি সমুদ্র

বৈদিক বাঙ্ময়ে সপ্তসমুদ্রের সন্ধান আছে। তাহার মধ্যে দুইটি সমুদ্র সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষক। একটি 'অপ্রকেতং সলিলম্', আর একটি 'মহো অর্ণঃ'। প্রথমটির সন্ধান আছে নাসদীয় সূক্তে (ঋ. ১০/১২৯/৩); দ্বিতীয়টির সন্ধান দিয়াছেন বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের ১/৩/১২ মন্ত্রে। নাসদীয় সূক্ত বলিয়াছেন (ঋ. ১০/১২৯/১-৩)—

> ''নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্।।
> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।
> তম আসীত্তমসা গূল্‌হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
> তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।''

অনুবাদ — ''এখন যাহা আছে, সৃষ্টির পূর্বে তাহা ছিল না, এখন যাহা নাই তাহাও ছিল না। তখন ভূমি ছিল না, আকাশ বা অন্য কিছুই ছিল না। তখন আবৃত করার মতও কিছু ছিল না, ছাড়াইবার কোন অবলম্বন ছিল না, অথচ এই যে বিশাল গভীর জলরাশি তাহাও ছিল না।''

''তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না, দিবা রাত্রির কোন প্রভেদ ছিল না। তখন ছিলেন একমাত্র এক বস্তু, যাঁহার বাঁচবার জন্য বায়ুর আবশ্যক ছিল না। সেই যে পরম চৈতন্য, তিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর কুত্রাপি কিছু ছিল না।''

''প্রথমে শুধু অন্ধকার (অজ্ঞানান্ধকার), গাঢ়তম অন্ধকার কর্তৃক আচ্ছাদিত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও জলময় ছিল। অবিদ্যমান্ বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন ....'' ('বেদ শ্রীঃ', শ্রীহরেন্দ্রকুমার, পৃ. ৫০)

'অপ্রকেতং সলিলম্' অর্থ হইল ভীষণ অন্ধকার জলরাশি। ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার। নিখিল বিশ্বের যত কিছু উপাদান সকলই ইহার মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, 'Potential' ছিল।

ইহার বিপরীত হইল 'সুপ্রকেতং মহো অর্ণঃ'। চেতনার পূর্ণজ্যোতিঃ। শক্তি ও আনন্দের মিলিত এক তীব্র ধারা। ঋতং ও বৃহতের পূর্ণপ্রকাশ। পরম জ্ঞানের অকুল সমুদ্র এই মহা অর্ণব। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, অন্ধকার

সমুদ্র হইল 'inconscient'। আর দ্বিতীয় 'মহো অর্ণঃ' হইল 'Super Conscient'। এখানে বিশ্বের যাহা কিছু সকলেরই actualisation। একস্থানে সব সম্পূর্ণ নিদ্রিত, আর অপর স্থানে সব সম্পূর্ণ জাগরিত। এই 'মহো অর্ণঃ' বৃহতের মহাসাগর। পরম চেতনার জ্যোতির্ময় অনন্ত সমুদ্র।

এই পরম সমুদ্রের কথাই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সোমবিষয়ক ১১৪টি সূক্তে বলিয়াছেন। দিব্যানন্দের দেবতা হইলেন সোম। এই সোম দেবতার প্রসাদে যে অমরত্ব তাহাকে বলা হইয়াছে মধুচেতনা।

ভাগবতে মহারাসলীলার প্রসঙ্গও এই মধুর উৎসের সর্বাঙ্গীণ বর্ণনা। বৈষ্ণব কবির ভাষায় —

"শুক নাচিছে শারী নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী আনন্দে নাচিছে ধরিছে কতেক তালে।।
ফুলের উপরে ভ্রমরা নাচিছে ভ্রমরী করিয়া সঙ্গে।
মধুকর কত নাচে শত শত মধু পিয়ে তার সঙ্গে।
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীন।
জলচর পাখী নাচিয়া চলিছে নাহি জানে রাতি দিন।
ঊর্ধ্বে নাচিছে যত দেবগণ হইয়া আনন্দ চিত।
গন্ধর্ব কিন্নর নাচিয়া নাচিয়া গাইছে মধুর গীত।।
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গে।
বৃষের উপরে মহেশ নাচিছে পার্বতী করি' সঙ্গে।।
মিহির নাচিছে পত্নী সহিতে রোহিণী সহিত চাঁদে।
যত দেবগণ আনন্দে নাচিছে হিয়া থির নাহি বান্ধে।।
সুরাসুর আদি আনন্দে নাচিছে পাতালে নাগের সঙ্গে।।
কূর্ম সহিতে অনন্ত নাচিছে অতি আনন্দিত মনে।।
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালি রে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাসকেলি।।"

যজ্ঞের ভাষায় বৈদিক ঋষিগণ বলিবেন — ইহাই আনন্দ যজ্ঞ। আনন্দলোকের বর্ণনা করিয়াছেন এক ঋষি। তাঁহার নাম যজ্ঞ ঋষি। ১০ম মণ্ডলের ১৩০ সূক্তের ৪-৬ মন্ত্রে —

"অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্বোষ্ণিহয়া সবিতা সং বভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্থৈর্মহস্বান্ বৃহস্পতের্বৃহতী বাচমাবৎ।।
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্ দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাক্লৃপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ।।
চাক্লৃপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষসা তান্ ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে।।"

বেদে প্রধানতঃ আটটি ছন্দ। ছন্দগুলি যেন দেবতাদের প্রিয়তমা পত্নী।

পত্নীকে পাশে পাইলে তাঁহাদের আনন্দ রসের পরিপূর্ণতা হয়। যজ্ঞ ঋষি বলিতেছেন —

"গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হলেন। দেব সবিতা উষ্ণিক্ নামক ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। সোম অনুষ্টুপ্ ছন্দের সাথে ও তেজোমূর্তি সূর্য উক্থ ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করল। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়ল এবং দিবা ভাগের যে সোম, তাও তাঁর ভাগে পড়ল। জগতী নামক ছন্দ সকল দেবতাকে আশ্রয় করল। এরূপে ঋষি ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন।।" (রমেশচন্দ্র দত্ত)

সৃষ্টি রহস্য — পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য মত

মানুষের যেমন জন্ম-জীবন-মৃত্যু ও পুনরায় জন্মাদি ঘটনা চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছে, এই বিশ্বসংসারও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ও পুনরায় সৃষ্ট্যাদি ক্রমে চক্রাকারে আর্বতিত। এই সৃষ্ট জগৎ সদাই পরিবর্তনশীল। গচ্ছতি। ইতি জগৎ, সর্বদাই চলিতেছে। একস্থানে স্থির হইয়া নাই জগৎ ব্যাপার। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতের যে রূপ বা চিত্র ছিল, আজ তাহা নাই। আজ যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা থাকিবে না, নিয়ত পরিবর্তনই এই জগতের ধর্ম।

সৃষ্টির মূলে বা শুরুতে জগতের কি অবস্থা ছিল, তখন প্রাণের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা, এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত, বৃহত্তর কোন সূর্যের আকর্ষণে আমাদের সূর্য হইতে গ্রহগুলি ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। গ্রহগুলি তখন ছিল প্রচণ্ড তপ্ত, সেখানে প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। ক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়। ধাতু (mineral), উদ্ভিদ (vegitation) ও প্রাণী (animal) জগৎ ক্রমে অভিব্যক্ত হয়।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মত, সৃষ্টির মূলে ক্রমবিবর্তন (Evolution) বা অভিব্যক্তি। জীবন সংগ্রাম (struggle for existence)-এ পরাজিত হইয়া বহু আদিম প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কারণ যোগ্যতম যে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে সে-ই টিকিয়া থাকিবে (Survival of the fittest) । এই নীতি অনুসারে বানর ও পরে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে বিশ্বে। আদিম মানুষ ছিল বুনা, বন্য জন্তু পোড়াইয়া খাইত। ক্রমে পশুপালন ও চাষবাস প্রবর্তিত হইল।

বেদের কবিতাগুলি ঐ চাষাদের গান, আদিম যুগে চাষারা প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নিজেদের অক্ষমতা ও অসহায়তার কারণে শক্তি-সমূহকে দেবতা জ্ঞানে স্তব-স্তুতি করিত, পরবর্তীকালে জনগণ অনুভব করিল, এই প্রকৃতি-দেবগণের মূলে একজন বিশ্বদেব আছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের শিষ্য শ্রীরমেশচন্দ্রও তাঁহার *Civilisation of Ancient India* গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The religion of the Rigveda travels from nature upto nature's god. The worship appreciates the glorious phenomena of nature and rises from these phenomenon to grasp the mysteries of the creator and the great creation"

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের ধারণা ছিল— একটি ক্রমিক ধারায় পৃথিবীর সব জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এখনও ঐ ধারা আরও অগ্রসর হইতেছে, মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর

প্রাচ্য ঋষিদের অভিমত : আর্যঋষিগণ সৃষ্টির অভিব্যক্তি ও রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন অন্যরূপে। মূলকথা এই : বিশ্ববীজ পরমাত্মা পরমপুরুষ তাঁহার নিজ পরাশক্তিতে ক্রিয়াশীল হইয়া বিচিত্র বিরাট বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরাশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই তিনগুণের অভিব্যক্তির বৈষম্যে, বিষম অবস্থাপন্ন বহু অঙ্গে বিরাটের বিচিত্ররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিরাটের এই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইতেছে, স্থিতিকালে তাঁহার জীবনের ক্রিয়া চলিতেছে, অন্তে আবার তাঁহাতে লীন হইতেছে। বিরাটের এই-প্রকার এক একটি প্রকাশ-কালকে কল্প বলা হয়। কল্পের পর কল্প ধরিয়া সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে।

এক কল্পের অর্জিত জ্ঞানের সংস্কার লইয়া পরবর্ত্তী কল্পে উচ্চতর অধিকারী হইয়া কেহ কেহ কোথাও আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা ঋষি। ঋষিদের দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়। এই সকল ঋষিগণ হিন্দু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মের প্রবর্তক যিনি তাঁহার জীবনাদর্শ সেই ধর্মের অনুবর্ত্তীদের নিকট মানবজীবনের উচ্চতম স্থল বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্মমতের আদর্শ যিশুখৃষ্টের মত (Christ like) হওয়া, ইসলাম ধর্মমতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হজরত মহম্মদ। এই ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরতের মত। বৌদ্ধধর্মমতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন বুদ্ধদেবের মত। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন ঋষিতুল্য। ঋষিত্বলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

মনু বলেন— ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানের মধ্যে যিনি জ্ঞান অনুসারে সর্ব কর্ম সম্পাদন করেন, তিনি কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানে মার্জিত বুদ্ধি, তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের মধ্যে যে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাঁহার লক্ষণ কি? ধৃতি (ধৈর্য), ক্ষমা, শম (চিত্তসংযম, মনস্তুষ্টি), দম (ইন্দ্রিয় সংযম), অচৌর্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীমান্ (প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত), সত্যনিষ্ঠ, অক্রোধ — এই দশ লক্ষণ ধর্ম যাঁহার জীবনে অনুষ্ঠিত হয়, নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান যিনি করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনি ঋষি।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল ঋষিত্ব লাভ। জীবন্মুক্ত হইয়াও ঋষিরা মানবের হিতার্থে মানব সমাজেই বাস করেন এবং ধর্মতত্ত্ব প্রকাশে মানবের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করেন।

ঋষিরা বলেন— এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন বহু হইবেন, এই ইচ্ছাশক্তির স্পন্দনে তাঁহার পরাশক্তি ক্রিয়াবতী হইলেন। তিনি পরাশক্তিতে ক্রিয়াশীল হইয়া বিচিত্র বিরাট বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সৃষ্টির মূলে "বহু স্যাং প্রজায়েয়"। এই সংকল্প বাক্য আজও ক্রিয়াশীল। প্রতিনিয়ত সেই ইচ্ছাশক্তি বিশ্বজগতে স্পন্দনাত্মিকা হইয়া সৃষ্টিকার্যে রত।

এক-ই মানুষ গুণানুসারে যে কাজের যোগ্য সেই কাজে সে ব্যাপৃত। এক-ই লোহায় ছুঁচ হয়, কলম হয়, তরবারি হয়, কুঠার হয়। ছুঁচ সেলাই করে, কলম লেখে, তরবারি শত্রুবধ করে, কুঠার গাছ কাটে। একের কাজ অন্যটির দ্বারা হয় না। গুণ-বৈষম্যে মানুষে মানুষে কর্মের পার্থক্য ঘটে। সুতরাং কর্মেই অধিকার স্বীকৃত হইলেও সকল কর্মে সকলের সমান অধিকার, স্বীকার করা যায় না।

ঋষিরা বলেন— গুণ ও কর্মভেদে সমাজ-দেহে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গভেদের ন্যায় শ্রেণীভেদ দেখা যায়। গুণ ও গুণানুরূপে কর্মের প্রবণতায় চারি প্রকারের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) কিছু ব্যক্তি স্বভাবত ধীর, শান্ত, বিদ্যালোচনা ও ধর্মসাধনা প্রভৃতি সত্ত্বগুণাত্মক কর্মের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা।

(খ) আর এক প্রকার লোক আছেন, যাঁহারা দৈহিক বলে, শৌর্যে বীর্যে বিশেষ ক্ষমতাবান্। উদ্দাম তেজস্বিতা, দুর্ধর্ষ বিক্রম প্রকাশে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসাহী। রাজসিকতাই তাঁহাদের স্বাভাবিক ও প্রধান লক্ষণ।

(গ) আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ধনার্জনমূলক বিষয়কর্মে পটু। তাঁহাদের স্বাভাবিক কর্মের প্রেরণা সেই দিকেই।

(ঘ) আর এক প্রকার মানুষ আছেন যাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি বা শক্তিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না, অন্যের অধীন থাকিয়া তাঁহাদের

নির্দেশমত দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজকর্ম করিতে সক্ষম। এই প্রকার লোকের সংখ্যা অধিক।

এই চারি শ্রেণী, সমাজদেহের চারি অঙ্গ। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে প্রধান। প্রত্যেকের সমান প্রয়োজন আছে সমাজদেহে। সকলেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোন অঙ্গ ক্ষীণ বা দুর্বল হইলে ও অন্য অঙ্গ অধিক পুষ্ট হইলে সমাজদেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সুস্থতা থাকে না, ফলে যে-কোন অমঙ্গল ঘটা মোটেই অসম্ভব নহে।

সমাজের এই বিভাগ মনু-সংহিতা নির্দেশিত, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আপন দেহ হইতেই প্রথম মানব 'মনু' এবং প্রথম মানবী 'শতরূপা'-কে সৃষ্টি করিলেন। শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিয়াছেন সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে। ব্রহ্মার নির্দেশে শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য মনু ও শতরূপা মিথুনধর্মে নিরত হইলেন। সৃষ্ট জীবগণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাজ-ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হইল।

ভারতের অধ্যাত্মসভ্যতার কোন এক পর্বে উপরে লিখিত গুণ-কর্মানুসারী সামাজিক বিভাগ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম সমাজে, রাষ্ট্রে ও পারিবারিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তখন ছিল বৈদিক-সভ্যতার সুবর্ণময় যুগ। পরবর্তীকালে এই বিভাগ বংশগত রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার শুভ ও অশুভ দুইটি দিক্ই আছে। পেশা বংশগত হইলে, পিতার দক্ষতা, কর্মকুশলতা সহজেই পুত্রে সঞ্চারিত হয় ও উৎকর্ষ লাভ করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের বংশগত দক্ষতা সর্বজনবিদিত।

ডাক্তার বা উকিলের পেশা যদি পুত্র গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহাদের দক্ষতা, অধ্যবসায়ের ফল নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-সন্তান যোগ্যতা থাকিলেও যদি পুরোহিতের কার্য না করে তবে তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না, এই ব্যবস্থায় সমাজে ক্রমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

বর্তমান কালে উপরে লিখিত সামাজিক বিভাগ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চারিদিকে প্রকট দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরূপ গুণ-কর্মানুসারী সামাজিক বিভাগ কোন কালেই ছিল না, দেশের চিন্তাবিদ্গণ মনে করেন ভারতবর্ষে এই সামাজিক বিভাগ ছিল স্বাভাবিক (natural), এবং কৃত্রিম নহে। সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহত, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে এইরূপ বিভাগ কার্যকরী হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যে দেখা যায়, চার্চ (Priesthood) ও রাজশক্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। যাজক সম্প্রদায়ের চেষ্টা রাজশক্তিকে তাহাদের অধীন করিতে এবং শাসকগোষ্ঠীর সদাই প্রয়াস যাজক সম্প্রদায়ের শক্তি খর্ব করা। তাহাদের এই সংঘাত

যে-পরিমাণ রক্তপাত ঘটাইয়াছে তাহা সম্ভবত কোন বিশ্বযুদ্ধে ঘটে নাই। একই ধর্মে মতাদর্শের সংঘাত, যেমন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী হানাহানি সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উহা অকল্পনীয়।

বৈদিক সামাজিক বিভাগ এক সময়ে রাষ্ট্র-সমাজে যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছিল, বর্তমানে কালে উহা আমাদের ভাবনার অতীত।

বেদে অবৈদিক ধারা

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই বৈদিক ভাবনা-ধারার পাশাপাশি আরেকটি অবৈদিক চিন্তাধারা নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত ছিল, যদিও তাহারা বহু প্রকারে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, তথাপি তাহারা একরকম মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছিল।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যেমন বর্তমান বাংলা দেশে রাজা রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কর্তৃক প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের গতানুগতিক হিন্দু ধর্ম, বহুলাংশে পরস্পর বিরোধী। বেদ উপনিষদ্ নির্দিষ্ট পরব্রহ্মকে আরাধ্য জানিয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকে নিরাকার জানিয়া আরাধনা করেন। পাশাপাশি গতানুগতিক হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তি করিয়া জাঁক-জমকে পূজা অর্চনা করেন। ব্রাহ্মরা বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষে মানুষে জাতিভেদ মিথ্যা। পক্ষান্তরে হিন্দুরা উঁচু-নীচু, ছোট-বড় কতগুলি জাতিভেদ রচনা করিয়া একে অপরের স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এই প্রকার বহুবিধ বিরোধিতা সত্ত্বেও দুইই বেদপন্থী পরিচয়ে সমাজের মধ্যে বসবাস করিতেছে।

সেই প্রকার বৈদিক চিন্তাধারার মধ্যে একটি অবৈদিক ধারা পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। ঋষি ও মুনি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে, তদ্‌বিষয় আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ঋষিদের দান বেদান্ত-দর্শন, মুনিদের দান সাংখ্যদর্শন। বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি উপনিষদের অপরোক্ষ অনুভূতি, সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি বিচার, বুদ্ধি ও তর্ক। ঋষির সম্পদ্ শ্রুতিবাক্য। মুনির সম্পদ্ আপ্ত বাক্য। ঋষিগণের সাধনা যজ্ঞ, মুনিগণের সাধনা যোগ। অবৈদিক ধারা অবলম্বনকারীদের অপর একটি ভদ্র নাম ব্রাত্য। ঋষিদের উপাস্য একর্ষি (সূর্য), আর ব্রাত্যদের যিনি উপাস্য তিনি একব্রাত্য বা মহাদেব। ভাগবতের ধারা বৈদিকভাব ঘেঁষা। আর শৈবধারা অবৈদিকভাব ঘেঁষা।

এই শৈবধারার সর্বপ্রধান নিন্দনীয় বিষয় শিশ্ন দেবতার পূজা। ঋ. ৭/২১/৫ মন্ত্রে বসিষ্ঠদেব ইন্দ্রদেবতাকে বলিতেছেন —'শিশ্নদেবা' অর্থাৎ লিঙ্গপূজকেরা যেন যজ্ঞস্থলে না আসে, "মা শিশ্নদেবাঃ অপি গুর্ঋতং নঃ।" এই লিঙ্গপূজা বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত। অনেক কিছুই আত্মসাৎ করিয়া যেন জাতে তুলিয়া লওয়া বৈদিক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

ব্রাত্যদের সম্বন্ধে আলোচনা অথর্ববেদ সংহিতার পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রারম্ভে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, অথর্ববেদের ব্রাত্য কাণ্ডে ব্রাত্যরা হীন বা নিন্দিত নহে, বরং অতিপ্রশস্ত।

''ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।।১
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ।।২
তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ তন্মহদভবৎ।
তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ তদ্ ব্রহ্মাভবৎ।
তৎ তপোহভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত।।৩
সোহবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোহভবৎ।।৪

অনুবাদ—''সৃষ্টির আদিতে এক ব্রাত্যই ছিলেন, তিনিই প্রজাপতিকে প্রেরণা দেওয়াতে প্রজাপতি তাঁর আত্মনিহিত সুবর্ণ জ্যোতি হতে বিশ্বের মূলতত্ত্বরূপে সৃষ্টি করলেন তপঃ, সত্য এবং ব্রহ্ম, তার ফলে এই জগৎ উৎপন্ন হল।''

ব্রাত্যদের দেবতা অবৈদিকদের রুদ্র। বিদ্যায় ব্রাত্যরা জ্ঞানবাদী, তাঁহারা কর্মকাণ্ডের বিরোধী, তাঁহারা সাংখ্যধারার বাহক, তাঁহারা অদীক্ষিত হইলেও দীক্ষিতের মত কথা বলে। দীক্ষার অর্থ এখানে সাবিত্রী-দীক্ষা মনে হয়। প্রাচীন যুগের জৈন তীর্থংকর ও বৌদ্ধদের কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে ইঁহারা নাথ এবং আধুনিক যুগে ইঁহারা আউল, বাউল। ইঁহারা সকলেই প্রাচীন ব্রাত্যদলের লোক, ইঁহারা আজ পর্যন্ত বিরাজমান আছেন। ইঁহাদিগকেই বেদের অবৈদিকধারা বলিয়াছি। এই অবৈদিকদের ভাষা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় 'তত্ত্ব কথা' বলে। বেদের ব্রাহ্মণে ইঁহাদের নিন্দা-প্রশংসা দুইই আছে। একটি অবৈদিক কালীমাতার 'পুতুল' পূজা করিয়া একজন 'অশিক্ষিত' ব্যক্তি অবতারপ্রতিম হইতে পারে, ইহা ব্রাহ্মধর্মের আচার্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য কোন উক্তি করেন নাই। ভগিনী নিবেদিতার মত একজন উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী মহিলাকে সারদামাতার সঙ্গে গেলেও দক্ষিণেশ্বরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছেন কুৎসিত ছুৎমার্গ কতদূর হীনতম পর্যায়ে নামিতে পারে। তাই অতি দুঃখে 'অপমানিত' কবিতায় লিখিয়াছেন—''মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে/ ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।।''

এই প্রসঙ্গে আর একটি মূল্যবান্ কথা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেকে বেদান্তকৃৎ এবং বেদবিদ্ বলিয়াছেন। এই কথা দুইটি বলিয়াছেন পঞ্চদশ অধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে

বেদবাদরতদের নিন্দা করিয়াছেন এবং পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' বলিয়া যেন ছোট করিয়াছেন। অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব' এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ের ছেচল্লিশ শ্লোকে বেদবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সকল বেদে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই এইরূপ বলিয়াছেন। এই তিনটি স্থানে (২/৪২, ৪৫, ৪৬) বেদের নিন্দা করিয়াছেন মনে হয়।

এইভাবে 'বেদনিন্দা' শ্রীকৃষ্ণের মুখে কেন উচ্চারিত হইল ইহার সদুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। ঐ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রবেশ না করিয়া আমরা একটি সহজ ও সাধারণ উত্তর দিতেছি। 'বেদবাদরতা', 'বেদাঃ' ও 'সর্বেষু বেদেষু' এই তিন স্থানে বেদ শব্দে প্রকৃত বেদের কথা বলেন নাই। যাহারা বেদ-বিরোধী, তাহারা ভুল বুঝিয়া যাহাকে বেদ মনে করে, তাহাকেই নিন্দা করিয়াছেন। বেদ-বিরোধীরাও নিজেদের বেদপন্থী মনে করেন। তাঁহারা বেদের ভ্রমাত্মক অর্থ করিয়া নিজেদের বেদজ্ঞ ভাবেন। সেই ভুল অর্থকারিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐরূপ নিন্দাসূচক কথা কহিয়াছেন। বস্তুতঃশ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করেন নাই। বেদ অপব্যাখ্যাকারীদের নিন্দা করিয়াছেন।

এই শ্লোকের আলোচনায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, "বৈদিক কাম্য কর্মের যে নিন্দা করা হইয়াছে বা যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা কর্মের নহে, কিন্তু ঐ কর্ম বিষয়ে যদি কাম্যবুদ্ধি মনে না থাকে তবে শুধু যাগযজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান্ নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন যে, মীমাংসকদিগের এই সকল যাগযজ্ঞাদি কর্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত। (গী. ১৮/৬)। গীতার এই দুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের শ্লোকে মীমাংসকদিগের কর্মকাণ্ডের যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা উহার কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়াছে, কর্মের জন্য নহে।" ('গীতা রহস্য,' ষষ্ঠ সংস্করণ, সম্পাদক, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, পৃ. ৫০৫)

বিষয়টি অতি জটিল ও অতি প্রয়োজনীয় বোধে শ্রীধরস্বামিপাদকে অবলম্বন করিয়া আরও একটু আলোচনা করিতেছি। 'বেদ-বাদরতাঃ' শব্দটি এই স্থানে বিশেষভাবে বুঝিবার। শ্রীধরের ব্যাখ্যার ভাষায় "বেদে যে বাদাঃ অর্থবাদাঃ 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি', তথা 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' ইত্যাদ্যাঃ, তেষু এব রতাঃ প্রীতা অতএব অতঃ পরমমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ।"

'গীতার্থ-সন্দীপনী' ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দজী বলেন, যাহারা সদসদ্ বিচার জ্ঞানশূন্য, তাহারাই কর্মকাণ্ডীয় বৈদিক বাণীকে স্বর্গাদি ফল-পরতা-যুক্ত বলিয়া স্বীকার করে তাহারাই—'চাতুর্মাস্য যজ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়' এই অর্থবাদপূর্ণ বাক্যের নিশ্চয়তা বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফল কামনা বর্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পন্ন করিলেই আত্মজ্ঞানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কর্মাঙ্গানুষ্ঠানে বিষয়বৈলক্ষণ্য আছে।''

অর্থবাদ শব্দটি বৈদিক পরিভাষা। অর্থবাদ অর্থ, যাহা যথার্থ নহে, তথাপি অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলা। যেমন 'চাঁদ ধরিয়া দিব'—এই লোভ দেখাইয়া শিশুকে ঔষধ খাওয়ানো। অর্থবাদ বাক্যকে যাহারা নিশ্চিত সত্য মনে করে তাহাদের চিত্ত কিছুতেই শান্ত হয় না।

পরবর্তী মন্ত্রে যেখানে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ' বলা হইয়াছে সেখানেও 'বেদাঃ' অর্থ বেদের অর্থবাদ বাক্য সকল। ঐ সকল বলা হয় শিষ্যের চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে। বেদের যাহা প্রকৃতবাণী তাহাই সত্য বেদবাণী—অর্থবাদ নহে। খাঁটি যাহা বেদবাক্য যাহা প্রকৃত আচার্যের নিকট জানিয়া পালন করা কর্তব্য। অর্থবাদবাক্যে ভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বলা মাত্র। সেই বাক্যগুলিকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ' বলা হইয়াছে। 'বেদাঃ' অর্থ বৈদিক অর্থবাদবাক্যসকল।

বেদবিরোধী ব্রাত্যদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বেদ সেইসব জ্ঞানীদের উপযুক্ত সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেমন, বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুরা, জৈন ধর্মের তীর্থংকরগণ এক একজন মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁহারা বেদ মানিতেন না। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান করিতেন।

অথর্ববেদ তাঁহাদের মত না মানিলেও ব্যক্তি হিসাবে তাঁহাদের বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব, তীর্থঙ্কর মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক এবং ইঁহাদের আবির্ভব হইয়াছিল ৬০০—৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ইঁহাদের বহু পরে (প্রায় ২০০০ বৎসর পরে তথাকথিত মধ্যযুগে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কতিপয় মহাপুরুষের। মনে হয়, ইঁহারাও ব্রাত্য, অবৈদিকধারার লোক। ধারা অর্থ ভাবধারা, যে ভাবের ভাবুক ছিলেন তাহার ধারা। ইঁহারা বেদকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু অপৌরুষেয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তবে ঋষিদের যে ব্রহ্মচর্য তাহা যথাযথ পালন করিতেন। ইঁহারা সংসার-ত্যাগী ছিলেন না, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালন করিতেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে

জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, জীবের কল্যাণ-সাধন ব্রত, ঈশ্বরে গাঢ় প্রেমানুরাগ, সকল মানবের শ্রদ্ধার বস্তু ও অনুকরণ যোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কবীর, নানক, রুইদাস (রবিদাস), দাদূ, রজ্জব, তুকারাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল মহাপুরুষ অনুভব করিয়াছেন শ্রীভগবানের সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সাধন-ভজনবলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয় বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ, আপ্ত ও গুরুপদবাচ্য। এই আপ্তরাই ধর্মজীবনের একমাত্র অবলম্বন— ইহাই তাঁহাদের অনুভব।

মাটির মধ্যে সকল রসের সমাবেশ। বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছগুলি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে মাটি হইতে রস টানিয়া লয় এবং উহাদের উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলে। একই মাটি হইতে রস লইতেছে অথচ কোনটির ফল সুমিষ্ট , কোনটি টক। বিভিন্ন ফুলের গন্ধ বিভিন্ন প্রকার। আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আপেল, আঙ্গুর— কোনটির স্বাদের সঙ্গে কোনটির মিল নাই। গোলাপ, বেল, বকুল, যূঁই, একটির গন্ধের সঙ্গে অপরটির মিল নাই। এদের কাহারও মধুর স্বাদ ও সুগন্ধ মাটিতে পাওয়া যায় না; সেইরূপ বেদশাস্ত্র অনুসারী নহে অথচ এই আপ্তগণ আপনার সাধন ও ঈশ্বরের কৃপাবলে বেদের সত্য নিজ জীবনে সফল করিয়াছেন। বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন 'যজ্ঞ কর্ম' ইঁহারা গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদের অনুভূতি—যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বাহিরের কর্ম; অন্তরে পরমপুরুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই প্রকৃত যোগ। ইঁহাদের জীবন ও বাণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবে অকৃত্রিম প্রীতি , শ্রীগুরুদেবে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে গাঢ় প্রেমানুরাগ ইঁহাদের মূল লক্ষ্য ও সাধনার ফসল। নিজ ভাষায় ছন্দে দোঁহায় গানে তাহার জীবন্ত প্রকাশ।

মরমিয়া এই সাধকগণের সাধনা ও অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"মানুষের অন্তর্বর্তী সেই সৃষ্টিকর্তা মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে যে-ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দ রূপ। .... বাইরে পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। .... এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্তি নয়, তার মর্মের স্বরূপ, ... গাছের পাতায় সূর্যের আলোর ছোঁওয়া লাগে, অমনিই এক জাগ্রত শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্বন ছেঁকে নেয়, তেমনি মানবসমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাদের মনে আলো

পড়ে আর তারা চারদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধরে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্র বচনের সনাতন সঞ্চয় থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাদের সংগ্রহ নয়। এইজন্যে এঁদের বাণী এমন নবীন, তার রস কখনো শুকায় না।'' (ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা)।

সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের উর্ধ্বে উঠিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে পরমেশ্বরে ইঁহাদের গাঢ় প্রেমানুরাগ কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, ভাবিতে বিস্ময় লাগে। ইঁহাদের দোঁহা ভজনগীতি হইতে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কবীর-এর(১৩৮০-১৪২০ খৃষ্টাব্দ) দোঁহা —

''সখিয়ো, হমহুঁ ভঈ বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো অব মৈঁ জ্ঞানগলি অঠিলাতী।''

''ওগো সখিরা, আমার প্রিয়কে পাবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়েছে। যৌবন এসেছে , বিরহ দিচ্ছে সন্তাপ, এখন জ্ঞান গলি দিয়ে সগর্বে চলছি।''

''সাঈ বিন দরদ করেজে হোয়।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিঁদিয়া, কাসে কহূঁ দুখ হোয়।
আধী বতিয়াঁ পিছলে পহরবা, সাঈ বিনা তরস তরস রহী সোয়।
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে, সাঈ মিলে সুখ হোয়।''

''স্বামীর বিরহে হৃদয় ব্যথাতুর, দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও ঘুম নেই। দুঃখ কাকে বলব, অর্ধেক রাত গেল, রাতের শেষ প্রহরও গেল কেটে, কিন্তু স্বামী এলেন না। আসছেন, এই আসছেন বলে প্রতীক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। কবীর বলছে, আদরের ভাইটি আমার শোনো, স্বামীকে পেলেই তবে সুখ হয়।''

''এক নিরঞ্জন অলহ মেরা, হিন্দু তুরুক দহূঁ নহী মেরা।
রাখূঁ ব্রত ন মহরম জানা, তিস হী সুমিরূঁ জো রহে নিদানা।
পূজা করূঁ ন নমাজ গুজারূঁ, এক নিরকার হিরদৈ নমস্কারূঁ।
না হজ জাঁউ ন তীরথ-পূজা, এক পিছান্যা তৌ ক্যা দূজা।
কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন সূ মন লাগা।।''

''আমার নিরঞ্জন ও আল্লা এক, আমার কাছে হিন্দু তুরুক দুই নয়। আমি ব্রত রাখি না, মহরম কি জানি না, নিদানকালে যে থাকে তাকে স্মরণ করি। পূজা করি না, নামাজ পড়ি না। হৃদয়ে এক নিরাকাবকে নমস্কার করি। হজেও যাই না, তীর্থব্রতও করি না। এক-কে চিনলে আর দুই কিসের? কবীর বলছে, সব ভ্রম দূর হয়েছে। এক নিরঞ্জনে সব মন নিবিষ্ট হয়েছে।''

নানকের (১৪৬০-১৫৩৯ খৃঃ) রচিত গীত —

"নানক গাবী ঐ গুণী নিধানু
গাবী ঐ সুনী ঐ মনি রখী ঐ ভাউ।
দুখু পরিহরি সুখু ঘরি লৈ জাই।
গুরমুখি নাদং গুরুমুখি বেদং গুরুমুখি রহি আ সমাঈ।"

"নানক কহে, সেই গুণ-নিধান পরমপ্রভুর স্তুতি গান কর। তাঁর গুণ কর গান, তাঁর গুণ কর শ্রবণ, হৃদয়ে সঞ্চিত রাখ তাঁর প্রেম, তবেই সর্ব দুঃখ করতে পারবে পরিহার, সুখ নিয়ে যেতে পারবে ঘরে,গুরুমুখেই শ্রবণ করা যায় নাদ বা ওঙ্কার, গুরু মুখেই বেদের তত্ত্ব যায় জানা।"

কবীর (রামানন্দের শিষ্য)-এর শিষ্য কামাল, কামালের শিষ্য জমাল, জমালের শিষ্য বিমল, বিমলের শিষ্য বুঢ়ঢন, বুঢ়ঢনের শিষ্য দাদূ, দাদূর শিষ্য রজ্জব। দাদূর (জন্ম ১৬০০ খৃঃ) বাণী —

"পূরণ বহ্ম সত্য করি জানী।
দেবী দেব ন পূজা পাতী।
তীরথ বরত ন সেরা জাতী।
হিন্দু তুরক ন ঝগড়া কীন্হো।"

"তিনি (দাদূ) ব্রহ্মের সমাধির পথে চলিলেন, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে সত্য করিয়া জানিলেন। দেব, দেবী, পূজাপাঁতি, তীর্থ ব্রতাদির সেবা ও জাতি প্রভৃতির বিচার মানিলেন না। হিন্দু-মুসলমান মত লইয়াও বিরোধ করিলেন না।"

"আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তেজৈ বিকার।
নির্বৈরী সব জীবসৌ দাদু যত মত সার।।"

"অহমিকা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা ও তনু মনের বিকার ত্যাগ, সকল জীবের সঙ্গে মৈত্রী (নির্বৈর), এই হইল সার মত।"

"অলখ ইলাহী জগতগুরু দূজা কোঈ নাঁহি।"

"সেই অলখ ঈশ্বরই জগদ্‌গুরু, তিনি ছাড়া আর কেহ নাই জগতে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে।"

"ঘট ঘট রাম রতন হৈ দাদূ লখৈ ন কোই।
জবহী কর দীপক দিয়া তবহী সূঝন হোই।।"

"হে দাদূ, প্রতি ঘটেই (জীবে) রামরতন বিরাজমান, অথচ কেহই দেখিতে পায় না; যখন গুরু হাতে সাধনার প্রদীপ দেন তখনই দর্শন মেলে।"

" মন মালা তহঁ ফেরিয়ে প্রতীম বৈঠে পাস।
অগম গুরুতৈঁ গম ভয়া পায়া নূর নিরাস।।"

"মন-মালা সেখানে ফেরাও যেখানে প্রিয়তম বসেন পাশে। গুরুর প্রসাদে অগম্যও হইয়াছে গম্য, জ্যোতির্ময় ধাম গিয়াছে পাওয়া।"

রজ্জবজীর বাণী —

"আয়ে মেরে পারব্রহ্ম কী প্যারে।
ত্রিগুণ রহিত নির্বন্ধ ব্রহ্ম রসরত সকল স্বাংগ গহি ডারে।
মালা তিলক করে নহীঁ কবহূঁ সব পাখংড পচি হারে।।"

"আসিলেন আমার গুরু পরব্রহ্মের প্রিয়, ত্রিগুণ রহিত, বন্ধনাতীত, ব্রহ্মরসরত, সাম্প্রদায়িক সকল ভেদচিহ্নাদি যিনি দিলেন ফেলিয়া, কণ্ঠীও তিনি ধরেন না, তিলকও তিনি ধরেন না, সকল ভণ্ডামি তাঁর কাছে হার মানিল।"

গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি, পরমেশ্বরে অনুরাগময় প্রীতি, সকল মরমিয়া সাধকগণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈদিকধারার বাহিরেও যে ঈশ্বরে গভীর প্রেম সম্ভব, ঐ সকল সাধকগণের জীবন ও সাধনা তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বেদগ্রন্থ বা বেদের মন্ত্র হইতে উহার মর্মার্থ বা বেদে বর্ণিত সত্যের মূল্য যে অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ কি! উপরে আলোচিত বিষয় যদি কেহ অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বলিয়া মনে করেন, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মরমিয়া সাধকগণ আক্ষরিক অর্থে বেদ না মানিলেও বেদের সত্য ইঁহাদের জীবনে মূর্ত, এই কারণে অবান্তর নহে।

বেদ-সংহিতা ও বাউল

এই গ্রন্থ মূলতঃ বেদকে কেন্দ্র করিয়া। এখন প্রশ্ন হইতে পারে ইহাতে আবার বাউলের প্রসঙ্গ আনা কেন? তাহার উত্তরে বলি, বাউলদের কেহ কেহ যত ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন তাঁহাদের সাধনের ধারায় ও রচনার মধ্যে যে অনেক বেদ-প্রতিপাদ্য চিরায়ত সত্যের আভাস মিলে, তাহা মনস্বীদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কবিগুরু ভারতীয় দর্শন মহাসভার মহা অধিবেশনকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মন্দিরে ১৯২৫ সালের "Philosophy of Our People" নামে যে অভিভাষণটি পড়িয়াছেন, তাহা বাংলাদেশের এই নিরক্ষর বাউলদেরই কথা। তাঁহাদেরই রচনা হইতে সংকলিত তত্ত্বসমৃদ্ধ ছিল তাঁহার মূল্যবান্ অভিভাষণটি। আবার ১৯৩০ সালে বিশ্ববিদ্যার প্রধান পাশ্চাত্ত্য কৌলীন্যপীঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাও কোন শাস্ত্রসম্মত অভিজাত গুরুগম্ভীর দর্শন বা বিদ্বান্‌দিগের ধর্মতত্ত্ব নহে। সেখানেও তাহা ছিল সন্ত-বাউলদের মানবধর্ম বা "Religion of Man"।

বাউলদের প্রধান সাধনাই হইল অধ্যাত্মরসের। নীলের পূজায়, পূর্ববঙ্গে চড়ক পূজায় ও কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলায়ও বাউলদের উৎসব পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের নীলের পূজায় গান আছে, মেনকা গৌরীকে প্রশ্ন করিয়াছেন —

"রূপে গুণে ধন্যা রে রাজার ঝিয়ারী।
কোন্ বা মন্ত্রে ভোলা তোরে কর'ল ভিখারী।।"

গৌরী গাইলেন —

"সকল দিয়া কাঙাল সাজে
সেই সে মহেশ্বর।
তার ভালেই মুই কাঙ্গালিনী
ঘুচ'ল আমার ঘর।।"

উত্তরপ্রদেশে ও পশ্চিমের সর্বত্র হোলি বা বসন্তোৎসবের বিশেষ সমারোহ হয়। বাউল সাধকেরা হোলিকে বিশ্বলীলার মধ্যে ও আত্মার অন্তরলীলার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য কবীর, কমাল, দাদূজী। বাউলেরা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক দোললীলা ও বসন্তোৎসবের আনন্দে মাতিয়া থাকিতেন।

বাউল সাধক শিরোমণি মনসুর বলেন —

"অগর হৈ শৌক মিলনেকা
তো হরদম লৌ লাগতা জা
জলায়াব খুদনুমঙ্গিকো
ভস্ম তনপর লাগতা জা।"

"যদি তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার মহদাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে নিরন্তর চল প্রেমের ব্যাকুলতায় জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া। অহঙ্কারকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের বিভূতি মাখিয়া নে সর্ব অঙ্গে।"

"না মর ভূয়ো না কর রোজা
ন জা মসজিদ ন সব সিজদা।
বচাসা তোড় দে কুজা
শরাবে সৌক পাতা জা।।"

অর্থাৎ, "না মরিস্ ক্ষুধায় বুভুক্ষিত, না করিস্ রোজা,
না যাস্ মসজিদে, না করিস্ মাথা প্রণত।
শুধু জলপাত্রটা ফেল ভাঙ্গিয়া,
পান কর প্রেমের সুধা।।"

সাধিকা বাবরি সাহেবার শিষ্য আরি সাহেব গাহিলেন—

"হম তো এক হু বার হৈ রে
সকিন বহর কে বীচ সদা।
দাবাযাকে বীজ দাবায়াপি মৌজ হৈ
বাহব নহী গৈর দুদা।।"

"আমি তো এক বুদ্‌বুদ মাত্র। সাগরের মধ্যেই আমার নিবাস। তরঙ্গের লীলা সব সাগরেরই মধ্যে। খোদার বাহিরে বা খোদা ছাড়া কিছুই যে নাই।"

মাড়বারের মুসলমান সাধক দরিয়া সাহেব বলেন —

"আদি অন্ত মেরা হৈ রাম।
উন বিনা ওরি সকল বেকাম।।
কাহা করু যে মান বড়াই
রাম বিনা সব হী দুঃখদায়ী।।"

"আদি অন্ত সবই আমার রাম। রাম বিনা সবই বিফল। মান বড়াই লইয়া কি করিব? রাম বিনা সুখ নাই। রাম বিনা সব দুঃখময়।"

সাধক দীন দরবেশ বলেন —

"হিন্দু কহেঁ গো হাম বড়,
মুসলমান কহে হম্।
এক যুগ দো ফাড় হইঁ,
কুন জাদা কুন কম।।"

"হিন্দু কহে আমি বড়, মুসলমান কহে আমি শ্রেষ্ঠ। ওরে মূর্খ, সেই একই, একই দ্বিদল (ডাল)-এর তোরা বিদীর্ণ দুই দল। তবে কে বড় কে ছোট কেন?"

মুসলমান কবিদের হোলির গান শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ধর্মের প্রভেদ সত্ত্বেও সেই সব ভাব রসিকেরা শুধু বাহ্যিক লীলারূপে দেখেন নাই, ইহার অন্তরে যে গভীর অধ্যাত্মরস আছে হৃদয় মন প্রাণে তাঁহারা তাহার সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন সাধনার দৃষ্টি ছাড়া সেই যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন।

বেদ-সংহিতার অনেক মন্ত্র গভীর অর্থদ্যোতক। সাধারণ মানুষ উহার অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হেঁয়ালি বলিয়া মনে করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটি উল্লেখ করা যাইতেছে —

"আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্।।"

অনুবাদ — "যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করেছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করেছিলাম।" (রমেশচন্দ্র)

পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন — "হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল, এখন কোথায় গেল?" মন্ত্রগুলির তাৎপর্য আপাতদৃষ্টিতে কিছুই বুঝি না। শুধু হেঁয়ালি মনে হয়। বেদের মধ্যে এইরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ মন্ত্রের অভাব নাই।

বেদ বহু প্রাচীন। পরবর্তী ও অধুনা কালে হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্যের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সাধকগণ হেঁয়ালিপূর্ণ কথ্য পালি ভাষায় তাঁহাদের সাধনার গূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ী যোগিগণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে উহার মর্মার্থ উপলব্ধি করা কোনপ্রকারে সম্ভব নহে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে হেঁয়ালিপূর্ণ চার পংক্তির কবিতায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এক বার্তা প্রেরণ করেন যথা,

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।"

এই হেঁয়ালি ভাষাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নাম দিয়াছেন 'তরজা'। পুরীধামে যত ভক্ত ছিলেন কেহই উহার অর্থ বুঝিলেন না। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের ভাবান্তর দর্শনে মনে হইল তিনি উহার অর্থ বুঝিয়াছেন। ভক্তেরা উহার কি তাৎপর্য, প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু উত্তরটি এড়াইয়া গেলেন।

এই জাতীয় বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে আচার্যগণ বলেন, সতী নারী যেমন নিজ দেহ সর্বতোভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন এবং কেবলমাত্র প্রাণপ্রিয়ের নিকট ব্যক্ত করেন, বেদশাস্ত্র সেইরূপ মন্ত্রের অর্থ সকলের নিকট প্রকাশ করেন না, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের নিকট কেবল প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরের ঋ. ৭/৮৮/৩ মন্ত্রটির অর্থ মনে হয় কিছুটা এইরূপ — বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন এক মহাসাগর। এখানে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা ভাসিতেছিল বরুণের নৌকায়। বরুণ অর্থ— যিনি বিশ্বকে আবরণ করিয়া আছেন। যতদূর আমাদের দৃষ্টি যায় আকাশে, আকাশ-গঙ্গা পর্যন্ত। আকাশ তাহার ঊর্ধ্বে মহাকাশ; মহাকাশে থাকিয়াই বরুণ আমাদের সকলকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই বরুণদেবের নৌকা। সাধক যিনি, তিনি ছিলেন বরুণের নৌকায়। বরুণ এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। দেশ-কাল, সমাজ,পরিবারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার সত্তা। এই বিচ্ছেদ বেদনা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অন্তর নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া চলিতেছে। ঋগ্বেদ ৭/৮৬/৪ মন্ত্রে —

"কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎ স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্।"

কি এমন অপরাধ আমি করিয়াছি, যে জন্য তুমি আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তোমার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক।

জীবনে দুঃখ আছে, সকল মানবজীবনেই আছে। দুঃখের অভিঘাতে জর্জরিত জীবনিবহ। দুঃখ আছেই, কিন্তু দুঃখকে বিন্দুমাত্র কামনা করে না কেহই। মানবজীবনের একান্ত ইচ্ছা ও একমাত্র প্রয়াস যাহাতে জীবনে দুঃখ না হয় এবং তদ্বিপরীত সুখ লাভ হয়। "দুঃখং মে মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ।" (শ্রুতি) কিন্তু দেখা যায়, জগতের কোন সম্পদ্ মানুষের দুঃখ চিরতরে দূর করিতে পারে না। যেজন্য জীবন দুঃখময়, যাহা পাইলে মনে হয় দুঃখ আর থাকিবে না, সুখময় হইবে জীবন, সেই বস্তু পাইবার পর দেখা যায় দুঃখ তো গেল না। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাগতিক কোন কিছুই আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। ইহার

কারণ কি হইতে পারে? মনে হয়, পরম সুখময়, পরমানন্দময় একটি অনুভূতি আমাদের ছিল এবং তাহা জাগতিক নহে, তাহা আমরা হারাইয়াছি। জাগতিক যদি হইত তবে সেই জাগতিক সম্পদ্‌লাভে দুঃখ চলিয়া যাইত। জগদতীত একটি সত্তার সঙ্গে, আনন্দ-স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত ছিল মানব। সেই সত্তাকে না পাইয়া জীবন দুঃখ-ভারাক্রান্ত বেদনাময়। সেই সত্তাকে পুনরায় না পাওয়া পর্যন্ত, তাঁহার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং উহা পুনরায় লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই দুঃখ যাইবার নহে।

ঐ জগদতীত সত্তা মানবদেহ ধারণ পূর্বক জগতে আসেন। তাঁহার অপার করুণাশক্তিই তাঁহাকে গোলোক হইতে ভূলোকে নামাইয়া আনে এবং তাহার ফলেই মানবের সঙ্গে সখ্য সম্ভব হয়।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।" (ভাগবত, ১০/৩৩/৩৭)

যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া আসেন তখন সাধারণ মানুষ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া অবজ্ঞা করে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" (গীতা, ৯/১১)

তিনি সর্বভূতের সুহৃদ্ (বন্ধু)-ইহা যে জানে সে-ই শান্তিলাভ করে।

"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।" (গীতা, ৫/২৯)

একটি বৃক্ষে দুইটি পাখী, একজন বদ্ধ ও অন্যজন মুক্ত। একজন ফল খায়, অন্যজন দেখে। এই দুই পাখী পরস্পর প্রেমে বাঁধা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের প্রেমে সখা।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি যস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি।।"

(ঋ. ১/১৬৪/২০)

বেদের পরমপুরুষই পুরুষ। এই বিশ্বে যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ সবই হইলেন পুরুষ।

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" (ঋ. ১০/৯০/২)

উপনিষদ্ বলেন — "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"।(কঠ, ১/৩/১১)

পুরুষের উপরে কিছু নাই। তিনি মানবীয় সত্য, তত্ত্বমাত্র নহেন। দেবতাগণের উপরে পুরুষের মহিমা। চণ্ডীদাস এই কথাই বলিয়াছেন —

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

এই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে মহাভারতে ভীষ্মের উক্তিতে —

"ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।" (শান্তিপর্ব)

এই পুরুষের মহিমা, মানবরূপে। তাঁহার প্রকাশ বহুভাবে বিভিন্ন বেদ-সংহিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই মহিমা, কিন্তু তিনি তাহা হইতেও বড়।

"এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াঁংশ্চ পূরুষঃ।" (ঋ. ১০/৯০/৩)

বেদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রবেশ না করিয়াও বেদের সত্য ও তত্ত্বের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় মরমীয়া বাউল সাধকগণের মধ্যে। তাঁহাদের মানবপ্রেম, মানবমহিমা এই পার্থিব ভূমির উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রধাবিত। ইহাতে মনে হয়, সকল মানবের অন্তরের অন্তস্তলে পরমপুরুষের অনুভূতিময় একটি সত্তা বিদ্যমান আছে। শাস্ত্রের কোন জ্ঞান না থাকিলেও শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বের অনুভবে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। ইদানীংকালে দেখা গিয়াছে শাস্ত্রের কোন জ্ঞান ছাড়াই শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব, সত্য ও উপলব্ধিগুলি ব্যক্ত হইয়াছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মহর্ষি রমণের বাণীগুলিতে। মানবমনের মধ্যে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহার স্বীকৃতি বেদেও পরিলক্ষিত হয়; যথা—

"যস্মিনৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্" (বাজসনেয়, ৩৪/৫) — আমার সেই মনের মধ্যেই ঋক্-সাম-যজুঃ প্রতিষ্ঠিত।

"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদ্ সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।"
(বাজসনেয়, ৩৪/১)

মানব-অন্তরে একটি দিব্য চেতনাময় অধিমানস সত্য আছে। কিবা জাগিয়া থাকিলে, কিবা ঘুমাইলে, কোথায় যেন তাহা দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার সেই সুদূরচারী অধিমানস, সর্ব জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই আমার মন কল্যাণসঙ্কল্প হউক।

অথর্ববেদে বাউলিয়া মতের অনুরূপ বহু মন্ত্র পাওয়া যায়। বিশ্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের যোগ, ধ্যানে। ইহাই গায়ত্রীর মন্ত্র। তাঁহার ধ্যানেই বিশ্বজগতের নানা বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টি। বিশ্বের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমারও যোগ ধ্যানে।

"বিশ্বপেশসং ধিয়ং"। (অথর্ব, ২০/৩৫/১৬)

ইহার অনুরণন বাউল হাসান রজার গানে —

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমীন।
কর্ণ হৈতে পৈদা হৈছে মুসলমানী দিন।।
নাকে করিয়াছে ..... খুসবয় আর ...... বদবয়।
আমি হৈতে সব উৎপত্তি হাছন রজা কয়।।"

অথর্ববেদ বাউলদের মতের অনুরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এই মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মকে যে দেখিল, সে-ই তাঁহাকে পরমস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিল —

"যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।" (অথর্ব, ১০/৭/১৭)

মানুষ হইতেই ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব এই চারি বেদ প্রকাশিত —

"যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।

সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখম্....''।। (অথর্ব, ১০/৭/২০)

অমৃত ও মৃত্যু এই মানুষেরই মধ্যে সমাহিত —

''যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেঽধি সমাহিতে।'' (অ. ১০/৭/১৫)

কর্মকাণ্ডহীন যজ্ঞকর্মবিহীন সাধারণ মানুষই ব্রাত্য। অথর্ববেদ পঞ্চদশ কাণ্ডে এই ব্রাত্যদের মহিমাই কীর্তন করিয়াছেন। এই মানবদেহ ভুবনের মধ্যেই মহান্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত —

''মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে''। (অ. ১০/৭/৩৮)

মানবমন সারা পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তাই বায়ুর মতই সদাই চঞ্চল আমাদের মন। কোথায় যে তাহার শান্তি বা স্বস্তি তা কে জানে।

''কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ।'' (অ. ১০/৭/৩৭)

ঈশ্বর আমাদের নিত্য প্রয়োজনের মধ্যে পড়েন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা তাহাই উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্ট হইতেই মানুষের সকল চিন্ময় সম্পদ্ উদ্ভূত। ঋত, সত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম ও কর্ম সবই এই উচ্ছিষ্টের প্রসাদে।

''ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।'' (অথর্ব, ১১/৭/১৭)

এই কল্যাণী পরমরমণীয় শোভা অজর অমর। মর্ত্যমন্দিরেই ইহা বিরাজমানা।

''ইয়ং কল্যাণ্যজরা মর্তস্যামৃতা গৃহে।'' (অ. ১০/৮/২৬)

মানুষ হইল ব্রহ্মের পুর অর্থাৎ মন্দির। তাই তাহার নাম পুরুষ।

''পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে।।'' (অ. ১০/২/২৮)

এই সোনার পুরী মানব-মন্দিরেই ব্রহ্ম বাস করেন। এই মন্দির সর্বত্র অপরাজিত।

''পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্।।'' (ঐ, ১০/২/৩৩)

অথর্ববেদের সঙ্গে একই সুরে বাউল সাধক গাহিয়াছেন, এই মানবদেহ দিনে দিনে কমলের মত ফুটিয়া চলিয়াছে —

''হৃদয়কমল চল্ছে গো ফুটে কত যুগ ধরি।''

অথর্ববেদ বলেন — ''অমৃতস্য পুষ্পম্'' (অ. ৬/৯৫/২)।

বাউলেরা বলেন, এই দেহ যেন সোনার নৌকা। তাহার বাঁধনও সোনার। সেখানে অমৃতের পুষ্প — ''সোনার নায়ে সোনার বাঁধন অমৃতের ফুল ফোটে।'' ইহা অথর্বের ৫/৪/৪ মন্ত্রের অনুরূপ।

বাউলমতে দেহেই অবস্থিত সর্ববিশ্ব। বিশ্বনাথই দেহমন্দিরের দেবতা। তাই বলেন, ''যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।'' ইঁহাদের সর্বতীর্থ সর্বসাধনা দেহেই। লোকসমাজে লোকধর্ম মানিলেও অন্তরে মানেন না —

"লোকমধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরুমধ্যে একাচার।।"

ইঁহারা বিগ্রহ মানেন না, কোন ব্রতাদি পালন করেন না। বেদ-স্মৃতি পুরাণাদির কোন ধার ধারেন না। তত্ত্ববস্তুর চরম অনুভব ইঁহাদের দেহতত্ত্বে।

"কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।।"

আবার গাহিয়াছেন —

"সহজ মানুষ আলেকলতা।
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা?
আলেকের প্রেমের কোলে, পেতেছে বাঁকা নলে
ত্রিবেণীর জল উজান চলে, বহিছে সর্বদা।
আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে,
বাউলে তোর লাগলো দিশে, যেতে নারবি সেথা।
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিনবি কেমন করে,
যে দিন ধরাব তোরে
মুগুর দিয়ে ছেঁচবে মাথা।।"

বাউলিয়াদের নিকট প্রাণহীন শাস্ত্র অপেক্ষা মানবীয় প্রেম অনেক বেশী সত্য। তীর্থ-ব্রত, যাগ-যজ্ঞ-উপবাস, বিগ্রহ মন্দির কিছুই কিছু নহে। নর-নারীর বন্ধনের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোন বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে।

কাশীর নিতাই বাউল বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামনার বাধা থাকায় তাঁহাকে তিনি পান নাই। স্ত্রী পরলোক গমনের ১২/১৩ বছর পর ভগবৎ করুণায় তাঁহাকে পান। বাউল গাহিয়াছেন,

"গুরু ব'লে কারে প্রণাম করিব মন?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।।
গুরু যে তোর বরণডালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা, (যে) ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?"

লালন ফকিরের শিষ্য গগনের গান রবীন্দ্রনাথ শুনিয়াছেন শিলাইদহে থাকাকালে। তাঁহার গান রবীন্দ্রনাথ Hibbert বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে।।"

বাউলেরা গুরুকেই মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্যরা শ্রীরাধা-সখী। তাঁহারা মনে করেন, তাঁদের পথ সহজ ও স্বাভাবিক। ঝড় উঠিলে কতক্ষণ তাহা প্রকৃতি সহ্য করিতে পারে? সহজ পথই শান্তির। কাম হইল কৃত্রিম ও তাই ক্ষণিক। সহজ নিষ্কামই শান্ত ও চিরন্তন। ভগবান্ সহজ তাই তাঁহার শব্দ নাই, প্রকাশ নাই। বাউল ঈশান বলেন —

"আমার সাঁই নয় তো ভাঙ্গা চাকা যে বলবে ক্ষণে ক্ষণে"
বল নীরব গুরু সাঁই, কোন্ সাধনে বাহির হলে ব্রহ্ম-কমল পাই
(চলে) চন্দ্র তারা নিত্য ধারা, কোন শব্দ নাই;
চক্রে চক্রে চলছে যে সাধন,
তার নাই কোন রব সদাই নীরব, ভরছে যে রস
(চলছে যে যোগ) — মনে মনে।।"

এই রসের সাধনা, নিত্য ও শাশ্বত জীবনের অমৃতরস বাউল সাধনার ধন। বেদের রস-ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতি তাঁহাদের সাধনার সার কথা। বেদের বা বেদানুসারী শাস্ত্রের সংস্পর্শরহিত হইয়াও তাঁহাদের যে সত্যোপলব্ধি তাহা অবৈদিক নহে, বেদানুগতই।

সিন্ধু নদের তীরে

সিন্ধু নদীর তীরে যে প্রাচীন সভ্যতা, তাহাই মূলতঃ সিন্ধুসভ্যতা। ইহা যে কত প্রাচীন তাহা কথায় কথায় অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। এদেশে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এক সীমান্তে, আর এক সীমান্তে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ও তাঁহাদের ভাবাশ্রিত এ দেশীয় শিষ্যরা। গোঁড়া পণ্ডিতদের মত হইল, বেদের কোন বয়স নাই — বেদ অপৌরুষেয় ও অনাদি। ইহার কোন আরম্ভ নাই। যুগের পর যুগ একইভাবে আছে। ইহার প্রত্যেক অক্ষর নিত্য এবং সত্য।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যদের মত— বেদ খুব বেশী হইলে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। ইহাও তাঁহারা আগে মানিত না। বর্তমানে মহেঞ্জোদারো খনন করিয়া যে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ইহা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বের, তাহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। ইহা হিন্দু-সভ্যতা বা বৈদিক-সভ্যতার শেষাংশ। এ-সময় এ-সংস্কৃতি অবশ্য যে কিরূপ তাহা না বুঝিলে আমরা বৈদিক সভ্যতাকে বুঝিতে পারিব না। কি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বেদান্ত-শাস্ত্র-পঠন ও গবেষণা আলোচনা হইত তাহা না বুঝিলে গ্রন্থের কথা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ঐ সময় সামাজিক অবস্থা বিশেষ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা কিরূপ ছিল উহা বলিব।

বেদের আদ্য অংশের নাম মন্ত্র বা বেদ বা সংহিতা। পরের অংশের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগুলি যে অন্তত চার হাজার বৎসর পূর্বের সেই তথ্য পাওয়া যায়। চার হাজার বৎসর পূর্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বের। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বৈদিক টীকা বা ব্যাখ্যা নহে, বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অবলম্বনে তাৎকালিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যজ্ঞাদি ও সাধারণ লোক-সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-আদি আলোচিত হইয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই ঐ সময়ে অঙ্কশাস্ত্র আলোচনার অত্যন্ত উন্নত অবস্থা। অঙ্কশাস্ত্রের তিন ভাগ (বীজগণিত, পাটিগণিত ও জ্যামিতি), যাহা এখনও আমরা মানিয়া চলিতেছি।

মানুষের মস্তিষ্ক খুব উর্বর না হইলে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা সম্ভব নহে। অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়গুলি অত্যন্ত abstract। বস্তু নিরপেক্ষ কোন বিষয়ই

হাতে তুলিয়া দেখাইবার জিনিস নহে। সবই বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার বস্তু। যেমন algebra, equation, জ্যামিতির theory এবং problem — এই সমস্ত বুদ্ধি দিয়াই বুঝা চলে, মস্তিষ্ক ব্যতীত এই সব তত্ত্ব বুঝিবার নহে। প্রাচীন সভ্যতাও সেইরূপ কতখানি উন্নত তাহা জানিতে বা বুঝিতে হইলে মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়। বুঝিতে হয়, জানিতে হয় — হাতে ধরিয়া দেখিবার বস্তু নহে, চিন্তনীয় বস্তু।

ছাত্রদিগের পড়াশুনা আরম্ভ হইত বারো বৎসর বয়সে। তখন তাহাদের প্রথমে কি কি পাঠ পড়িতে হইত তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম বিষয় ছিল গণিত, মুদ্রা ও ক্ষেত্রগণিত। মুদ্রা হইল finger-এর arithmetic, গণনা হইল mental arithmetic ও ক্ষেত্রগণিত হইল geometry। এইসব পাঠ্য যখন পড়ানো হইত তখন তাহা যে কত উন্নত ছিল ভাবি! অঙ্কশাস্ত্রে নয় (৯) সংখ্যার পরে যে আবার ঘুরিয়া পূর্ব সংখ্যাগুলির সহযোগেই বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশের নিয়ম অর্থাৎ দশমিক প্রণালী তাহা বৈদিক ঋষিদের আবিষ্কার। রোমদেশে যে Roman অক্ষরে অঙ্ক দেখানো হইত তাহাতে অঙ্কশাস্ত্র পরিচ্ছন্ন হইত না। দশমিক ধারাতে যে অঙ্কশাস্ত্র প্রচলিত হইল তাহাও বৈদিকশাস্ত্র প্রণোদিত। যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ এগুলি হিন্দুশাস্ত্র প্রণোদিত। কিন্তু Arabian-রা প্রথম তাহা গ্রহণ করে বলিয়া উহাকে Arabic শাস্ত্রসম্মত বলা হয়। Arabian-দের হইতে ইউরোপীয়ানরা তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু গণিতের এ সমস্ত ধারাই হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ভুত। শূন্য (Zero)-এর আবিষ্কারও হিন্দুদের। এই শূন্য (০) বা Zero (0)-এর আবিষ্কারের ফলে গণিত শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি লাভ হইয়াছে। গণিত শাস্ত্রের শূন্য ও পরবর্তীকালের দার্শনিকদের আকাশতত্ত্ব একই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায় প্রথম-পাদে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে দেখি নারদ মুনি গিয়াছিলেন সনৎকুমারের নিকট শিক্ষার জন্য। নারদ বলিলেন — আমি শিক্ষার্থী। আমাকে শিক্ষা দিন। গুরু বলিলেন— তুমি যাহা জান আমাকে বল। তাহার পর আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। নারদ বলিলেন — "ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোহধ্যেমি।

"হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ জ্ঞাত আছি। হে ভগবন্, আমি যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, পঞ্চম স্থানীয় ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব-উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা-কল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্বশাস্ত্র — এ সমস্তই অবগত।"

আচার্য সনৎকুমার ভাবিতেছেন, এতই যখন জানা আছে তবে আর কি শিখিতে আসা হইয়াছে। নারদ বলিলেন, শাস্ত্র-পুঁথিগুলির অক্ষর জ্ঞান হইয়াছে মাত্র, তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই। আত্মজ্ঞান হয় নাই। আত্মজ্ঞান না হইলে সকল জ্ঞানই আধা জ্ঞান — মিথ্যাজ্ঞানতুল্য। আচার্য্য তখন তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দান করেন।

এই সব কথাবার্তা শুনিলে মনে হয় তাঁহারা কত গভীরভাবে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ও জ্ঞানান্বেষী ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় ঐসময় একটি উচ্চস্তরের সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার এক বিন্দু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু (Pandit Jawaharlal Nehru) তাঁহার সুবিখ্যাত বই *The Discovery of India* তে লিখিয়াছেন (পৃ.58), "The Indus Valley civilization, as we find it, was highly developed and must have taken thousands of years to reach that stage.....

Sir John Marshall the acknowledged authority on the Indus Valley civilization, who was himself responsible for the excavation says, 'One thing that stands out clear and unmistakable both Mahenjo-daro and Harappa is that the Civilization hitherto revealed at these two places is not an incipient civilization, but one already age-old and stereotyped on Indian soil, with many millenniums of human endeavour behind it...... the Panjab and Sind, were enjoying an advanced and singularly uniform Civilization of their own, closely akin and advanced but in some respects even supirior, to that of contemporary Mesopotamia and Egypt."

বৈদিক-সভ্যতা জানিতে বুঝিতে হইলে সিন্ধুসভ্যতার একবিন্দু আমাদের জানা প্রয়োজন। সভ্যতার উচ্চভূমিতে স্থিতি নির্ভর করে তৎকালীন সভ্য জগতে ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বস্তুর ভাবনার উপর। সাধারণত আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ লইয়া ভাবনায় অভ্যস্ত। ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ বস্তুর কথা লইয়া ভাবনা-চিন্তা-গবেষণা ও যুক্তি-পূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে একান্তভাবে প্রয়োজন সুতীক্ষ্ণ উর্বর মস্তিস্ক।

পাটীগণিতের ১,২,৩ অঙ্কগুলি, বীজগণিতের a,b,c x,y,z প্রভৃতি

রাশি এবং জ্যমিতির সম্পাদ্য উপপাদ্যগুলি সকলই বস্তুনিরপেক্ষ। অঙ্ক প্রকাশ করিতে রোমানদের I, II, III, IV, V, VI ইত্যাদি ব্যবহার হইত। উহার সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, পুরণ ও ভাগ প্রায় অসম্ভব হইত। ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯-এর ব্যবহার ও আবিষ্কার হিন্দু ঋষিদের। তাঁহারা একক দশক শতক সহস্র হইতে প্রায় ১৮ অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত গুণিতে পারিতেন। প্রত্যেক বারই দশ-দশ গুণ অঙ্ক অধিক। এগুলি দশমিক (Decimal) আবিষ্কারের ফল। এই আবিষ্কার হিন্দু ঋষিদের। হিন্দুদের এইসব আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী যুগের অঙ্কশাস্ত্রের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। সমগ্র বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই আছে অঙ্কশাস্ত্র।

গণিতে উন্নতির মূলে '0' (Zero)-এর স্থান, দর্শনের বিকাশের মূলে আকাশ-তত্ত্বের দান। সাধারণত আকাশকে শূন্য বলে। আকাশকে আমরা দুইভাবে দেখি। আকাশে এক দেখি অসীম অনন্ত (space), আর তাহার মধ্যে রাজাধিরাজের মত মধ্য-গগনে সুর্য। রাত্রে দেখি কোটী কোটী তারকারাশি। প্রত্যেকটি তারকাকে ঋষিরা দেবতা মনে করিতেন। দেবতার নাম ঋষিদের ভাষায় বিশ্বদেব। বেদের ঋষিরা বলিয়াছেন, দিবসে যিনি সূর্য, রাত্রিকালে তিনিই বরুণ। দিবসে সূর্যের একত্ব, রাত্রিতে বিশ্বদেবগণের বহুত্ব। অন্তরাকাশে একত্ব বহুত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাগ্রত হইয়া উঠিত। তিনি এক, তিনি বহু, যাহা বহু তাহাই এক। ঋষির শাস্ত্রে একত্ব বহুত্বের সমাধান মানব-সভ্যতার এক মহাদান। গ্রীক-দর্শনের সর্বজনমান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্লেটো (Plato) শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম শিক্ষানবীশদের কর্তব্য অঙ্কশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র ও খগোল (আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি বিষয়, Astronomy) - এর পাঠ গ্রহণ করা।

তাঁহার মতে অঙ্কশাস্ত্রের abstract চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞান হইলে ছন্দ বিষয়ে অনুভূতি হয়। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের জ্ঞান হইলে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যে অপূর্ব ছন্দবোধ আছে তাহার জ্ঞান হয়—এই ছন্দ জগতের সর্বত্র আছে। ছন্দের মধ্যে আছে একটি symetry। এই harmony-র মধ্যে জগতে জীবনের সৌন্দর্য নিহিত।

বৈদিক ঋষিদের এইরূপ অনুভব ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। অঙ্কশাস্ত্রের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন সঙ্গীতের কথা বলিতেছি। সাম-সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে সামবেদের মন্ত্রকে গানের আকারে রাখিয়া একই মন্ত্রের বিভিন্ন শব্দকে একাধিকবার প্রয়োগ করিয়া বহু দীর্ঘ করা হয়। ইহাকে সামসংহিতা বলে। সামগানে গানসংহিতারই প্রয়োগ হয়। সামসংহিতা মন্ত্রসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

"সামগানে স্বর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। উর, কণ্ঠ ও শির—এই তিন স্থান হইতে শব্দ উত্থিত হয়। উর স্থানকে প্রাতঃসবন, কণ্ঠস্থানকে মাধ্যন্দিন সবন এবং শিরঃস্থানকে তৃতীয় সবন মনে করিতে হইবে। এই তিন স্থানে সাত সাতটি স্বর বিচরণ করে—আমরা কর্ণ দ্বারা তাহা শ্রবণ করিতে পারি না। ৭ স্বর, ৩ গ্রাম, ২১ মূর্ছনা ও ৪৯ স্বর-কে স্বরমণ্ডল বলে। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই ৭টি স্বর। ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার—এই তিন গ্রাম। ষড়জ গ্রামে তান ১৪টি, মধ্যম গ্রামে ২০টি, এবং গান্ধার গ্রামে তান ১৫টি। মূর্ছনা তিন প্রকারের—ঋষি, পিতৃ ও দেব। নন্দী, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও বলা— এই ৭টি দেব মূর্ছনা আপ্যায়িনী, বিশ্বভৃতা, চন্দা, হেমা, কপর্দিনী, মৈত্রী ও বাহর্তী—এই ৭টি পিতৃমূর্ছনা। উত্তরমন্দ্রা, উদ্‌গাতা, অশ্বক্রান্তা, সৌবীরা, হৃষ্যকা, উত্তরায়তা ও রজনী—এই সাতটি ঋষি মূর্ছনা।" (শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, 'ঋগ্বেদ-সংহিতা,' পৃ. ১৯)।

ঋষিশাস্ত্রে সামসঙ্গীতের এই সব বিশ্লেষণ দেখিয়া আধুনিক সঙ্গীতজ্ঞেরা বিস্ময়ে অবাক্।

এখন জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব। ঋগ্বেদের সময়ে দেখা যায় ঋষিগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অথর্ববেদের ১৯শ কাণ্ডে সপ্তম সূক্তে আমরা পাই ২৭টি নক্ষত্রের নাম, সুন্দরভাবে বর্ণিত—

"সুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে।।২
পুণ্যং পূর্বা ফাল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্।।
অন্নং পূর্বা রাসতাং মে অষাঢ়া ঊর্জং দেব্যুত্তরা আ বহন্তু।
অভিজিন্মে রাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্।।৪
আ মে মহচ্ছতভিষগ্ বরীয় আমে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগং ম আ মে রয়িং ভরণ্য আ বহন্তু।।"৫

কৌতুহলীপাঠক মূলগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। কয়েকটি নক্ষত্রের প্রচলিত আধুনিক নামের উল্লেখ করিতেছি : (১) কৃত্তিকা (Pleiades), (২) রোহিণী (Hyades), (৩) মৃগশিরা (কালপুরুষ বা Orion-এর কটিবন্ধ বা belt এবং দুইপদ)। মহাত্মা তিলক বলেন যে, এই কালপুরুষেরই ঋগ্বেদীয় নাম "যজ্ঞ" বা প্রজাপতি। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" (ঋ. ১০/৯০/১৬)। "অঘাসু হন্যতে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে" (ঋ.১০/৮৫/১৩), ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই 'অঘা' বা 'মঘা এবং 'অর্জুনী' বা 'ফাল্গুনী' নক্ষত্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। আবার, "যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।

বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্‌ম শরদ্ধবিঃ।। (ঋ. ১০/৯০/৬)

তাহারা পুরুষ বা কালপুরুষ বা প্রজাপতি (Orion) নক্ষত্রের স্থানও অবগত ছিলেন।

"সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতিদ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করলে তাহা অপেক্ষা অনেকদিন কম হইয়া পড়ে; এইজন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধান করিবার জন্য চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিক মাস, (অধিমাস বা মলমাস) ধরিতে হয়। এই ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জানিতেন এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্যবিধান করিতেও জানিতেন।" (শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, 'ঋগ্বেদ-দ্বিতীয় ভাগ')

ঋগ্বেদীয় ঋষি ইহাও জানিতেন যে চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সামসঙ্গীত ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহা বর্ত্তমানে যুগেব শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্-দের অন্যতম আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের দুই শিষ্য দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী ও দ্বিজদাস দত্ত লিখিত দুই গ্রন্থ হইতে অধ্যাহার করিয়া।

বেদ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই বৈদিক যুগে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ছিল। বেদের যুগে নারী প্রয়োজন মত যুদ্ধে সেনাপতির কাজ করিত। যুদ্ধে জয় করিত। যুদ্ধে পা কাটিয়া গেলেও নারী লৌহ-নির্মিত পা লইয়া যুদ্ধে উপস্থিত থাকিত। এই উচ্চতম সভ্যতার যুগে বেদ ছিল জাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও অবলম্বন। বেদ চাষার গান নহে। কতিপয় গভীর অনুভূতি সম্পন্ন আচার্যগণের জীবের পরম কল্যাণকর মর্মবাণী। সাধনালব্ধ নহে। অসীম করুণাপ্রাপ্ত।

পূর্বোক্ত শ্রীদ্বিজদাস দত্তের ভাষায় বলি—

"'অথর্ববেদে সাম্য মন্ত্র

"সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্তে সহ বো যুনজ্‌মি।

সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ।।" (অ.৩/৩০/৬)

অর্থাৎ "এক পান-শালাতে তোমরা পান কর, একত্র সকলে একই অন্ন ভাগ করিয়া খাও, একই স্নেহরজ্জুতে আমি তোমাদের সকলকে একত্রে বন্ধন করিতেছি; একই লক্ষ্যে বদ্ধ হইয়া তোমরা সকলে পরম অগ্নি পরমেশ্বরের সেবা কর, অর বা রথ চক্রের কীলকসকল যেমন তাহার নাভি বা মধ্যছিদ্রকে বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব কার্য সাধন করে, তোমরাও সেইরূপ এক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব স্ব ব্রতের সাধনাদ্বারা অগ্নিদেবের (জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের) সেবা কর—" তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, বেদমাতার আশীর্বাদে এই পতিত হিন্দু জাতি জগতে আবার উচ্চস্থান অধিকার করিবে।''' ('ঋগ্বেদ- দ্বিতীয় ভাগ,' ভূমিকা)।

বৈদিক সমাজ-সভ্যতার রূপরেখা

আমাদের দেশের কতকগুলি লোকের ধারণা আমাদের দেশের যাহা কিছু সবই অযুক্তিকর অসুন্দর, পাশ্চাত্ত্য জাতির নিকট হইতে যাহা আসে তাহাই যথার্থ ও সুন্দর যুক্তিযুক্ত। আমাদের দেশের মূল ধর্মগ্রন্থ পাশ্চাত্ত্য জাতি পড়িয়াছে। ইহা আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না। পাশ্চাত্ত্যে যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা বেদ সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী তাঁহারা বেদের অতি কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের যাঁহারা এ দেশীয় শিষ্য তাঁহারা আরও কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পরম সত্য মনে করিয়া আমরাও সেই দিকে ছুটিতেছি, "বাবু যত বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ।"

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, "Theory of Evolution"। ইহা ডারউইনের আমলে ছিল প্রাণীবিদ্যা। এখন মনে হয় বিজ্ঞানেও প্রয়োগ হয়। অনেক অনেক বিষয়ে উহার প্রয়োগ চালানো হয়। আদিম মানুষ — বর্বর ক্রমে সে সুসভ্য হইয়াছে। বর্বর মানুষের ধর্মও বর্বরোচিত। তাহারা নির্জীব সজীব সকল বস্তুতেই প্রাণ আছে মনে করিত এবং ধর্মের সাধনা ছিল ম্যাজিক বা তুকতাক। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু উজ্জ্বল বা ভয়ঙ্কর তাহাকেই তাহারা দেবতা মনে করিয়া পূজা করিত। তাহারা ক্রোধকে ভয় করিত। তুকতাক করিয়া দেবতাকে ঘুষ দিয়া তাহারা তাহাদের বশ করার চেষ্টা করিত। আদিম মানুষেরা ধর্মবিশ্বাসে বহুদেববাদী ছিল। বেদের ধর্ম ইহাই। এই দেবতাদের আপ্যায়ন করিবার প্রয়াস বেদের সর্বত্রই দেখা যায়।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন, বৈদিক যুগের সমাজটা কেমন ছিল? লোকগুলি জ্ঞানী পণ্ডিত ছিল, নাকি বর্বর ছিল ইহা ভাবিয়া দেখা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ চক্ষুষ্মান্ মানুষের কর্তব্য।

বাসস্থান

বৈদিক যুগের অধিবাসীদের আদি বাসস্থান কোথায়, এই বিষয়ে নানা মত আছে। বেদবিৎ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাঞ্জাবের সুবাস্ত জনপদে আর্যদিগের

আদিনিবাস ছিল। ঐ জনপদ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অনুমান করা যায় যে, আর্যগণ নদীর তীরে বাস করিতেন, পানীয় জল ও শস্যাদির জন্য নদীর তীর একান্ত কাম্য।

ঋক্‌বেদের ১০/৭৫/৫ মন্ত্রে কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায়।

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়াহর্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।।"

"হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে সরস্বতি, শতদ্রু, পরুষ্ণি— আমার এই স্তবগুলি ভাগ করে নাও। হে অসিক্নী সঙ্গত মরুদ্‌বৃধা নদী, হে বিতস্তা ও সুষোমা সঙ্গত অর্জীকীয়া নদী, তোমরা শোনো।"

ইহার পরবর্তী ঋ. ১০/৭৫/৬ মন্ত্রেও কতগুলি নদীর নাম আছে। ৫ম ঋকে সিন্ধুনদীর পূর্বদিকের ও ৬ষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের কাবুল প্রদেশের শাখা গুলির নাম পাওয়া যায়। একটি নদীর নামও ছিল কাবুল।

এই শুতুদ্রি, বিতস্তা, অসিক্নী নদীই বর্তমানে শতদ্রু, বিপাশা ও চেনার নামে পরিচিত। সিন্ধু নদের ও সরস্বতীর নাম পূর্বে বহুবার আছে গঙ্গার নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই। এই প্রথম পাওয়া গেল দশম মণ্ডলে। সরস্বতী নদী এখন রাজস্থানের মরুভূমিতে বিলুপ্ত। এই বেদমন্ত্রটি আলোচনা করিয়া পণ্ডিতদের এই অনুমান যে, আর্যগণ সরস্বতী নদীর তীর হইতে সরিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত আসিয়া ছিলেন।

বেদের অনেক মন্ত্রে গ্রাম ও নগরের কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চুয়াল্লিশ সূক্তে ১০ম মন্ত্রে গ্রামের নাম আছে, "অসি গ্রামেষ্ব-বিতা পুরোহিতোহসি যজ্ঞেসু মানুষঃ।।" অর্থাৎ, মনুষ্য হিতের জন্য গ্রামের রক্ষক ও যজ্ঞের পুরোহিত। ইহা হইতে বুঝা যায় বৈদিক যুগে আর্যগণ গ্রামে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই তিন শ্রেণীর উপনয়ন গ্রহণের অধিকার ছিল। উপনয়ন গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হইত। তাহাদিগকে বলা হইত দ্বিজ। তাহাদের কর্ণে সাবিত্রীমন্ত্র দেওয়া হইত। সাবিত্রীমন্ত্র পাইলেই তাহাদের দ্বিতীয় জন্মলাভ হইত। তাহার অর্থ এই যে, তাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইত। ছাত্রগণকে বলা হইত ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর কাজ ছিল নিত্য যজ্ঞকুণ্ডে কাষ্ঠ দান করা। ব্রহ্মচারীকে আচার্যের আজ্ঞাধীন থাকিতে হইত, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইত। ব্রহ্মচারীদের নিত্যভিক্ষা করিতে হইত। অসংকোচে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। এই ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাহার মনে বিনয়ের উদয় হইত। আচার্যের গৃহস্থলীর তদারক ও গোচরণ ব্রহ্মচারীর ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য ছিল। ছাত্রগণকে নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যচর্চা ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে নিবৃত্ত

থাকিতে হইত। জীবনগঠনের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকের সঙ্গ ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হইত। বৈদিক-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, এই সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার বিধান ছিল। পবিত্র বেদজ্ঞান আচার্য মৌখিক ভাবে দিতেন। বেদ-বেদান্ত ছাড়া অন্য বিষয় মধ্যে ছিল অঙ্ক বা রাশি শাস্ত্র, দৈববিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, (রাজনৈতিক ও শাসন প্রণালী) প্রভৃতি ও ব্যাকরণশাস্ত্র আলোচনা সভায় যোগদান করিতে হইত। শাস্ত্রে তর্কসভার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। রাজর্ষি জনকের যুগে বিতর্ক সভা চরম উন্নতি লাভ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহার বিবরণ প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রমাণ। বিদুষী মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্যারূপে মহিলা দার্শনিক গার্গীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

ছাত্রদের মধ্যে দুইটি বিভাগ ছিল। উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ ছাত্ররা পাঠ সমাপনান্তে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গার্হস্থ জীবন আরম্ভ করিতেন। নৈষ্ঠিক ছাত্রগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিত না। তাহারা কৌমার্যব্রত গ্রহণ করিত। তাহারা পরবর্তীকালে কোনও পণ্ডিত বা ঋষি হইতেন। বিদ্যাদানের জন্য আচার্য কোনও মূল্য গ্রহণ করিতেন না। বিদ্যা-বিক্রয় অপরাধ-মধ্যে গণনা হইত। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য প্রায় দশ হাজার ছাত্রের ভরণ পোষণের ভার লইয়া শিক্ষাদান করিতেন। এইরূপ আচার্যগণকে কুলপতি বলা হইত। আর একশ্রেণীর আচার্য ছিলেন ভ্রাম্যমাণ। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগকে বলা হই চরক। চরক অর্থ ভ্রাম্যমাণ। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় আচার্যদিগের নিকট হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতেন ইহার দৃষ্টান্ত বেদে অনেক পাওয়া যায়। আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। প্রত্যেকদিন আচার্য ও শিষ্য একত্র হইলে বলিতে হইত—

"ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।" (তৈঃ উঃ. ২/১/২)

"ব্রহ্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন, তিনি আমাদের একত্রে বহন করুন। আমরা একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করিতে পারে — অথবা আলোকের ন্যায় সুদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।"

নারীদের ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদে উল্লিখিত আছে

রমনীগণকে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। বিদুষী নারীদের মধ্যে এই দুই ভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মচারিণী। যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী তাঁহারা ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। বৈদিকযুগে নারী ঋষিরা সুপণ্ডিত ছিলেন। সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। চারশত খৃষ্টপূর্বাব্দে মেগাস্থিনিস ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, বহু নারী বিদ্বান্ চিরকুমার পুরুষদের মত কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন। ঋষিদের সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। বৈদিকযুগে রমণীদের নৃত্যবিদ্যা, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত।

কৃষি কার্য ও বয়ন কার্য — দশম মণ্ডলে একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যে-ব্যক্তি উপযুক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে পারে না তাহার কৃষিকার্য ও বয়ানকার্য করা উচিত। মানুষের পানীয় জল-সংরক্ষণের জন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চার উল্লেখ আছে আর পশুদের জল-সংরক্ষণের জন্য ছোট চৌবাচ্চার উল্লেখ আছে। আর নলকূপেরও উল্লেখ আছে। বৈদিকযুগে আর্যগণ উন্নত পোত নির্মাণ করিতেন। সামুদ্রিক যাত্রায় সামুদ্রিক পোতের কথা একাধিক বর্ণনায় পাওয়া যায়— সমুদ্রগামী পোতগুলি অতি দৃঢ়ভাবে নির্মিত হইত যাহাতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের স্পর্শে বা লবণাক্ত জলের স্পর্শে কোনরূপ ক্ষতি না হয়। সামুদ্রিক নৌকাকে সৌরাবতী নৌ বলা হইত। লবণাক্ত সমুদ্রের জল অপেয় বলিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইত। সীবন, বয়ন ও পশমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। সে-যুগে বস্ত্রালঙ্করণ-শিল্প ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। বৈদিক-সাহিত্যে বস্ত্রালঙ্করণ (embroidery)-এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পেশ শব্দটির অর্থ হইল অলঙ্করণ, পেশ শব্দের সমপর্যায় ভুক্ত বেশ শব্দের অর্থ হইল পরিচ্ছদ।

যজুর্বেদে তৎকালীন বৈদিকভারতে সভ্য সুরুচির প্রকাশ ছিল। তন্মধ্যে বস্ত্রধৌতি, সুগন্ধি দ্রব্য নির্মাণ, কাজল প্রস্তুতি, তরবারির কোষ নির্মাণ, পুত্তলী নির্মাণ, বস্ত্রাদি রঙ করা ও অলঙ্কারকরণ বা পেশস্করণ — এইসব বৃত্তি ছিল কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট।

সামরিক শিক্ষাদান নারীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে কয়েকটি মন্ত্র হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রমণীদের বীরত্ব কাহিনী ও যুদ্ধকর্মের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্পলার বীরত্বসূচক কার্যাবলী ঋগ্বেদের অশ্বিন সূক্তে ঋ. ১/১১৬/১৫ মন্ত্রে পাওয়া যায়। ঋক্-সংহিতার ১০/১০২ সূক্তমধ্যে দুর্জয় সাহসী মুদগলানী কর্তৃক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও বীরত্ব সূচক যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইন্দ্রদেবতার সূক্তে (ঋ. ১/৩২) পাওয়া যায় বৃত্রাসুরের মাতা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতার যুগ হইতে নারীশিক্ষার উন্নত-ভূমি জাগিতে আরম্ভ করে।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণের কৃষি ও গোপালন প্রধান জীবিকা ছিল। পাশা খেলা নিন্দনীয় ছিল। ঋষি বলিতেছেন, পাশা খেলিও না—কৃষি কার্য কর।

স্বর্ণশিল্প ঃ অনেক মন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই সময় স্বর্ণের প্রাচুর্য ছিল। যথেষ্ট স্বর্ণের ব্যবহার ছিল। অনেক দেবতার বর্ণনায় স্বর্ণ-নির্মিত রথের কথা আছে।

চর্মশিল্প ঃ কতকগুলি মন্ত্রে চর্ম শিল্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, চর্মনির্মিত বৃহদাকার জলপূর্ণ আধার হইতে রাস্তায় জল দেওয়া হইত। শূকরচর্মের জুতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

লৌহ শিল্প ঃ কতিপয় মন্ত্রে লৌহ শিল্পের কথা আছে। লৌহনির্মিত নগরের বর্ণনা আছে। ঋ ৭/১৫/১৪ মন্ত্রে পাই, 'পূর্ভবা শতভূজিঃ', অর্থাৎ হে দুর্ধর্ষ অগ্নি, তুমি মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত লৌহনগরী নির্মাণ কর।

উন্নত শল্যচিকিৎসা— যুদ্ধে বীর রমণী বিশ্‌পলার জঙ্ঘা ভঙ্গ হয়। সেইস্থানে অস্ত্রোপচার করিয়া লৌহ-নির্মিত জঙঘা লাগানো হয়। ইহাতে রমণীদের বীরত্ব ও শল্য চিকিৎসা দুইয়েরই কথা পাওয়া যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাহারা সূর্য চন্দ্রের পৃথিবী আবর্তনের কথা জানিত, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহাদির আবর্তনের কথা জানিত। পৃথিবীর আবর্তনের কথাও আছে। সূর্য যে চন্দ্রকে দীপ্ত করে তাহার কথাও আছে। দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে ঋষি চন্দ্রের প্রভাবকে সাগর ও নদীর জোয়ার ভাটার কারণ বলিয়াছেন। পঞ্চত্রিংশতম সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রটি অবলম্বন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কয়েকজন জ্যোতির্বিদ গণিতশাস্ত্র নিষ্ণাত পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, তদানীন্তন আর্যদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা অতি উন্নতস্তরের ছিল।

এইসব জানিয়াও কেহ যদি বলে 'বেদ অশিক্ষিত চাষার গান' তবে তাহার উক্তিকে নিতান্ত বালকোচিত বলা ছাড়া আর কি বলা যাইবে?

বর্ণপ্রথা

সংহিতার যুগেও বর্ণপ্রথা ছিল। পরবর্তী যুগে বর্ণপ্রথার তদ্রূপ কোন সুদৃঢ় প্রথা অবশ্য ছিল না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কঠিন সীমারেখা ঋক্-সংহিতার যুগে ছিল না। বৈদিকযুগে গুণের দ্বারা জাতির বিচার হইত, জন্ম বা জাতির দ্বারা গুণের বিচার হইত না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণভেদ দেবতাদের মধ্যেও

আছে। অগ্নি এবং বৃহস্পতি ইঁহারা দুইজন ব্রাহ্মণ। ইন্দ্র, বরুণ, সোম, যম, ইহারা ক্ষত্রিয়। বসু , আদিত্য, বিশ্বদেব, মরুৎ ইঁহারা বৈশ্য। পূষন্ শূদ্র। কেবল দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে নহে, পশুদের মধ্যেও ছাগল ব্রাহ্মণ, অশ্ব ক্ষত্রিয়, গাধা বৈশ্য এবং শূদ্র, সিংহ এবং ব্যাঘ্র পশুদের রাজা। বৃক্ষের মধ্যে পলাশ ব্রাহ্মণ। দূর্বা ক্ষত্রিয়। বৈদিক ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ব্রাহ্মণ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ক্ষত্রিয়। শূদ্র কোন সম্পত্তির অধিকারী হইবে না, তাহাকে ইচ্ছা হইলে কোন সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করা যাইবে।

এই বর্ণবিভাগ ঠিক কোথা হইতে কবে আসিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। পুরুষসূক্তে আছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।"(ঋ. ১০/৯০/১২))

ইহার অর্থ, ব্রহ্মপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি।

ইহা আসলে রূপককথা মাত্র। ইহাতে চারিবর্ণের সমান হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন —

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।" (গীতা, ৪/১৩)

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন — আমি অকর্তা, আমি সৃষ্টি করি নাই। এই গুণকর্মের বিভাগ কে করিল, কবে করিল তাহা বুঝা যায় না। আর অধুনাকাল পর্যন্ত ইহা হিন্দু সমাজ হইতে উঠিয়া যায় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের গৃহে অন্ন গ্রহণ করেন নাই। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে দেখিয়াছি বুনা, ডোম ও শূদ্র-ভক্তের গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে। তিনি লিখিয়াছেন — "নরজাতি দেবত্ব।" প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবত্ব বিরাজমান একইভাবে। তিনি বলিয়াছেন, "আমি দুইটি জাত মানি — মহাজাতি ও অপজাতি। যাঁহাদের ভিতরে হরিভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহারা মহাজাতি। যাহাদের ফুটে নাই তাহারা অপজাতি। মহাজাতিদের কর্ত্তব্য অপজাতিদের সমাজে টানিয়া তোলা, তাহাদের ঘৃণা করা নহে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবও রাসমণি দেবীর হাতে অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

ললিত কলা — সেযুগে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত দুই-ই প্রচলিত ছিল। সোমলতা ছেঁচিয়া যখন রস বাহির করা হইত তখন পুরোহিতেরা গানযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিত। (ঋ. ৭/১০৩/১, ৮, দেবতা—মণ্ডূক)

ঋক্-সংহিতায় বীণা, দুন্দুভি, শততন্ত্রী বা বাণ, বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে বীণা ও বাণ এই দুইটি

তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। বাণ নামক বাদ্যযন্ত্রে একশত তন্ত্রী ছিল। এই যন্ত্রটি যে বাজাইতে পারিত তাহাকে অতিকুশলী বলা হইত। ঋ. ১/৮৫/১০ মন্ত্রে দেবগণ বাণ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছেন এইরূপ কথা পাওয়া যায়। কর্করি নামক বাদ্যযন্ত্রের কথা ঋক্‌সংহিতায় ২/৪৩/৩ মন্ত্রে উল্লেখ আছে।

বাঁশীর কথাও মন্ত্রে আছে। তৎকালে আর্যসমাজে বংশীবাদনের খুব চল ছিল।

বিবাহ — বৈদিকযুগে আর্যগণ বিবাহকে অতি পবিত্র মনে করিতেন। একটি বিবাহমন্ত্রে বর, বধূকে ধ্রুবনক্ষত্র দেখাইয়া বলিতে বলে— "আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই নক্ষত্র ধ্রুব, আমিও পতিকুলে ধ্রুব অর্থাৎ চিরতরে বিরাজ করিব।" আবার বর বধূকে বলিতেছে— "বসিষ্ঠের পাশে যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্র, নারায়ণের পাশে যেমন লক্ষ্মী , অগ্নির যেরূপ স্বাহা, ইন্দ্রের যেরূপ শচী, তদ্রূপ তুমিও আমার হও।" অরুন্ধতী একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ইহা সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মধ্যে ধ্রুবের পাশে সর্বদা বিরাজমান থাকে। ধ্রুব নক্ষত্র না থাকিলে অরুন্ধতীকে কখনও চেনা যায় না। এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয়ের শ্রুতিসম্মত অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত পবিত্র বন্ধন ছিল এই বিবাহকর্ম। সহধর্মিণী শব্দ পত্নীতে সার্থক রূপ পাইয়াছিল।

রাজতন্ত্র — সমাজের মূল কাঠামোটিই ছিল পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া, আবার রাজ্যের ভিত্তি ছিল সমাজ। সেই যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। রাজাই ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার। ঋ. ৭/৩৩/৩, ঋ. ৭/৮৩/৬ প্রভৃতি মন্ত্রে রাজা সুদাসের সঙ্গে দশজন নৃপতির সমবেত ভাবে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে। সৈন্যদলের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী-সৈন্যও থাকিত।

শিক্ষা — বাস্তবে আমরা ছাত্রজীবন ও সাধুজীবনকে এক মনে করি না। বৈদিকযুগে এরূপ ছিল না। ছাত্রদের অধ্যয়ন হইতেছে তপস্যা। গুরুগৃহই ছিল তপোবন বিদ্যালয়। আট-নয় বছরে গুরুগৃহে উপনয়ন হইল তখনই হইল তাহার দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্ম হইল অধ্যাত্ম-জীবনের জন্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর গুরুগৃহে বাস বাধ্যতামূলক ছিল। ছাত্র গুরুগৃহে আসিবার পর তাহাদের কি কর্তব্য শতপথব্রাহ্মণে বিস্তারিত আছে। ছাত্রগণ বিনয়ের সহিত গুরুগৃহে আসিত। ছাত্রের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া গুরু তাহাদের অন্তরে ভগবদ্‌ভাব জাগাইয়া দিতেন। তাহাদের নিত্য বেদপাঠ করিতে হইত। বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ কালে গুরু শিষ্যের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিতেন — "যজ্ঞীয় অগ্নির উজ্জ্বল শিখা

তোমার মনকে উদ্দীপ্ত করুক।'' ছাত্র যে কোন বর্ণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জাতি হউক, ধনী বা দরিদ্রের সন্তান হউক, তাহাকে লজ্জা ও অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া নিত্য ভিক্ষা করিতে হইত। আট-দশ বৎসর পর বিদ্যার্জন সমাপন করিয়া তাহাকে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত। ফিরিয়া আসাকে সমাবর্তন বলা হইত। এই শব্দটি আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদানকালে সমাবর্তন উৎসব নামে প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালে গৃহস্থাশ্রমে কি করিয়া আসিয়া কিভাবে সদ্‌গৃহী হইতে হইবে এই বিষয়ে আচার্য বলিয়া দিতেন। এইগুলির কিয়দংশ পূর্বে স্বাধ্যায়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

ছাত্রদিগকে দিবানিদ্রা, আলস্য, লোভ অহঙ্কার, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রশংসা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে দূরে থাকিতে হইত। যাহা তাহার মানসিক নৈতিক আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা হইতে পারে, তাহা হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইত।

পাঠ্যবিষয় ছিল বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও বেদাঙ্গ। শিক্ষাদান ছিল মৌখিক। শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে মাঝে মাঝে পরিষদ্ হইত। এইসব পরিষদ্‌গুলি বাধ্যতামূলক ছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত বা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানা বিষয় লইয়া আলোচনা হইত। এই সভাকে জ্ঞানীরা বলিতেন ব্রহ্মোদ্য। এই সভায় বাদী প্রতিবাদী থাকিত। যোগ্য বিশারদ থাকিত।

বৈদিকযুগে আচার্য ছিলেন দুই প্রকারের — আবাসিক ও চরক। একশ্রেণীর আচার্য ছিলেন যাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেন। এইরূপ অধ্যাপক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আছে। তাঁহাদের বলা হয় Visiting professors। তাঁহারা তিন মাসের জন্য আসিতেন। তাঁহাদেরই চরক বলা হইত। আবাসিক শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আচার্য দশহাজার ছাত্রের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহাদের কুলপতি বলা হইত। এখন প্রায় সর্বত্র কুলপতি-শব্দস্থলে Chancellor শব্দ প্রয়োগ হয়।

ছাত্রদের প্রথম গুরু পিতামাতা। সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হইত — ''পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব।'' দ্বিতীয় গুরু গায়ত্রী মন্ত্র। তৃতীয় গুরু যেকোন উচ্চশিক্ষায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। বিদেহরাজ জনক একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ আচার্য। অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত উপনিষদে অনেক পাওয়া যায়। আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। শিক্ষার

প্রারম্ভে আচার্যদেব একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন—

"ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।" (তৈঃ উঃ ২/১/২)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন, তিনি আমাদের একত্রে ভোগ করান, আমরা একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করিতে পারে অথবা আলোকের ন্যায় সুদীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।

সামগান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন — ''সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে একথা বলা বাহুল্য। ... প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। ... বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল—'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল —বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়াকর্মে যজ্ঞে তা রস রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে, পরবর্তী কালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে, তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না।''

ঠিক বলিতে না পারিলেও তবু কিছু বলিব। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'রাগ ও রূপ' অবলম্বনে বলিব: বেদমন্ত্রে তিনটি স্বর ব্যবহার হয়—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। পাণিনীয় শিক্ষায় বলা হইয়াছে যে, এই বৈদিক উদাত্তাদি তিন স্বর হইতে পরবর্তীকালে মার্গসঙ্গীত ও লৌকিক সঙ্গীতের সাতটি স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

''উচ্চৌ নিষাদ-গান্ধারৌ নীচাবৃষভ-ধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।।''

অনুদাত্ত হইতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমের সৃষ্টি হইয়াছে। অনুদাত্তের নাম মন্দ্র অর্থাৎ খাদ, উদাত্ত গর্ব বা চড়া, এরই সমতারক্ষক স্বরিত মধ্যস্বর। উরঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে ইহাদের উৎপত্তি স্থান, ''তেষু মন্দ্রমুরসি বর্ততে, উত্তমং শিরসি বর্ততে।''

সামবেদকে বৈদিক সঙ্গীতগ্রন্থ বলা চলে। এই বেদকে পূর্বার্চিক উত্তরার্চিক দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্বার্চিককে আবার 'গ্রামে গেয়' 'অরণ্যে গেয়', এই দুই গানাংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। উত্তরার্চিকের দুইভাগ— ঊহ ও ঊহ্য। ইহা রহস্যগান— এই দুইটি সকলে করিতে পারিত না। একমাত্র উপনিষদের রহস্যবেত্তা সাধকরাই ঐ গানের অধিকারী ছিলেন— গ্রামে গেয় গান গ্রামাঞ্চলে সাধারণের জন্য নির্বাচিত ছিল, সকলেই প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিত। অরণ্যে গেয় গান নিরালায় নিভৃতে মুখ্যত জন-বিহীন অরণ্য প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত।

ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে সুর যোজনা করিয়া সামবেদের সৃষ্টি। ইহাই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল উৎস ভূমি।

ঋক্‌সংহিতার সব মণ্ডল হইতেই সামসংহিতার মন্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ম ও ৯ম মণ্ডলের মন্ত্রই বেশী। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীর প্রয়োগ সব চাইতে বেশী।

বৈদিক যজ্ঞে প্রধানত চারিজন পুরোহিত থাকেন। হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা।

ঋগ্‌বেদের পুরোহিতকে হোতা বলে। তিনি যজ্ঞে ঋক্‌-মন্ত্র উচ্চারণ করেন। যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু। যিনি যজ্ঞের যাবতীয় ক্রিয়া-সাধন করেন তিনি অধ্বর্যু। সামবেদের পুরোহিত উদ্‌গাতা। তিনি সামমন্ত্র গান করিয়া দেবতার স্তব করেন। ব্রহ্মা তিন বেদেই বিশেষ পারঙ্গম। তিনি যজ্ঞের সারথি।

সুতরাং উদগাতৃ পুরোহিতেরাই সামগা বা সামগানকারী। হোতৃ পুরোহিতেরা কেবল মন্ত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, একটি স্বরের সাহায্য নিয়া। কিন্তু উদ্‌গাতারা বিভিন্ন স্বর প্রয়োগ করিয়া ঋঙ্‌মন্ত্র গান করিতেন। এই গানই আসলে সামগান, বৈদিকগান। ইহা আপাতত মার্গ সঙ্গীত হইতে পৃথক্‌।

মার্গ অর্থ মার্গিত অর্থাৎ অন্বেষিত বা দৃষ্ট। ''মার্গিতো অন্বেষিতো দৃষ্টঃ।'' ইহা হইতে বোঝা যায়, প্রাচীন আচার্যগণ বৈদিক গানের উপাদান লইয়াই মার্গগান সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সামগানের সাতটি স্বর ও দেশী মার্গ-সঙ্গীতের সাত স্বর পরস্পর ভিন্ন নহে। দুইটি সঙ্গীতের ধারা সমান্তরাল সরলরেখার মত ছিল। নারদীয় শিক্ষাগ্রন্থে নারদ বেণু ও বীণা, বৈদিক ও লৌকিক, দুইগানের স্বরগুলি পরস্পরের মধ্যে একটি ঐক্যমূলক যোগসূত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষাকার নারদ সর্বপ্রথম এই দুইটি ধারার মধ্যে একটি মিতালী (মাতলী) পাঠাইলেন পরস্পরের মধ্যে একটি সমভাব দেখাইবার জন্য।

''য সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমস্বরঃ। যো দ্বিতীয় স গান্ধারস্তৃতীয় ঋষভঃ স্মৃতঃ। চতুর্থ ষড়জ ইত্যাহ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ, ষষ্ঠো নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ। সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।'' সামগানের যেইটি প্রথম স্বর তাহারকম্পন সংখ্যা ও স্বর স্থানের সঙ্গে লৌকিক গানের মধ্যমের মিল আছে। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, 'মন্দ্র', 'অতিস্বার্য' ও 'ক্রুষ্ট'-র সঙ্গে গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ, ধৈবত, নিষাদ ও পঞ্চমের ঐক্য আছে।

সামসংহিতায় আর্চিক পাঠের সময় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরই লাগানো হয়। কিন্তু গানের সময় লাগে ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়,

তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র এবং অতিস্বার্য এই সাতটি স্বর। পূর্বেই বলিয়াছি শিক্ষাকার নারদের মতে এই স্বরগুলি যথাক্রমে লৌকিক পঞ্চম মধ্যম গান্ধার ঋষভ ষড়জ ধৈবত ও নিষাদ।

ইহা ঋগ্বেদে ভাষ্য উপক্রমণিকায় সায়ণও দেখাইয়াছেন।

নারদ ও সায়ণের মধ্যে পার্থক্য এই—নারদ লৌকিক রীতির অনুসরণে 'আরোহী' ভাবাপন্ন (Upward), সায়ণ বৈদিক রীতির অনুসারে 'অবরোহ' ভাবাপন্ন (Downward) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক স্বরগুলির গতি ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে (Descending)। লৌকিকগতি তদ্বিপরীতে (Ascending)।

বেদচর্চায় বাঙ্গালী মনীষী

বেদশাস্ত্রের আলোচনায় যে সকল বাঙ্গালী মনীষীর অবদান আছে, তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বেদ আলোচনায় আমরা বাঙ্গালীরা চিরকালই পরাঙ্‌মুখ, তথাপি দীর্ঘকালের মধ্যে বিশেষভাবে চারজনের নাম মনে আসে।

(১) সত্যব্রত সামশ্রমী — ইনি ব্রিটিশ সরকারের আমলে পাটনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর সত্যব্রতের পিতা সপরিবারে কাশীবাসী হইলেন। সেই সময় কাশীধামে নন্দরাম ত্রিবেদী নামক সামবেদে অভিজ্ঞ এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকট সত্যব্রত সামশ্রমী বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মেধা ও মনীষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ত্রিবেদীর নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া তিনি কাশীধামে সরস্বতী মঠে গৌরস্বামীর নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বয়সেই তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। বুন্দির মহারাজ এক পণ্ডিতসভা আহ্বান করেন। বহু খ্যাতনামা বিদ্বান্ সেই সভায় সমবেত হন। সেই সভার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে সামশ্রমী উপাধিতে ভূষিত করেন। কাশ্মীরের রাজা রণবীর সিংহ তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের মথুরানাথ পদরত্নের কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এই মথুরানাথের পিতাই স্বনামধন্য ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের নির্দেশে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবদ্বীপে বিখ্যাত হরিসভা স্থাপন করেন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের স্মৃতি বিজাড়িত সেই হরিসভা অদ্যাপি বিদ্যমান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সামশ্রমী কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ মুদ্রাঙ্কনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি 'বৈদিক গ্রন্থপ্রত্ন' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি যখন বেদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশনের উদ্যোগ করেন, তখন বেদাঙ্গের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরুক্তগ্রন্থ প্রণয়নের ভার

সামশ্রমীকে দেওয়া হয়। এই গ্রন্থের একটি দীর্ঘ ভূমিকা তিনি সংস্কৃতে 'নিরুক্তালোচনম্' নাম দিয়া লেখেন। তিনি 'উষা' নামে বেদের আলোচনামূলক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তিনি 'ঐতরেয়ালোচনম্' নাম দিয়া প্রায় একশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন। এই ভূমিকায় বৈদিক সমাজের চতুর্বর্ণতত্ত্ব, নিম্ন ও উচ্চতর, বর্ণের রূপান্তর, আর্যদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল -- ইত্যাদি আলোচনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ দুইটিতে তিনি টিপ্পনী পাদটীকাও দিয়াছেন। বেদ ব্যতীত তিনি বঙ্গজননীরও বহু সেবা করিয়া গিয়াছেন। বহু কবিতা ও স্বরচিত বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশ করেন এবং বহু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। সামশ্রমী গোভিলগৃহ্যসূত্র, শুক্লযজুর্বেদ, সামবেদ, সামবেদের বংশব্রাহ্মণ ও দেবতাধ্যায়-ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ভারতে বিশাল বৈদিক বাঙ্ময়ের গ্রন্থরাজি যে সকল পণ্ডিত সম্পাদন বা অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সামশ্রমীর নাম শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসরোগে ১লা জুন তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। সত্যব্রত সামশ্রমী সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইল তাহার মূল ভাবটুকু ড. যোগীরাজ বসুর 'বেদের পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত। (পৃ. ১৮১)

(২) **রমেশচন্দ্র দত্ত** -- বেদের বঙ্গানুবাদ সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই স্মরণীয় কাজ আরম্ভ করেন। এই অনুবাদকালে তাঁহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুবাদে কিছু কিছু ত্রুটি থাকার জন্য বঙ্গদেশের গোঁড়া পণ্ডিতেরা তাঁহার গ্রন্থের যথোচিত আদর করেন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আদি অনুবাদক বলিয়া বাঙালী মাত্রই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৺সীতারাম শাস্ত্রী ও ৺অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী— ইঁহারা অনর্গল সংস্কৃত বলিতেন। তাঁহাদের অনেক কথা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। তাই রমেশচন্দ্রের বাংলা অনুবাদেই আমরা বেদের কথা বুঝিতে এবং জানিতে পারিয়াছি।

(৩) **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** — ইনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। কয়েকখানি বৈদিকগ্রন্থ, সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গোপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঐতরেয় আরণ্যক উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

(৪) **দুর্গাদাস লাহিড়ী** — সানুবাদ সায়ণভাষ্য সহ ইঁহার বৈদিক গ্রন্থ-সকল বিশাল। তিনি উপনিষদ্ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইনি সারা জীবনই শাস্ত্রচর্চায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রব্যাখ্যা অনেক সময় নিয়মমত হয় নাই। এই জন্য তৎকালীন গোঁড়া পণ্ডিতেরা খুব উচ্চ স্থান দেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যাকারী দুর্লভ।

এই ব্যাখ্যাকারী সেই সময়ের প্রকৃতির শোভা ও কোথাও কোথাও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা অপ্রয়োজনীয় নহে। মন্ত্র অপৌরুষেয় হইলেও দেশ, কাল ও পাত্র হইতে একেবারে নিরপেক্ষ নহে।

বাক্ ও অর্থ

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের পরম ভক্ত শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন 'বিদ্যার্থীসেবক রমেশ শর্মা'। প্রভুর ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে তাঁহার একটি আদর্শ জীবন ছিল। তাঁহার আদর্শে শত শত উচ্ছৃঙ্খল যুবক পথে আসিয়াছে।

ভবানীপুরের একটি বাসায় রমেশচন্দ্র শেষ শয্যায় শায়িত সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকুমার ব্রহ্মচারীকে লইয়া সেখানে গেলাম। পরের দিন সকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বদিবসে সারারাত্র তাঁহার পার্শ্বে ছিলাম। ডাক্তার বলিয়াছেন, হাতের নাড়ীর স্পন্দন নাই। তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া অনর্গল কথা বলিতেছেন। কথাগুলি সুস্পষ্ট। ডাক্তার কতক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া 'আশ্চর্য' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র আমাকে একটু বড় বানাইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝিবে, তাই তোমাকে বলিতেছি।" কিন্তু হায়, কিছু বুঝার মত বুঝি নাই। তাঁহার মুখোক্ত কথাগুলি কৃষ্ণকুমারকে লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। আশ্রমের উপর দিয়া নানাপ্রকার রাজনৈতিক অত্যাচার চলিয়া গিয়াছিল। সেই খাতাটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণকুমারও এখন পরলোকে। রমেশচন্দ্রের মুখের দু'একটি কথা মনে করিয়া লিখিতেছি। ভাবটি ঠিক হইলেও ভাষাটি ঠিক হইবে না।

প্রভু — "রমেশ, বেদ পড়িস্।"

রমেশ — "বেদ পড়িলে কি হয়?"

প্রভু — "বেদ পড়িলে ভেদ জ্ঞান থাকে না।"

রমেশ — "ভেদটি কি একটু বুঝাইয়া দেন, তারপর বেদের পড়া আরম্ভ করিব।"

প্রভু — " আরম্ভ তো করিয়াছিস্।"

রমেশ — " না প্রভু, আরম্ভ তো করি নাই।"

প্রভু — " যেদিন পৈতাটি কান্ধে উঠিয়াছে, সেই দিনই করিয়াছিস্। ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থির থাকিলেই মনটি একমুখী হইবে। হরিনাম করিতে করিতে জিহ্বাটি পবিত্র হইবে, তখন মন্ত্র উচ্চারণ স্পষ্টতর হইবে।"

রমেশ — " প্রভু! বেদের কথা একটু বলুন, বেদ কি?"

প্রভু — " বেদ হইল আদি বাক্; আদিগঙ্গার মত, হরিপাদোদ্ভবা। প্রথমে ছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, তারপর নামেন শিবের জটায়, তারপর আসিলেন ভস্মীভূত স গর বংশের উদ্ধারে, মহাদেবের জটাজালের মধ্যে বেদময় গঙ্গার অপ্রকটিত ভাবে নিগূঢ় অবস্থান, ব্রহ্মাকমণ্ডলুতে স্থিতি, হর-জটা জালে অবগুণ্ঠন, জহ্নুমুনি কর্তৃক পান, ভস্মপ্রায় সগর- সন্তানের দ্বারা বেদধারার আবির্ভাব সঙ্কেত। তোরা এখন আদি গঙ্গা পাস্ কালীঘাটে, যা কাটা গঙ্গা বা মরা গঙ্গা নামে পরিচিত; না আছে গভীরতা, না আছে নির্মলতা। বেদ আদি বাক্, পরা বাক, বাক্ই বেদ।"

বৈদিকসাহিত্যের মূলে এক দিব্যশক্তির প্রেরণা আছে, ঋষিরা সেই দিব্যশক্তিকে অনুভব করিতেন। তাঁহারা তাহার নাম দিয়াছিলেন বাক্। 'মিস্টিক্' বা মরমীয়া যাঁহারা, তাঁহারা সেই বাক্‌কে দেখিয়াছেন 'দিবীব চক্ষুরাততম্' দ্বারা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Vak is the goddess of speech"। বাক্ একটি দেবী, ঋষিগণ সেই দেবীর কাছে প্রার্থনা করিতেন, তাঁহারা ধ্যানে দেবীর রূপ দর্শন করিতেন, বাকের ঔজ্জ্বল্য সর্ববিধ অন্ধকার নাশকারী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বাগ্‌দেবীর পূজার মন্ত্র পাই —

"আয়াহি বরদে! দেবি! অক্ষরান্ ব্রহ্মসংযুতান্।"

ঋক্-সংহিতায় ব্রহ্ম এবং বাকের একই ব্যঞ্জনা। আদি বাক্ ত্বষ্টার মত তক্ষণ করিয়া অক্ষরে জীবনাধান করেন। সংহিতার মতে (ঋ. ১/১৬৪/৪৫) বাক্ চারি প্রকার—

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।"

এই চারি প্রকার বাকের নাম— পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। কথাবার্তা, সাহিত্য, গান, বক্তৃতা ইত্যাদিতে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি বা শুনিতে অভ্যস্ত, উহাই বৈখরী বাক্। এই সব শব্দগুলির উৎস কণ্ঠদেশ। তন্ত্রাভিজ্ঞ দার্শনিক স্যার জন উড্‌রফ (Sir John Woodroffe) সিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের শিষ্য। উড্‌রফ গুরু আজ্ঞায় তন্ত্রবিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন Arthur Avalon ছদ্মনামে। তিনি তাঁহার *The Serpent Power* গ্রন্থে বাক্-তত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"Vaikhari sabda is uttered speech developed in the throat issuing from the mouth........Vaikhari sabda is therefore language or gross lettered sound."

অপর তিন প্রকার শব্দ অর্থাৎ মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা, সম্যক্

অনুধাবন করিতে পারি না। তবে যেটুকু অর্থ মনে উদিত হয় তাহা এই — আমরা অনেক সময় নিজের মনে কথা বলি, মনে মনে ভাবনা করি, জপ করি— ইহা মধ্যমা। এই সকল শব্দের উৎস হৃদয়। উড্রফের মতে — "Madhyama sound is associated with Buddhi"।

পশ্যন্তী শব্দের উৎস নাভি। সাধারণ মানুষ ইহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারে না। হঠযোগিগণ যোগপন্থা অবলম্বনে উহার প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ জানিতে সক্ষম হন। উড্রফ বলেন —"It is here associated with Manas. These represent the motionless and first moving Isvara aspect of the sabda." (*The serpent power*, pp. 88-89)।

পরা শব্দের উৎস মূলাধার। ইহা সাধারণ যোগীর অগম্য। গভীর সমাধি যোগে সাধক এই ভূমিতে উপনীত হইলে ঐ গূঢ় তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে। উড্রফ এই অবস্থাকে বলিয়াছেন — "This is motionless causal sabda in Kundalini in the muladhara centre of the body."।

প্রসঙ্গত পরা বাক্ ও বৈখরী বাক্ সম্বন্ধে নিজ জীবনের একটি ছোট কাহিনী মনে আসিতেছে। ১৯৩৭ সনে লণ্ডনে একটি বড় কনফারেন্সে গিয়াছিলাম। অনেক আমেরিকান্ ডেলিগেটস্ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিদেশী মহিলার সঙ্গে একটি তরুণ বয়স্ক পুত্র ছিল। তাহার কথাবার্তা আকৃতি-প্রকৃতি আমার খুব ভাল লাগিত। ছেলেটির মা তাঁহাকে ডাকিত 'ঠ্যাডা'। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নামে ডাকেন কেন? আমাদের দেশে বাংলাদেশে এই শব্দটিতে বোঝায় foolish, Idiot। মাতা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনাদের ভাষায় যাহাই বুঝাক, মা-বাবার মনে কি বুঝায় তাহা বলি। ছেলের নাম 'Theodor' (থিয়োডোর)। Theo অর্থ ঈশ্বর, আর Dor অর্থ দান। সংস্কৃত ভাষায় দেবাশিস্।"

পরে হঠাৎ যেন মনে হইল ঐ দেবাশিস্‌টি পরা বাক্ আর 'ঠ্যাডা' বৈখরী বাক্। বেদের মূলে পরা বাক্। আমরা যাহা পড়ি, বুঝি, শুনি, তাহা বৈখরী বাক্।

বস্তুবিষয়ে ধারণা নির্ভর করে মনের উভয়বিধ কার্যের উপর। যথা— শব্দশ্রবণ ও উহার অর্থগ্রহণ। ইহা সূক্ষ্ম মনের কার্য।

"বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।" (ঋ. ৩/৫৩/১২)

এই মন্ত্রে ব্রহ্মপদে ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি অর্থ মন্ত্রশক্তি। বাগ্‌দেবীর শক্তিই বাচস্পতি। বিশ্বকর্মা। হইলেন দিব্য বাচস্পতি।

ঋ. ১০/৮১/৭ মন্ত্রে সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্বকর্মা বা দিব্য বাচস্পতির মধ্যে। মানুষের মধ্যে বাচস্পতি হইলেন ঋত্বিক্ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, যাঁহার কাছে 'উশতী সুবাসা জায়া'র মত বাক্ তাঁহার তনুখানি

মেলিয়া ধরেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, সোমযোগে ষোলজন পুরোহিতের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি ব্রহ্মা। তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মূর্তিমান জ্ঞানস্বরূপ। মনে হয় এই ব্রহ্মাই উপনিষদের পরমাত্মা স্বরূপ। ইনি ব্রহ্মাতে পরিণত হইয়াছেন।

আবার বাকের কথায় আসি। বাক্ ও অর্থ চির যুগনদ্ধ, মিথুনীভূত। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যের প্রারম্ভে প্রণাম মন্ত্রে লিখিয়াছেন—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ।।"

অনুবাদ — "শব্দ এবং অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত জগতের জনক-জননী পার্বতী এবং পরমেশ্বরকে শব্দ এবং অর্থের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত আমি বন্দনা করিতেছি।" যেন ফুল ও তাহার গন্ধ। ফুল ভাবে কখন গন্ধের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার প্রকাশকে পূর্ণ করিব, গন্ধ ভাবে কখন ফুলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার সত্তাকে ভোগোপযোগী করিব।

" ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিখিল বিশ্ব বাকের বিভূতি। বাক্ জননী, প্রসবিণী; কিন্তু অর্থ সঙ্গে না থাকিলে বাক্ বন্ধ্যা। অর্থকে ব্যক্ত করা বাকের কার্য। এই ব্যক্ত করা কার্যটি যাঁহার লেখনীতে যত সুন্দর, সুষ্ঠু ও প্রাঞ্জল তিনি তত বড় সাহিত্যিক কবি। কবিগণের লেখনীমধ্যে বাকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। রামায়ণ ও মহাভারতকার বাল্মীকি ও বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত; পাশ্চাত্ত্যে হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া শেক্সপীয়র, মিল্টন, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রন, গ্যেটে, টেনিসন পর্যন্ত সকলেই বাকের বিভূতি বিস্তার করিয়াছেন। আরও কত সহস্রজন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন তাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা কোন কালেই শেষ হইবার নহে। বাকের বিভূতি অসীম ও অনন্ত।

বাক্ পার্বতী, অর্থ শিব। অর্থের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য বাক্ পার্বতী লালায়িত। নিজ স্কন্ধ হইতে সতীর দেহ হারাইয়া শিব তখন সতীর ধ্যানমগ্ন। দেবতাগণ পরামর্শ করিলেন। যৌবন ও শ্রী দ্বারাই শিবকে লাভ

করিতে পার্বতী যখন তৎপর, কামদেব তখন পঞ্চশর লইয়া শিবকে চঞ্চল করিতে সহায় হইবেন। পার্বতী সুসজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইলে পরে পরিকল্পনানুযায়ী কামদেব ধনু ও পুষ্পবাণ হাতে লইয়া শিবের ধ্যান ভাঙ্গিবার জন্য প্রস্তুত। কামের উদ্যোগ মাত্রই শিবের মধ্যনেত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম করিল— "ভস্মাবশেষং মদনং চকার"। পার্বতী বুঝিলেন বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা শিবকে তুষ্ট করা যাইবে না। প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার। পার্বতী কঠোর তপস্যায় মগ্না হইলেন। শ্রেষ্ঠ তপস্বীগণ আহার ত্যাগ করেন, বৃক্ষ হইতে গলিত পর্ণ গ্রহণ করেন। পার্বতী তাহাও ত্যাগ করিলেন, তাই তাঁহার নাম হইল অপর্ণা। শিব তখন ছদ্মবেশে আসিয়া পার্বতীর শিবনিষ্ঠার পরীক্ষা করিলেন। পার্বতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। শিব-পার্বতীর সম্মিলনের ফল দেব-সেনাপতি কুমাব। কুমার তপস্যাজাত সন্তান। এই কুমারই আসুরিক শক্তি দলনে একমাত্র সমর্থ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শ্রেষ্ঠ কবিগণের তপস্যালব্ধ ফসল। ঋষিদের হৃদয়ে যখন মন্ত্র প্রকটিত হন তখন "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের"মত একটি মহা গম্ভীর অনুপ্রেরণা জাগে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন— বাক্ অধ্যাত্ম রাজ্যের মূল উৎস। সধ্রি ঋষি ঋ.১০/১১৪/৮ মন্ত্রে ভাবের কথা বলেন। ব্রহ্মাই স্বরূপতঃ চেতনার সর্বোচ্চ ভূমিতে উত্তরণ। চেতনার বাকের মধ্যে তাঁহার স্ফূর্তি।

ঋষিরা বাক্‌কে দর্শন করেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ইন্দ্রও এই বাক্‌কে দর্শন করিয়াছেন বিদ্যুৎ ছটার মত। তাঁহার নাম উমা হৈমবতী। শ্রীঅনির্বাণের মত বেদ-পুরুষেরা মনে হয় এই হৈমবতীর ক্রোড়ে বাস করিতেন।

বাগ্‌দেবীর অপ্রাকৃত মূর্তি আমাদিগের সকল চিত্তমালিন্য ধ্বংস করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা দৃষ্ট হয়। পাণিনীয় সূত্রের মহাভাষ্যে স্ফোটবাদ প্রসঙ্গে শব্দতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য পরিব্যক্ত। একটি পদ বর্ণসমূহের সমষ্টি। শব্দের দ্বারা অর্থের বোধ জন্মে, কিন্তু বৈয়াকরণদের মতে, এই অর্থবোধের হেতু বর্ণমাত্র নহে। বর্ণের দ্বারা বর্ণের অতিরিক্ত একটি নিত্য-শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে। এই নিত্যশব্দ যাহা বর্ণাতিরিক্ত, কিন্তু বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত তাহাই বর্ণার্থের বোধক স্ফোট। এই স্ফোটই জগতের উপাদান। ইহা অক্ষর অনির্বচনীয় ব্রহ্ম।

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া বলিতেছি, বাকের কথা খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ *New Testament* -এ পাওয়া যায় — "In the beginning there was word, word was with God and the word was God" (সেন্ট জনের গস্‌পেল)। word-এর একটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় যথা — 'logos'। মনে হয় এই logos -ই বৈদিক বাক্, এই হইল

New Testament -এর কথা।

তাহার পূর্ববর্তী *Old Testament*-এর প্রথমেই পাই — "God said, let there be light and there was light"। প্রথমে said, অর্থাৎ বলা, বলার সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া। এই বলাই বাক্, হওয়াই অর্থ। মানুষের বলা ও হওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেক। সেই ব্যবধান হইল কার্য-কারণ সম্পর্ক-জনিতপ্রচেষ্টা। এই মধ্যবর্তী প্রচেষ্টার প্রয়োজন শ্রীভগবানের হয় না। বাক্ উচ্চারণ মাত্রই অর্থের প্রকাশ। শ্রীভগবান্ বলিলেন, ''আমি বহু হইব এবং তৎক্ষণাৎ বহু হইলেন। এখনও হইতেছেন। বাক্ ও অর্থের মিলনের মধ্যে নিখিল সৃষ্টি-রহস্য অন্তর্নিহিত।

বাক্ ও অর্থকে যুগনদ্ধ বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আরও কতিপয় যুগনদ্ধের কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম"

ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২১ তম সূক্তটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সূক্তটির নাম হিরণ্যগর্ভ, সূক্তের ঋষির নামও হিরণ্যগর্ভ। দেবতা হইলেন প্রজাপতি, এই হেতু সূক্তটিকে প্রজাপতি সূক্তও বলা হয়। হিরণ্য অর্থ সুবর্ণ। হিরণ্যগর্ভ তিনি, যাঁহার মধ্যভাগ সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল। হিরণ্যগর্ভের কথা বেদে উপনিষদে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও স্থানে হিরণ্যগর্ভকে অখণ্ডজ্যোতি বা আনন্দের আধার বলা হইয়াছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক Wilson বলিয়াছেন—

"Hiranyagarbha literally means 'the gold germ', source of golden light, 'the Sun God' as the great power of the universe, from which all other powers and existences, divine and earthly, are derived, a conception which is the nearest approach to the later mystical conception of Brahma, the creator of the world."

এই সূক্তে দশটি মন্ত্র আছে। শেষের মন্ত্র বাদে অন্যগুলিতে একটি ধুয়া বা ধ্রুব বাক্য আছে— "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" এই ধ্রুব বাক্যটির "মন্ত্রের উপাস্য কে?" এই অর্থ লইলে, একটি দ্বন্দ্ব বা বিভেদের সম্ভাবনা থাকে। কেহ বলেন, 'ক' বর্ণটি ব্রহ্মের একটি নাম। তাহা হইলে ধ্রুব বাক্যটির অর্থ হয় — আমরা ঘৃতাহুতি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিব। [কঃ যখন প্রজাপতি (পুং) তখন ৪র্থীর একবচনে বস্তুতঃ 'কায়' হওয়া উচিত ছিল।] ব্যাকরণ মতে 'কিম্' শব্দের চতুর্থীর একবচনেই 'কস্মৈ' হয়; তাহাতে ধ্রুবপদের অর্থ হয় — কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা অর্চনা করিব? প্রশ্নটির উত্তর ঋষি যতদূর সম্ভব সূক্তের মধ্যেই প্রদান করিয়াছেন। উত্তরটি যেন দশম মন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহাতে ধুয়াটি নাই।

"প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।।"
(ঋ. ১০/১২১/১০)

"হে প্রজাপতি, তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়। আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।"

এই দশম মন্ত্রে দেখি ঋষি অবশেষে প্রজাপতি হবিঃ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'ক' যে প্রজাপতিরতে আর এক নাম তাহার বর্ণনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। 'ক' বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোঽহম্?" ইন্দ্র বলিলেন,তুমি যাহা বলিলে তাহাই অর্থাৎ 'ক' (কঃ অহম্)।

এই 'ক' ব্রহ্ম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম খণ্ডে তপোনিষ্ঠ উপকোশল ব্রহ্মচারীর একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। উপকোশল বিখ্যাত সত্যকাম জাবালের শিষ্য। উপকোশল বারো বছর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে যথাকর্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক সকল ব্রহ্মচারিগণের সমাবর্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গুরু উপকোশলকে সমাবর্তনের আদেশ প্রদান করিলেন না। মনোদুঃখে উপকোশল অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। অগ্নি দেবতার তিনটি রূপ। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়। এই তিন মূর্তি একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন এবং উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। অগ্নিগণ বলিলেন, "শোনো উপকোশল, আমরা তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি", এবং যাহা বলিলেন তাহা নিম্নরূপ—

"প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি।" (ছান্দোগ্য, ৪/১০/৪)

অগ্নিদেবগণ কথিত 'প্রাণোব্রহ্ম' কথাটি বুঝা যায়। কিন্তু 'কং ব্রহ্ম' বা 'খং ব্রহ্ম' যে কি তাহা বুঝা যায় না। অগ্নিদেবগণ বুঝাইয়া দিলেন, — 'কং' অর্থ সুখ, অনিত্য বিষয় সুখ নহে; দিব্য অপ্রাকৃত সুখ। তাহাই চিদাকাশস্থিত আনন্দ। অর্থাৎ আনন্দ ব্রহ্মাই উপাস্য। তিনি রসস্বরূপ— "রসো বৈ সঃ।" এই আনন্দ সমস্ত জগৎ, জল-স্থল অন্তরিক্ষ পূর্ণ করিয়া আছেন। এই আনন্দ যদি না থাকিত তাহা হইলে কে-ই বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে-ই বা প্রাণধারণ করিত—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

(তৈত্তিঃ উপঃ, ২/৪)

'খং' শব্দটির অর্থ আকাশ। আমাদের এই ভৌতিক আকাশ নহে, চিদাকাশই খং-এর প্রতিপাদ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপরে উল্লিখিত মন্ত্রে (৪/১০/৪) কং ও খং পরস্পর পরস্পরের বিশেষত্বজ্ঞাপক। কং খং বলিতে পরব্রহ্ম বা আনন্দব্রহ্ম লক্ষিত। ছান্দোগ্যের অর্থ অবলম্বন করিয়া যদি আমরা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করি, তাহা হইলে 'কস্মৈ বিধেম' অর্থাৎ

কাহাকে উপাসনা করিব, এই বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

হিরণ্যগর্ভ সূক্তের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। চিদাকাশস্থিত আনন্দময় ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে। আমাদের এই ভৌম আকাশে আনন্দ নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐ আনন্দ পূর্ণ আনন্দ নহে, যথার্থ আনন্দ নহে। সাধকের চিদাকাশ জুড়িয়া যে পরমানন্দ বিরাজ করে উহাই পূর্ণানন্দ, উহাই প্রকৃত আনন্দ। এই আনন্দ লাভ হইলে ভব-ভয়ে ভীত সংসারে মানব কোন কিছু হইতে আর ভীত হয় না।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" (তৈত্তিঃ উপঃ, ২/৯)

এই আনন্দের প্রতিপাদক 'কং' ও 'খং'। ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। এই হেতু ইহারা অভিন্নার্থক।

অন্য প্রকারেও কং ব্রহ্ম ও খং ব্রহ্মকে আলোচনা করা যায়। কং অর্থ সুখ, খং অর্থ শূন্য। সুতরাং কিছু বস্তু ও শূন্য বিপরীত। এই বিপরীতের মিলনেই যুগনদ্ধতা। মিলটি এইরূপ — কং অর্থ নির্দোষ নির্মল সুখ অর্থাৎ আত্মিক সুখ। এই সুখকে পাইতে হইলে খ হইয়া যাইতে হইবে। খ অর্থ শূন্য। এই যে 'আমার আমার' সর্বদা করিতেছি, 'আমার আমার' বলিয়া সকল বস্তুকে আকড়াইয়া ধরিতেছি, কবির ভাষায়, "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে" — এই আমার আমার ত্যাগ করিতে হইবে। এই আমি ও আমারকে মুছিয়া ফেলিয়া শূন্য হইতে হইবে। শূন্য হইলে প্রকৃত সুখ মিলিবে। শূন্য ও পূর্ণ আপাতত বিরুদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ নহে। যতই আমার আমার চিন্তাভাবনা চাহিদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ততই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইব। অন্তর যাঁহার শূন্য তিনি বাস্তবিকই পূর্ণ। কোন বাসনা নাই যাঁহার তিনিই কং বা সুখ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন। সুতরাং কং খং-এর তাৎপর্য হইল শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার প্রাপ্তি।

অংকশাস্ত্রে যেমন শূন্য সাধারণভাবে মূল্যহীন, কিন্তু কোন একটি একক সংখ্যার অঙ্কের দক্ষিণে বসিলেই তাহার মূল্য দশগুণ বাড়িয়া যায়। আকাশকে আমরা শূন্য বলি কিন্তু সূর্য-চন্দ্র-বিহীন গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে সেই আকাশেই লক্ষ কোটি অসংখ্য উজ্জ্বল গ্রহ- তারকার আবির্ভাব দেখি। বেদান্ত বলেন, 'নেতি নেতি' বলিয়া সব পরিত্যাগ করিয়া শূন্য হইয়া গেলে ব্রহ্মবস্তুর সন্ধান মিলে। সব ত্যাগের মধ্যেই সব পাওয়া। ইহাকেই 'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে।

"শব্দঃ খে"

"প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।" (গীতা, ৭/৮) পরমার্থ তত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ নিজ শ্রেষ্ঠ বিভূতির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সকল দেবের মধ্যে তিনি প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার, আকাশের মধ্যে শব্দ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে পৌরুষ। গীতার বিভূতিযোগের শেষে বলিয়াছেন---

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।" ১০/৪১

অর্থাৎ, যেখানে যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী ও শক্তিসম্পন্ন বা শ্রেষ্ঠ তাহাই আমার বিভূতি। শ্লোকস্থ 'শব্দঃ খে' শব্দ দুইটিতে বুঝা গেল, আকাশ শব্দ বহন করে। আকাশের আর কোন গুণ নাই। ইহা ন্যায়, সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক সকল ঋষিরাই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন বিশেষভাবে বলিয়াছেন — আকাশের গুণ শব্দে, বাতাসের গুণ শব্দ-স্পর্শে, তেজের গুণ শব্দ-স্পর্শ-রূপে, অপের (জলের) গুণ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে বিদ্যমান। আকাশের বিশেষ গুণ হইল শব্দ — এই কথা আচার্য শঙ্কর হইতে বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণ সকলে উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, শব্দ আকাশের গুণ নহে, বাতাসের গুণ। বাতাসের দ্বারা শব্দ চালিত হয়। যেখানে বাতাস নাই, সেখানে শব্দ নাই — ইহা বিজ্ঞান-প্রমাণিত সত্য। গানের সা রে গা মা পা ধা নি কত সেকেণ্ডে কত স্পন্দন তুলিয়া আসিতেছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা যায়।

শাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিরোধ গুরুতর। ইহার সমাধানের কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলাও ঔদ্ধত্যের সামিল। ইহার কোন সমাধান আমি দিতে পারিব না। শাস্ত্রের কথাই উদ্ধৃত করিতে পারি। তবে স্মরণ রাখা ভাল, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোন তথ্যই চরম সত্য নহে। বিজ্ঞানের আজিকার সিদ্ধান্ত, আগামীকল্যই ভুল প্রমাণিত হইতে পারে পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে।

বেদে বায়ুকে দর্শত (দর্শনীয় বা দর্শয়ক) বলা হইয়াছে। 'বায়োবা যাহি দর্শতেমে' (ঋ. ১/২/১) আমরা দর্শক, এবং দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাই। শব্দ অর্থ তরিৎবাহিত। তরঙ্গ আকাশে অবস্থিত। আকাশ আছে বলিয়াই শব্দের বিস্তার হয়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন — ব্রহ্মের দুইটি রূপ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। যিনি শব্দব্রহ্মকে ঠিক ঠিক জানেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। শব্দব্রহ্মই বাক্। বাক্‌তত্ত্ব লইয়াই বৈয়াকরণের স্ফোটবাদ ও বৈষ্ণবাচার্যদের নামতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের *New Testament* এর চতুর্থ Gospel-এ উক্ত হইয়াছে — "In the beginning there was word. Word was with God and word was God" — এই বাণী শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে।

বেদান্তসূত্র আকাশাধিকরণে বলিয়াছেন "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।" (১/২/২৩) এবং প্রাণাধিকরণে ইহার পরবর্তী সূত্র (১/২/২৪) — "অতএব প্রাণঃ" — এই দুই সূত্রে বলা হইয়াছে। শ্রুতি যেখানেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপে আকাশ ও প্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। শ্রুতিমতে আকাশ (ইথার), প্রাণ (elan vital) জড়, সবই জড়বস্তু। উহাদের পরিচালনার জন্য আছেন অন্তরে অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। শ্রীমদ্‌ভাগবত বেশ রসাল করিয়া বলিয়াছেন— "ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।" (১২/১১/১৪)

ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, মুখ্য প্রাণ, ইহারা তত্ত্বরূপে 'গদা'। গদা ধরিয়া পরমাত্মা কার্য করেন। ভগবানের রূপ তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া মুখ্য প্রাণ গদারূপে ব্রহ্মের স্বরূপাত্মক।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১/৯/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।।" ১

(শালবত্য)— "এই লোকের আশ্রয় কি?" (প্রবাহণ জৈবলি) বলিলেন, — "আকাশ। স্থাবরজঙ্গমাদি এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয়; কারণ আকাশই এই সকল হইতে মহত্তর; সুতরাং আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই বলিয়াছেন — "শব্দঃ খে"।

বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার কি সামঞ্জস্য হইতে পারে তাহা বিজ্ঞানের সাধক ও সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। ঋষিগণের অনুভব চিরন্তন সত্যের বাহক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅরবিন্দ অনির্বাণ প্রমুখ বেদজ্ঞগণের অনুভুতির উপরে লক্ষ রাখিয়া সমাধানের প্রতি পরিপুষ্ট করিতেছি।

'খ' শব্দের আভিধানিক অর্থ শূন্য। 'খ'-এর ইংরেজী অনুবাদ হইতে পারে Void, Vacuum বা Infinite Space। চলতি কথায় এই 'খ' কে আমরা আকাশ বলি। আকাশকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিতে পারি— (১) দিনে সূর্যের আলোতে আমরা যে আকাশ দেখি। (২) অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারময় রাত্রিতে আমরা যে আকাশ দেখি, সে আকাশ অগণিত গ্রহ নক্ষত্র খচিত। খুব শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণের সাহায্যে বর্তমান বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে মিলাইয়া যাহা দেখা যায়, যাহা ভাবনাতীত — অতি বিরাট। আমাদের সূর্য একটি অতি ক্ষুদ্র তারকা । আমরা যাহাকে আকাশ- গঙ্গা বা milky-way বলি, তাহার মধ্যে সূর্য অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে বড় কোটি কোটি সূর্য বিরাজমান। এই গেল আকাশের দুইটি রূপ। ইহার পর তৃতীয় আকাশের কথা। (৩) বৈদিক দৃষ্টিতে এই দ্বিতীয় আকাশের ঊর্ধ্বে মূলে আরও একটি মহাকাশ আছে। গীতা বলিয়াছেন—

"অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।"

দ্বিতীয় আকাশে আমরা যাহা দেখি তাহা 'ব্যক্ত-মধ্যানি।' ইহার মূলে যে-আকাশ তাহা 'অব্যক্তাদিনী'। তাহার নাম দেওয়া যায় মহাকাশ। এখানে সবকিছুই potential অর্থাৎ অব্যক্ত। ঋক্-সংহিতা অব্যক্তকে কখনও কখনও অসৎ বলিয়াছেন। উপনিষদ্ও অসৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে আরম্ভেই বলিয়াছেন— 'ন অসৎ আসীৎ ন সৎ আসীৎ' — এই অসৎ-এর অর্থ করিলে যদি আকাশ-কুসুম বা শশশৃঙ্গের মত কিছুই না বুঝায় তাহা হইলে সেই অসৎ ছিল না বলার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং অসৎ অর্থ অব্যক্ত। অব্যক্ত মহাকাশের কিছুই আমরা জানি না। তবে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ একটি কথা নিশ্চিতরূপেই জানিয়াছেন সেই মহাকাশের একটি গুণ— সেই গুণটির নাম শব্দ।

এই শব্দই 'প্রণব' বা 'ওঙ্কার'। যাহা কিছু ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল ধরিয়া হইবে তাহাই ওঙ্কার হইতে। ওঙ্কারকে গ্রীক ভাষায় Logos বলে । বাইবেলে *New Testament* - এ St. John এর Gospel-এ বলা হইয়াছে 'Word'। পণ্ডিতেরা ইহাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলেন।

বেদান্ত সূত্রে — "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।।" (১/১/২৩) 'আকাশ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 'তল্লিঙ্গাৎ' অর্থ ব্রহ্মের সূচক চিহ্ন এই। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১/৯/১ মন্ত্রে আকাশকে যে সর্বাপেক্ষা অতিশয় মহান্ (জ্যায়ান্) ও পরম আশ্রয় 'পরায়ণ' বলিয়াছেন — তাহা পরব্রহ্মেরই

সূচক। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মহাকাশ বা 'খ' কে 'বৃহদাত্মলিঙ্গম্' বলিয়াছেন (ভা. ২/২/২৮)। ভাগবত ৮/৫/১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, "তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে।" এই মহাকাশকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা "শব্দঃ খে" বলিয়াছেন।

বৈদিক সিদ্ধান্তে বাক্-এর চারিটি স্তর— পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মহাকাশ ভূমিতেই পরা বাকের উৎস। বৈখরী বাক্ আমরা কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও দন্ত দ্বারা সর্বদা উচ্চারণ করি। এই বৈখরী বায়ুস্পন্দন হইতে জাত। ইহার কথাই বিজ্ঞান বলিতেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের কথা 'শব্দ বায়ুস্পন্দন হইতে জাত' ও 'শব্দ আকাশের গুণ' এই বৈদিক সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই।

পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা এক সময় ইথার লইয়া মাতিয়াছিলেন। এখন ইথার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম (relativity ও quantum physics)-এর আবিষ্কার ইথারকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। ইথার ছিল প্রায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরতুল্য, তাহা এখন অপ্রয়োজনীয় সত্তা। ইহা বিজ্ঞান জগতে এক ভয়ানক ছন্দঃপতন।

জড় ও চৈতন্য

আর্য ভাবনায় জড় ও চৈতন্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম ভাবনায় জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ভেদ আছে। ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় মতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি বাহির হইতে জগৎ গড়াইতেছেন; বৈদিক ভাবনায় ঈশ্বর জগৎ হইয়াছেন। তিনি জগৎ হইতেছেন কিন্তু ফুরাইয়া যাইতেছেন না। পুরুষসূক্তে নারায়ণ ঋষি বলেন, তিনি ভূমিকে সকল দিক্ হইতে আবৃত করিয়াও দশ অঙ্গুলি ছাপাইয়া আছেন। খ্রীষ্টীয় ও ইসলামের ঈশ্বর বিশ্বোত্তীর্ণ, কিন্তু বিশ্বাত্মক নহেন। আর্য ঋষি বলেন, যাহা যাহা বিভূতিমৎ তাহাই তিনি।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।" (গীতা, ১০/৪১)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সূর্য সর্বোত্তম বিভূতি, তিনিই সূর্য হইয়াছেন — "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থূষঃ" স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু সকলের আত্মাই সূর্য। সূর্যকে যখন দেখিতেছি তখন জগতের আত্মাই দেখিতেছি। সূর্য জড় নহেন; সূর্যই বিষ্ণু, এই কথা সংহিতার স্পষ্টোক্তি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছি, তাঁহাতেই বৃহৎকে দেখিতেছি। সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই একেরই অবস্থান।

এক শতাব্দী পূর্বে বিজ্ঞান বলিত, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই জড় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানে জড়বাদ স্বীকৃত নহে। জড় কোন বস্তু নাই, সবই শক্তি। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁহার যুগান্তকারী আবিষ্কার একটি ছোট্ট সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন '$E=mc^2$' (E =Energy বা শক্তি, m=mass বা বস্তুর ভর, c= আলোর গতিবেগ) অর্থাৎ প্রতিটি জড় বস্তুই শক্তির ঘনীভূত রূপ। আণবিক শক্তির মূল রহস্যই এই সূত্র হইতে উদ্ভূত। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে দেখা যাইতেছে যে, সামান্য এতটুকু পদার্থে কি বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। তাই এখন জড়বাদ অর্থই শক্তিবাদ।

নিখিল বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় জগতের শক্তির খেলা। পরাক্ দৃষ্টিতে যাহাকে বলি শক্তি, প্রত্যক্ দৃষ্টিতে তাহাই প্রাণ। আমি বাড়িতেছি —

ইহার অর্থ চৈতন্যের আরোহিণী শক্তি ক্রমে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে জাগিয়া উঠিতেছি, ইহা হইল শক্তির অন্তরঙ্গ পরিচয়। আমার বৃহৎ হওয়া একটি শক্তির চিন্ময় রূপ। বাহিরে যে নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া শক্তি অন্তরে চিৎ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই তাহার যথার্থ রূপ। বাহিরে যাহা আলো, অন্তরে তাহাই তাঁহার চৈতন্য। সূর্য শুধু তাপ দেন না, চৈতন্যও জাগান। শক্তি যখন তাপরূপ, তখন সে জড়; যখন সে প্রাণের চেতনরূপ, তখন সে চৈতন্য। ইহা হইলে জড় ও চৈতন্যের ভেদ কোথায়? কবি বিরাট্ হিমালয়কেও দেবতাত্মা বলিয়াছেন। তাহা হইলে জড়ে ও চেতনাতে ভেদ কোথায়? কান্ত কবি বলিয়াছেন —

"আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
আছ শশীতারকায় তপনে।"

জড়, শক্তি এবং চৈতন্য এই তিনের গভীর সম্বন্ধের তত্ত্ব আরও একটু গভীরভাবে বুঝিতে হইবে। বহির্দৃষ্টিতে জগতের যেখানে যাহাকে দেখিতেছি, অন্তর দৃষ্টিতে তাহাই চৈতন্যময় ঈশ্বর — ইহাই ঋষির প্রত্যক্ষ দর্শন। ঋষি-কবির কাছে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ।

সমগ্র বৈদিকসাহিত্য কবির চেতনার বাঙ্ময় বিগ্রহ। বৈদিক ঋষিরা নিজেদের বলিতেন কবি। দেবতাদেরও বলিয়াছেন কবি। প্রভাতে দেখিতেছি সূর্য উঠিতেছেন। তিনি চাহিয়া আছেন আমাদের দিকে। ইহা কাহার চক্ষু? "চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ"। ইহা বিশ্বময় মিত্রের চক্ষু। ইহা বিশ্বোত্তীর্ণ বরুণের চক্ষু। ইহা অন্তর্যামী চিৎ অগ্নির চক্ষু। দেখিতে দেখিতে দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িল, পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে ও দ্যুলোকে একটি পরম অনুভূতিতে অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুভব হইল, নিখিল বিশ্বের যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম সকলেরই আত্মা সূর্য। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', জগতে যাহা কিছু সকল বস্তুই তিনি। এইরূপ সহস্র সহস্র মন্ত্র আছে যাহা দেবতার চিন্ময় চক্ষুর প্রশস্তি। আমার আত্ম-চেতনার বিস্ফারণে ব্রহ্ম-চেতনা। আর ব্রহ্মচেতনার বিসৃষ্টি এই জগৎ। সুতরাং জড় ও চেতনার ভেদ কোথায়? কোথায় পৃথক্ত্ব? পৃথক্ত্ব কেবল ব্যবহারে।

আবার আর এক ঋষির দৃষ্টিতে বলিতেছি।

উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে কহিলেন — আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় সৎ ছিল। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। তেজ ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব। তিনি অপ্ সৃষ্টি করিলেন। অপ্ঈক্ষণ করিলেন আমি বহু হইব। তিনি অন্ন সৃষ্টি করিলেন, তাহাও দেবতা অর্থাৎ চিন্ময়; কিন্তু পরম দেবতার অনুপ্রবেশ ছাড়া তাঁহারা সক্রিয় হন না।

তুমি যে অন্ন খাও, তাহার স্থূল অংশ মলরূপে বাহির হইয়া যায়, মধ্যম অংশ মাংস, সূক্ষ্মতম অংশ হয় মন।

মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, আর বাক্ তেজোময় — এই যে অনুভাব তাহাই সবকিছুরই আত্মা।

আত্মা চিন্ময়, আর অপ্ তেজ ইহারা কি জড়?

বাস্তবেপ্রভেদ কোথায় — প্রভেদ ব্যবহারে মাত্র, মূলতঃনহে; বিকার বা ব্যবহারজন্য।

“অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্”

বৈদিক সাহিত্যে একাধিক স্থলেই এই কথাটি আছে। ব্রহ্মবস্তু সর্বাপেক্ষা বড় আবার সর্বাপেক্ষা ছোট। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছামাত্র ব্যক্ত, নিশ্বাস হইতে ব্যক্ত, তিনি যে কত বড়, তাহা মানবীয় কল্পনার অতীত। আবার প্রত্যেক অণুপরমাণুতে অনুস্যূত হইয়া আছেন, সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাও আর এক বিস্ময়। সর্বাপেক্ষা ছোট যিনি, তাহাপেক্ষা ছোট যিনি, তাহা অপেক্ষাও তিনি ছোট। এই কথা পুরাণাদি সাহিত্যে সর্বত্র আছে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অতি সুন্দর করিয়া অদ্ভুতভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি যখনই বড়রও বড়, তখনই ছোটরও ছোট। একই সঙ্গে তিনি সকলের বড়, সকলের ছোট। ভাগবতী কথায় ইহা শুধু বলেন নাই, লীলার মধ্যে মূর্ত দেখাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে মাটি খাইয়াছেন। বালকগণ ছুটিয়া গিয়া মায়ের কাছে অভিযোগ করিয়াছে — তোমার গোপাল মাটি খাইয়াছে। জননী যশোদা শুনিয়া আসিয়াছেন। মা বাম হস্তে গোপালের দক্ষিণহস্ত ধরিয়া তর্জনী দেখাইয়া বলিতেছেন, “দুষ্টু ছেলে! মাটি খাইলি কেন?” গোপাল মায়ের ভয়ে ভীত হইয়া বলিতেছেন, “না মা! আমি মাটি খাই নাই।” মা বলিতেছেন, “ তোর ভাইরা সবাই বলিতেছে।” গোপাল বলিলেন, “মা, ওরা সবাই মিথ্যা কথা বলিতেছে। আমি মাটি খাই নাই। বিশ্বাস না হয় আমার মুখ দেখ।” গোপাল হাঁ করিলেন, মা গোপালের মুখের মধ্যে তাকাইলেন। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন আশ্চর্য ব্যাপার! গোপালের মুখের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। দেখিলেন অসংখ্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র। বিশ্বের যাহা কিছু আছে সবই দেখিলেন সেই মুখের মধ্যে আবার বৃন্দাবনধাম। যশোদা নিজের বাড়ীও দেখিলেন। নিজের বাড়ীর আঙ্গিনায় মায়ের হাত ধরা গোপাল। মা বলিতেছেন, “বল্, কেন মাটি খাইয়াছিস্?” — ইহাও গোপালের মুখের মধ্যে দেখিলেন। নিখিল অনন্ত বিশ্বের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব। সবই বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর এই যে, মা হাতের মধ্যে গোপালের হাত ধরিয়া রাখিয়াছেন, এই দৃশ্য। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের একই সময়ে

''অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'' দেখাইবার অপূর্ব ভঙ্গি। এখন বিজ্ঞানের ভঙ্গিতে দেখিব।

১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি। পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে। তারপর মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো প্রভৃতি গ্রহে যায়। সব লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। এত বিরাট এই সৌর জগৎ, ভাবিতে বিস্ময় লাগে। সূর্যকে আমরা দেখি একটি থালার মত বস্তুরূপে। ব্রহ্মবস্তু যে কত বড়, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না।

আবার আর এক দিক্ দিয়া দেখি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণু, তাহার অংশ পরমাণু। এখানে বিজ্ঞান বেশ কিছুদিন দাঁড়াইয়াছিল। তারপরে দেখা গেল ঐ পরমাণুর মধ্যেও সৌরজগতের ন্যায় সব বিচিত্র ঘটনা অনবরত ঘটিয়া চলিয়াছে। পরমাণুর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস)-এ আছে প্রোটন (ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট) ও নিউট্রন (আধানহীন)-এর সমষ্টি। আর এই কেন্দ্রের চারিধারে বৃত্তাকার নিজ নিজ অক্ষপথে সৌরজগতের গ্রহগুলির ন্যায় অত্যন্ত বেগে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রনসমূহ ঘুরিতেছে। শুধু ঘুরিতেছে না, মাঝে মধ্যে অত্যন্ত বেগে ছিটকাইয়া তাহাদের কক্ষপথগুলি দ্রুত পরিবর্তন করিতেছে। পরমাণুর মধ্যে এইরূপ খণ্ড প্রলয় হইতে থাকিলে বাহিরে যে অভিব্যক্তি তাহাই তাহার Radio activity বা তেজস্ক্রিয়তা। সারা সৌরজগতে একটি তড়িৎশক্তির প্রবাহ বহাইয়া রাখিয়াছেন সূর্যদেব। তড়িতের প্রবাহ যেন এক বিপুল সেনা অভিযান। ব্যোমকেশ মহাব্যোমে রশ্মিজাল রূপে তাঁহার জটাকলাপই যে শুধু কাঁপাইতেছেন তাহা নহে, তাহার দিব্য অঙ্গের ভস্ম বিভূতিগুলিও দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইতেছেন, তাই এই charged particle গুলির সমান্তরাল প্রবাহ বুঝাইবার জন্য বেদমন্ত্রে ঐ সংক্ষিপ্ত পদ ''তস্য পাংসুরে'' — তাঁহার ধূলিবিশিষ্ট পদে জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছেন। বামনাবতারের কথা আমরা পুরাণে পড়িয়াছি। ইহার মূল রহিয়াছে বেদে। ঋগ্বেদের ১/২২ সূক্তের ১৭ ঋক্ শুনুন — বিষ্ণু ইহা পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধুলিযুক্তপদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল, ইহারই মর্মার্থ বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের atomic structure of radiation বুঝানো ছাড়া আর কি যে 'পাংসুরে' শব্দটি দ্বারা বুঝাইবে তাহা তো খুঁজিয়া পাই না। মনে হয় ঐ পাংসুরে শব্দের ইঙ্গিতে ঋষিরা তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ বা আপ্তবাক্য radiation theory-র কথা আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি আইনস্টাইনের খুব নাম হইয়াছে। তিনি theory করিয়া

ছিলেন যে, শুধু magnetism-এর কেন, gravitation-এরও আলোকরশ্মির উপর প্রভাব আছে। অর্থাৎ কোনও সুদূরবর্তী নক্ষত্রের আলোক যদি সূর্যমণ্ডলের কাছ দিয়া আসে তবে সূর্য তাহাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইবে। সম্প্রতি পরীক্ষায় উক্ত theory যাচাই হইয়া বহাল হইয়াছে।

বেদে রশ্মি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। ঋ. ১/২২ সূক্তের ১৬ ঋকে 'সপ্ত ধামভিঃ' পদ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দ দ্বারা। এই অর্থ যদি ঠিকই হয় তবে প্রশ্ন উঠে — সূর্য সপ্ত ছন্দে পরিক্রম করিতেছেন কিরূপে? তাহার সাতটি কিরণ সাত প্রকার ছন্দোবদ্ধ নৃত্য বা স্পন্দন হইতে সমুৎপন্ন — 'Wave motion is harmonic motion'। প্রত্যেক প্রকার কিরণের জন্য এক প্রকার harmonic motion দরকার। সেইগুলিই এক একটি ছন্দ। ছন্দ মন্ত্রের ছন্দ বটেই, তাছাড়া বর্তমান রূপকে ইহা বুঝাইতেছে harmonic motion. বেদের মধ্যে জড়তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের অনেক গভীর রহস্যই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এক একটি পরমাণুতে যে সকল ইলেকট্রন প্রভৃতি রহিয়াছে বাহির হইতে যদি কোনও প্রকাবে ঐ সকলের কক্ষপথ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায় বা কেন্দ্রটিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র পরমাণুটি হইতে বিরাট শক্তি নির্গত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুকে বিভাজন বা সংশ্লেষণ জনিত যে বিপুল শক্তি উৎপাদিত হইবে তাহা বিশাল বিশাল মহাদেশকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে কত অনন্ত শক্তি নিহিত আছে ইহা যদি শাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখি তাহাই শাস্ত্রের ভাষায়—

"অণোরনীয়ন্ মহত্রে মহীয়ান্ আত্মহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রুতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।"
(কঠ, ১/২/২০)

গীতা ইহাকেই বলিয়াছেন — "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং"।

এখন "পাংসুরে" শব্দটি যে মন্ত্রটিতে আছে সেই মন্ত্রটি আর একটু বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝিতে হইবে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা, মেধাতিথি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সূক্তটির সপ্তদশ মন্ত্রটি এইরূপ—

"ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূল্হমস্য পাংসুরে।।"

অনুবাদ — "বিষ্ণুও এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার

পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধুলিযুক্ত পদে জগৎ ধুলিময় হয়েছিল।"

যাস্ক বলেন —" বিষ্ণুরাদিত্যঃ", সূর্যই বিষ্ণু। তিন পদবিক্ষেপের আধ্যাত্মিক অর্থ করা যায়— জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আধিভৌতিক অর্থ করা যায় সূর্য; তিনি উদয়গিরি, অন্তরিক্ষ ও অস্তগিরি, এই তিন স্থানে পদবিক্ষেপ করেন। এইরূপ হইলে "সমূল্হমস্য পাংসুরে" ইহার অর্থ কি হইবে ? ব্যাখ্যাটি সূর্যকে লইয়াই করিতে হইবে।

সূর্যরশ্মি সম্বন্ধে অনেক রহস্য বৈদিক ঋষিরা জানিতেন। বেদের অনেকস্থানে সূর্যের রথ সাতটি অশ্ব টানিতেছে এইরূপ উক্তি আছে। সূর্যের রশ্মিকে অনেক সময় অশ্ব এই প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। নিউটন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সূর্যের কিরণে সাতটি বর্ণের রশ্মি সম্মিলিত থাকে — Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange ও Red। এই প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর গ্রহণ করিলে এই সাতটি নামকে সংক্ষেপে "VIBGYOR" বলা হয়। প্রিজম্ (Prism)-এর ভিতর দিয়া সূর্যের এই সাতটি রঙ দেখা যায়। রামধনুর মধ্যে এই সাতটি রঙ দেখা যায়।

বর্তমান কালে অনেক বৈজ্ঞানিক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে-কোন অ্যাটমের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত ইলেকট্রনগুলি নৃত্য করে। নৃত্য করিতে করিতে তাহারা ইথার (Ether) সাগর কাঁপাইয়া তুলে।

ইলেকট্রনগুলির কম্পনই আলোকের মূল। দুই প্রকার ইলেকট্রন আছে বদ্ধ ও মুক্ত। ইলেকট্রনগুলি Atom-এর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পাক খাইতেছে। ইহাতে চারিদিকে অসংখ্য রশ্মির জাল উদগীর্ণ হইতেছে। ইহাই আলোকের উৎস। ইহা ছাড়াও অসংখ্য ইলেকট্রন-রশ্মি শূন্যে ইথার-সাগরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সেইগুলি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তাহারা অদৃশ্য অরূপভাবেই থাকিয়া যায়। সূর্যমণ্ডল হইতে এই বদ্ধ ও মুক্ত ইলেকট্রন উভয় কণাগুলিকে Radiation বলে। সারা সৌরজগতে সূর্য একটি তড়িৎশক্তির প্রবাহ বহাইয়া রাখিয়াছেন। মনে হয় বেদ এই ইলেকট্রন-কণাগুলিকে ধুলিকণা বলিতেছেন। বেদমন্ত্রে "অস্য পাংসুরে" অর্থাৎ অসংখ্য ধুলিকণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চরম দৃষ্টিতে যে-বস্তু চৈতন্য, একটু খাটো করিয়া দেখিলে সেই বস্তুই দেশ-কালাবচ্ছিন্ন ধূলিকণা। সুতরাং পার্থক্য কোথায় ?

পুরুষ-প্রকৃতি

পরমব্রহ্ম বস্তু এক, ইহা বেদ নানারকমে জানাইয়াছেন — 'একং সৎ', 'একং তৎ', 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' ইত্যাদি মন্ত্রে। সেই একের মধ্যে অপরিসীম ঐশ্বর্য। কেন জানি তাহা ব্যক্ত না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। একা একা ব্যক্ত হওয়ার কাজটি সম্ভব হয় না। এই ব্যক্ত হওয়ার কাজটির শ্রুতি নাম দিয়াছেন — 'রমণ'। "একাকী নৈব রমতে।" তিনি নিজেকে দুই করিলেন, "দ্বেধা অপাতয়ৎ"। এই দুইকে দার্শনিকেরা নানারকমে দেখিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন — তিনি এক, কখনই দুই হইতে পারেন না। দুই হইবেন কিরূপে? যিনি দ্বিতীয় হইবেন, তিনি যদি সৎ হয়েন, তাহা হইলে দুইটি সৎ স্বীকার করিতে হয়। দুইটি সৎ হইলে অদ্বৈত-দর্শনই ধূলিসাৎ হয়।

যিনি দ্বিতীয় হইবেন, তিনি যদি অসৎ হয়েন, তাহা হইলে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। অসৎ-এর কোন কার্যকারিত্ব থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তিনি সৎ-ও নহেন, অসৎ-ও নহেন, অনির্বচনীয় কিঞ্চিৎ। এই অনির্বচনীয়ের কি কোন নাম নাই? নাম যদি দিতে চাহেন তাহা হইলে একটি নামই আছে — 'মায়া'। বেদ বলিয়াছেন, ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপ হইলেন।

এই মায়ার কাজটি কি? কবির ভাষায় বলি — "ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা।" রৌদ্র ও ছায়া দুইই ক্ষণস্থায়ী। তাহার তুলনায় ধানের ক্ষেতটি একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী। ঠিক ক্ষেতের উপরে রৌদ্র-ছায়া কতরকম লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। যাহারা খেলিতেছে দুইই মিথ্যা। নশ্বর ধানের ক্ষেত্রে কতরকম বিচিত্রতা সৃষ্টি করিতেছে। এই বিচিত্রতায় কাহার লাভ? যে দেখে তাহার লাভ, কবির লাভ।

মায়া-শক্তির আলো-ছায়ার মত দুইটি কার্য: আবরণ ও বিক্ষেপ। সত্যকে ঢাকিয়া রাখার নাম আবরণ, আর মিথ্যাকে দেখানোর নাম বিক্ষেপ। এই আবরণ আর বিক্ষেপের বৈচিত্র্য হইতেছে বিশ্বময়। তাহা নিজেই ভোগ করিতেছেন। যাঁহারা একের সঙ্গী তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে

বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছেন। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গী নহে, তাহারা কোন খবরই রাখে না। তাহারা আবরণ-বিক্ষেপের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে। সৃষ্ট প্রকৃতিকে বৈদান্তিক এমন করিয়াই দেখিতেছেন।

গীতা অন্যরূপ বলেন। যে প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন ভোগ করিবার জন্য বা আত্মপ্রকাশের জন্য, সেই প্রকৃতি দুই প্রকারের: একটি অপরা, একটি পরা। অপরা হইল ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটি।

অপরাশক্তি জড়, কিছু করিবার শক্তি নাই। আর পরাপ্রকৃতি চেতনাময়। এই চেতনার দ্বারা তিনি নিখিল জগৎটিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ''যয়েদং ধার্যতে জগৎ''। কেবল ধরিয়া রাখেন নাই, নানা প্রকারে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন। মালিক তাহা উপভোগ করিতেছেন। ইহার মধ্যে আবরণ-বিক্ষেপের ঢাকা-নাকি কিছু নাই, সবই খোলা। এই বৈচিত্র্যময় জগৎ তাঁহারই ভোগ্য।

সাংখ্যদর্শনকার কপিল মুনি বলিতেছেন যে, কথাটি অর্ধেক বলা হইল। আর অর্ধেক আমি বলি। একটি পরা প্রকৃতি আর একটি চৈতন্যময়ী শক্তি কেমন করিয়া কাজ করিতেছে তাহাই বলি। যে জড়, সে চৈতন্যময় পরা প্রকৃতির কাছে থাকিয়া নিজেকে মনে করে, সে চৈতন্যময়। আর চৈতন্যময় পুরুষ, জড় প্রকৃতির কাছে থাকিয়া মনে করেন, আমি চলচ্ছক্তিহীন, কিছু করিবার শক্তি নাই।

একজন অন্ধ আর একজন খঞ্জ। অন্ধ পথ দেখে না, চলিবে কেমনে? কিন্তু অন্ধের পা আছে। খঞ্জের পা নাই, চলিবে কেমনে? কিন্তু চোখ আছে। অন্ধের কাঁধে খঞ্জ উঠিয়া বসিলে একটি চলার ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্ধের কাঁধে খঞ্জ বসিয়া দুইজনে চলিতেছে। অন্ধ চলিতেছে — খঞ্জ রাস্তা দেখাইতেছে। ইহাই বৈচিত্র্যময় জগৎ। সেইরূপ জড় প্রকৃতি ও চেতন পুরুষের তথাকথিত মিলনে জগতের সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া চলিতেছে। ইহা কপিলদেবের মত।

তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, তাহা নহে। একজন শিব, একজন শক্তি। শক্তি না থাকিলে শিব শব। শিব না থাকিলে শক্তির সৃষ্টি সম্ভব নহে। শক্তির শিবকে চাইই। শক্তি গেলেন শিবের নিকট, কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত ও তপস্যান্তে মিলন হইল। এই মিলন হইতেই সৃষ্টি হইল ভাবী দেবসেনাপতি কুমারের।

পতঞ্জলি কপিলদেবের 'নিরীশ্বর' সাংখ্যকে 'সেশ্বর' করিয়াছেন। এই ঈশ্বরের কথায় পরে আসিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'অন্ধ-খঞ্জ' ন্যায় এর দৃষ্টান্তটি ভুল। দ্রষ্টা পুরুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন প্রকৃতির মধ্যে।

সত্য বলিলে বলা উচিত, দ্রষ্টা বা পুরুষকে স্বরূপে স্থিত হইতে হইবে। দ্রষ্টা পুরুষকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে অসংখ্য চিত্তের বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হইবে। এই নিরোধ করা কার্যটির নাম যোগ। যোগের আটটি অঙ্গ — যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সমাধিস্থ অবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ জ্ঞান উজ্জ্বল হয়। পতঞ্জলির মতে এই ভেদ-জ্ঞানের পারিভাষিক নাম 'বিবেক খ্যাতি'।

অষ্টাঙ্গ যোগের পথটি খুব কঠিন। ইহার ব্যতিরেক ও সহজতর উপায় ঈশ্বরপ্রণিধান। সূত্র— "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা", অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে। ইহা পতঞ্জলির অবদান। প্রণিধান কি করিয়া হয় সংক্ষেপে বলিতেছি, পতঞ্জলির ধ্যানে ঈশ্বর তখন ক্লেশাদি দোষশূন্য বিশেষমাত্র নহেন। তিনি সকলের গুরু, আদি গুরু। তিনি সর্বজ্ঞ, জ্ঞানটি নিরতিশয় (Absolute)। এই গুরুতে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে স্বরূপে স্থিতি। তখন প্রকৃতি কি অবস্থায় থাকেন? পতঞ্জলি পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই। মনে হয়, প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া একত্ব প্রাপ্ত হন। পতঞ্জলি ইহা মানিয়া লইলে বেদান্তদর্শনের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়। সাংখ্যের বহুপুরুষ 'এক' হইল।

তন্ত্রে এই শক্তির তপস্যা অতি কঠিন। শ্রুতি বলেন, পুরুষ তপস্যা করিবেন প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া। এমনভাবে প্রবেশ করিবেন, যেন অণু পরমাণুতে অনুস্যূত হইয়া; তাই সৃষ্টি সংসার চলিতেছে, বহু হইতেছে। বৈষ্ণবেরা বলেন — অত কঠোরতার প্রয়োজন [illegible] প্রয়োজন নাই। গভীর ভালবাসা দ্বারাই সৃষ্টিকার্য হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অবিরাম খুঁজিতে খুঁজিতে ভালবাসা দ্বারা শ্রীরাধার মধ্যে আপনাকে পাইলেন। শ্রীরাধাও খুঁজিতে খুঁজিতে গভীর ভালবাসার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইলেন। গভীর ভালবাসার ফলেই আত্মোৎসর্গ হয়। এইভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া সৃষ্টিসংসার চলিতেছে।

বেদ বিশ্বযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার কথা বলিয়াছেন। ঐ আত্মাহুতি গভীর ভালবাসা দ্বারা হইলে সৃষ্টি সংসার সুন্দরভাবে চলিবে। ইহারই নাম একত্রে যুগলতত্ত্ব। যুগলতত্ত্ব একটিই, দুই হইয়াছেন। যেন এক তৈলে দুইটি শিখা, এক বৃন্তে দুইটি ফুল।

স্বাহা ও স্বধা

"কা দেবতাঃ স্বাহাকৃতয়ঃ? বিশ্বেদেবা ইতি।" (ঐঃ ব্রাঃ, ২/১২) আবার অন্যত্র পাওয়া যায় এই স্বাহাকৃতিরা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, তাঁহাদের মধ্যেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা এবং যজ্ঞের পূর্ণতা। সাধারণতঃস্বাহা অর্থ আবাহন এবং আত্মোৎসর্গ দুইই বুঝায়।

সপ্তশতী চণ্ডীতে ব্রহ্মা ঘুমন্ত বিষ্ণুর স্তবে বলিয়াছেন, "ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা" ইত্যাদি। পাঠ করিলে হঠাৎ মনে হয় স্বাহা ও স্বধা বোধ হয় একার্থক; কিন্তু তাহা নহে। স্বাহার মধ্যে একটি গতি আছে, স্বধার মধ্যে স্থিতি আছে। স্বাহা বলিয়া যে বস্তু দান করি, আপনাকেও দান করি। তবে তিনি তাহা স্বসন্নিধানে লইয়া যান। আর স্বধার মধ্যে একটি স্থিতি আছে। ভগবান্ কোথায় আছেন? নিজ মহিমায়, নিজ স্বরূপে। তিনি স্বধায় স্থিত, তাই স্বধস্থ। এক স্বধায় সকল বিশ্বদেবগণ থাকেন।

নাসদীয় সূক্তে পাই সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সেই এক ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখনও তাঁহার সঙ্গে অবিনাভূত হইয়াছিল স্বধা ও আত্মস্থিতির বীর্য। ইহাই নাসদীয় সূক্তের, 'প্রয়তি' "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ" (ঋ. ১০/১২৯/৫)। ইঁহার দ্বারাই তিনি বিনা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিলেন "আনীদবাতং" তাঁহার আত্মবিসৃষ্টির আধারই হইল এই স্বধা। এই 'স্বধা'ই রূপান্তরিত হইয়াছে সুধায়। সোমের দেবী স্বধা বা দিব্য স্বধার কথাও সংহিতায় আছে। সোমমণ্ডলের শেষের পূর্বের সূক্তটিতে (ঋ. ৯/১১৩/১০) আনন্দ লোকের বর্ণনায় পাই —

"যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।"

অর্থাৎ যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যেখানে স্বধা নামক দেবতার ধাম আছে, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

এই ভাবনা উপনিষদের আত্মরতির স্বগোত্র।

দিবা ও রাত্রি

দিন ও রাত্রি — ইহারা যেন যুগনদ্ধ। দিবস অন্তে রাত্রি এবং রাত্রি অবসানে দিবসের পুনরাগমন। দিন ও রাত্র বিষয়ে আমরা সাধারণতঃ যাহা ভাবি বা লিখি, শাস্ত্র সেইভাবে দেখেন না বা লেখেন না। গীতাশাস্ত্র লিখিয়াছেন যেইভাবে, বেদ তাহা লিখিয়াছেন অন্যভাবে। গীতা কি লিখিয়াছেন তাহা বলিতেছি, পরে বলিব বেদের কথা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি বিখ্যাত মন্ত্র—

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।" ২/৬৯

অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহা রাত্রি-স্বরূপ, তাহাতে সংযমী যোগিপুরুষ জাগ্রত থাকেন। আর সাধারণ মানুষ যেখানে জাগিয়া থাকেন, সংযমী মুনিদের পক্ষে তাহা রাত্রি-স্বরূপ। কথাটির তাৎপর্য হইল, অজ্ঞ-জন সাধারণত আত্মস্বরূপের ভাবনায় নিদ্রিত, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে সদা জাগ্রত। সংযমী মুনি-ঋষিবা সর্বদা আত্মচিন্তায় জাগ্রত, বিষয়ের ব্যাপারে নিদ্রিত। ভোগীব্যক্তি বিষয়ভাবনায় নিরত, আত্মচিন্তায় বিরত। যোগী ব্যক্তিগণ আত্মচিন্তায় নিরত, বিষয়ভোগে বিরত।

শ্রীভগবান্ যোগিপুরুষের জাগতিক বিষয়ে নির্লিপ্ততা আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য পরবর্তী শ্লোকে সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।" ২/৭০

সমুদ্র সদাই জলপূর্ণ। ঐ সমুদ্রে অফুরন্ত জলরাশি বাহির হইতে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র একইরূপ স্থিরভাবে অবস্থিত থাকে, কোনরূপ বিক্ষেপ দেখা যায় না। সেইরূপ সকল বিষয়রাশি যোগযুক্ত সাধকের নিকট আসিলেও তাঁহার চিত্তে বিক্ষেপ জন্মায় না। তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয় না। এইরূপ নির্লিপ্ত ছিলেন রাজর্ষি জনক। তিনি অন্তরে জানিতেন এবং বলিতেন, সমগ্র মিথিলা রাজ্য দগ্ধীভূত হইলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হইবে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, তাঁহার জীবন-নৌকা সংসার-জলের মধ্যে রহিলেও একবিন্দু জল

তাহাতে প্রবেশ করিত না। দিবা ও রাত্রির দৃষ্টান্তে ইহাই শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়।

বেদ-সংহিতায় রাত্রিও এক দেবতা। দশম মণ্ডলের এক শত সাতাইশ সূক্তের ঋষি কুশিক। মন্ত্রের দেবতা রাত্রি। ইহার ছন্দ গায়ত্রী। সূক্তটিতে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রের ভাবানুবাদ এইরূপ— বহুস্থানে বহুদেশে দীপ্তিশালিনী দেবী, রাত্রি দেবী আসিতে আসিতে নক্ষত্ররূপ চক্ষু দ্বারা আমাদিগকে বিশেষভাবে দর্শন করিতেছেন। ইনি অশেষ প্রকার শোভা ধারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য এইরূপ — অমৃতময়ী রাত্রিদেবীর খেলা দেখ। ইনি প্রথমে বিস্তীর্ণ গগন মণ্ডলকে অন্ধকার দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। নীচের তৃণ-গুল্মগুলিকে, তারপর উচ্চে উত্থিত বৃক্ষাদিকে অন্ধকার দ্বারা আবৃত করেন। তারপর আবার চন্দ্রাদি গ্রহ-নক্ষত্রগণের কিরণ দ্বারা এই অন্ধকারকে দূর করেন। অন্ধকার দিয়া বিশ্ব ছাইয়া ফেলেন। আবার উহা দূর করিবার উপায়ও তিনি করেন।

শ্রীনলিনীকান্ত বলেন, "বাহ্যত দেখা যায় রাত্রি যেন দিনের বিপরীত, বিরোধী— বস্তুত তাহা নহ রাত্রি গোপনে ধারণ করে পোষণ করে দিনের আলো। রাত্রি দিনের এক ঘনীভূত মূর্তি —হীরকের গুপ্তরূপ নয় কি অঙ্গার?" (রচনাবলী, পৃ. ২৬০)

ঋ. ৫/৫/৬ মন্ত্রে বসুশ্রুত ঋষি দিবা-রাত্রিকে 'ঋতস্য মাতরা' বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Two mighty mothers of the Truth, fairly fronting us..."।

ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্তের শেষ মন্ত্রটিতে ঋষি রাত্রিকে 'দুহিতর্দিবঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রতি মানুষের মধ্যে দুইটি চেতনা বিদ্যমান — একটি মানুষী চেতনা ও অপরটি দৈবী চেতনা। তাহাদের প্রতীক হইল দিবা ও রাত্র। দিবা হইল আমাদের প্রাকৃত চেতনা। এই চেতনা ধরিয়া রাখিয়াছে আমাদের নানা বিষয়ে, নানা প্রয়োজনে। অত্যুজ্জ্বল দিনের আলো ক্রমে পশ্চিম দিগন্তে যায় বিলীন হইয়া। এই চেতনার কোলে ধীরে ধীরে রাত্রির আগমনে বর্দ্ধিত হয় আমাদের আত্মিক চেতনা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়— "Night and Dawn symbols of the alternation of the divine and human consciousness in us."।

ঋ. ৫/৫/৬ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন— "ঋতস্য মাতরা", দিবা ও রাত্রি দুই মা। প্রাকৃত চেতনা ও আত্মিক চেতনাকে ঋষি দেখিয়াছেন পরিপূরকরূপে। একটিকে অপরটির বিপরীতরূপে দেখেন নাই।

ঈশোপনিষদের মন্ত্রে আছে—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"

— এই জগতে কর্মে লিপ্ত থাকিয়াই শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন। তিনি (পরমেশ্বর) যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে হইবে, লুব্ধ হইয়া নহে, ত্যাগী হইয়া ভোগ করিতে হইবে।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।" (ঈশ, ১)

বেদের দৃষ্টিতে এই ত্যাগ ও ভোগ বিরোধী নহে। গীতার দৃষ্টি হইতে ইহা পৃথক্। আমরা যাহা কিছু ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা দিবসে আহরণ করি, তাহাকে সংকুচিত ও আত্মভূত করি রাত্রে। দিবসের আহার্য পুষ্টিসাধন করে রাত্রে। বাংলাদেশে একটি চলতি কথা আছে — " দিনের খাওয়া পায়। রাতের খাওয়া গায়।।" রাত্রি গোপনে পোষণ করে। দিন ক্লান্তি, শ্রান্তির কাল; রাত্রি বিশ্রাম-প্রশান্তির কাল। রাত্র আত্মনিমগ্নতার কাল। দিনের ঘনীভূত মূর্তি রাত্রি। ঋষির দৃষ্টিতে দেখিতে দুইপ্রকার, কিন্তু অন্তরে তাহারা এক। হীরক ও অঙ্গার বাহিরের দৃষ্টিতে পৃথক্, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এক। (দৃষ্টান্ত বেদমন্ত্র-মঞ্জরীর)

দিবা ও রাত্রি বিষয়ে আর একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Night and Dawn, the eternal and equal sisters, come like weaving women full of gladness, weaving out the weft that is spun, the weft of our perfected works into a shape of sacrifice." (*HMF.* p. 73)।

ওরা যেন দুইজন তাঁতি, দুই বোন আমাদের জীবনযজ্ঞে বয়ন করিয়া চলিয়াছেন আত্মত্যাগ লক্ষ্যে। এঁরা যেন টানা-পোড়েন, বস্ত্র বয়নের মত বার বার আসে যায়। জীবনটি যেন একখানি শুদ্ধ যজ্ঞবস্ত্র।

গৃৎসমদ ঋষি ঋ. ২/৩/৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"তন্তুং ততং সংবয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী।।"

অর্থাৎ, বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সাহায্যার্থে গমনাগমন করেন এবং যজ্ঞের রূপ নির্মাণার্থে পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন।

দ্যাবা-পৃথিবী

দ্যাবা-পৃথিবীকে আদি মিথুন বলা হয়। দ্যাবা-পৃথিবীর উপাসনা প্রাচীন ধর্মে ছিল, এখনও লুপ্ত হয় নাই। মানুষের জন্ম পৃথিবীর বুকে। পৃথিবী সকল মানুষের ধাত্রী। দ্যুলোকের আলো মানুষের প্রাণশক্তির পোষক। দ্যাবা-পৃথিবী হইল মানুষের ধাত্রী ও পোষ্টা। সংহিতার অনেক মন্ত্রে দ্যাবা-পৃথিবীকে সকলের পিতা-মাতা বলা হইয়াছে। দেবতারাও তাঁহাদের পুত্র।

পৃথিবীর আর এক নাম 'ভূ' বা 'ভূমি'। ভূমি বা ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া; যাহাতে সকল কিছু হইতেছে। পৃথিবীর আর এক নাম 'ক্ষিতি'। ক্ষিতি অর্থ নিবাসের স্থান। পৃথিবী শব্দ 'প্রথ্' ধাতু হইতে; 'প্রথ্' অর্থ হইল বিস্তার। এই পৃথিবীকে দেবতা বলা হইয়াছে, ইহার কারণ বোধ হয় — সতত প্রত্যক্ষ পরিব্যাপ্ততা। ঋষির চেতনায় সংক্রামিত হইয়া তাহাকে 'দেবতা' করিয়াছেন। পৃথিবীর বিস্তীর্ণতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের চেতনাও বিপুল হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের শরীরটাই পৃথিবী। এই শরীরের বক্ষঃস্থল যজ্ঞবেদী; হৃদয়ে রহিয়াছেন যজ্ঞাগ্নি। এইভাবের মন্ত্র ঋক্-সংহিতায় দৃষ্ট হয়। এতদ্‌ভিন্ন একটি বিপরীত দৃষ্টিও লক্ষ করা যায়। কোন-কোন ঋষির অনুভূতিতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের দুইটি মেরু — একটি দ্যৌ ও অপরটি পৃথিবী। দ্যুলোক ও ভূলোকের মাঝে অবিরাম চলিতেছে একটি অবসর্পণ ও উৎসর্পণ লীলা। দ্যুলোক হইতে অনন্ত জ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপরে ঝরিয়া পড়ে। দ্যুলোক যেন একটি বৃষ এবং পৃথিবী যেন একটি ধেনু। ধেনু মাতা। মানুষ সব কাম্যবস্তু দোহন করেন পৃথিবী হইতে। মাতার মত পৃথিবী মানুষকে ভরণ করেন।

দ্যুলোকের পিতৃবীর্য বা কল্যাণময় রেত, প্রাণ-উচ্ছলতায় পৃথিবীকে করিতেছেন শতরূপা। দ্যুলোকের অগ্নি, সূর্য ও সোমের ধ্যানময় দীপ্তি পৃথিবীর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রবাহিত হইতেছে। সব কিছু গড়িয়া উঠিতেছে অমলিন হইয়া। তাই দ্যাবা-পৃথিবীর মিলনের কারুণ্য স্রোতোধারা আমাদের উপর নির্ঝরের মত বর্ষিত হইতেছে। এই অনুভবটি ঋষির মনে পরম সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তাই দীর্ঘতমা ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রে বিশ্বের পিতা-মাতারূপে দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তব করিয়াছেন। যথা—

"উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ।
সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ।।"

অনুবাদ— আমি দ্রোহরহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্র দ্বারা জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীর মনও জানিয়াছি। পিতা-মাতা দ্যাবা-পৃথিবী নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিয়া প্রভূত বিস্তার সাধন করিতেছেন।

ঐ দীর্ঘতমা ঋষি ঋ. ১/১৬৪/৩৩ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।"

প্রাচীন গ্রীস দেশে আকাশকে পিতৃরূপে এবং পৃথিবীকে মাতৃরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। আকাশকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'Zeus'। Zeus শব্দটি সংস্কৃতে 'দ্যৌ' হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়

মানুষের দেহে কয়েকটি অঙ্গ জোড়া জোড়া। যেমন, হাত দুইটি, পা দুইটি, কান দুইটি, নিষ্কাশনের দ্বার দুইটি, নাসিকার রন্ধ্র দুইটি। সেইরূপ একাধিক দেবগণও যুগনদ্ধ থাকেন। যুগনদ্ধ দেবতার মধ্যে কয়েকজন দেবতা যুগলভাবেই সর্বদা বিরাজ করেন; যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আবার মিত্রাবরুণ, অগ্নিযোম ইঁহারা যুগলিতও থাকেন, পৃথক্‌ও চলেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কথা আমরা আলোচনা করিব। যাস্ক নিরুক্তে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ''তৎ কৌ অশ্বিনৌ? দ্যাবাপৃথিবী ইত্যেকে, সূর্যাচন্দ্রমসৌ ইত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ।'' যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায় — অর্ধরাত্রির পর প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলো অন্ধকার বিজড়িত থাকে, তাঁহারাই অশ্বিদ্বয়। অশ্বিনৌ—অশ্বযুক্ত বা আলোকযুক্ত। দুজন কেন? যাস্ক বলেন— একজন তমোভাগের অশ্বিন্, একজন জ্যোতির্ভাগের অশ্বিন। একজন অন্ধকারের মধ্যেই আলো লইয়া যাত্রা করেন। মনে করুন রাত্র ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত। তারপর অন্ধকার একটু পাতলা হইলে আকাশকে ক্রমে ক্রমে আলোকিত করিতে করিতে আসেন আর একজন, রাত্র ৩টা হইতে উষাকাল পর্যন্ত। অশ্বিদ্বয় আলো লইয়া পৌঁছান উষার পাদমূল পর্যন্ত।

বৈদিক চিন্তায় ভাবনার বিষয় অনেক। তন্মধ্যে চেতনার উত্তরণ একটি বিশেষ বিষয়। এই আত্মিক উত্তরণের সঙ্গে অন্ধকারের আবরণ সরাইয়া মধ্যগগনে সূর্যের পৌঁছানো পর্যন্ত আলোর যাত্রার একটি অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। এই আলোর অভিযানের সাতটি পর্ব : অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উষা, সবিতা, ভগ, সূর্য, পূষা ও শিরোপরি বিষ্ণু।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথমপর্বে অন্ধকারের মধ্য দিয়া অদৃশ্য একটি আলো যেন ছুটিয়া আসিতেছে, এইরূপ মনে হয়। এই স্থানে কুমারদ্বয়ের দুইজনের দুইরকম কার্য, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। একজনের কাজ তমোহরণ, আর একজনের কাজ আলোর সম্ভাষণ। এই দুইটি কাজ তাঁহারা নিত্যকালই করিতেছেন।

এই দুই কার্য-সাদৃশ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বর্গের দেবগণের ভিষক্ বা

চিকিৎসক বলা হয়। একজন ব্যাধি দূর করেন, আর একজন সুস্থতা সম্পাদন করেন। বেদে দেব শব্দ আলোবাচক। দেব বলিতে দীপ্তিমান্ বুঝায়। সে আলো যখন ঢাকা পড়ে অন্ধকারে তখন সে অসুস্থ অস্বস্থ। দেবতাদের সুস্থ করিতে আগাইয়া আসেন দুইভাই অশ্বিদ্বয়। "দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপেক্ষিতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাম্ ভেষজৌ ইতি শ্রুতেঃ" — সায়ণ।

আমাদের দেহে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একটি অধিষ্ঠান আছে। ইহারা নাসিকার দুইটি ছিদ্র। ইহা দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শ্বাস-প্রশ্বাস বহে। যোগিগণ দেহের কোন ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবন করেন না। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা দেহ সুস্থ করেন। অশ্বিনীদ্বয় কেবল দেবলোকের চিকিৎসক নহেন — প্রাণায়াম-পরায়ণ সাধক-যোগীদেরও উত্তম চিকিৎসক। ইঁহারা সর্বদাই যুগনদ্ধ।

পুরাণে অশ্বিনীকুমার-যুগল স্বর্গের বৈদ্য। তাঁহারা দেহ হইতে ব্যাধি, জরা, অক্ষমতা ও দুর্বলতা দূর করেন। তাঁহাদের উদ্দেশে অন্তত ৫০টি স্তব বা সূক্ত আছে। ইঁহারা মধুবিদ্যা-বিশারদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার কথা আছে।

'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু", এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু; তেমনি সর্বভূতও আবার এই পৃথিবীর মধু —ইত্যাদি (বৃহঃ উপঃ, ২/৫/১)। ইহাতে জানা গেল অশ্বিদ্বয় অমৃতত্বের দেবতা। তাঁহাদের কর্ম প্রাণে অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দুই ভাই সূর্যের যমজ পুত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। সর্বত্র যুগলরূপেই বিরাজ করেন। ইঁহারা দেহেরও চিকিৎসক মনেরও চিকিৎসক। একজন দিতেছেন জ্ঞান, আর একজন কর্মশক্তি। ইঁহারা একজন দেন আঁধারকে ঠেলিয়া, আর একজন আনেন আলোকে টানিয়া। উষার আগমনের আগে ইঁহারা দুইজনে আসেন আঁধার ঠেলিয়া দিয়া আলোকে নিকটে টানিয়া আনিতে । তাই বলিয়াছি, ইঁহারা দেহ মন উভয়েরই চিকিৎসক। এই কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে। বেদে আছে, অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞ যিনি উষার আগমনের পূর্বে সম্পন্ন করেন তিনি যজ্ঞ-ফলভাগী হন। অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞ হয় মধ্যরাত্রির পরে এবং উষার আগমনের পূর্বে। ঋগ্বেদের ১/১১৬ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসা-বিদ্যার কথা অনেক আছে। বিশ্‌পলার একটি পা যুদ্ধে ছিন্ন হইলে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে লৌহময় জঙঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন। জীর্ণাঙ্গ চ্যবন ঋষি পুত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় চ্যবন ঋষির জরা দূর করিয়া পুনরায় যৌবন দান করিয়াছিলেন। ঋষি কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগবশতঃ দুর্ভগা ছিলেন। কিন্তু ঋষিকন্যা ঋষিত্ব লাভ

করিয়া দুইটি সূক্তের (ঋ. ১০/৩৯ এবং ঋ. ১০/৪০) দ্রষ্ট্রী হন।

অশ্বিদ্বয় দেবতা, ঘোষা নাম্নী নারী ঋষি; এই দুইটি সূক্ত দ্বারা তিনি অশ্বিনীকুমারদের স্তুতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া ঘোষাকে জরারহিত, রোগরহিত, সুভগা ও পুত্রবতী করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত কতিপয় ঋকে ঘোষিত আছে।

এই দেবতা যুগল সর্বাভীষ্টবর্ষী — সকল অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁহারা জগৎত্রাতা, দুঃখত্রাতা, ভয়ত্রাতা, রোগ শোক প্রভৃতি সকল আর্তি দূর করেন। তাঁহারা নিপুণ চিকিৎসক। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল ব্যাধি তাঁহারা আরোগ্য করিতে পারেন। কেবলমাত্র পৃথিবীতে নহে, দ্যুলোক অন্তরিক্ষলোকেও তাঁহারা দুঃস্থের সাহায্যার্থে যান। তাঁহারা দূরে দূরে যান সূর্যের আলোকে ভর করিয়া। তাঁহারা সূর্যপুত্রই, তাঁহারা যজ্ঞে হব্য কিছু চাহেন না, তাই সূক্তগুলিতে দেখা যায় ইঁহাদের হবি প্রদানের বাহুল্য নাই। তাঁহারা দুই ভাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক — এই ত্রিতাপের বৈদ্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—ইঁহারা 'Lords of the human Journey' — জীবনযাত্রার পুরোধা দেবতা। ইঁহারা দুজনে 'Lustrous coursers of Truth', আলোক রশ্মির অগ্রদূত। (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ২৯) "তাঁরা সত্যের ঋতের জ্ঞানময় ক্রিয়াশক্তি। আধ্যাত্মিক চেতনার আত্ম-জাগরণের উষালগ্ন নিয়ে আসেন তাঁরা। (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ৩০)

ঋ. ৪/৪৫/৪ মন্ত্রে বামদেব ঋষি অশ্বিদ্বয়কে অস্রিধঃ হিরণ্যপর্ণা ও মধুমন্তঃ বলিয়াছেন। অস্রিধঃ অর্থ অপ্রতিরোধ্য (unassailable)। হিরণ্যপর্ণা অর্থ — সোনার পাখা মেলিয়া যিনি ঊর্ধ্বে উড়িয়া চলেন। মধুমন্তঃ অর্থ — মধুধারা বর্ষণকারী। এই অশ্বিযুগল কে? এই বিষয় নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "কেহ কেহ বলেন অশ্বিযুগল দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রতীক। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণ।" (বেদের পরিচয়, পৃ. ১১৭)

অগ্নিষোম

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে সোম ও অগ্নি বিষয়ে পরপর দুইটি মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে। যথা—

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।। ১৫/১৩-১৪

— আমি সোমরূপে (চন্দ্ররূপা হইয়া) ওষধিগণের পরিপুষ্টি সাধন করি। আর বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে অন্নাদি পরিপাক করি। অগ্নি পরিপাক করেন অর্থাৎ পরিণতির দিকে লইয়া যান। একটি বীজ অঙ্কুরোদগম হইলে বুঝি পরিণতি প্রাপ্ত হইল। অঙ্কুরটি পরিণত হইলে বৃক্ষের উদগম হয়, তখন অঙ্কুরটি বিদায় লয়। গাছটি যদি ওষধি হয়, তাহা হইলে প্রচুর শস্যের জন্ম দেয় এবং শস্য পরিণতি প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষগুলি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। এই পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া অগ্নির কাজ। আর নূতনের জন্ম দিয়া পরিপুষ্ট করা সোমের কাজ।

অগ্নি করেন পরিপাক, সোম সাধন করেন পুষ্টি। এইরূপে অগ্নি-সোমের পরিপাক ও পরিপুষ্টি কার্য বিশ্ব জুড়িয়া নিরন্তর চলিতেছে। ভুক্ত দ্রব্য চতুর্বিধ— চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়। এই চতুর্বিধ খাদ্য উদরস্থ হইয়া রসে পরিণত হয়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র— এই প্রতিটি পরিবর্তনের হেতুমূলে অগ্নি-সোমের ক্রিয়া চলিতেছে যুগপৎ। মাতৃকুক্ষিতে পৌঁছাইয়া অগ্নি-সোমের যুগপৎ ক্রিয়ার ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই অগ্নি-সোমের কার্য চলিতেছে নিরবধি। ইহাদের যুগনদ্ধ কর্মের ফলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটিত হইতেছে। এই হেতু পৃথিবীকে অগ্নি-সোমাত্মক বলা হইয়া থাকে।

আর এক দৃষ্টিকোণ হইতেও অগ্নি-সোম যুগনদ্ধ। অগ্নি ঊর্ধ্বশিখ, সদাই ঊর্ধ্বমুখী প্রধাবন অগ্নির। অগ্নি আমাদের সাধনাকে ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। কেবল সাধনায়ও সেই পরমাত্মা লভ্য হয়েন না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" (কঠ, ১/২/২৩) তাঁহাকে লাভ করিতে তাঁহার করুণার অপেক্ষা আছে — "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" যাঁহার প্রতি ইনি কৃপা করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করেন। সোম যেন সেই কৃপা, ঊর্ধ্ব হইতে কৃপারূপে সাধকের প্রতি বর্ষিত হন। সাধকের সাধনার ঊর্ধ্বগতি ও করুণাশক্তির কৃপাবতরণ যুগপৎ চলিতে থাকে। এই দু'য়ের মিলনে ঘটে সাধনার চরিতার্থতা বা পূর্ণপ্রাপ্তি।

ঋষিরা বহুবিধ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন অগ্নি-সোমকে। পাণ্ডবদের বনবাসকালে একদিন অগ্নিহোত্রী এক ব্রাহ্মণের অরণি ও মন্থদণ্ড হরিণের শিঙে আটকাইয়া হরিণের সহিত বনে হারাইয়া যায়। ব্রাহ্মণের অনুরোধে পাণ্ডবগণ পাঁচ ভ্রাতাই হরিণের সন্ধানে বন হইতে বনান্তরে খুঁজিতে খুঁজিতে খুব তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠির জলের সন্ধানে পাঠাইলেন নকুলকে। তিনি আর ফিরিলেন না। পরপর সহদেব, অর্জুন ও ভীমকে পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই ফিরিল না দেখিয়া যুধিষ্ঠির জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চার ভাই-ই জলাশয়ের তীরে মৃত পড়িয়া আছে। যুধিষ্ঠির জল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে গম্ভীর স্বরে বকরূপী এক যক্ষ বলিলেন ,"আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল পান কর। অন্যথায় তোমার ভ্রাতৃগণের দশা তুমিও প্রাপ্ত হইবে।"

যক্ষের প্রধান চারিটি প্রশ্নের মধ্যে একটি একটি — "কা চ বার্তা?" বার্তা কি?

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন —

"অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।।

(মহাভারত, বন, ৩১৩/১১৮)

—এই মহামোহরূপ কটাহে মহাকাল প্রাণীসমূহকে পাক করিতেছেন; সূর্য তাহার অগ্নি, রাত্রি-দিন ইন্ধন এবং মাস-ঋতু তাহার আলোড়নের দর্বী (হাতা) —এই হইল বার্তা।

মাস ও ঋতুর গমনাগমনে, রাত্রি ও দিনের ক্রমিক সঞ্চরণে, সূর্যের আবর্তনে নিরন্তর নিখিল ভূতবর্গের পাক অর্থাৎ পরিণাম বা রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে কালের কর্তৃত্বে। সূর্যাগ্নি কি? বেদসংহিতা মতে অগ্নির তিনটি রূপ। যথা, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ এবং দ্যুলোকে সূর্য। সূর্যাগ্নি দ্বারা পাক হইতেছে অর্থাৎ অগ্নি দেবতা পাক করিতেছেন। অগ্নির ক্রিয়ায় দগ্ধ হইবার কথা। কিন্তু সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় না কেন? কারণ, সকল বস্তু অগ্নি পোড়াইতে পারে না। অগ্নি পোড়াইতে ও

রূপান্তর ঘটাইতে পারে পরিদৃশ্যমান জাগতিক সকল বস্তুর। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে যিনি ধ্বংসরহিত, অনন্ত পরিবর্তনের মধ্যে যিনি অপরিবর্তনীয়, জগতের অন্তহীন চঞ্চলতার মধ্যে যিনি অচঞ্চল, জগদ্‌ব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে যিনি অমৃতরূপে বিদ্যমান, তিনি সর্বগত সর্বব্যাপী হইয়াও অগ্নির স্পর্শাতীত, তিনি নিত্য, সর্বত্র ও সর্বকালে বিদ্যমান, স্থির ও অচঞ্চল (নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ" — গীতা, ২/২৪)। আমরা মনে করি সেই অদাহ্য বস্তুই সোম।

সেই অপরিণামী, নিত্য, অবিনাশী সত্তা এই জগৎ ও আমাদের অন্তর-বাহির পূর্ণ করিয়া আছেন। তিনি আছেন বলিয়া, ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হই না। বেদের রহস্যময় ভাষায় ইনিই লক্ষিত হইয়াছেন সোম নামে। আমরা যথার্থই বলিতে পারি, জগদ্‌ব্যাপী নিরন্তর চলিতেছে এই অগ্নি ও সোমের কার্য। আমাদের দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য জরা নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে। আবার ইহার (দেহের) মধ্যে যে আত্মা তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে না। দেহের শত পরিবর্তনেও আত্মা অবিকৃত। এই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না বা অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না —

" নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" (গীতা, ২/২৩)

এই অবিকৃত আত্মার স্বকীয় গতি ঊর্ধ্বমুখী, এই গতি ত্বরান্বিত করাই সাধনার লক্ষ্য। উহাকেই যোগ কহে। যোগস্থ হইয়া কর্ম করাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত এবং ঐ কর্ম ফলাকাঙ্‌ক্ষাশূন্য হইয়া করাই শ্রীভগবানের নির্দেশ —

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" (গীতা, ২/৪৮)

তখন সাধক দুঃখময় জন্মরূপ বন্ধন বা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর ক্লেশশূন্য পরমপদলাভে ধন্য হন—

"জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।" (গীতা, ২/৫১)

এই ঊর্ধ্বগতি মুখে চলিতে চলিতে নানা ফললাভের আশায় বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকের মনোবুদ্ধি স্থির, নিশ্চল হইয়া সমাধিস্থ বা যোগযুক্ত হইবে। নিত্য নিরঞ্জন চিদ্‌ঘন বস্তু সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এ মিলিত হইবেন এবং সেই মহামিলনের তটে সাধনার যাত্রার পরিসমাপ্তি।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।" (গীতা, ২/৫৩)

তখন তিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট (আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ), দুঃখসমূহে উদ্বেগশূন্য চিত্ত, সুখসমূহে স্পৃহাশূন্য, আসক্তি-ভয়-ক্রোধ রহিত পরমপদ লাভ করেন।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।" (গীতা, ২/৫৬)

যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহার সঙ্গে মিলনে তিনি পরমপ্রসন্নতা-লাভে (ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা) কৃতার্থ হন।

আমাদের অস্থিরতায় দগ্ধ করিয়া এবং অচঞ্চল শান্ত পরমপদ দান করতঃ অগ্নি-সোম যুগ্মভাবে নিরন্তর কার্য করিতেছেন। অগ্নি-সোমের কথা বেদে সুবিস্তৃত। এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বিশ্ব-জগৎকে অগ্নিষোমীয় বলা হইয়াছে। ইহার কয়েকটি হেতু বলা হইল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে।

মিত্রাবরুণ

বরুণ ও মিত্র ঠিক যুগ্ম বা যুগনদ্ধ নহেন, তবে যুগনদ্ধের মত। পৃথক্ পৃথক্ ইঁহাদের দুইজনের অনেক মন্ত্র আছে। বেদ-সংহিতায় ইঁহারা অনেক সময় দুইজন একই মন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন। বরুণ বৃহতের দেবতা আর মিত্র ঋত ও ছন্দের দেবতা। বৃহতের মধ্যে ছন্দ বা order অবশ্যই চাই। এইজন্যই ইঁহারা (দুইজনে) যুগ্ম দেবতা। ইঁহারা দুইজন যেন সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্য ও সম্মিলনে যে ধর্ম তাহার নামই মিত্র। নিরুক্ত বরুণের পরিচয়ে বলিয়াছেন— "বরুণো বৃণোতীতি সতঃ"। বরুণ সব কিছুকে ছাইয়া আছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ফুরাইয়া যান নাই। বরুণ রহস্যময় সমুদ্র। সমুদ্র একটি নহে। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, অন্তরিক্ষে প্রাণের সমুদ্র, আর দ্যুলোকে আলোর সমুদ্র, এক রহস্যময় তুরীয় সমুদ্র অব্যক্ত আনন্দের সমুদ্র। বরুণ পরম শূন্যতা। বরুণ অত্যন্ত আপন হইলেও আমরা নাগাল পাই না। মিত্র হইতেছেন বরুণের মাধুর্য। এই মাধুর্য আছে বলিয়াই বরুণকে আমরা আপনজন করিতে পারি। এই জন্যই মিত্র ও বরুণ যুগ্মদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি ঋ. ৩/৫৯/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবানো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।।" ১

অনুবাদ— মিত্র স্তুত হইয়া লোক সকলকে কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন। মিত্র অনিমেষ নেত্রে পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। মিত্র অনিমেষনেত্রে লোকসকলের দিকে চাহিয়া আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর। বরুণ দেবতার মহিমা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই অত্যন্ত প্রশংসার সহিত কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন — "Varun is the most moral god of the Vedas, He watches over the world, punishes the evildoers and forgives the sins of those who implore his pardon. The sun is his eye, the sky is his garment and the storm is his breath. Rivers flow by his command; the sun shines, the star and the moon are in their courses for

fear of him. By his law heaven and earth are held apart. He upholds the physical and the moral order. He is no capricious god, but a "dhrtavrata", (ধৃতব্রত) one of fixed resolve. Other gods obey his orders. He is omniscient, and as such knows the flight of the birds in the sky, the path of the ships on the ocean and the course of the wind. Not a sparrow can fall without his knowledge. He is the supreme God, the God of gods, harsh to the guilty and gracious to the penitent." (Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. I, p. 77)

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের যে এত মহিমা তাহার বড় কারণ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বসিষ্ঠ ঋষি। সেইরূপ বরুণের এত মহিমা, তাহার কারণ মিত্র দেবতা তাঁহার সহিত সকল সময় নিত্য বিরাজিত আছেন। মিত্রের কাজ হইল ঋত। "ঋত stands for law in general and the immanence of justice". Professor Macdonell says that, "Varuna's character resembles that of the divine ruler in a monotheistic belief of an exalted type." (*Indian Philosophy*, Vol. I, p.78)"। ইহার মূল কারণ হইল মিত্র ও বরুণের যুগনদ্ধতা।

গুণ ও কর্মের দিক্ হইতে মিত্র ও বরুণের সাদৃশ্য অনেক। বেদ সংহিতায় মিত্রাবরুণরূপে যে সাযুজ্য ও সামীপ্য তাহাতে ইঁহাদের পৃথক্ কল্পনা করা যায় না।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি, "অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণা।" আচার্য সায়ণও মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মরণার্থক মী ধাতু এবং ত্রাণার্থক ত্রৈ ধাতু হইতে মিত্র অর্থাৎ মৃত্যু হইতে যিনি ত্রাণ করেন। 'বরুণো বৃণোতীতি সতঃ" (নিঃ ১০/৩), "বৃঞ্ বরণে, বৃঞ্ আবরণে।" "কৃ-বৃদাদিভ্য উণন্"—বরুণ (দীক্ষিত)। মিত্র স্বর্গস্থ জল দ্বারা স্নিগ্ধ করেন, এই জন্য মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা। এইজন্য বরুণের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা।

মিত্র ও বরুণের সহাবস্থান হেতু বরুণকে মনে হয় বর্ষার আদিত্য। ইনি আকাশ মেঘে আবৃত করেন। মিত্র হেমন্তে শস্য পরিপুষ্ট করিয়া সকল লোককে মরণ হইতে ত্রাণ করেন, এই জন্য মিত্র। মিত্র বস্তুতঃ সূর্যেরই এক নাম। মিত্র বৃষ্টিরও দেবতা। এ বিষয় তিনি ইন্দ্র, বরুণ ও সূর্যের সঙ্গে সমান ধর্মী।

এই মিত্র দেবতা পারসিকদের মিথ্র দেবতার সঙ্গে অভিন্ন। বেদে যিনি মিত্র, অবেস্তায় তিনি মিথ্র। আমরা বরুণ দেবতার কথা মনে রাখিয়াছি, কিন্তু মিত্রকে ভুলিয়া গিয়াছি। পারসিক ধর্মে মিথ্র-বরুণের স্থান অতি উচ্চে। মিত্র মানবের প্রতি করুণাময়, মানবের ত্রাণকর্তা (Saviour)। অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া বলিতেছি, বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থে শ্রীরাধারাণী কর্তৃক সূর্যপূজার বর্ণনা আছে তিনি মিত্রপূজা করিয়াছেন। সূর্য ও মিত্র একই। মিত্র শব্দের অর্থ বন্ধু। শ্রীরাধা সুসজ্জিতা ও সখাগণ-পরিবৃতা হইয়া চলিয়াছেন। শাশুড়ী ননদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন — "বধূ, কোথায় যাইবে?" শ্রীরাধা বলিলেন, "মিত্রপূজায় যাইতেছি"। তাঁহারা বুঝিলেন— বধূ সূর্যপূজায় যাইতেছে। সেইকালে গৃহস্থের কল্যাণের জন্য নিত্য সূর্যপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। মিত্র শব্দের আড়ালে প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। মিথ্যা না বলিয়াও শাশুড়ীকে ফাঁকি বিধানের বিশেষ সুবিধা হয় দেখা যায়।

সূর্য ও বরুণের মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য। সূর্য দিনের দেবতা ও বরুণ রাত্রের দেবতা। সূর্যের সঙ্গে বরুণের মিত্রতা এই জন্য।

মিত্র ও বরুণ উভয়ে সত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার রক্ষক বলিয়া পূজিত। তাঁহারা উভয়েই ন্যায় বিচারক। মিত্র উপাসনা পারস্যের মধ্য দিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রোম ইংলণ্ডে মিত্র দেবতার পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। ব্রিটেনে পাঁচটি মিত্র দেবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টপূজার তুলনায় মিত্রপূজার প্রসার ছিল অধিক্। সম্রাট্ কন্স্টান্টাইন্ প্রথমে মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন। পরে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাট্‌গণ আইনের বলে ও দৈহিক ক্ষমতার জোরে মিত্র পূজা বন্ধ করিয়া দেন। পূজা বন্ধ করিলেও খ্রীষ্ট ধর্মমত মিত্রপূজার বহুবিধ অনুষ্ঠান আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন — "ফিলাডেলফিয়া শহরের অধ্যাপক Groten, Christian Eucharist সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিত্রপূজার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন— "We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then west-ward through Gaul across the channel into the land of the Briton."

মিত্রপূজায় খৃষ্টানদের eucharistic অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান

ছিল। পারসিক ধর্মমতে রুটি ও সোমরস উৎসর্গ করিতেন। মিত্রপূজায় অনুরূপ ছিল, খৃষ্টের উক্তি " I am the Bread of life" —আমি প্রাণের অন্নস্বরূপ। "He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in me and am in him" — "যে আমার মাংস ভক্ষণ করে এবং আমার রক্তপান করে, সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাতে অবস্থিত হই—উভয়ের একতা সম্পাদিত হয়।" অধ্যাপক ত্রিবেদী মহাশয় বৈদিকধারায় অনুরূপ সাদৃশ্য দেখিয়াছেন। সেখানে পুরোডাশ বা রুটি ও সোমরস দেওয়া হইত। সোমরস অমরত্ব দান করিত। (অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা' গ্রন্থ)

প্রবন্ধের বিষয় অধিক বিস্তার না করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি, মিত্রাবরুণের পূজা দেশের সীমা অতিক্রম করত বহুদেশে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

দিতি অদিতি

পুরাণে পাই, প্রজাপতি কশ্যপের দুই পত্নী— অদিতি ও দিতি। দিতি শব্দ দো ধাতু + তি (ক্তিন্) করিয়া হয়। দিতি অর্থ — খণ্ডন, ছেদন, বিভাগ। দিতিজাত দৈত্য। অথর্ববেদে সায়ণ দিতি শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অসুরমাতা'। অদিতি অর্থ অখণ্ড, অবিভক্ত, পূর্ণ। অথর্ববেদ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় দিতি শব্দ এবং অদিতি শব্দ পাশাপাশি আছে।

দৈত্য শব্দ বেদে পাওয়া যায় না। গীতা ও উপনিষদে দৈত্য শব্দ আছে। বেদে অদিতি শব্দ বেশ কয়েকবার দৃষ্ট হয়। বৈদিক অর্থে অদিতি হইলেন অখণ্ড বা সমগ্রতার প্রতীক। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ এক অখণ্ড সত্তা বা বস্তু। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর যোগাযোগ আছে, একথা বিজ্ঞানসম্মত। বস্তুত খণ্ড বলিয়া কিছু নাই। খণ্ডতা আমাদের সৃষ্টি। খণ্ডিত দৃষ্টিহেতু অর্থাৎ সংকীর্ণ দৃষ্টিতেই সব পৃথক্ দেখায়। সমগ্র বস্তু খণ্ড খণ্ড করাই মনের কার্য। আবার মনঃসংযোগ না ঘটিলে কোন ইন্দ্রিয় কাজ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড বস্তু, ইহা বুঝিতে মনের লয় অপরিহার্য এবং সাধনার লক্ষ্য ইহাই।

ধরুন, বিরাট মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এক অখণ্ড মাত্রাহীন, সীমাহীন অনুভূতি জাগিতেছে অন্তরে। সীমাহীন আকাশ, বাধাহীন বাতাস। এই অসীম অনুভবের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা জাগিল অন্তরে। কিছুটা স্থান প্রাচীর তুলিয়া নিজস্ব করিয়া লইলাম, গৃহাদি নির্মাণ করিলাম বসবাসের জন্য। অখণ্ডকে খণ্ড করিলাম নিজ প্রয়োজনে। দেখিতে দেখিতে আর দশ খানি গৃহ তৈয়ার হইল আসে পাশে। আপনি ঘর বানাইয়াছেন আমার দেওয়াল ঘেঁসিয়া। আপনার বাড়ীর হৈ হট্টগোলে আমার শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে। এইভাবে শুরু হইল ঝগড়া-ঝাটি, অশান্তি দ্বন্দ্ব। ইহাই প্রতিবেশীপূর্ণ সংসারের চিত্র। অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া লওয়াই অশান্তির কারণ। এই খণ্ডতা পৃথক্ত্ব সৃষ্টি করে আমাদের মন। যতক্ষণ আমাদের মন কাজ করিতেছে, মনের অমিলহেতু রচিত হয় না কোন মিলনসেতু। মনের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে এই অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কিছু নাই। মনের ঊর্ধ্বে যে অতিমানস ভূমি, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়

'Overmind' বা 'Supermind' — সেখানে উঠিতে না পারিলে মনের অশান্তি দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটিতে চাহে না। অতিমানস সত্তার অনুভবের ভূমিতে উঠিলেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান।

"Our object is the supramental realisation and we have to do whatever is necessary for that or towards that under the conditions of each stage"....... "The first step is a quiet mind, silence is a further step, but quietude must be there; and by a quiet mind I mean a mental consciousness within"....... "Only on the quiet mind and being can the supramental Truth build its true creation." (*Bases of Yoga*, Sri Aurobindo)

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকল মানবের প্রধাবন খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে অখণ্ড ও পূর্ণতার প্রতি। সকল মানবের সাধনা এইজন্যই। নিম্ন ভোগ ভূমি হইতে দিব্য আনন্দের ভূমিতে উর্ধ্বগতি। এখানে উঠিবার কোন লৌকিক সিঁড়ি নাই। বিষয়-আশয়, দেহ-ইন্দ্রিয়ের সুখ, নাম-যশের মোহ হইতে নিত্য শুদ্ধ শান্তি-আনন্দময় অধ্যাত্মধামে গমন, মানস-উত্তরণের মাধ্যমে। পণ্ডিচেরীর মা বলেন — "The higher perfection is the spiritual perfection, integral union with the Divine, identification with the Divine, freedom from all the limitations of the lower world." (*The Supramental Manifestation, The Mother's Talks*)

মানসভূমির দুই ভাগ — একটি নিম্নভূমি আর অপরটি উর্ধ্বভূমি। একটি নিম্ন ভোগভূমি এবং অপরটি উচ্চ অধ্যাত্মভূমি। আমরা সকলে একই আকাশতলে বাস করি, একই বাতাস গ্রহণ করি। কিন্তু কেহ আপন স্বার্থ (Own interest)-এ অন্ধ হইয়া খণ্ড তমোময় আঁধারে ঘুরিয়া মরিতেছি। আবার কেউ আপন স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া উর্ধ্বে অখণ্ড অধ্যাত্ম রাজ্যে বিচরণের প্রয়াসী হইয়াছি। পৃথক্ বুদ্ধি ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অবিদ্যাচ্ছন্ন নিম্নযোনিতে বদ্ধ; ইহার বাস্তব সত্তা নাই। ইহা অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের কার্য। 'আমার আমার' বুদ্ধি ইহা আমারই সৃষ্টি, আমার ভ্রমাত্মক মনের কার্য। অধ্যাত্মসাধনার পন্থা অবলম্বনে মানুষ যখন ইহার উর্ধ্বে উঠে, তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ঐ পৃথক্ত্ব ভেদবুদ্ধি সত্য নহে, উহা অবাস্তব ও কৃত্রিম। এই অবাস্তব অবস্থাটি যতদিন সত্য বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন আমরা আছি দিতির রাজ্যে। বাস্তব বস্তু কি? শ্রীমদ্ভাগবত তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন গ্রন্থের ১/১/২ শ্লোকে —

'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু' — বাস্তব বস্তুই একমাত্র বেদ্য।

এই বাস্তব বস্তুই শিব বা কল্যাণ আনয়ন করে, তাপত্রয় উন্মূলন করে।

"বেদ্যং বাস্তবম্ অত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

— যাহা নিত্য, সত্য, চিরন্তন, তাহা কখনই অবাস্তব বলিয়া ভাবা যায় না। ঈশ্বরারাধনরূপ পরমধর্মই একমাত্র বাস্তব। ঈশ্বর হইতেও ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়রূপ ধর্ম জীবের পক্ষে অধিকতর বাস্তব। কারণ ঐ উপায় ছাড়া তো ঈশ্বরপ্রাপ্তির আর পথ নাই (নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়)।

ইহাই বাস্তব-অবাস্তব, অখণ্ড-খণ্ডের রহস্য। বেদে একটি মন্ত্র আছে—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।"
(ঋ. ১/৮৯/১০; অথর্ব, ৭/৬/১)

মন্ত্রটির অর্থ — দেবমাতা অদিতি (অথবা অখণ্ডনীয়া পৃথিবী), দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক, তিনিই জগতের জননী, তিনিই উৎপাদক পিতা ও তিনিই পুত্র। তিনি সকল দেবগণ, তিনি নিষাদাদি পঞ্চজন (অথবা গন্ধর্বাদি পঞ্চজন), জাত ও জনিষ্যমান যা কিছু সবই অদিতি। (এখানে সকল জগদাত্মরূপে অদিতির বিভূতি বলা হইয়াছে।)

ঋষির অনুভবে অদিতি এক অখণ্ড সত্তারূপে প্রতিভাত। পৃথিবী দ্যুলোক অন্তরিক্ষ, পিতা-মাতা-পুত্র, সকল দেবগণ, জাত-অজাত সকলই অদিতি। সকল ভাবনা দর্শন চরমতাপ্রাপ্ত যে অখণ্ডসত্তায় তিনি অদিতি। অদিতি বিশ্বাত্মা। বেদ যে ব্রহ্মস্বরূপের কথা বলিয়াছেন, যিনি এক-অদ্বিতীয়-অখণ্ড তিনি অদিতি।

বস্তুর যে শেষ বা চরম রূপ, যে মূলসত্তা, যাহাকে আর খণ্ড করা যায় না, তাহাকে জানিবার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়াস অন্তহীন। একদিন বিজ্ঞান অ্যাটম্ (Atom) আবিষ্কার করিয়া ভাবিয়াছিল বস্তুর যে শেষ বা চরমরূপ বা মূল, যাহাকে আর খণ্ড করা যায় না, তাহা পাইয়াছি ইহা ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। পরবর্তী গবেষণায় Atom ভাঙ্গিয়া ইলেক্ট্রন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি পাওয়া গেল। বেশ কিছু দিন ইলেকট্রন মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছিল। পরবর্তী আবিষ্কার হইতে দেখা গেল ইলেকট্রন শক্তিপুঞ্জ, অখণ্ড পদার্থ নহে। বর্তমান বিজ্ঞান ইথার (Ether) সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করিতেছে মৌলিক বা অখণ্ড বস্তুরূপে। যদি ইথারের মৌলিকত্ব বা অখণ্ডত্ব চূড়ান্ত বলিয়া বিজ্ঞান মানিয়া লয়, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আকাশ (বা ইথার) যাহা সীমাহীন, অখণ্ড ও ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার সহিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মিলিয়া যাইবে। ব্রহ্মের অংশ হয় না, তিনি নিরংশ; খণ্ড হয় না, তাই অখণ্ড। সুতরাং এক অদিতিই আছেন অখণ্ডরূপে, বিশ্বময়, পূর্ণস্বরূপে।

দেবমাতা অদিতির মূর্তিখানি কুয়াশা ঘেরা। এই কুয়াশা এমন ঘন যা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা এমনকি কল্পনাও সেই কুয়াশা ভেদ করিতে পারে না। সৃষ্টির গোড়ায় যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন বস্তুটি, তাহাই অদিতি। গীতায় ভগবান্ অর্জুনের কাছে আভাসে বলিয়াছেন —

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" (গীতা, ২/২৮)

সেই বস্তুই অদিতি। এই যে চলতি কথায় বলে তেত্রিশ কোটি দেবতা, এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই অদিতি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং এখনও ধারণ করিয়া আছেন। এই অদিতির কথা বলিতে বেদও হেঁয়ালির ভাষায় বলিয়াছেন— "অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি।" (ঋ. ১০/৭২/৪) অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন। আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন।

"অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।" (ঋ. ১০/৭২/৫)

হে দক্ষ। অদিতি জন্মিলেন তোমার কন্যা। যে অদিতি মা, তিনি অবশ্য চরমা ও পরমা অদিতি। সেই নিরতিশয় অখণ্ড বিভু, যাহা নিখিল ব্রহ্মের অখিলের আশ্রয়, সেই বস্তুটি কি? তাহা চিৎ বা চৈতন্য। একটি চৈতন্যের মধ্যেই নিখিল জগৎ চলিতেছে।

চৈতন্য আলাদা, জড় আলাদা, দেশ-কাল আলাদা, ক্ষিতি অপ্ তেজ আলাদা — এই ভেদ বস্তুটি সত্য নহে। এই ভেদ বস্তুটি ব্যবহারিক সত্য, কাজ চালাইবার জন্য। স্বরূপতঃ চৈতন্যের বাহিরে পৃথিবীর অস্তিত্বের থাকার প্রমাণ নাই। ব্যবহারে যাহাই হউক, আসলে চৈতন্যের মধ্যেই সব। এই চৈতন্যকেই শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম, আত্মা বা চিদাকাশ।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্য জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।।" ১/৯/১

এই "জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্" আকাশই চিদাকাশ। বিজ্ঞান যাহাকে ইথার বলে, তাহা এই চিদাকাশের মূর্তিবিশেষ। চরম আধারভাবে দেখিলে যাহা চৈতন্য, তাহাই অপেক্ষাকৃত খাটো করিয়া দেখিলে আকাশ। দেশ কাল ইথার আকাশ। এই আধার বস্তুটিতে চরমভাব, তিনিই হইলেন অদিতি।

দেশ যাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন তিনিই সাক্ষাৎ চিন্ময়ী বা চৈতন্যরূপিণী। এই চিন্ময়ী অদিতির সন্ধান বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত পায় নাই; তবে পাইবার পথে। মূলাধারে যে বস্তুটি অর্থাৎ চেতনা, তাহা ছেদহীন হইলে তিনিই হইলেন অদিতি। আর আধারের মধ্যে বিভিন্ন গণ্ডী বা এলাকা আসিয়া পড়িলেই দিতি।

প্রসঙ্গতঃ অনেকে মনে করেন, বেদে শক্তিবাদের কোন গন্ধ নাই; ইহা আমাদের পরিবর্তীকালের কল্পনা। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। অদিতি মাকে একবার চিনিলে দেখা যায় যে, বেদ-সংহিতা তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। মা অদিতি সকল দেবপুত্র জনগণের জননী। উষাকেও জননী বলা হইয়াছে। উষার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ নিবিড় বলিয়া উষাকে সূর্যের প্রেমিকা বলিয়াছেন। (ঋ. ৭/৭৬/৬) বেদে সূর্য সত্যের প্রতীক। সূর্যের মহাশক্তির বিকাশ করেন উষাদেবী। অরূপ হইতে রূপের যাত্রাপথে রূপের সৃষ্টি তিনিই করেন। সূর্যে যাইবার পথ তিনিই উন্মুক্ত করেন। আত্রেয় ঋষি বলেন, উষা পাহাড় কাটিয়া দেবযান পথ নির্মাণ করেন। পাহাড় অর্থ মনে হয় জড়ের গভীর আবরণ।

সরস্বতী বাগ্‌দেবী। ইনি জ্ঞানসমুদ্রের উদ্বোধন করেন। ইলাদেবী দিব্যশ্রুতিধাত্রী। দেবী ভারতী বিশ্বব্যাপ্ত চিন্তাশক্তির ধাত্রী। এইরূপ বহু শক্তির কথা ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। "ইলা, সরস্বতী আর মহী বা ভারতী — এই দেবীত্রয়ের নাম ঋগ্বেদে প্রায়ই একত্র পাওয়া যায় (ঋ. ১/১৩/৯; ১/১৪২/৯; ২/৩/৮; ৫/৫/৮)। দিব্যবাক্, সত্যের যে ছন্দোময় বাঙ্ময় প্রকাশ তাহারই ত্রিমূর্তি ইঁহারা। ইঁহাদের সহিত আরও দুইজনকে যোগ করিতে হয়, তাঁহারা সরমা ও দক্ষিণা — এই পাঁচজন দিব্যজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা। মহী Vast consciousness, ইলা Revelation, সরস্বতী Inspiration, সরমা Intuition, দক্ষিণা Discrimination (শ্রীঅরবিন্দ)।

ঋক্-সংহিতায় বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন —

"দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ।'"

(ঋ. ৩/৭/৫)

(শ্রীনলিনীকান্তের 'রচনাবলী', পৃ. ১৫৭)

সকল দেবদেবীগণের মূল উৎস অদিতি। ইনি দেবদেবীগণের প্রসূতি। ইহার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হইল। ইঁহার সন্তান-সন্ততিগণের গাথা লইয়াই বেদ। এখন অদিতির সন্তান-সন্ততিগণের অনুসন্ধান আমরা করিব। কিছু কথাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে — এখন কিছু কথা শৃঙ্খলার সহিত বলিবার চেষ্টা করিব।

অগ্নি-সূক্ত

বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দটি জ্ঞানার্থক। বেদ অনাদি অনন্ত লোকোত্তর জ্ঞানরাশি। যাহা নিত্য, চিরন্তন সত্য, তাহাই বিধৃত বেদে। বেদ কোন ব্যক্তি বা পুরুষের রচিত নহে, এই হেতু অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত হয়। বেদের ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা; স্রষ্টা নহেন। বেদের মুখ্যাংশ উপনিষদ্। উপনিষদ্ স্থাপন করিয়াছেন ব্রহ্মতত্ত্ব। বেদান্ত উপনিষদের সূত্ররূপ বা সংক্ষিপ্তসার। সুতরাং বেদান্তও ব্রহ্মবাদী। বিষয়বস্তু অনুসারে বেদের দুই ভাগ — মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা। সংহিতা দেববাদী। ব্রহ্মবাদের সাধনা ধ্যান। দেববাদের সাধনা যজ্ঞ। বেদ সংহিতায় যাগের কথা ও বেদান্তে যোগের কথা। যজ্ঞ বাহ্য অনুষ্ঠানপ্রধান। যোগ আত্মিক নিবিষ্টতাপ্রধান। বেদান্তের শেষপাদে সাধনা ও উপাসনার কথা। এখন সংহিতার সাধনার কথা বলিতেছি।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম ঋক্‌টি এই —

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।।" ১/১/১

মন্ত্রটির তাৎপর্য কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিব। মন্ত্রটিতে ঐ একটি ক্রিয়াপদ 'ঈলে'। 'ঈড়্' ধাতু হইতে 'ঈড়ে' বা 'ঈলে'। 'ঈলে' অর্থ আমি স্তব করি, স্তুতি করি, আরাধনা করি। কাহাকে? অগ্নিকে। অগ্নি সকলের অগ্রণী। তিনি চলেন সর্বাগ্রে। সব তাঁহার পিছনে পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া চলেন। তাই সর্বাগ্রে অগ্নির স্তব করি। জন্মমাত্র সূতিকাগৃহে অগ্নি লাগে। মরণের পর শ্মশানেও অগ্নি। আগেও তিনি, পিছেও তিনি। এই মন্ত্রে অগ্নি পদটির পাঁচটি বিশেষণ — 'পুরোহিতম্', 'যজ্ঞস্য দেবম্', 'ঋত্বিজম্', 'হোতারম্' ও 'রত্নধাতমম্'।

অগ্নি 'পুরোহিত'। পুরোহিত — পুরের যিনি হিত বিধান করেন। পুর বা পুরী দুইখানি। দেহপুর আর বিশ্বপুর। দেহপুর ব্যষ্টিজীবের দেহ। বিশ্বপুর সমষ্টি জীবের দেহ। অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির দেহপুরে থাকিয়া দেহের সর্ববিধ হিত বা কল্যাণসাধন করেন। যাস্ক বলিয়াছেন "অঙ্গান্ নয়তি সংনমমান।" প্রাণীদেহের সমস্ত অঙ্গকে একীভূত করেন, তাই নাম 'অগ্নি'। আবার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডপুরেও তিনি অন্তরচারী অন্তর্যামিরূপে

থাকিয়া সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন। অগ্নি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতু। শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Sublime mediator between earth and heaven."(*On the Veda*, p. 446)।

অগ্নি 'যজ্ঞস্য দেবম্'। অগ্নি যজ্ঞের দেব। এই বিরাট বিশ্ব একটি অসীম অনন্ত যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পরম পুরুষ সর্বদা আপনাকে আহুতি দিতেছেন। তিনি অনন্ত, তাই আহুতির আর শেষ নাই। মানুষের প্রত্যেকটি কর্মই যজ্ঞ। যাহা অকল্যাণদ তাহা অযজ্ঞ। অযজ্ঞ মানুষকে অমানুষ করে। যজ্ঞ হইল ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, সকলের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। উৎসর্গ ছাড়া কোন কর্মই যথাযথ হয় না। অগ্নি সকল যজ্ঞকর্মে 'দেব'— দেদীপ্যমান, উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত। 'দেব' শব্দের আর একটি অর্থ ক্রীড়াপরায়ণ, লীলাময়। এই নিখিল জগৎ পরমপুরুষের কর্ম নহে, লীলা। আমরা জীবগণও সেই লীলার সহচর। আমাদের সকল শুভকর্মে তিনি দেব, তিনি লীলাপরায়ণ।

অগ্নি 'ঋত্বিক্'। ঋত-সাধক বা সত্যসাধকগণ কর্তৃক তিনি আরাধিত।

অগ্নি 'হোতা' আহ্বায়ক। পরমপুরুষকে সকল দেবগণকে, সমগ্র জীবজগৎকে তিনি আবাহন করিয়া লইয়া আসেন, তাই তিনি 'হোতা'। আমাদের ক্ষুদ্র জীবন যজ্ঞের সমিধ্ যখন বিশ্বের মহাযজ্ঞের সঙ্গে একাকার হয় তখন মনে অনুভূত হয় আমার সকল যজ্ঞের তিনিই 'হোতা' তিনিই 'ঋত্বিক্'। সবই তিনি, আমি শুধু যজ্ঞে কাষ্ঠ আহরণকারী।

অগ্নি 'রত্নধাতম'। সকল দেবতাই 'রত্নধা' — ধনরত্ন দেন। অগ্নি রত্নধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা রমণীয় যে ধন, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ধন, তাহার তিনি ধাতা, ধারক ও প্রদাতা। সর্বশ্রেষ্ঠ ধন প্রজ্ঞা প্রেমভক্তি। এই ধন পাইলেই তিনি 'আমার' হইয়া যান, নদী সাগর হইয়া যায়। এই ধন সাধনা করিয়া পাওয়া যায় না, একমাত্র তিনি প্রদাতা। আমার সাধনাও চাই। আমি ঘরের দরজাটি খুলিয়া রাখি, এই আমার সাধনা। আর সূর্যের কিরণমালা অতি বেগে লক্ষ লক্ষ মাইল পথ ছুটিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করে, এইটি সূর্যের করুণা। দরজাটি বন্ধ থাকিলে আসিতে পারে না, খোলা পাইলেই প্রবেশ করে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন যে প্রেমভক্তি — অগ্নি তাহার দাতা।

বেদ বলিয়াছেন এই অনন্তবিশ্বে সদ্ বস্তু একটিই, "একং সৎ"। তাঁহার নাম অনেক। একটি নাম 'অগ্নি'। অগ্নি তাহা হইলে পরব্রহ্মই। অগ্নি ব্রহ্মের তপঃশক্তি। যখন কিছুই ছিল না, সকলই অন্ধকার, অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার ছিল সমাবৃত, তখন কি ছিল? তখন ছিল একটি মাত্র 'সদ্' বস্তু। সেই সদ্বস্তুর সঙ্গে একীভূত ছিল তাঁহার তপঃশক্তি। সেই তপঃশক্তি দ্বারা তিনি

যতকিছু সবই সৃষ্টি করিলেন। তপস্যার প্রথম সন্তান তেজ।

বেদ বলেন, এই তেজের তিনটি মূর্তি — ঊর্ধ্বলোকে তিনি 'সূর্য', মধ্যে অন্তরিক্ষে তিনি 'বিদ্যুৎ' ও মর্ত্যলোকে ভূমিতে তিনি 'অগ্নি'। অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য বস্তুতঃ একই বস্তু। যখন সবই প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত তখন পশু আর মানুষ একাকার ছিল, মর্ত্যে যখন অগ্নি আসিলেন তখন পশু ও মানুষের পার্থক্য স্পষ্ট হইল। পশু অন্ধকারেই থাকিল। মানুষ আলো জ্বালিল। পশু কাঁচা খায়, খাইতেই থাকিল। মানুষ পাক করিয়া খায়, অগ্নিকে পাইয়া মানুষ কাঁচাকে পাকা করিয়া লইল। গীতা বলিয়াছেন, যে নিজের জন্য পাক করিয়া নিজেই খায়, সে পাপ খায়। (ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ। গীতা, ৩/১৩) যে সকলকে দিয়া যজ্ঞের অবশেষ খায়, সে ব্রহ্মকে পায়।

সকলকে খাওয়াইয়া অবশেষে নিজে খাইবার সুযোগ হইল মানুষের অগ্নির সহায়তায়। শুধু কি অগ্নির সহায়তা? না, আর কিছুর সহায়তা লাগিল। এখানে পশু মানুষের পার্থক্য আর একটু বলি। পশু চারিপায়ে চলে। তাহার মেরুদণ্ডটি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল (Parallel)। মানুষ পৃথিবীর উপর লম্বভাবে (Perpendicular) খাড়া হইয়া দাড়াইল। তাহার দেহটি বহন করিতে দুইটি পা-ই যথেষ্ট। তাহার সামনের দুইটি পা যেন হাত হইয়া গেল। হাতের মুক্তিতে মানুষ যেন মুক্ত হইল। অগ্নি সহায়তায় মানুষের দুই হাত তাহাকে বিশ্বসভায় অংশীদার করিল। সে এখন পরের জন্য যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞাবশেষ আহার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে চলিতে পারে।

মানুষ যখন লম্ব হইয়া পৃথিবীর উপর দাঁড়াইল, তখন সে অগ্নি দেবতার যে উৎস, সূর্যদেব, তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে অসীম আকাশটি দেখিল, আর দেখিল অনন্ত আকাশে একটি সূর্য, আবার অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকা দেখিল। তাহার মধ্যে দেখিল একটি চন্দ্র। বহুত্বের মধ্যে একত্ব। একত্বের শক্তির সহায়তায় মানুষ ব্রহ্মানুসন্ধানপর হইল। জল যেমন নিম্নগামী, অগ্নি সেইরূপ সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী। অগ্নির কৃপাতেই মানুষের ঊর্ধ্বদৃষ্টি। যাঁহাদের ঊর্ধ্বদৃষ্টি, অগ্নির আরাধনা তাঁহাদেরই সার্থক। তাই বেদের প্রথম মন্ত্রে বলিয়াছেন, "আমি অগ্নিকে আরাধনা করি।" আরাধনা করিয়া পরম আরাধ্য বস্তুকে পাইব — এই আশায়।

দ্বিতীয় মন্ত্র —

"অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি।।" ১/১/২

অগ্নিকে আমরা আরাধনা করি বলিয়াছি। কেন আরাধনা করি? আমরা তো আধুনিক, কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী ঋষিরা অতি প্রাচীনকাল

হইতে অগ্নির আরাধনা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যেভাবে যজ্ঞে অগ্নির স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেইভাবে করি। আমরা বর্তমান কালের (modern), আমরা কি করিতে পারি? প্রাচীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি, নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা কিছু করিতে যাই না। আচার্যপরম্পরাক্রমে সাধন-ভজন কর্ম করিয়া যাওয়াই সুন্দর সুষ্ঠু। যদি বলেন, কেন? অগ্নি ছাড়া তো আরও অন্য অনেক দেবতা আছেন, তাঁহাদের আরাধনাও তো করিতে পার। তা পারি বটে, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করি না। "অগ্নৌ পূজিতে সর্বদেবাঃ পূজিতাঃ ভবন্তি।" "অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ"। অগ্নি একজন অভিনব পূজ্য দেবতা। তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি অন্যান্য পূজ্য দেবগণকে তৎসহ লইয়া আসেন। ইহা কি প্রকারে বুঝিলে? আমরা প্রত্যক্ষ দেখি অগ্নি আমাদের দূত। আবার দেবতাদেরও দূত।

অগ্নি হব্যবাহন। আমাদের যে দান, তাহা দেবতাদের নিকটে লইয়া যান। আর শুধু তাঁহাদের আশীর্বাদ নহে — সাক্ষাৎ তাঁহাদিগকে আমাদের সমীপে লইয়া আসেন। 'আবক্ষতি' — আনয়তি। মানুষ ও দেবতার মধ্যে অগ্নি দৌত্য করেন। অগ্নিকে আশ্রয় করিলেই আমরা সকল দেবতাদের সামীপ্যলাভের আনন্দ পাই। প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। তিনি আমাদেরও পুরোহিত, দেবতাদিগেরও পুরোহিত। আমরা যেমন দেবতাদের নিকটে পাইয়া তাহাদের সাযুজ্যসুখ ভোগ করিতে চাই — তাঁহারাও আমাদের কাছে আসিতে চাহেন। আমাদের চাওয়ার আগেই তাঁহারা চাহেন। তাঁহারা চাহেন বলিয়াই আমাদের অন্তরে চাহিদা জাগে। আমাদের সন্নিধানে আসিবার জন্য আগ্রহান্বিত যে দেবগণ, তাঁহাদিগকে লইয়া আসেন অগ্নি।

পূর্বমন্ত্রে অগ্নিকে 'ঋত্বিক্' বলা হইয়াছে। ঋত্বিক্ পদে ঋতুযাজী। যজ্ঞের সাধনার সঙ্গে ঋতুর যোগাযোগ আছে। ঋতুর পরিবর্তন হয় সূর্যের গতির সঙ্গে, ইহা ব্যবহারিক সত্য। সূর্যের গতি হয় বিশ্বছন্দে। 'ঋত্বিক্' সেই ছন্দের জ্ঞাতা। তাই ঋতু অনুসারে তাঁহার যজ্ঞের রহস্যের জ্ঞাতা অগ্নি। অগ্নি 'ঋত্বিক্' হইয়া ঋতুর ভাব অনুসারে দেবগণকে লইয়া আসেন। সুতরাং অগ্নিকে আশ্রয় করিলে অগ্নি-ঋত্বিকের সাহচর্যে আমরা সকল ঋতুর সকল দেবতাকে পাইব। এইজন্য অগ্নিকেই আশ্রয় করিয়াছি।

অগ্নি বৃহৎ বিশ্বময়। আমরা ক্ষুদ্র। অগ্নির আশ্রয়ে আমরা বৃহৎ হইতে পারি। আমরা বৃহৎ হইলে সকল দেবতাদের সঙ্গে সাযুজ্য হইবে। তখন আমরা আর ক্ষুদ্র থাকিব না। দেবতারাও যাহা, আমরাও তাহাই হইয়া যাইব। তাই অগ্নির আশ্রয়ে থাকাই শ্রেয়।

এই আধুনিক ও প্রাচীন কাল কত পূর্বের তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পূর্বে বেদ কত প্রাচীন তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা ছয়-সাত হাজার বছরের পুরাতন তাঁহারাও নিজেদের আধুনিক বলিয়াছেন। অগ্নিপূজা যে কত প্রাচীন ইহাতে তাহার কিছু বোধগম্য হয়। ঋষি বলিতেছেন — আমরা যে অগ্নি আরাধনা করিতেছি ইহা প্রাচীনদিগেরই আরাধনার পথ অনুসরণ মাত্র।

তৃতীয় মন্ত্র—

"অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ
পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমম্।।" ১/১/৩

পূর্বে প্রথম মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে, অগ্নি সর্বোত্তম রত্নদাতা 'রত্নধাতমম্'। স্পষ্ট কথাই আরও স্পষ্টতর করা হইতেছে এই মন্ত্রে। অগ্নির কৃপায় আমরা সর্ববিধ ধন পাই। প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন— "ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ"। যদি ধন ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্নির শরণ লও। 'রয়ি', 'রায়', 'বসু', 'ভগ' ইত্যাদি রত্নের প্রতিশব্দ। 'রয়ি' বা ধন বলিতে পার্থিব ও অপার্থিব ধন, দুইই বুঝায়। ধন শব্দের অর্থ—যাহা আনন্দ দেয়, "ধিনোতীতি ধনম্"। পার্থিব ধন যে অগ্নি দান করেন, ইহা তো বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। পৃথিবীতে বিদ্যুতের সাহায্যে বর্তমানে যে সভ্যতার গতিময়তা তাহার মূলেই অগ্নি। অগ্নি বা বিদ্যুৎ বন্ধ হইয়া গেলে ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই ধন অতি তুচ্ছ। তাহা দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রে যে ধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা 'দিবে-দিবে' অর্থাৎ দিনে দিনে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল। 'পোষং' পোষ্যমাণং বর্দ্ধমানম্। অগ্নির কৃপালব্ধ যে অপার্থিব ধন, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনপরায়ণ। প্রকৃত ধন হইল আমাদের চেতনায় ভগবৎ আবেশ। সাধু লোকেরা ভাগবত রসেই জীবনধারণ করেন। এই ধন পাইলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেতনা হইতে মুক্ত হই। এই ধন পাইলে বিশ্বের বিপুলতার মধ্যে আমরা যুক্ত হই। 'রয়িং' পদে বিপুল আনন্দ, যাহা সমুদ্রের মত আমাদিগের দশদিকে বিস্তৃত হইয়া ঘিরিয়া আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Rayi means both objective and internal, material and spiritual happiness, spiritual wealth."। যে সম্পদ্ পাইলে আমরা ভূমার সন্ধান পাই, তাহাই 'রয়ি'। উহা নিয়ত বর্ধনশীল। পার্থিব ধন দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ধন অক্ষয়। শুধু অক্ষয় নহে সততই বর্ধিত হইতে থাকে। বৈষ্ণবাচার্যদের ভাষায় এই 'রয়ি' কৃষ্ণ-তৃষ্ণা। পার্থিব জলের তৃষ্ণা জল পান করিলেই চলিয়া যায়, জলের প্রয়োজন

আর থাকে না। অন্নের ক্ষুধা অন্ন আহার করিলেই চলিয়া যায়, আর অন্নের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণকে পাইবার যে লালসা উহা একটিবার অন্তরে জাগ্রত হইলে, "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে কোটি গুণ।" হৃদয়ে যদি কৃষ্ণানুরাগ জাগে তবে তাহা ক্রমেই বাড়ে। কৃষ্ণকে পাইলে আরও বাড়ে। যতই ভক্তের কৃষ্ণ-তৃষ্ণা বাড়ে ততই কৃষ্ণের মাধুর্য বাড়ে। এইজন্য যত পাওয়া যায়, ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কৃষ্ণের মাধুর্য নিত্য নবায়মান। এইজন্য ভক্তের তৃষ্ণাও নিত্য নবায়মান। গোপীরা যখনই কৃষ্ণকে দেখেন, তখনই মনে করেন — এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে মথুরায় নারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন —

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।" (ভাগবত, ১০/৪৪/১৪)

"গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা নয়ন দ্বারা ঐ কৃষ্ণের রূপ পান করেন; যে রূপ লাবণ্যের সার, যাহা অনন্যসিদ্ধ, যাহা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃশোভা এবং ঐশ্বর্যের চরম আশ্রয়, যাহা অতি দুর্লভ।"

'অনুসবাভিনবম্' পদটির অর্থ প্রতিক্ষণেই নূতন। তাই যতবারই দর্শন করা যাউক না কেন, সর্বদাই মনে হয় যেন এইমাত্র দর্শন করিলাম।

"কৃষ্ণ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।।"

এই যে কৃষ্ণাসক্তি, কৃষ্ণের জন্য তৃষ্ণা, ইহা পরম ধন। অগ্নিদেবের কৃপায় এই ধন আমরা লাভ করিতে পারি। আর সেই ধন 'বীরবত্তমম্', সর্বদা সেই বিশেষ প্রেরণাদায়ক। প্রেমিক ভক্তের সদাই চিন্তা, কিসে কৃষ্ণ সুখী হইবেন। এই ভাবনায় নিত্য নূতন প্রেরণা জাগে। কখনও ভাবেন, ধনহীনকে ধন দিলে কৃষ্ণ সুখী হইবেন। কখনও ভাবেন বিদ্যাহীনকে বিদ্যা দিলে কৃষ্ণ সুখী হইবেন,। কখনও ভাবেন শান্তিহারা জীবকে শান্তি দিলে কৃষ্ণ সুখী হইবেন। কখনও ভাবেন প্রেমভক্তিহীন জীবকে প্রেমভক্তি দান করিলে কৃষ্ণ সুখী হইবেন। এই প্রেরণা অনুসারে নানাবিধ কর্ম করেন। সেই ধন যশোদায়ক।

"কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম)

অগ্নি এই পরম ধনের দাতা। অগ্নি পরম পুরুষের ইচ্ছাশক্তি। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সব মহাধন দিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ মন্ত্র—

"অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।।" ১/১/৪

হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞকে সকল দিক্ দিয়া সর্বতোভাবে 'পরিভূঃ' — পরিব্যাপ্ত, 'অসি' — করিয়া আছ, তাহা নিশ্চয়ই হিংসাশূন্য। তাহা কেবলই মানুষের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠিত হয়।

'অধ্বর' শব্দের অর্থ সায়ণ বলিয়াছেন — অহিংসিত বা হিংসাশূন্য যজ্ঞ। হিংসাযুক্ত যজ্ঞ নিন্দিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন — 'অধ্বর' শব্দটি যজ্ঞের বিশেষণ। অধ্বর যজ্ঞ অর্থাৎ "Sacrificial action travelling on the path, the sacrifice that is the nature of a progression or journeying."

'যজ্ঞ' এই শব্দটির অর্থ বলিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ — "কর্মপ্রবাহে যাহা অর্জন বা সঞ্চয় করিতে পার, সবই অমৃতময়ের উদ্দেশ্যে হবিঃ রূপে তপঃ অগ্নিতে ঢাল। ক্ষুদ্র সর্বস্ব দানে অনন্ত সর্বস্ব লাভ করিবে।" (বিবিধ রচনা, পৃঃ ৪৫) যে যজ্ঞকে অগ্নি ঘিরিয়া রাখে তাহা নিশ্চয়ই দেবতার অভিমুখে গমন করে। মন্ত্রটির মধ্যে শুধু মহিমা কীর্তনই আছে। কিছু যাচ্ঞা নাই।

পঞ্চম মন্ত্র—

"অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ
সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ।।" ১/১/৫

মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'কবিক্রতুঃ' বলা হইয়াছে। 'কবি' বলিতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বুঝায়। বেদমন্ত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য আছে তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা 'কবি'। নিরুক্তকার মতে 'কবি' অর্থ 'ক্রান্তদর্শী'। 'ক্রান্ত' অর্থ শেষ সীমা। একটি সত্যের চরম সীমা পর্যন্ত যাঁহারা দেখেন তাঁহারা 'কবি'। 'কবি'র সৃষ্টি-কর্মের অপ্রতিহত গতিকে যাঁহারা দেখেন, সায়ণ বলেন, তাঁহারা 'কবিক্রতু'। হৃদয়ের মধ্যে যিনি সত্য সংকল্প, শক্তি জাগাইয়া তোলেন, কর্মোদ্দীপনা স্ফুরিত করেন, তিনি 'কবিক্রতু'। অগ্নি 'হোতা'। 'দেবগণের আহ্বানকারী' 'কবিক্রতু' — কবির মত যাঁহার কর্ম, সর্বজ্ঞ সাধকের মত সংকল্প যাঁহার, সিদ্ধকর্মা। Macdonell বলেন — " ..... having the knowledge of a sage"। শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Sacrificial Will"।

অগ্নি পরমেশ্বরের তপঃশক্তি। যে তপঃশক্তি আমাদের সংকল্পের পরিচালক। অগ্নিকে বলা হইয়াছে সত্য ও নিত্য, যাহা সর্বদা বিদ্যমান। সৎ, অস্তিত্বরূপে যাহার স্থিতি চিরন্তন, তিনি সত্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮/৩/৫ মন্ত্রে 'সত্য' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, যাহা তিনটি অক্ষর লইয়া, — 'স' অর্থ অমৃত, 'ত' অর্থ সত্য, ঊর্ধ্বের অমৃত ও নিম্নের সত্যকে যাহা নিয়মবদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাই 'য্' (y)। অগ্নি এই সত্যের মূর্তি।

অগ্নির আর একটি বিশেষণ 'চিত্রশ্রবঃ'। 'শ্রব' শব্দের অর্থ গুণরাশি। চিত্র অর্থ বিচিত্র। চিত্রাণি আশ্চর্যময়ানি শ্রবাংসি গুণরাশয়ঃ যস্য সঃ চিত্রশ্রবঃ। 'দেব' যিনি সর্বদা দেদীপ্যমান। এবম্ভূত যে অগ্নিদেব তিনি দেবগণসহ 'আগমৎ', আগচ্ছন্তু। এই সকল গুণসম্পন্ন অগ্নিদেবতাকে আহ্বান করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্র—

"যদঙ্গ দাশুষে ত্বম্
অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ।।" ১/১/৬

— "হে অগ্নি! 'দাশুষে' তোমাকে যাঁহারা অর্ঘ্যপ্রদান করেন, আত্মদান করেন, তাঁহাদিগকে তুমি ভদ্র কর। তুমি যে ভদ্র (ভদ্রং) কর, 'তৎ ভদ্রং' সেই ভদ্রকার্য 'তব ইৎ তৎ' তোমারই যোগ্য। তাহা অপর কেহ করিতে সক্ষম নহে। এই কথা সত্য 'তৎ সত্যম্'। ইহাতে কোন বিসংবাদ নাই। মানবের তুমিই সকল প্রকার মঙ্গলকারক।"

'ভদ্র' শব্দের ঠিক অর্থ হইল — শুভ, কল্যাণ। কিরূপ কল্যাণ? যে কল্যাণ অশেষ দুঃখ-কষ্ট দুর্দৈবের বিপরীত। মানুষ ভদ্র হইলেই মন প্রসন্ন হয়। প্রসন্নতা লাভ করিয়া উদার হয়। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন —

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ,
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।"....

সপ্তম মন্ত্র —

"উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি।।" ১/১/৭

— 'অগ্নে' হে অগ্নি, 'বয়ম্' আমরা, তোমার যজমানেরা, 'দিবেদিবে' প্রতিদিন উত্তরোত্তর, 'দোষাবস্তঃ' দিনরাত, 'নমো ভরন্ত' তোমাকে প্রণাম করিতে করিতে যেন, 'ত্বা' তোমার নিকট, 'উপ আ ইমসি' উপস্থিত হই, যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই, যেন তোমার সহিত মিশিয়া যাই। কি

উপায়ে? 'ধিয়া' ধ্যানের দ্বারা। আমরা তোমার আশ্রয় লইলাম।

অষ্টম মন্ত্র —

"রাজন্তমধ্বরাণাং
গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে।।" ১/১/৮

— "হে অগ্নি! তুমি হিংসারহিত যজ্ঞকর্মে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, সম্পদে-বিপদে তুমি ঋতের রক্ষক। নিখিল বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারক তুমি, স্বভবনে নিত্য বর্ধিষ্ণু ও সত্যস্বরূপ পরম ঈশ্বর তুমি। এই হেতু তোমাকেই ভজনা করি।"

এই মন্ত্রটিতে ক্রিয়াপদ নাই। পূর্ববর্তী মন্ত্রটির সঙ্গে একবাক্যতা পূর্বক পাঠ-ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'নমো ভরন্ত এমসি' — নমস্কার পূর্বক প্রণত হইয়া 'উপ-আ-ইমসি' — উপসংগচ্ছামি আশ্রয়ামঃ — অগ্নির আশ্রয় লইব। এই কথাটি অধ্যাহার করিতে হইবে। রাজন্তম্, অধ্বরাণাং গোপাম্, ঋতস্য দীদিবিম্, স্বে দমে বর্ধমানম্ — এই কয়েকটি অগ্নির বিশেষণ। 'রাজন্তম্ং' অর্থ সর্বশোভাময়। সকল যজ্ঞ-কর্ম মধ্যে সুশোভিত 'ঋতস্য গোপাম্' — সত্যের রক্ষক। নিজের ধামে (স্বে দমে) তিনি দীপ্যমান (দীদিবিম্) এবং স্বপ্রকাশ রূপে বিরাজমান।

নবম মন্ত্র—

"স নঃ পিতেব সূনবে -
হগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।।" ১/১/৯

অগ্নি দেবতার স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান হৃদয়ে সম্যক্ জাগ্রত হইলে ভক্ত সাধক প্রার্থনা করিতেছেন — হে অগ্নি! কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাক। 'নঃ স্বস্তয়ে সচস্ব' — আমাদের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য আমাদের সেবা কর। পিতা যেমন পুত্রের ক্ষেত্রে করে, সর্বপ্রকার যত্ন করে, তুমি আমাদের 'সূপায়নঃ' হও অর্থাৎ স্বচ্ছন্দগম্য, সহজে প্রাপক হও। সুন্দরভাবে পিতার মত যেন তোমাকে পাই। পরম মঙ্গল ও পরম স্বস্তি লাভের জন্য এবং অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার প্রকৃত অস্তিত্ব যাহাতে শোভমান হয়, সেইজন্য তুমি আমাদের নিকটে 'সচস্ব' অর্থাৎ সমবেত হও, নিকটস্থ হও, দূরে থাকিও না। সাধক দেবতার পিতৃ-বাৎসল্য কামনা করিতেছেন।

দেবতা আমাদের উপাস্য। তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধই সম্ভব। তিনি প্রভু, তিনি পিতা, তিনি সখা। সখ্য সম্বন্ধের কথা বেদে বহুবার দেখা যায়। শ্রীঅনির্বাণ বলেন — "সখ্য সম্বন্ধই মূল। সখ্যের উজানে বাৎসল্য,

ভাটিতে দাস্য।" এই মন্ত্রে পিতৃবাৎসল্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

এই অগ্নিসূক্তে অগ্নির উদ্দেশ্যে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, ঐগুলি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকল ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যেই বলা চলে এবং বলা হইয়াছেও। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে — নাম ও রূপে পৃথক্ হইলেও সকল দেবতাই এক পরম ঈশ্বরের বিভূতি। শ্রীঅনির্বাণ বলেন, "বহু গোড়ায়, কিন্তু শেষ এক-এ। আবার এক বহু যেমন সত্য, এক দুই-ও সত্য, যুগপৎ সত্য।"

অগ্নিসূক্তের শ্রীঅরবিন্দকৃত অনুবাদ এইরূপ —

1. "I adore the flame, the vicar, the divine Ritwik of the Sacrifice, the summoner who most founds the ecstasy.
2. The Flame adorable by the ancient sages is adorable too by the new. He brings here Gods.
3. By the flame one enjoys a treasure that verily increases day by day, glorious, most full of hero-power.
4. O Flame ! the pilgrim-sacrifice on every side of which thou art with the envisioning being, that truly goes among the Gods.
5. The Flame, the Summoner, the Seer-Will, true and most full of richly varied listenings, may he come a God with the Gods.
6. O Flame! the happy good which thou shalt create for the giver is that Truth and varily thine, O Angiras!
7. To thee, O Flame! we day by day, in the night and in the light, come, carrying by our thought the obeisance.
8. To thee, who reignest over our pilgrim-sacrifices, luminous guardian to the Truth, increasing in thy own home.
9. Therefore, be easy of access to us as father unto his son, cling to us for our happy state."

(*Hymns To The Mystic Fire*, pp. 3-5)

অগ্নিসূক্তের ভাব অবলম্বনে একসময় এই কবিতাটি লিখিয়াছিলাম-

দেবের অগ্রণী অগ্নি তোমায় স্তব করি।
পুরোহিত সর্বদিকে পুরী রক্ষাকারী।
যজ্ঞের তুমি নিষ্পাদক ঋত্বিক্ সর্বদ্রষ্টা।
তোমার ডাকে সবে আসে মঙ্গল পরিবেষ্টা।
প্রাচীনের পূজ্য তুমি মোদের আচার্য।
তুমি শ্রেষ্ঠ ধনদাতা তুমি আর্যবর্য।
তব ধন ক্ষয়হীন প্রাণ আধায়ক।
জীবন প্রসন্নকারী কল্যাণদায়ক।।
পরব্রহ্মের পরাশক্তি শক্তিমান মহান্।
তুমি সত্য রক্ষাকারী চির দীপ্যমান।।
আঁধারে আলোকে ধ্যানে নীরব স্তবনে।
তোমা নমস্করি মোরা আশ্রিত চরণে।।
তুমি সর্ব-শোভমান চির বিরাজমান্।
হিংসাশূন্য যজ্ঞে কর সুখ-সমাধান।।
পরপীড়া স্পর্শহীন মহাসত্যের সন্ধানে।
চির উজ্জ্বল কর পদাশ্রিত জনে।।
তুমি ক্রান্তপ্রজ্ঞ ক্রান্তদর্শী সর্বজ্ঞ আহ্বাতা।
কল্যাণজীবনে সহায়ক তুমি হে যজ্ঞ-হোতা।।
আশ্চর্যতত্ত্ব নিখিল শ্রুতি মন্ত্রে যুক্ত।
সর্বকল্যাণদ তুমি, তুমি চির মুক্ত।।
গুণান্বিত পিতা যেমন সন্তান পালনে।
সেইমত স্বাগত হও জীবন যাপনে।।
স্বধামে স্বগৌরবে সদা বর্ধমান।
সম্পদে বিপদে তুমি চির শোভমান।।

অগ্নি

অগ্নি = অ + গ্ + নি। 'অ' আসিয়াছে 'ই' ধাতু হইতে। 'ই' ধাতুর রূপ 'আয়য়তি'। আয়য়তি পদে আছে 'আ'কার। আ-কার অ-কারেরই দীর্ঘ। অথবা 'ই' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অয়ন। অয়ন অ-কার যুক্ত। ব্যঞ্জনার্থ 'অঞ্জ্' ধাতু হইতে অথবা দহনার্থক 'দহ্' ধাতু হইতে আসিয়াছে গ্-কার। প্রাপনার্থক অর্থাৎ লইয়া যাওয়া এই অর্থ বিদ্যমান 'নী' ধাতু হইতে আসিয়াছে 'নি'। অগ্নি শব্দে উপরি উক্ত সকল ধাতুর অর্থই বিদ্যমান — অগ্নি গতিসম্পন্ন, অগ্নি পদার্থ ব্যঞ্জক অথবা পদার্থ দাহক। অগ্নি হবিপ্রাপক অর্থাৎ দেবতাদের নিকট হবি লইয়া যান।

বৈয়াকরণমতে 'অঙ্গ্' ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয়ে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন।

এই অগ্নি দেবতাটি কে ?

ছেলেবেলায় শুনিয়াছি দেবতাদের পা মাটিতে স্পর্শে না। দেবতাদের চক্ষে নিমেষ নাই। দেবতাদের ছায়া নাই। গ্রাম্যকথা হইলেও কিছু তথ্য নিহিত আছে। দেবতারা মাটিতে চলেন না — ইহাতে বুঝা যায় তাঁহারা ভৌম বস্তু নহেন, দিব্য বস্তু। দেবতার চক্ষে পলক নাই — ইহাতে বুঝা যায় তাঁহারা ধীর, স্থির ও অচঞ্চল। চক্ষের পলক চঞ্চলতার চিহ্ন। দেবতার দৃষ্টি ধ্রুব, অস্থিরতাশূন্য। দেবতাদের ছায়া নাই — ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের দেহ transparent — স্বচ্ছ। তাঁহারা জ্যোতির তৈরী, জ্যোতির্ময়। নিরেট বস্তুই আলো আসিতে বাধা দেয়। তাই ছায়া পড়ে। সূর্যদেবতা তাই উদিত হইলেই অন্ধকার দূর হয়। সূর্য দেখা দিলেই দিবা হয়। দিবা আর দেব প্রায় একই শব্দ। বিদ্যুৎ চমকাইলে আলো হয়, বিদ্যুৎও দেবতা। সূর্য বিদ্যুৎ আমাদের নিকটে নহে, অনেক দূরে। আমাদের নিকটস্থ দেবতা অগ্নি। অগ্নির প্রকাশ মাত্রই আলো হয়। তাই অগ্নি দেবতা। আমরা ভূমিতে বাস করি। আলো জ্বালাইয়া অন্ধকার দূর করি। অগ্নি ভৌম দেবতা। চন্দ্র সূর্য যখন আকাশে থাকে না তখন অগ্নিই আমাদের পথপ্রদর্শক। অগ্নি শুধু আলো দেয় না, তাপও দেয়। তাপে আমরা খাদ্য সিদ্ধ করিয়া খাই। পশুরা আলো জ্বালায় না। অন্ধকারেই থাকে। রান্না করিয়া খায় না। কাঁচাই খায়। পশু হইতে মানুষকে পৃথক করিল অগ্নি দেবতা।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রকার যন্ত্র (Machine) চলিতেছে। মেশিন কত লক্ষ প্রকার কার্য করিতেছে। মেশিন চলে অগ্নি দ্বারা বা বিদ্যুৎ দ্বারা। বিদ্যুৎ অগ্নিরই আর এক রূপ। অগ্নি ও বিদ্যুৎ যদি এককালে নির্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মানব সভ্যতা স্তব্ধ হইয়া যাইবে। অন্ধকারে মানুষ দিশাহারা পাগল-পারা হইয়া যাইবে। মানুষ মাতৃগর্ভে গাঢ় অন্ধকারে থাকে। জন্মগ্রহণ করিয়া আলো আর তাপ পাইবার জন্য কাঁদিতে থাকে। তাহাকে বাঁচাইতে তাপ লাগে। মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন দেহটি সৎকার করিতে অগ্নির প্রয়োজন হয়। জনমে মরণে অগ্নিদেবতা আমাদের অপরিহার্য।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম অগ্নি সূক্তটি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। সূক্তটিতে কোন প্রার্থনা নাই। শুধু অগ্নির গুণ কীর্তন, মহিমা কীর্তন। শেষের মন্ত্রটি অগ্নি দেবতার সঙ্গে পিতা পুত্রের সম্বন্ধের কথা অবলম্বন করিয়া। বেদে আর কোথায় দেবতার সঙ্গে কি কি সম্বন্ধের কথা আছে তাহারও দিগ্‌দর্শন প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে পরবর্তীকালে ভাগবতীয় শাস্ত্র—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি যত প্রকার সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন সবই বীজাকারে বেদে আছে। ক্রমে আমরা দেখাইব ভাগবতীয় সাধনায় যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চন, আত্মনিবেদনের কথা তাহার বীজও বেদ শাস্ত্রে আছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রায় দুইশত অগ্নি সূক্ত আছে। সূক্ত মধ্যে অগ্নির অনেক বিশেষণ আছে। বিশেষণগুলিই নাম হইয়া গিয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আছে, যেমন বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্র আছে সেইরূপ অগ্নির অগণিত নাম। এই নামগুলি হইতে তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কয়েকটি নামের কথা বলিব।

অগ্নি পাবক। কুৎস ঋষি একটি সূক্তে গানের ধুয়ার মত বলিয়াছেন (ঋ. ১/৯৭) — "অপ নঃ শোশুচদঘম্।" — অগ্নি আমাদের সব মালিন্য জ্বালাইয়া দিয়া দূর করিয়া দেন। দহনেই আধারের শুচিতা। অগ্নি অন্তর বাহির পবিত্রকারী। তাই পাবক।

অগ্নি স্বর-বিদ্। অগ্নি আমাদিগকে স্বর্‌কে পাওয়াইয়া দেন। স্বর্ অর্থ বৃহৎ, ভূমা বা ব্রহ্ম। অগ্নি জানেন ভূমার তত্ত্ব। তাই তিনি বৃহৎকে মিলাইয়া দিতে পারেন।

অগ্নি অমৃতময়। জরাহীন হওয়া, মৃত্যুহীন হওয়া মানুষের পুরুষার্থ। তাহা সিদ্ধ হয় অগ্নির সহায়তায়। অগ্নির সাযুজ্য হইলে মনঃপ্রাণ অমৃতের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। তাই অগ্নি অমৃতময়।

অগ্নি স্বধাবান্। স্বধা বা সুধা। অগ্নি আপন সুধাময় স্থানে আপনি সর্বদা থাকেন। কখনও চ্যুত হন না। স্বস্থানে থাকিতে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

অগ্নি স্বরাট্। স্বয়ং রাজতে। ইহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

অগ্নি বিদ্বান্। অগ্নি জানেন সকলের সকল সংবাদ।

অগ্নি জাতবেদাঃ। মানুষ দেবতার রহস্য কিছু জানেন না। অগ্নি সব জানেন। মর্ত্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, যেখানে যাহা কিছু জাত হয়, অগ্নি তাহা সব জানেন। অগ্নি নিত্য জাগ্রত। সাধনার প্রারম্ভে অগ্নি, অন্তে সোম। অগ্নির আর একটি রূপ সোম। অগ্নি দেবতা জাগ্রত দুই প্রান্তেই। তাই অগ্নি জাতবেদাঃ (জাতবেদস্ শব্দ) বিদ্বান্।

অগ্নি কবি। কবি অর্থ ক্রান্তদর্শী। তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিনি অনেক দূর, কোন কিছুর শেষ পর্যন্ত দেখেন। কবি ও ঋষি একার্থবোধক। শাস্ত্রে পরমেশ্বরকেও কবি বলা হইয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টি কোন ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্টের সৃষ্টি নহে। ইহা কবির সৃষ্টি। অগ্নি ক্রান্তদর্শী — প্রান্তদর্শী তাই কবি।

কবির সম্পদ্ হইল বাক্য। বৈদিকভাষায় বাক্ চারিস্তরের — পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। (পরা = যাহা উচ্চারিত হয় না। পশ্যন্তী = যে বাক্ প্রকাশের আকৃতিতে নিরীক্ষণ করে। মধ্যমা = যাহা প্রকাশোন্মুখ। বৈখরী = যাহা উচ্চারিত।) আমরা সর্বদা যে কথা বলি তাহা বৈখরী। তাহা ভূমির, মর্ত্যের। আমাদের বাক্য শুধু বস্তুর স্মরণ। জল শব্দটি জলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পরা ও পশ্যন্তী স্তরের বাক্ আদি বাক্। সেখানে বাক্য আর বস্তু অভিন্ন। এই বাক্ আগ্নেয়ী, অগ্নিময়। এই জন্য অগ্নি কবি কবতেঃ। পরা ও পশ্যন্তী বাকের কবি অগ্নি। অগ্নিকে কবিক্রতু বলা হইয়াছে। যাঁহার সকল কর্মই কাব্যময়, মাধুর্য ও সৌন্দর্যময়। Macdonell বলিয়াছেন, কবিক্রতু অর্থ "having intelligence of a sage"। কবি সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত। কবির সত্য দৃষ্টি যেন সূর্যের দৃষ্টি। সূর্য যেমন এই দ্যুলোক ভূলোককে দৃষ্টি দ্বারা উদ্ভাসিত করেন তদ্রূপ। ঋ. ১০/১২৪/৭ মন্ত্রে অগ্নি ঋষি বলেন, "কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজদ প্রভূতী", কবি তাঁহার কবিত্বশক্তি দ্বারা দ্যুলোককে বহু বর্ণে আলোকিত করেন। এই মন্ত্রে ঋষির নাম ও দেবতার নাম অভিন্ন। দেবতাই ঋষি হইয়াছেন অথবা ঋষিই দেবতাময় অগ্নি হইয়াছেন।

অগ্নি মন্দ্র। মন্দ্র অর্থ আনন্দমত্ততা। নিরন্তর আনন্দমত্ততা হইতে অগ্নির নাম মন্দ্র। এই আনন্দ সৌম্য-আনন্দ। অগ্নি পিতৃশক্তি, সোম মাতৃশক্তি। দুই মিলিয়া এই অগ্নিষোমীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিপালন করেন।

অগ্নি গোপা। গোপা অর্থ রক্ষক। গোপালক রাখাল। অগ্নি আলোর রাখাল। যখন আকাশে আলো থাকে তখন অগ্নি হয়েন আমাদের আলোর

রাখাল। বিশ্বের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইবে, যাহা কিছু হইতেছে তাহা অগ্নি। বিচিত্ররূপে অগ্নি সকলের গোপা।

অগ্নি দূত। দূতিপনা বা দৌত্য তাঁহার আসল কর্ম। গীতা বলেন —

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।" ৩/১১

অর্থাৎ, তোমরা দেবগণের সংবর্ধনা কর। দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুন। পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা পরম শ্রেয় লাভ করিবে। মানুষ ও দেবতার মধ্যে অগ্নি হইলেন দূত। অগ্নি মানুষের আকৃতি দেবতার কাছে পৌঁছান ও দেবতার করুণা মানুষের কাছে লইয়া আসেন। মানুষের সাধনা ও দেবতার করুণা এই দুইকে একত্র করিয়া দেন অগ্নি দেবতা। অগ্নির শিখা সততই ঊর্ধ্বগামী। করুণার ধারা গঙ্গাধারাবৎ সতত নিম্নগামী। এই দুইয়ের মধ্যে দূতের কার্য করেন অগ্নি। অগ্নির এই কার্যই আমাদের তপস্যা। এই তপস্যাই প্রকৃত যজ্ঞরূপা। দূতরূপে অগ্নির দুইটি কার্য। আবাহন ও আবহন। যখন আবাহন করেন তখন তিনি হোতা। তিনি আমাদের যজ্ঞের হোতা। সকল দেবগণকে আবাহন করেন। যখন আবহন করেন তখন তিনি বহ্নি। দেবতার আশীর্বাদ বহনকারী। দেবতাদের তিনি বহ্নি। এই আশীর্বাদ দেবতাত্ম ভাবনা। ইহার বাহক অগ্নি। এই দৌত্যই যজ্ঞের বিশিষ্টরূপ। দেববাদের সাধনাই যজ্ঞ। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবাদের সাধনা ধ্যান ও উপাসনা।

যজ্ঞ একটি সাধারণ শব্দ। ইহার অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয় বস্তু ত্যাগ। যজ্ঞের বিশিষ্ট নাম 'অধ্বর'। যে যজ্ঞে হিংসা নাই, কপটতা নাই, পশুবধ নাই, তাহা অধ্বর। অধ্বরে অর্থ আছে ঋজুতা, অমায়িকতা, বাঁকা চালের অভাব। অধ্বরের পরিণাম ফল ঋতম্, বিশ্বের কল্যাণময় ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দ মেলানো। প্রথম মন্ত্রে আছে 'অগ্নিমীলে', অগ্নিকে ঈলন করি। ঈলনের ঠিক অর্থ চেতাইয়া তুলি। ঘৃতাহুতি দিয়া চেতাইয়া তুলি। 'ঘৃত' শব্দটি ঘৃ-ধাতু নিষ্পন্ন। ঘৃ অর্থ দীপ্ত হওয়া। ঘৃত অর্থ আলোক, পরিশুদ্ধ মানস-চেতনা, "classified mental consciousness" (শ্রীঅরবিন্দ)। শ্রীঅনির্বাণ বলেন, ঘৃত অর্থ জ্যোতির ধারা। ঘৃতের সঙ্গে অগ্নির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঘৃত অগ্নির সংস্পর্শে আসা মাত্র জ্যোতিতে রূপান্তরিত হয়। তাহা হইতে ঘৃতের একটি বিশিষ্ট অর্থ জ্যোতির্ময়। এই হেতু অগ্নির একটি বিশেষণ ঘৃতপ্রতীক। শ্রীঅনির্বাণ বলেন —

"ঘৃত পঞ্চামৃতের তৃতীয় অমৃত। পয়ঃ জাগ্রত চেতনার শুভ্র ধারা। গাভী কালো হউক আর লাল হউক, সকল গাভীর দুগ্ধই শুভ্র বর্ণ। পার্থিব সত্তা হইতে শুভ্র জ্যোতির এই পয়োধারা। তমঃ এবং রজঃ হইতেই সত্ত্বের

আবির্ভাব। দুগ্ধ ঘনীভূত হইলে দধি। প্রজ্বলিত হইলে ঘৃত। আনন্দের সৌম্য চেতনায় রূপান্তরিত হইলে হয় মধু।" (বেদ-মীমাংসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭)। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া জ্যোতির ধারাকে বর্ধিত করিয়া তুলি।

দেবগণের আদিতে অগ্নি। সংহিতার প্রায় সকল মণ্ডলের প্রথম অগ্নি-প্রশস্তি। প্রথম মণ্ডলের ৬৯ সূক্তে ৩য় মন্ত্রে পরাশর ঋষি বলিয়াছেন — "অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ।।" বেদের অনেক দেবতার মধ্যে অগ্নি প্রধান এই কথা বুঝাইলেন। প্রকৃতির এক নিয়ন্তা, এক ঈশ্বরের অনুভূতি এই মন্ত্রে সুস্পষ্ট। ইহা দশম মণ্ডলের মন্ত্র নহে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২/২/৯১) বলা হইয়াছে "অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ।।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ (মাধ্যঃ) বলিয়াছেন—"সর্বেষাং হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ"। (৭/৪/১/২৫)।

শ্রেষ্ঠ বৈদিক ঋষির অন্যতম দীর্ঘতমা বলেন — দেবতা মূলত একজনই এবং তিনি অগ্নি। নিরুক্তকার যাস্কের অভিমতও তদ্রূপ মনে হয়। তবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ইন্দ্রেরও কম নহে। বস্তুত ইন্দ্র সমানশক্তি। বিশ্বেরপরিচালন বা administration-এর শব্দ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় মূল অগ্নি। অগ্নির মধ্যে দুইটি বস্তু বিদ্যমান। তাপ ও আলো। আর্য ঋষিগণের সমস্ত সাধনাই হইল অন্ধকার হইতে আলোয় যাওয়া। অগ্নির দিব্য আলোক-রশ্মি মানুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলেন। তাহার সকল কর্মের প্রেরণার মূলই তাপ। আর প্রাপ্তি চরমতম আলোময় ভূমি। আলোপ্রাপ্তির পথে চরমতম বিপত্তিসকল দূর করেন ইন্দ্র।

চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ঋষি বলিয়াছেন, তেজঃশক্তিতে অগ্নি মানুষকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলেন। কোন্ দিকে চলেন — পূর্ণ জ্যোতির দিকে। "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "*Hymns to the Mystic Fire*" গ্রন্থে (পৃ. 191) বলিয়াছেন (ঋ. ৪/১/৯) —

"He (Agni) makes men conscious of the knowledge and is the friend of their sacrifice; they lead him on with a mighty cord;"

ঋগ্বেদে ৩/১৭/৪ মন্ত্রে ঋষি বলেন, অগ্নি "অমৃতস্য নাভিম্"। মহাভারতে আছে — "অগ্নির্হি দেবতাঃ সর্বাঃ"। অগ্নিদেব জড়পদার্থ নহেন, অগ্নিদেব সংকল্প শক্তি। একথা ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে "অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ।।" (ব্রহ্মসূত্র, ১/২/২৮)

অগ্নির অবস্থান তিনভাগে — 'ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ'। 'ভূঃ' পদে মর্ত্যলোক, 'ভুবঃ' পদে অন্তরিক্ষলোক ও 'স্বঃ' পদে দ্যুলোক। নিখিল

বিশ্বকে এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ঋষিভাবনায় ভূলোকে যিনি অগ্নি, অন্তরিক্ষে তিনি ইন্দ্র, বায়ু ও বিদ্যুৎ। দ্যুলোকে তিনি সূর্য। ঋষিরা মধ্যগগনস্থ সূর্যকেই বিষ্ণু বলিয়াছেন। এই বিষ্ণুর চরণই মধুর উৎস কহিয়াছেন। বিষ্ণুর তিন পাদ। শাকপূণি ঋষির মতে বিষ্ণুর এই তিন পাদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গ। "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ।" সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত তিনটি বিন্দু—ত্রিপাদ, উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি ও অস্তাচলে অস্তগমন। এই তিনটি পদবিক্ষেপ।

একই স্বরূপের তিনটি প্রকাশ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক — এই তিন ভূমির অনুরোধে। ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক তত্ত্বদৃষ্টিতে দেহ, মন ও বিজ্ঞানের ভূমি। একই দেবতা চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরে তাঁহার বহুধা প্রকাশ। মহাশক্তির তিনটি নাভি বা চিৎকেন্দ্র। অগ্নি এই ত্রিভুবনে বিরাজ করেন। "অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ।" (ঋগ্বেদ, ৮/৩৯/৯) উক্তিটি কণ্বগোত্রীয় নাভাক ঋষির। এক আর বহুর সমন্বয়কারী যে সূক্ষ্ম জ্ঞানদৃষ্টি তাহাই ঋষিদৃষ্টি। এই দৃষ্টি বেদের সর্বত্র প্রতিফলিত।

এই একত্বের তত্ত্ব — আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করি। অগ্নির মধ্যে আমরা দুইটি বস্তু পাই— তাপ ও আলো। এই দুইটি বস্তু বস্তুতঃ দুই নহে, একই। আলোর তরঙ্গ সূর্য হইতে যাত্রা করে। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এই পথ অতিক্রম করিতে আলোর ৮ মিনিট সময় লাগে। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়। এত বড় সূর্যকে আকাশের একধারে আমাদের কাছে প্রভাতকালে একখানি সোনার থালার মত দেখা যায়। সূর্য উদিত হইলে আমরা আলো ও তাপ পাই। আকাশ পথে সূর্য হইতে যে আলোটি আসে, তাহার চলা একটি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মত। আলোর ঢেউয়ের সঙ্গে আরেকটি ঢেউ আসে সেইটি তাপের ঢেউ। সেইটি চোখে দেখি না, স্পর্শে বুঝি। এই দুইপ্রকার ঢেউয়ের একটা নাম দেওয়া যায়, সেইটি হইল তেজ। এই তেজের মধ্যে কম্পন আছে। পাথর হউক, লোহা হউক, বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় তাহারা স্থির, কোন নড়াচড়া নাই। বিজ্ঞান আমাদিগকে জানাইয়াছে যে অণু-পরমাণু এবং সংসারে যত বস্তু আছে, সকল বস্তুই সকল সময় কাঁপিতেছে। এই কাঁপুনিকে বিজ্ঞান বলে Vibration। এই Vibration-এর কারণ বিজ্ঞান কিছু বলিতে পারে না। আর্য ঋষিরা বলিয়াছেন সৃষ্টির আরম্ভে পরম পুরুষ ইচ্ছা করিলেন তিনি বহু হইবেন। এই ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ কম্পনে। বেদান্তদর্শনে সূত্র আছে — "কম্পনাৎ"। এই কম্পনের গতিবেগ যখন কম থাকে তখন তাহা

তাপ। আর যখন সীমারেখা ছাড়াইয়া যায় তখন আলো। বাইবেলের প্রারম্ভে লিখিত আছে ঈশ্বর বলিলেন, "আলো হউক, আর আলো হইল।" এই বলার পিছনে আছে ইচ্ছাশক্তি। এই নিখিল বিশ্বজগৎ এই কম্পন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই কম্পনের উৎস হইল তেজ। পরব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তির এই তেজোরূপ। এই তেজ হইতে বায়ু, জল, মৃত্তিকা, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও হইতেছে।

এই তেজকে বৈদিক ঋষি আর একটি গম্ভীর নাম দিয়াছেন 'ভর্গ'। এই 'ভর্গ' শব্দ প্রথম আমরা পাই ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে।

ভর্গ — √ভৃজ্ + ঘঞ্। ভৃজ্ ধাতুর অর্থ পাক করা। পাক করা অর্থ নাশ করা নহে। পাক অর্থ পরিণতি সাধন করা। ফল পাকিয়াছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন পাকা আমটি ভোগ করা যায়, আহার করা যায় অথবা সুপক্ক আমটি পুঁতিয়া রাখিলে উহার আঁটি হইতে সে আর একটি বৃক্ষের সৃষ্টি করিতে পারে। যে বৃক্ষটি হইতে ঐ আম আসিয়াছে, এরূপ আর একটি বৃক্ষকে সে তখন জন্ম দিতে পারে। তণ্ডুল ও গমকে আমরা পাক করিয়া আহারের যোগ্য অন্ন ও রুটি করি। উহা আহারযোগ্য। বীজ হইতে যে অঙ্কুর হয় তাহাও পাক। অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, তাহাতে ফল ফলে — এই কার্যও পাক। পরিণতি আনয়ন করা বা maturity-তে শব্দ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। পৌঁছানো, এই কার্য করে ভর্গ।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।" (গীতা, ১৫/১৪)

ইহাও ভর্গের কার্য। মহাভারতে বকরূপী যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। "কা চ বার্তা" — এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে ইহার মধ্যে বার্তাটি কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছেন — "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।" নিখিল ভূত সমূহ (ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ- মরুৎ-ব্যোম)-কে কাল পাক করিতেছে। মাস ঋতু, হাতা (দর্বী); সূর্য অগ্নি; রাত্রি দিন ইন্ধন। কাল ভর্গেরই শক্তি। গীতায় আছে ভগবান্ বলিতেছেন কালোঽস্মি। এই যে বিশ্বের মধ্যে একটি বিরাট পাককার্য চলিতেছে — ইহার মূলে ভর্গ। ঐ ভৃজ্ ধাতু হইতেই সেই ভর্গ আসিয়াছে। যে পাক করে সেও ভর্গ যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও ভর্গ। কালও ভর্গ, অগ্নিও ভর্গ। পরিণত অন্নও ভর্গ। ভর্গ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা গোপথ-ব্রাহ্মণে আছে। শঙ্কর সায়ণ, ইঁহারা গায়ত্রী ব্যাখ্যায় ভর্গকে অন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ভর্গই অগ্নি। প্রণব তথা ওঙ্কার বেদের বীজ। তাহার পরিচয় দিয়াছেন শাস্ত্রে সন্ধ্যামন্ত্রে—"ওঙ্কারস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নিঃ

দেবতা।" সর্বনারায়ণ উপনিষদে—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নির্দেবতা, ব্রহ্ম ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ পরমাত্মস্বরূপং সাযুজ্যে বিনিয়োগঃ।" একাক্ষর ওঙ্কার মন্ত্রের দেবতা অগ্নি।

অগ্নিই যে গায়ত্রী মন্ত্রের ভর্গঃ তাহা দীর্ঘতমা ঋষি ঋগ্বেদে ১/১৪১/১ মন্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি ঋ. ২/১/৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন, গায়ত্রীর দেব সবিতা অগ্নিই। অষ্টম মণ্ডলে শ্যাবাশ্ব ঋষি বলিয়াছেন, অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে ঋ. ৮/৩৮/৬ মন্ত্রে — "ইমাং গায়ত্রবর্তনিং", ইহাই হইল গায়ত্রী মন্ত্রের পথ। ঋ. ৮/৩৮/১০ মন্ত্রে বলিয়াছেন ইন্দ্রাগ্নি সম্বন্ধে "যাভ্যাং গায়ত্রমৃচ্যতে", যাঁহাদের (ইন্দ্র ও অগ্নি) কাছে গায়ত্রীমন্ত্র জাগিয়া উঠে সুতরাং গায়ত্রী মন্ত্রের ভর্গ যে অগ্নি, ইহা বৈদিক ঋষিরই দর্শন। ঋষি বৎস অগ্নির জন্মস্থান কোথায় সে সম্বন্ধে বলিতেছেন —

"যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত।" (ঋ. ১০/১৮৭/৫) অর্থাৎ, যে অগ্নি এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ঋত ও সত্যের জন্ম কোন্ স্থান হইতে? ঋষি বলেন (ঋ. ১০/১৯০/১) "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ অভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত", প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে। এই তপস্যাই তাপ ও আলো। তাপ আলোই অগ্নির পরিচয়। প্রজ্বলিত অগ্নিই পর-ব্রহ্মের তপস্যা।

গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন --- "গায়ত্রী ছন্দসামহম্", বেদ সংহিতার মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র। ইহাই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র তাহা হইলে সর্বপ্রথমে অগ্নি ছিলেন কেন? এই কথার উত্তরের জন্যই এতক্ষণ বলিয়াছি অগ্নিই গায়ত্রীর ভর্গ শব্দের বাচ্য। ইন্দ্রসূক্ত ব্যতীত সকল দেবতা অপেক্ষা অগ্নিসূক্তের সংখ্যাও অধিক। অন্য কোন দেবতার পৃথক্ পূজা হয় নাই, ইন্দ্রেরও নহে। অগ্নিতেই অন্যান্য দেবতার পৃথক্ পূজা হইয়াছে। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু ইঁহাদের পৃথক্ কোন পূজা হয় না। অগ্নিপূজা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পার্শীরা অগ্নিপূজক ছিলেন— আজও আছেন। আমরা হিন্দুরা আজও অগ্নিপূজক। আমাদের বিবাহ উপনয়ন বা অন্নারম্ভ — সকল শুভকার্যেই যজ্ঞের প্রয়োজন। এই জন্যই অগ্নিসূক্তদ্বারা ঋগ্বেদের আরম্ভ।

গায়ত্রী

ওঁ "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।" ওঁ (ঋগ্বেদ, ৩/৬২/১০)

বেদপাঠ যেই দিন ইচ্ছা সেই দিনই আরম্ভ করা যাইবে না। আমাদের যে মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, সেইজন্য বেদ পাঠে অধিকার নাই — যোগ্যতা নাই। হিন্দু জীবনে ১০টি সংস্কার আছে। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ সংস্কার উপনয়ন। এই উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়, অর্থাৎ এই সংস্কার হইলে আর একটি জন্ম হয়। সেই জন্ম হইতে আমরা দ্বিজ হই। দ্বিজ হওয়ার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। সামাজিক জীবনে অনেক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের উপনয়ন সংস্কার শুধু ব্রাহ্মণেরই হইয়া থাকে। ঐ সংস্কারের দিন বেদের একটি বিশিষ্ট মন্ত্র আচার্য বালকের কানে দিয়া দেন। ৮ বৎসর হইতে ১২ বৎসর উহার উপযুক্ত সময়। মন্ত্রটি পাইয়া শুদ্ধভাবে উহা জপ করিতে হয়। প্রতিদিন জপ না করিলে দ্বিজত্ব নষ্ট হইয়া যায়। মন্ত্রটি তিন বেদেই আছে। মন্ত্রের দেবতা—সবিতা, দ্রষ্টা ঋষি—বিশ্বামিত্র। মন্ত্রের দেবতা সবিতা বলিয়া উহার নাম সাবিত্রী। মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে আম্নাত বলিয়া উহা গায়ত্রী নামে বিখ্যাত। এইটি বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্রটি যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, গীতায় ভগবান্ তাহা অর্জুনকে বলিয়াছেন। গীতায় দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন — "গায়ত্রী ছন্দসামহম্"। এস্থলে 'ছন্দ' অর্থ বেদ। "বেদের মধ্যে আমি গায়ত্রী"— এই কথা বলিয়াছেন। দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে বলিয়াছেন, যেই যেই বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি বা আমার বিভূতি। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, বেদের মধ্যে গায়ত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। মন্ত্রের সঙ্গে ছাত্রের প্রথম পরিচয় ঘটে আচার্যের মুখ হইতে। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তাহাকে বেদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। সুতরাং বেদ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম গায়ত্রী মন্ত্রের আলোচনা করা প্রয়োজন। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে নিখিল বেদ বীজস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, ইহা আচার্যগণ বলিয়াছেন। বেদ একটি মহীরূহ। গায়ত্রী মন্ত্র তাহার বীজ স্বরূপ।

গায়ত্রী মন্ত্রে প্রথমে বলিতে হয় — "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ"। ইহাদের বলা হয় ব্যাহৃতি। মোট সাতটি ব্যাহৃতি পদ আছে। এই তিনটিকে বলা হয় মহাব্যাহৃতি। এই ব্যাহৃতিগুলি Formula-র মতন। যে স্থানে লাগাও, সেইস্থানেই লাগে।

ভূঃ অর্থ — পৃথিবী, ভুবঃ অর্থ — অন্তরিক্ষ, আর স্বঃ অর্থ — স্বর্গ। অর্থাৎ এই তিন লোক।

আবার ভূঃ অর্থ — অতীত, ভুবঃ অর্থ — বর্তমান, আর স্বঃ অর্থ — ভবিষ্যৎ। আবার ভূঃ অর্থ — জাগ্রত, ভুবঃ অর্থ — স্বপ্ন, আর স্বঃ অর্থ — সুষুপ্তি। আরও গভীর অর্থ, ভূঃ অর্থ — শরীর, ভুবঃ অর্থ — প্রাণ, আর স্বঃ অর্থ — আত্মা, আরও গভীরতর অর্থ, ভূঃ অর্থ — সৎ, ভুবঃ অর্থ — চিৎ, আর স্ব অর্থ — আনন্দ।

ভূঃ — ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে — সৎ।

ভুবঃ — সর্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি চিন্মাত্রমুচ্যতে — চিৎ,

স্বঃ — সুব্রিয়তে ইতি স্বঃ সুখস্বরূপমিতি — আনন্দ।

এই সমুদায় অর্থে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ-র সঙ্গে যুক্ত যে 'সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ', তাঁহাকে ধ্যান করি। এই তিনটি মহাব্যাহৃতি প্রথমে উচ্চারণ করিয়া আদ্যন্তে প্রণব দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিতে হয়। প্রণবের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। প্রণব পদে ওঙ্কার বুঝায়। ভগবান্ বলিয়াছেন — "প্রণবঃ সর্ববেদেষু" (গীতা, ৭/৮)।

ওঙ্কার না বলিয়া প্রণব বলা হয় কেন? ওঙ্কার শব্দটি অতি পবিত্র। সর্ব অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নহে। এই জন্য ইহার আর এক নাম প্রণব। 'প্র' উপসর্গ পূর্বক 'নু' ধাতুর 'অল্' প্রত্যয়ে 'প্রণব'। 'নু' ধাতু অর্থ স্তব করা — ডাকা। প্রণব অর্থ — প্রকৃষ্ট উপায়ে ডাকা। অতি সুন্দর ভাবে ডাকা — প্রীতির সহিত ডাকা। মানুষের অনেক নাম থাকে। একটি পোষাকী নাম হয়। তাহা ব্যতীত আর একটি ডাক নাম (nick name) থাকে। হঠাৎ বহুলোকের মধ্যে কেহ যদি কাহাকেও ডাক নাম ধরিয়া ডাকে, তাহা হইলে তাহার অধিক প্রীতি হয়। বুঝা যায় সে অতি প্রিয়জন। ব্রহ্মের অনেক নাম। কেহ যদি তাঁহাকে 'ওঁ' বলিয়া ডাকে, তাঁহার বেশী প্রীতি হয়। তাহাকে প্রিয়জন মনে করেন। ভগবান্‌কে তুষ্ট রাখিতে এই নামটি সুন্দর মনোহর। এই জন্যই ওঙ্কারকে প্রণব বলে।

ঋষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন — "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ", শ্রেষ্ঠ পুরুষের বাচক শব্দ প্রণব। ঈশ্বর বাচ্য, আর প্রণব বাচক। যেমন গাভী বলিলে একটি বিশেষ প্রাণীকে বুঝায়, যাহার গলদেশে কম্বলের মতন একটি বস্তু আছে, তাহাকে 'সাস্না' বলে। গাভী বলিতে সাস্না বা গলকম্বল বিশিষ্ট

প্রাণীকেই বুঝায়। সেই প্রকার ওঙ্কার বলিতে পরমপুরুষকে বুঝায়। আদিতেও তিনি, অন্তেও তিনি। ইহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে দুইবার ওঙ্কার দ্বারা পুটিত করা হয়।

(১) তৎ, (২) সবিতুঃ, (৩) বরেণ্যম্, (৪) ভর্গঃ, (৫) দেবস্য, (৬) ধীমহি, (৭) ধিয়ঃ, (৮) যঃ, (৯) নঃ, (১০) প্রচোদয়াৎ।।

১।	তৎ—সেই,	৬।	ধীমহি—ধ্যান করি,
২।	সবিতুঃ—সবিতার,	৭।	ধিয়ঃ—বুদ্ধি সমূহের,
৩।	বরেণ্যং—বরণীয়, সম্ভজনীয়,	৮।	যঃ—যিনি,
৪।	ভর্গঃ—জ্যোতি,	৯।	নঃ—আমাদের,
৫।	দেবস্য—দেবতার,	১০।	প্রচোদয়াৎ—প্রণোদিত করেন।

"সবিতুর্দেবস্য" — সবিতৃদেবতার, "তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ" — সেই বরণীয় জ্যোতি, "ধীমহি" — ধ্যান করি। "যো নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ" — যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রণোদিত করেন, তিনিই প্রণোদিত করুন। অর্থাৎ যিনি বিশ্ব জগতের প্রসবিতা, সেই ক্রীড়াময় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতি আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের মন ও বুদ্ধিকে শুভকার্যে প্রেরণা দিতেছেন — তিনিই যেন চিরদিন দিতে থাকেন; এই প্রার্থনার তাৎপর্য এই যে, আমার ক্ষুদ্রতা হেতু কোনও না কোনো ত্রুটি বা অপরাধবশতঃ প্রচোদনের বিরোধ না হয়। এই জন্য তাঁহার ইচ্ছা মতই আমাকে তাঁহার দিকে প্রচোদন করেন।

যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক মন্ত্রটিও গায়ত্রী। Colebrooke অর্থ করিয়াছেন — "Let us meditate on the adorable light of the Divine Ruler Savitri. May it guide our intellect." সাহিত্য সম্রাট্ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদ করিয়াছেন — "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।"

এই গায়ত্রী ঋগ্বেদের অন্তর্গত তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের দশম মন্ত্র। সায়ণাচার্য এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে চার প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি আগে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থ করিয়াছেন। আমাদের ধী-বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন। "যিনি প্রেরণ করেন", এই বাক্যাংশ একটি বিশেষণ-স্বরূপ। এই বিশেষণটি সবিতারও হইতে পারে, ভর্গেরও হইতে পারে। সবিতার হইলে অর্থ হইবে আমার বুদ্ধি সমূহকে যিনি প্রেরণ করেন সেই সবিতা, তাঁহার ধ্যান করি। এই বাক্যাংশ সবিতার বিশেষণ।

এই বাক্যাংশ যদি ভর্গের বিশেষণ হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে — যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন, সবিতার সেই ভর্গকে ধ্যান

করি। এস্থলে ''ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'' এই বাক্যাংশটি ভর্গের বিশেষণ। এই মন্ত্রে সবিতা অর্থ জগৎস্রষ্টা, আর সবিতার সেই তেজ, যাহা ভর্গ বা জ্যোতিরূপে আমাদের বুদ্ধিকে চালনা করেন, তাঁহাকে ধ্যান করি।

তৃতীয় অর্থ — সবিতা অর্থ সূর্য। ভর্গ অর্থ মণ্ডল। যে সূর্যমণ্ডল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চালনা করেন সেই সবিতৃমণ্ডলকে ধ্যান করি।

আর চতুর্থ অর্থ — সবিতা অর্থাৎ সূর্য। ভর্গ অর্থ অন্ন। এস্থলে অর্থ হইবে সূর্যের প্রসাদে যে আমরা অন্ন পাই, সেই অন্নকে আমরা ধারণ করি 'ধারয়ামঃ'। ''আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নম্''।

সূর্য যে কিরণ বিস্তার করিয়া শস্য অন্ন উৎপাদন করেন, সেই রবিশস্য দ্বারাই আমরা প্রাণ ধারণ করি।

পূর্বমীমাংসাকার বলিয়াছেন — সকল বেদের মন্ত্রই সমান মূল্যবান্ নহে। যে মন্ত্রে কোনও ক্রিয়া নাই অর্থাৎ আমাদের কিছু করিতে বলা হয় নাই, শুধু কতকগুলি কথা, তাহা প্রায়শই নিরর্থক। যেমন, ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'' এই বাক্যে শুধু কতকগুলি কথা মাত্র। কিছু করিতে বলা হয় নাই। কিন্তু যদি বলেন, ''অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'' — প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক করিবে— এস্থলে আমাকে কিছু করিতে বলা হইয়াছে। এই মন্ত্র সার্থক, অর্থাৎ অর্থযুক্ত। ইহা পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনির মত। গায়ত্রী মন্ত্র নিরর্থক নহে। কারণ ইহাতে আমাদের কিছু করিতে বলা হইয়াছে। কি বলা হইয়াছে? 'ধীমহি'। ধ্যান করিতে। ঋষি বলিয়াছেন — আমি ধ্যান করি। কিন্তু ক্রিয়া দিয়াছেন বহুবচনের। 'ধীমহি' অর্থ ধ্যায়েমঃ। অর্থাৎ আমরা ধ্যান করি। অথবা ঋষি বিশ্ববাসীর কাছে একাত্ম বোধ করিয়া বলিয়াছেন — আসুন বিশ্ববাসী, আমরা সকলে মিলিয়া ধ্যান করি।

মুখ্য ক্রিয়াপদ 'ধীমহি' — সকলে মিলিয়া ধ্যান করি। কাহাকে ধ্যান করিব? ভর্গকে। 'ভর্গ' অর্থ জ্যোতি। জ্যোতিকে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। জ্যোতি কাহার? ''তৎ সবিতুর্বরেণ্যং'' জ্যোতি। সেই বিখ্যাত সবিতৃদেবতার বরণীয় জ্যোতি।

সবিতা অর্থ সূর্য। সূর্যের জ্যোতিঃকিরণমালা তেজোরাশি। সেই জ্যোতি আমাদের সকলের বরণীয়, আদরণীয়। কিন্তু সূর্যের জ্যোতি তাঁহার নিজের নহে। এই জ্যোতি তাঁহার ধার করা। কাহার নিকট হইতে ধার করিয়াছেন? গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —

> ''যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্।।'' ১৫/১২

অর্থ — সূর্যের যে তেজ সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়েতেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে উত্তমপুরুষ বলিয়াছেন —

"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।" ১৫/১৮

সুতরাং গায়ত্রী মন্ত্র আমাদের বলিতেছেন, উত্তম পুরুষের বরণীয় জ্যোতি, এসো আমরা ধ্যান করি। এই ভর্গ বা জ্যোতির বিশেষণ দিয়াছেন — 'দেবস্য'। 'দিব্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। 'দেবস্য ভর্গঃ' অর্থ হইল — যিনি নিয়ত ক্রীড়াময়, লীলাময়, তাঁহার জ্যোতিকে ধ্যান করি। 'দেব' শব্দের আর একটি অর্থ 'প্রকাশমান'। ক্রীড়াময় লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের যে জ্যোতি সর্বদাই প্রকাশিত, সেই জ্যোতিকে ধ্যান করি। গীতায় এই অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে আর একটি পরিচয় দিয়াছেন — তিনি 'পরমাত্মা'।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।" (গীতা, ১৫/১৭)

পরমাত্মার এই জ্যোতি শুধু সূর্যকেই আলোকিত করে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও আলোকিত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সূর্য আছে। তাঁহারা সকলেই এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন — যাঁহাকে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"।

এই বরেণ্য ভর্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। তাহাই আমাদের ধ্যানের বিষয়। 'তৎ সবিতুঃ' সেই বিখ্যাত সবিতৃদেবতার, এই অর্থ না করিয়া, অর্থাৎ 'তৎ'কে সবিতার বিশেষণ না করিয়া, 'তৎ' শব্দকে বিশেষ্য ধরিয়া 'ব্রহ্ম' অর্থ করা যায়। প্রমাণ — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্ম অর্থেই 'তৎ'-কে ধরা হইয়াছে।

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীতা, ১৭/২৩)

'তৎ' ও 'ভর্গঃ' শব্দ অভিন্ন। অর্থ হইল — ব্রহ্ম স্বরূপ যে জ্যোতি অথবা জ্যোতিঃস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে ধ্যান করি। 'তৎ' শব্দ ব্রহ্মের সমানাধিকরণ।

সেই জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি কেন? তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? উত্তর দিয়াছেন— "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" প্রচোদয়াৎ অর্থ পরিচালনা করেন, প্রেরণা দেন। 'যো নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ', 'ধী' শব্দের অর্থ বুদ্ধি। আমাদের অন্তঃকরণের যে বৃত্তিসমূহ, উহার কেন্দ্রস্থ (Centre) যাহা, তাহাই 'ধী'। সেই জ্যোতি আমাদের ধী-কে প্রণোদিত করেন। কোন্দিকে প্রণোদিত করেন? মন্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই। বুঝিতে হইবে, তিনি পরম মঙ্গলময়, সুতরাং মঙ্গলের দিকেই প্রণোদিত করেন। তবে

আমরা অন্যপথে যাই কেন? যখন আমরা আমাদের 'অহং' দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলি, তখন আমরা অমঙ্গলের পথে যাই। আমাদের অহং কর্তৃত্বাভিমান সরিয়া গেলে আমরা বুঝি, সর্বদাই আমাদের মঙ্গলের পথে তিনি প্রণোদিত করেন।

সায়ণাচার্যকৃত গায়ত্রী মন্ত্রের বেদভাষ্যে যেমন চার প্রকার অর্থ দেখানো হইয়াছে তদ্রূপ শংকরাচার্য প্রমুখ আচার্যগণেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়। কয়েকখানি উপনিষদেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রের নানারকম অর্থ হয় কি করিয়া? এক হয় প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন অর্থ করিয়া, আর দ্বিতীয় হয় বৈয়াকরণ শৈলী দ্বারা। বৈয়াকরণদের শৈলী কিরূপ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যাইতেছে।

তৎ— 'তৎ' শব্দের অর্থ গীতা মতে 'ব্রহ্ম' করা যায়। গীতা বলেন— 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি ব্রহ্মের বাচক। শঙ্কর বলেন— "তৎ শব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।" আর একটি অর্থ হইল 'সবিতুঃ' অর্থাৎ সেই শ্রুতি শাস্ত্রের বিখ্যাত সবিতৃদেবতার, এইরূপ অর্থ করা যায়। আবার 'তৎ' কে ভর্গের বিশেষণ করিয়া দুই রকম অর্থ করা যায়। 'তৎ' শব্দটি ভর্গের বিশেষণ অথবা সমানাধিকরণ। অর্থাৎ এক অর্থ সেই ভর্গ।

সবিতুঃ— সকলেই জানেন সবিতা অর্থ সূর্য। অপর সবিতা অর্থ বিশ্ব প্রসবিতা, সূ—প্রসবে। শংকর বলেন এইপদে ব্রহ্মই লক্ষ্য। নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিহীন, জগৎ প্রসব করা ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত। যেমন রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্প অধ্যস্ত হইয়াছে। অন্ধকারে সর্প দর্শন হয়। আলো আসিলে সর্প থাকে না। সর্প যখন দৃষ্ট হয় তখনও নাই, আগেও ছিল না, পরেও থাকিবে না। ত্রিকালে সর্পের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সর্প মিথ্যা, মায়া-বিজৃম্ভনম্ মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান উদয় হইলে দেখা যায় রজ্জুই ছিল। আমার জ্ঞান হওয়ার পূর্বেই ছিল। জ্ঞান হওয়ার পরেও আছে। সুতরাং অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং জগৎ প্রসবিতা সবিতুঃ পদে ব্রহ্মই লক্ষীভূত। সবিতুঃ শব্দটি ষষ্ঠী বিভক্তি। এই ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের অর্থ এইভাবে করা যায়—সবিতার ভর্গঃ আবার নিরর্থক অর্থে হয় না, কেননা রাহুই শির (মাথা), তদ্রূপ 'সবিতার ভর্গঃ' এই প্রকার ব্যাখ্যায় কোন অর্থ হয় না। কেননা সবিতাই ভর্গঃ। ইংরাজীতে গভর্নরকে লেখা হয় 'His excellency'। এই His-এর অর্থ গর্ভনর নিজেই। অর্থাৎ তাঁহার মর্যাদা তিনি নিজেই। সেইরূপ সবিতার ভর্গ।

সবিতা বলিতে সাধারণতঃসূর্যকে বুঝায়। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে এই যে 'সবিতুঃ' শব্দ, উহার অর্থ অতিব্যাপক, অতি গূঢ়, ঋক্ সংহিতার পঞ্চম

মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্ত সবিতৃ দেবতার উদ্দেশ্যে। তাহার আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—সবিতা দ্রষ্টা ও প্রেরণাদাতা। সবিতা দিব্য জ্ঞানের উৎস 'Source of Divine Knowledge', সমস্ত জ্ঞানদাতা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তা। বিশ্বে উভয় জীবনের অসীম মঙ্গলদাতা ও সুখদাতা। সবিতা স্বীয় শক্তিতে ও মহিমায় আমাদের পার্থিব জগৎ সমূহের স্থিরত্ব রক্ষা করেন। জ্যোতির দিব্য সূর্যালোকে সবিতার একাংশের মহত্ত্ব ব্যক্ত। সবিতা নিখিল সৃষ্টির একমাত্র কর্তা।

প্রথম মণ্ডলের ১/৩৫/২ মন্ত্রে সবিতার কথা বলিয়াছেন—

"আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।"

সূর্য বহিরাকাশের, সবিতা অন্তরাকাশে দেদীপ্যমান। বহিরাকাশের সূর্য সকলের চির পরিচিত। অন্তরাকাশের সূর্য—যাঁহার বিশিষ্ট নাম সবিতা, সকলের সর্বান্তর আত্মা। সবিতার বরেণ্য বিশেষণটি আলোচনা করিলে সবিতার রহস্য বিশেষভাবে ভেদ হইতে পারে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাব্যান্ শ্রদ্ধয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন উচ্যতে।।"

বহিরাকাশে সূর্যমণ্ডলের অন্তঃস্থ পুরুষ সবিতা। আমরা নিত্য যে সূর্য দেখি তাহা অপেক্ষা গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতার পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সূর্য একটি জ্যোতির পিণ্ড। আর সবিতা জ্যোতির জ্যোতি "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ", "যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" (কঠ, ২/২/১৫) উবটের মতে সবিতা সর্বপ্রসবিতা। আদিত্যের অন্তর-পুরুষ বিজ্ঞানানন্দস্বভাব ব্রহ্ম। মহীধর মতে সবিতা প্রেরক অন্তর্যামী বিজ্ঞানানন্দস্বভাব। সায়ণ মতে সবিতা সর্বান্তর্যামী। প্রেরক অন্তর্দ্রষ্টা পরমেশ্বর। দৃশ্য সূর্যমণ্ডল সবিতার বিভূতির কলামাত্র। সবিতার সত্তায় অসংখ্য সূর্যমণ্ডল সত্তাবান্। সবিতা সূর্যের সূর্য। অসংখ্য সৌরমণ্ডল সবিতাকে পরিক্রমণ করে।

বরেণ্যং — 'বরেণ্যং' অর্থ বরণীয়। অনুসন্ধেয় বা পূজনীয় শ্রেষ্ঠ। 'বরেণ্যং' ভর্গের বিশেষণ। সকলের আরাধ্য, উপাস্য ও ভজনীয়। অথবা ইহাকে প্রচোদন কার্যের ক্রিয়াবিশেষণ করা হয়। তাহাতে কিরূপ অর্থ দাঁড়ায় ক্রমে বলা হইবে।

ভর্গঃ — ভ্রস্জ ধাতুর সহিত ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে 'ভর্গ' শব্দ। ভ্রস্জ ধাতুর অর্থ পাক করা। কর্তৃবাচ্যে অর্থ হইবে যে পাক করে। কর্মবাচ্যে অর্থ হইবে, যাহাকে পাক করে। 'যে পাক করে' অর্থে সূর্যের কিরণ বুঝাইবে। আর যাহা পাক করা হয় অর্থে অন্ন বুঝাইবে। শংকর মতে,

পাক করা অর্থ—বিনাশ করা। যে বিনাশ করে, অবিদ্যাকে যে বিনাশ করে, সে-ই ভর্গ। অবিদ্যা বিনাশ করে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্যোতি। এই অর্থটি বিবর্তবাদের পক্ষে।

ভ্রস্জ্ ধাতুর ঠিক অর্থ পাক করা নহে, সিদ্ধ করা। সিদ্ধ করা অর্থ নাশ করা নহে, গ্রহণের উপযুক্ত করা। চাউলকে আহার করা যায় না, আটাও নহে; ভাত রুটি প্রভৃতিতে পরিণাম প্রাপ্ত করানো হয়, তবেই গ্রহণের উপযুক্ত হয়।

ভর্গ শব্দের আর একটি অর্থ হইল যাতায়াত।

ভরগ = ভ — ভাসয়তি, প্রকাশয়তি।
র — রঞ্জয়তি।
গ — গময়তি।

জগৎকে প্রকাশিত করেন ব্রহ্মজ্যোতি। জগৎ রঞ্জনও করেন ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। আর গতি অর্থ হইল আসা -যাওয়া। তিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ রূপে জগতের বাহিরে আছেন, আবার উপাদান কারণরূপে জগতের ভিতরে আছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" — এই সূত্রানুসারে তিনি সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব তিনি বিশ্বগ ও বিশ্বাতিগ (Transcendent এবং immanent)। এই যাতায়াত যিনি করেন তিনি ব্রহ্ম।

দেবস্য — 'দেবস্য'কে সবিতুঃ র বিশেষণ করা যায় অথবা ভর্গের সম্বন্ধীও করা যায়। 'দেবস্য ভর্গঃ' বলা যায়, 'দেবস্য সবিতুঃ' বলা যায়। 'দেব' শব্দ অর্থ দীপ্তিমান্ জ্যোতিষ্মান্। আবার 'দেব' শব্দ অর্থ ক্রীড়াময়। ক্রীড়াময় অর্থ ধরিয়া ভগবানের সৃষ্টিলীলা, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। সৃষ্টিলীলাটি পরমেশ্বরের ক্রীড়া। ক্রীড়া মানে লীলা, "দিবু ক্রীড়ায়াম্"। অর্থাৎ লীলাময় যে পরমেশ্বর তাঁহার।

ধীমহি — 'ধীমহি' অর্থ ধ্যায়েম অথবা ধারয়াম। আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি অথবা তাঁহাকে ধারণ করি। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" — এই বাক্যাংশকে সবিতার পরিচয়ও বলা যায়, ভর্গের পরিচয়ও বলা যায়। সবিতার পরিচয় অর্থ এই যে, আমাদের বুদ্ধিকে যিনি প্রচোদিত করেন সেই সবিতার বরেণ্য ভর্গকে আমরা ধ্যান করি। আর ভর্গের বিশেষণ করিলে অর্থ হইবে সবিতার যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করেন, তাঁহাকে ধ্যান করি।

প্রচোদয়াৎ — 'প্রচোদয়াৎ' পদের অর্থ প্রচোদনা করেন, প্রচোদনা করুন, তিনি যেন প্রচোদনা করেন। এই তিন রকম অর্থ করা যায়। 'প্রচোদনা' শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রেরণা বা কর্ম প্রবর্তনা (চুদ্ প্রেরণে)।

প্রযোজ্য, প্রযোজক, উপায় ও উপেয় এই চারটি বস্তু প্রচোদনারূপ কার্যে প্রয়োজন। বিশ্বের প্রসবিতা সবিতা, যাঁহার বরেণ্য ভর্গ আমরা ধ্যান করি, 'যঃ' পদে তিনিই উদ্দিষ্ট, তিনিই প্রযোজক। আমাদের 'ধিয়ঃ' সকল বুদ্ধি প্রযোজ্য। এখন কি উপায়ে প্রেরণা কার্যটি করেন, কেনই বা করেন, কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য সাধন করিবার আশায় — অনুসন্ধেয়।

শিষ্যের প্রতি গুরু কহিলেন, এখন বেদপাঠ কর। শিষ্য ব্রতী হইল। এস্থলে উপায় হইল উপদেশ, উপেয় হইল বেদাধ্যয়ন। গুরু উপদেশ দ্বারা শিষ্যের ধী-কে বেদপাঠে প্রবর্তিত করিলেন। রাখাল বালক বহু পাঁচনি প্রহার করিয়াও গাভীটিকে গৃহের পথে লইতে পারিতেছে না। আপনি তাহার বাছুরটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন। গাভী আপনার পশ্চাৎ চলিল। এস্থলে উপায় বাৎসল্য প্রীতি, উপেয় অভিলষিত পথ।

প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে কর্মপ্রবর্তনা দৃষ্ট হয়। ভীতিপূর্বিকা, নীতিপূর্বিকা ও প্রীতিপূর্বিকা।

ভীতিপূর্বিকা— একটি গাভীকে পথ হইতে গৃহে আনিতে হইলে লাঠি দেখাইয়া প্রহার করিয়া গৃহে লওয়া যায় — ইহা ভীতির দ্বারা। শাস্ত্র আমাদের নরকের ভয় দেখাইয়া ও স্বর্গভ্রষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়া অনেক কর্মে প্রবর্তিত করেন। এইটি ভীতির দ্বারা। নরকে যাওয়া ভীতির কাজ। স্বর্গে না যাইতে পারাও ভীতি। ইহাদিগকে পুনরায় সামান্য বিশেষ দুই ভাগে ভাগ করা চলে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার ভয়ে বিদ্যার্থী পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এস্থলে সামান্য ভীতি, কর্মের প্রবর্তক। ভর্ৎসনা বা প্রহারের ভয়ে বিদ্যার্থী পাঠ তৈয়ারী করিতেছে। এস্থলে বিশেষ ভীতি প্রবর্তনের হেতু। শাস্ত্রেও এইরূপ পরকালের সুখাভাবের ভীতি বা বিশেষ কোন ভয়াবহ নরকের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা কর্মে প্রবর্তনা দৃষ্ট হয়। এই প্রেরণা অতীব নিম্নস্তরের।

নীতিপূর্বিকা — অর্থাৎ সদুপদেশ দেওয়া। অর্জুনের কর্তব্য ছিল যুদ্ধ। অর্জুন বলিয়াছিলেন — যুদ্ধ করিব না। কৃষ্ণ সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিকে ঘুরাইয়া দিলেন। বুদ্ধি যখন স্থির হইল, তখন অর্জুন বলিলেন — "করিষ্যে বচনং তব"। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম — এই শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা অর্জুনকে যে যুদ্ধ করাইলেন, ইহা হইল নীতির দ্বারা। আচার্য শিষ্যকে ও মহাপুরুষরা মানব জাতিকে শুভপথে চালনা করেন নীতির দ্বারা। ভীতি হইতে নীতির পথ উত্তম।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" — নিত্য বেদপাঠ করিবে, এই শাস্ত্রীয় সামান্য নীতি অনুসারে বিদ্যার্থী নিত্য বেদপাঠ করিতেছে। "প্রত্যহ প্রভাতে দণ্ডকাল বেদাবৃত্তি করিবে", আচার্যের এইরূপ বিশেষ উপদেশ হেতু

বিদ্যার্থী নিয়মিত বেদাভ্যাস করিতেছে। এই সকল স্থলে সামান্য ও বিশেষ নীতি হইল উপায়। বেদাভ্যাস হইল উপেয়। নীতির প্রেরণা মধ্যম স্তরের।

প্রীতিপূর্বিকা — শ্রীভগবান্‌কে সর্বলোক-মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া (সর্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাম্) তাঁহাকে ভজন করিবার জন্য কাহারও চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হইয়াছে। এই ভজন প্রবর্তনা সামান্য প্রীতিমূলক। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া প্রীতিপূর্ণ প্রেমপূর্ণ আহ্বানে আকর্ষণ করিয়া গোপীদিগকে ঘরের বাহির করিয়া টানিয়া আনিয়াছিলেন। আবার কাহারও বা "স্বপদরমণ" বৃন্দাবনের পথে যমুনার তটে জলদবরণ কোনও অনির্বচনীয় নটবর বপু দর্শন করিয়া "মোর মনে হয় বিজুরী হয়ে, জড়ায়ে থাকিগে ও মেঘে গিয়ে" এইরূপ সাধ হইয়াছে।

পরমেশ্বর জীবকে অন্যায় পথেও আকর্ষণ করিতে পারেন। যেমন গীতায় বলিয়াছেন — "দ্যূতং ছলয়তামস্মি"। ছলা-কলা কার্য সমূহের মধ্যে আমি দ্যূত ক্রীড়া। এই দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা যখন আকর্ষণ করেন তখন অন্যায়ভাবে আকর্ষণ করেন। যুধিষ্ঠিরের মত মহাধার্মিক ব্যক্তিকেও দীর্ঘকাল বনবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। আর যখন শুভকর্মের দিকে আকর্ষণ করেন তখনই তাহা মহামঙ্গল ও কল্যাণকর হয়। পরোপকার, সমাজ সেবা ইত্যাদি শুভ কর্ম। এই কর্ম দ্বারা ভগবান্ আমাদের আকর্ষণ করেন। আর অর্জুনের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়াছেন ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যকর্মের দিকে। গোপীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন কর্তব্যের দিকে নহে, কর্তব্য লঙ্ঘন করিয়া আত্ম-সমর্পণের দিকে, আপনার নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নীতি দ্বারা কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ সুন্দর, কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রীতি দ্বারা আপনার প্রতি আকর্ষণ সুন্দরতর। যখন ভগবান্ প্রীতির দ্বারা আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন, তখন সেই আকর্ষণ বরেণ্য। প্রচোদনটি গোপীদের প্রতি বিশেষরূপে ব্যবহার করা চলে।

ভীতির আবেদন জৈব, প্রায়শঃ দেহ-দৈহিকে বা মনের নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ। নীতির আবেদন মানবীয়, চিত্তের উচ্চতর স্তরে ইহার অভিব্যক্তি। প্রীতির আবেদন আত্মিক, নিখিল আত্মচৈতন্য ভূমিতে ইহার পরিব্যাপ্তি ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি। প্রিয়ত্ব আত্মার নিত্যধর্ম। এই নিত্য ধর্ম অবলম্বনে আত্মার দ্বারা যে প্রেরণা তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

বিভিন্ন প্রাপ্য বস্তুর প্রতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির গতিও বহুমুখী। দুঃখী জীব সুখী হইতে চায়, "সুখং মে ভূয়াৎ"। সুখ কামনা করিয়া সে ইতি-উতি প্রধাবিত হয়। এই শৃঙ্খলাহীন ছুটাছুটিকেও মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে— ভুক্তিমুখী, মুক্তিমুখী ও ভক্তিমুখী।

গায়ত্রী মন্ত্রে প্রেরণকর্তা স্বয়ং তিনি যদি কখনও নিজ প্রেমামৃত ঢালিয়া কাহারও বুদ্ধি আকর্ষণকরতঃ নিজাভিমুখেই প্রেরণ করেন অর্থাৎ টানিয়া আনেন, তাহা হইলেই গায়ত্রীর বুদ্ধি প্রবর্তনা কার্যটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়।

নিখিল শাস্ত্রের কেন্দ্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীভগবানের লীলামন্দির। ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধ মন্দিরের পার্শ্বদেবতা। দশম স্কন্ধ গর্ভ মন্দির। বৃন্দাবনলীলা গর্ভমন্দিরের রত্নবেদী। পঞ্চাধ্যায়ী সেই বেদীতে সমাসীন শ্রীবিগ্রহ।

তিনি নিজ প্রেমমধু বংশীধ্বনি রূপে প্রেরণ করিয়া ব্রজবধূগণের মন আকর্ষণ করিলেন। তাঁহাদের 'ধী' প্রচোদিত করিলেন। ইহাই প্রচোদনের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'প্রচোদয়াৎ', শব্দটি বিধিলিঙ্। বিধিলিঙের অর্থ দুইটি। তিনি আমার বুদ্ধিকে প্রচোদিত করেন, সবটাই করেন, সকল কালেই করেন। তবে আমি অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে প্রচোদনা করিতে দিই না। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদের প্রণোদিত করিলেন তাহা ভোগের দিকে নহে, কর্মের দিকে নহে, কর্তব্যের দিকে নহে, মোক্ষের দিকে নহে — প্রণোদিত করিলেন আপনার রসিকশেখর স্বরূপের দিকে। তাঁহারা উন্মাদিনীবৎ ছুটিলেন, "স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ", যেথায় লীলাপুরুষোত্তম প্রাণদয়িত বিরাজমান। "কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ" বধূগণ যখন "অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ" হইয়া সমুদ্রাভিসারিণী বেগবতী স্রোতস্বতীর মত ছুটিয়া আসিতেছেন (আজগ্মুঃ), ঠিক তখনই ব্রহ্মগায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ' কথাটি পূর্ণতমতা প্রাপ্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, এই দাবী তখনই সার্থকতা লাভ করিল।

নঃ — 'নঃ' অর্থ আমাদিগকে, বহুবচনে নির্দেশ। কেহ কেহ বলিয়াছেন শিষ্যাভিপ্রায়ে বহুবচন। গুরু বলিতেছেন, হে শিষ্যগণ! তোমাদের ও আমাকে যিনি প্রচোদিত করেন অথবা অর্জুনকে যিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন — তাহা কেবল একা অর্জুনকে নহে। কৃষ্ণের উপদেশের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মনুষ্যকুল কর্তব্যবুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। গোপীগণকে যে আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা বহু ছিলেন। 'নঃ' শব্দের অর্থ যদি সকলকে, সকল মানবজাতিকেই, পুরুষ নারী ছোট বড় নির্বিশেষে অর্থ করা যায়, তাহা হইলে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরই উদ্দিষ্ট হন, যিনি নিজের রূপমাধুর্য ও লীলামাধুর্যের দ্বারা অগণিত নরনারীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে 'নঃ প্রচোদয়াৎ' কথাটি মহাপ্রভুর প্রেরণায় সার্থক হইয়াছে। বিশ্বমানব সকলেই যদি

ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, যাহাকে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন 'মহাউদ্ধারণ', তাহা সার্থক হইবে।

প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি—বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্র মধুচ্ছন্দা দুইজনেই ক্ষত্রিয়। বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র ও প্রথম মন্ত্রটির দ্রষ্টা পুত্র মধুচ্ছন্দা। যে মন্ত্র পাইয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হয় সেই মন্ত্রটি ক্ষত্রিয়ের দান; আর হিন্দুর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ—তাহা হাতে লইয়াই প্রথমে যে মন্ত্রটি পড়ি, তাহার দ্রষ্টা ঋষিও ক্ষত্রিয়। পণ্ডিত কবি ভর্তৃহরি তাঁহার ভট্টিকাব্যে লিখিয়াছেন, "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম্"। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বাঁচাইয়া রাখে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বাঁচাইয়া রাখে। যেদিন হইতে ভারতের ক্ষাত্রশক্তির পতন হইয়াছে, সেদিন হইতেই ব্রাহ্মণ্যশক্তিরও পতন আরম্ভ হইয়াছে। ৫৫০ বছর আরবীয়, আর ২০০ বছর ইংলণ্ডীয় জাতির শাসনপর্বে ভারতীয় ক্ষত্রিয় জাতি তাঁহাদের ক্ষমতা হারায়। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শক্তিরও অধঃপতন ঘটে। অধঃপতন হইতে হইতে প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার পর এই পঞ্চাশ বছরেও, না ক্ষত্রিয় শক্তি, না ব্রাহ্মণ্য শক্তি, কাহারও কোন জাগরণ হয় নাই। এই পঞ্চাশ বছর যাঁহারা ভারতের শাসক, তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে আশ্রয় করিয়াছেন। ধর্মহীন হইলে ভারতীয় জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আবার বৈদিক প্রসঙ্গে আসিতেছি।

প্রসঙ্গে বলিয়াছি, পরমেশ্বর জীবকে অন্যায় পথেও আকর্ষণ করেন। কথাটি বিচারসহ। ভগবান্ করুণাময়। তিনি জীবকে অন্যায় পথে আকর্ষণ করিবেন কেন? জীবই তাহার কর্মের জন্য বিপরীতে চলে। কোনও কোনও প্রাজ্ঞ সাধকের মত—যখন 'বরেণ্য ভর্গঃ' বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়, অবরেণ্য ভর্গও আছে; সেইটি আমাদের ধ্যানের যোগ্য নহে। সেই অবরেণ্য ভর্গের নাম কাম—যে কামের অগ্নিতে আমরা পুড়িয়া মরি। এই অবরেণ্য ভর্গের আর এক নাম কাল— যে কালের অগ্নিতে সমস্ত ভূতগণ নিয়ত পচ্যমান ("ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা", মহাভারত)। মানুষের অন্তরে জ্বলিতেছে কামাগ্নি, আর বাহিরে জ্বলিতেছে কালাগ্নি। এই উভয় অগ্নি দ্বারা নিয়ত দগ্ধীভূত হইতেছে জীবনিবহ এবং আকুলভাবে তাহা হইতে নিস্তারের পথ খুঁজিতেছে। আমরা তাই গায়ত্রীর কাছে আসিয়াছি বরণীয় ভর্গের অন্বেষণে, যাঁহাকে অবলম্বন করিলে পাইব পরিত্রাণ—কাম ও কালের বিশ্বগ্রাসী তাপ হইতে।

আর একটি কথা বলা হইয়াছে, সবিতা ও তাঁহার ভর্গ অভিন্ন।

সবিতুঃ— এই ষষ্ঠী বিভক্তি অভেদার্থে। ভেদার্থেও অর্থ করা যায়। ভর্গ যেন সবিতার ঠিক কেন্দ্রস্থিত বস্তুটি। সবিতার মধ্য কেন্দ্রে যাইতে হইলে এই ভর্গের পথে যাইতে হইবে। 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থে আছে যে, পরম পুরুষোত্তমের অঙ্গজ্যোতিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের কান্তি বা ছটা। সবিতাই এই পুরুষোত্তমের অঙ্গজ্যোতি। তিনি জ্যোতির অভ্যন্তরে। অভ্যন্তরেই রহিয়াছেন 'বরেণ্য ভর্গঃ'। জ্যোতির মধ্যে একটি বিরাট ঐশ্বর্যের ঝলক। জ্যোতি পার হইয়া যখন কেন্দ্রে ভর্গতে পৌঁছাই, তখন দেখা পাই মাধুর্য বিগ্রহের। জ্যোতি তেজোময়, চক্ষু ঝলসায়; মাধুর্য প্রেমময়, চক্ষুকে নিজ মধুরতা ভরিয়া ভর্গের দিকে আকর্ষণ করেন। ভর্গ অর্থ যিনি ভরিয়া দেন। কৃপায় ভরণ করেন, কারুণ্যামৃতে তোষণ করেন, মাধুর্যামৃতে আত্মসাৎ করেন।

গায়ত্রীর একটি প্রণাম মন্ত্র আছে—

ওঁ আয়াহি বরদে! দেবি! ত্র্যক্ষরে! ব্রহ্মবাদিনি!
গায়ত্রি! ছন্দসাং মাতঃ! ব্রহ্মযোনি! নমোঽস্তু তে।।"

এই মন্ত্রে গায়ত্রীকে ব্রহ্মযোনি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মযোনি অর্থ ব্রহ্ম যাহার উদ্ভবস্থল। গায়ত্রী যদি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম হয়—তাহা হইলে কেন্দ্রস্থলের ভর্গ হইবে সেই জ্যোতির উদ্ভবস্থল। যেন সুগন্ধ পুষ্পের পাপড়ি ও পরাগ। পাপড়ির যে সুবাস তাহার উদ্ভবস্থল মধ্যবর্তী কিঞ্জল্ক এই ভর্গ। কিঞ্জল্ক ত্রিভুবনরমণ মাধুর্যের খনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র। আর সবিতায় তাঁহার ঐশ্বর্যময় বিকাশ। অপরিসীম বিভূতিময় অঙ্গকান্তির ভাস্বর ছটা। 'সবিতুঃ' এই ষষ্ঠী বিভক্তির মধ্যে অভেদ ও ভেদ বা অচিন্ত্যভেদাভেদের দর্শন পাওয়া যায়।

প্রণব

উপনিষদ্ বলিতেছেন, গাছের সব পাতা যেমন কাণ্ডের সংগে যুক্ত, ঠিক একইভাবে সব শব্দই একত্রিত আছে 'ওঁ' উচ্চারণের মধ্যে। 'ওঁ'-ই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। শুধু মানুষই নহে, সমগ্র মহাবিশ্বেরও এই একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা আছে সরলীকরণের মাধ্যমে, এবং ঈশ্বর নিজেও তাহাই চাহেন।

'ওঁ'-এর প্রথম অর্থ হইল, অন্য কোন অর্থ যুক্ত না করিয়া মূলতত্ত্বকে ঘনীভূত রূপ দেওয়া এবং সহজ করা। 'ওঁ'-এর দ্বিতীয় কার্য মানুষের প্রয়োজনে হ্যাঁ বোধক সাড়া দেওয়া। 'ওঁ'-ই হইতেছে পরিপূর্ণতা। স্তোত্র, প্রার্থনা, এবং ধ্যান শুরু হয় গায়ত্রীমন্ত্র দিয়া এবং শেষ হয় 'ওঁ' দিয়া। এই দুইটি বস্তুই বিভিন্নভাবে পরমপুরুষকেই বুঝায়।

ঋগ্‌বেদ অথবা অথর্ববেদে ওঁ-এর সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহার প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবং বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণে। ঐ সময়ে ওঁ ধ্বনির মাধ্যমে বুঝাইত কার্যের সম্মতি। পরবর্তী সময়ে বেদের নির্যাস এবং মহাজাগতিক অস্তিত্বকে ওঁ-এর মধ্যেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। উপনিষদ্ ওঁ এবং ব্রহ্মকে সমার্থক ধরিয়াছেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে ওমের ব্যাখ্যা আছে। অ উ ম্।

কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলিতেছেন যে, বেদের তত্ত্ব এবং সৎ ও ধর্মীয় আচরণ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে নিরর্থক। সবকিছুরই প্রকাশ সম্ভব একমাত্র ওঁ-এর মাধ্যমে। ওঁ-ই শাশ্বত ব্রাহ্মণ। ওঁ-ই শেষ অবলম্বন, যাহার উপর মানুষ নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে, জীবনযাত্রার শেষে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে মিলিত হওয়ার সময়। ওঁ-এর প্রতি উচ্চারণেই গভীর হইতে গভীরতর উপলব্ধি আসে সেই পরম একের। ওঁ উচ্চারিত হইয়া থাকে শাস্ত্রাদি পাঠ, পবিত্র কাজ ইত্যাদির আরম্ভে ও শেষে। যোগীপুরুষরা অনবরত ওঁ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বারবার ওঁ ধ্বনি মঙ্গলকারক। ওঁ কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রার্থনার বস্তু নহে, ইহা সকলের। ওঁ কোন দেবতার প্রার্থনার মন্ত্র নহে; সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল কথা নিহিত আছে ইহাতে। ইহা একটি স্বর্গীয় বস্তু। সামগ্রিক পারমার্থিক চিন্তার আত্মস্বরূপ বলা যায় ওঁ-কে।

ওঁ-ধ্বনির বিনাশ নাই। ওঁ-ই ব্রাহ্মণ। ওঁ-ই পৃথিবী। ওঁ-শব্দ ব্রহ্ম। ওঁ শুধু ধ্বনিই নহে — নীরবতাও। এই মহাধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে এক নীরবতার স্তর আছে, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ যাহাকে বলিয়াছেন 'তুরীয়'। মাণ্ডুক্য উপনিষদ ওঁ এবং পরমপুরুষ, এই দুই-এর গভীর সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মানুষ চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণামে চরম নীরবতায় বিলীন হয়। এই নীরবতার সন্ধানই দিয়াছেন ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ এবং গৃহ্যসূত্রের ক্রিয়াদির স্তোত্র, উপনিষদ্ এবং ভগবদ্গীতা। প্রকৃত জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির জন্য এই মাধুর্যমণ্ডিত নীরবতাই অভিপ্রেত। প্রকৃত সাধনার শুরু নীরবতায় এবং অনন্ত শাশ্বত নীরবতায়-ই মানুষের পরম প্রাপ্তি।

ওঁ-ই প্রথম শব্দ — মহাবিশ্বের প্রথম প্রতীক, প্রথম বিকাশ, বাস্তব সত্তার ঘনীভূত রূপ। ইহা পৃথিবীরও আগে, ইহাই পৃথিবীর শেষ কথা, ইহাই সারকথা। ইহার নিজস্ব কোন অর্থ নাই; কারণ সমস্ত অর্থের ইহাই উৎস। ইহা একের প্রতীক।

ঋক্সংহিতার মধ্যে ওঙ্কার-এর কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছিলেন বেদের পণ্ডিত শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর। তাঁহার বেদজ্ঞপুত্র শ্রীপরিতোষ ঠাকুরকেও এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

''ঋক্সংহিতায় অব-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ওম্ শব্দের বিভিন্ন রূপের (ওমাসঃ, ওমানং, ওমভিঃ .... ঋ. ১/৩/৭; ১/৩৪/৬; ৫/৪৩/১৩) উল্লেখ আছে।''

এখন বিশেষ বিবেচনার বিষয় বেদে ওম্ শব্দের উৎস কোথায়। ওম্ শব্দের যে বিভিন্ন রূপ ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, ওম্ শব্দটি প্রাতিপদিক; কিন্তু পরবর্তীতে কোন শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে ওম্ সর্বদা অব্যয় রূপে ব্যবহৃত। প্রাতিপদিক ওম্ কি করিয়া অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন — ''বেদে ওম্-এর বিভক্তি-বচনযুক্ত রূপ 'ওমাসঃ' যেমন আছে, তেমনি অব্যয় 'ওম্' শব্দও আছে। পরবর্তীকালে 'ওমাসঃ' অপ্রচলিত হয়েছে, থেকে গেছে শুধু অব্যয় 'ওম্'। ওম্-এর অন্যান্য বিভক্তিযুক্ত রূপও বেদে ছিল যা অপ্রচলিত হয়েছে।'' ('ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম') [ওম্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে]।

অ-উ-ম্ এই তিন অক্ষরের সমাসে ওঁ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা ছাড়া অন্য

উপায়েও ওঁ-শব্দ হইতে পারে। অব ধাতু মন্ করিয়া ওঁ শব্দ নিষ্পন্ন। অব রক্ষণে। অব ধাতু অর্থ রক্ষা করা। ওঁ অর্থ যিনি রক্ষা করেন।

অব + মন্। "অবতেষ্টিলোপশ্চ" — এই উণাদির সূত্রানুসারে মন্ প্রত্যয়ের টি অর্থাৎ অন্ অংশ লোপ হয়, থাকে শুধু ম্। "জ্বর-ত্বর-শ্রি-ব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" এই সূত্রানুসারে অব ধাতুর উপধা ও ব-কার স্থানে ঊঠ হয়। ঠ-কার ইৎ যায়। সুতরাং অব + মন্ = ঊম্। 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' এই সূত্রানুসারে ঊ-কারের গুণ হইলে ওম্ পদ নিষ্পন্ন হইল। অব-ধাতুর ঊনিশ প্রকার অর্থ। সকল অর্থই ওম্ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা পূর্বে উল্লিখিত 'ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম' প্রবন্ধে বিশদ আলোচিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হয় ধর্ম। আর অব ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ওম্। ধর্ম অর্থে যিনি রক্ষা করেন। দুয়ের অর্থ প্রায় একই দাঁড়াইল। (উপনিষদ্ ভাবনা, ১ম খণ্ড)

ওঙ্কার শব্দটি বেদ-সংহিতার মধ্যে কোথাও পাই না ইহা বলিয়াছি। তবে বেদের ব্রাহ্মণে ইহা দৃষ্ট হয়। উপনিষদে ওঙ্কারের ব্যবহার ও আলোচনা প্রচুর। বেদের গায়ত্রী মন্ত্রকে আমরা আদিতে ও অন্তে প্রণব যুক্ত করিয়া পাঠ করি। ইহা কবে হইতে আরম্ভ হইল ইহার তাৎপর্য বলা কঠিন। প্রণব শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হুবহু লিখিতেছি।

ওঁ ব্রহ্মমন্ত্র

"ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র। তাহার কোন বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না— সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জানিয়াছি, যেমন করিয়াই পাইয়াছি, এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে, কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন — ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে —

সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে, অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য-ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন 'ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতিসম' — ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে ওঁ অর্থাৎ হ্যাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকুমাত্র অবলম্বন — ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই। তিনি হ্যাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্যগণ ইন্দ্র, ব্রহ্ম, বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১/৫/১) আছে, সূর্যদেবও ওম্ উচ্চারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন, জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ। তিনিই চিরন্তন হ্যাঁ, তিনিই Everlasting Yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হ্যাঁ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনিই ওঁ, তিনিই হ্যাঁ; এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হ্যাঁ। এই মহান্ নিত্য এবং সর্বব্যাপী যে হ্যাঁ, ওঁ ধ্বনি ইহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না — কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনা-নিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারিগণ বিশ্ব জগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি। ওঁ সঙ্গীত। তদ্দ্বারা প্রেম উদ্‌বেলিত ও ব্যাপ্ত হইতে থাকে ওঁ আনন্দ।

ওমিতি ব্রহ্ম প্রসৌতি। ওঁ আদেশ-বাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক্ আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর, আমাদের সমস্ত কর্মের উপর, মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং

জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

তিনি যেখানে, সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।'

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম।
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।'

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না। ধর্ম হইতে স্খলিত হইবে না। কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না। মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।''

(রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৪)

ওঁ তৎ সৎ

স্রষ্টা সৃষ্টির মূল উৎস। সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁহার পরিচিতি। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিপূর্ণতা। জীব ও জগৎ লইয়াই সৃষ্টি। ঈশ্বর জীব ও জগৎ এই তিন মিলিয়া এক অখণ্ডতা — ব্রহ্মের সমগ্রতা। এই সমগ্রতার প্রকাশক "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র। ওঁ (প্রণব) ব্রহ্ম। তৎ জীব। সৎ জগৎ। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেদ। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ড। জগৎ কর্মময়। কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যজ্ঞ। সুতরাং "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রে বেদ, ব্রহ্মাণ্ড ও যজ্ঞ বুঝায়।

প্রণব বা ওঙ্কারই যে বেদের নির্যাস ও ব্রহ্মবস্তু, এ সম্বন্ধে নিখিল শ্রুতি এক মত। গীতা নিজেই বলিয়াছেন "প্রণবঃ সর্ববেদেষু"। ছান্দোগ্য কহিয়াছেন, "ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত।" ওঁ এই অক্ষররূপী ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতীদং সর্বং" — ওঙ্কারই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে —

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং —
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব,
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" ১

এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ ওঙ্কার মন্ত্রাত্মক। ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান এই, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্তই ওঙ্কারাত্মক। কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু আছে তাহাও এই ওঙ্কারই। কঠশ্রুতিতে আখ্যাত হইয়াছে (১/২/১৫) —

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।"

সর্ববেদ যাঁহার পদে সম্যক্ রূপে নমস্কার করে, সকল তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তিনি ওই ওঙ্কার। এই কথা যম বলিয়াছেন নচিকেতাকে।

প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন (৫/২)—

"এতদ্বৈ সত্যকাম, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।"

হে সত্যকাম, যাহা ওঙ্কার বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (১/১৪) —

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।।"

নিজ দেহকে একখানি অরণি ও প্রণবকে অপর একখানি অরণি করিয়া তাহাদের ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস করিলে দেহমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দর্শন লাভ করা যায়।

কঠোপনিষদ্ আবার বলিয়াছেন (১/২/১৭) —

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"

ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার অবলম্বন আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ। ওঙ্কারকে জানিলে ব্রহ্মধামে মহীয়ান্ হইতে পারা যায়।

মাণ্ডূক্য কারিকায় (২৮) শ্রীগৌড়পাদ কহিয়াছেন —

"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।"

সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। যোগদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, যোগসূত্রে সমাধিপাদে (২৭-২৮) —

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

প্রণবই ঈশ্বরের নাম। তাহার জপ ও অর্থচিন্তা করণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর বলিয়াছেন —

"প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব বিশ্বধাম।।"
"সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।"(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ৭ম)

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১/১/৩) এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে ব্রহ্মই সমগ্র শাস্ত্রের নিদান। প্রণব ব্রহ্মেরই অভিন্ন স্বরূপ হওয়াতে প্রণবও যে বেদের নিদান ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

ওঙ্কারের মধ্যেও তিনটি অক্ষর আছে। অ-উ-ম্। অ-কার আনন্দ। উ-কার চৈতন্য। ম্-কার সৎ। অতএব ওঙ্কার সচ্চিদানন্দ। ইহা সূক্ষ্মতম কথা। সূক্ষ্মতত্ত্ব হইল উ-কার গতি। ম্-কার স্থিতি। অ-কার স্থিতি ও গতির মহাসমন্বয়। আরও স্থূল কথা অ-কার বিষ্ণু, সত্ত্বগুণ। উ-কার ব্রহ্মা, রজোগুণ। ম-কার রুদ্র, তমোগুণ। অ-কার আদি। "অক্ষরাণামকারোঽস্মি।" ম্-কার শেষ। উ-কার মিলনাত্মক। এই তিনেরই ব্যক্ত রূপ — ওঁ তৎ সৎ। ওঙ্কার

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তৎ-চিৎস্বরূপ জীব। সৎ-জগৎপ্রপঞ্চ। বহির্জগৎ-সৎ। অন্তর্জগৎ তৎ। এই দুয়ের একটি মূল ওঁ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে — ব্রহ্মের হৃদাকাশ হইতে নাদ। নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার। ওঙ্কার স্বপ্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎ বাচক। ইহা নিখিল বেদমন্ত্রের শাশ্বত বীজ। প্রথম অব্যক্ত ওঙ্কারের তিন বর্ণ প্রকাশিত হইল, অ-উ-ম্। উহা হইতে ক্রমশ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; ঋক্, সাম, যজুঃ; ভূঃ, ভুবঃ; স্বঃ এই সকল পরিব্যক্ত

বহির্জগৎ রূপময়। অন্তর্জগৎ ভাবময় বা নামময়। ইহাকেই বলে নামরূপাত্মক জগৎ। ইহারই সূত্র তৎ সৎ। তৎ বলিতে নামময়। সৎ বলিতে রূপময়। এই নাম-রূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের যাহা উৎস তাহাই ওঙ্কার। ওঙ্কার অপরিণামী নিত্য। নামরূপাত্মক তৎ সৎ পরিণামী নিত্য। এই কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে প্রথম মন্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকারে কহিয়াছেন

''সোঽকাময়ত— বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চনিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।''

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যাখ্যা করিলে উপরোক্ত শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মের কামনাও তপস্যা। তাহা সত্য ও জ্ঞানময়। ইহা ব্রহ্মের আত্মভূত। প্রজাসৃষ্টির কামনা অর্থ, ব্রহ্মের ভিতরে যে সমস্ত নাম-রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান, তাহা অভিব্যক্ত করা। যখন ব্রহ্ম অনভিব্যক্ত নাম-রূপ অভিব্যক্ত করেন তখনও তাঁহার স্বীয় নাম-রূপ পরিত্যক্ত হয় না। এই জন্য ব্রহ্মাই অপরিণামী নিত্য। ইহাই ব্রহ্মের বহু হওয়া। জাগতিক নাম-রূপ (তৎ ও সৎ) ব্রহ্ম দ্বারাই আত্মলাভ করে। নিজ স্বরূপ রক্ষা করিয়াই ব্রহ্ম নাম-রূপাত্মক জগতে প্রবেশ করেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে সৎ অসৎ, নিরুক্ত অনিরুক্ত, নিলয় অনিলয়, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান, সত্য অনৃত প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণময় বলা হয়।

এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির ''সচ্চ-ত্যচ্চ'' ই গীতার ''তৎ সৎ''।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই তৎ ও সৎ ব্রহ্মের উপাধি। বৈষ্ণব-বেদান্ত মতে তৎ ও সৎ ব্রহ্মের শক্তি, তিনি নিয়তই এই শক্তিবিশিষ্ট। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া এই তৎ সৎ ব্রহ্মই। গীতাও এই অভিন্নতা দৃষ্টে বলিয়াছেন —

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" ১৭/২৩

'নির্দেশ' শব্দে দেখাইয়া দেওয়া বুঝায়। পতঞ্জলির 'বাচক' ও গীতার 'নির্দেশ' একই কথা। প্রণব ব্রহ্মের বাচক বা প্রণব দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ — একই কথা। এস্থলে বিচার্য এই যে, লৌকিকে বাচক ও বাচ্য ভিন্ন। জল শব্দটি বাচক বা নাম, জল নামক নদীস্থ বস্তুটি বাচ্য বা নামী। বাচ্য জল পানে পিপাসা দূর হয়, বাচক জল উচ্চারণে পিপাসা দূর হয় না। বাচক-জল বাচ্য-জলকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু বাচ্য-জলের শক্তি বাচক-জলে নাই। এই জগতের সকল বাচ্য-বাচকের মধ্যে এই সম্বন্ধ। বাচক-সন্দেশ জলযোগের বিপণিস্থিত বাচ্য-সন্দেশের স্মারক। স্মরণ করায়, রসনাতে জল আনিয়া দেয়, কিন্তু মুখে মিষ্টত্বের অনুভব করাইতে পারে না। উদরও পূরণ করিতে পারে না। জগতের সকল বাচ্য-বাচকের মধ্যে এই রূপই সম্বন্ধ। দুই চলিয়াছে সমান্তরাল রেখার মত।

নাম আর নামী, বাচক আর বাচ্য। যার যার কাজ সে করে, একে অন্যের সঙ্গে মিশে না, সমান দূরত্বে অবস্থান করে। বাগ্‌দেবী আর শ্রীদেবী দুই সপত্নীর মত সমান দূরত্বে থাকিয়া দৃশ্যমান জগতের কার্য নির্বাহ করেন। ইহারা মিশে না; কিন্তু মিশে। সমান্তরাল রেখা অসীমে গেলে মিশে (Parallel lines meet in infinity); ইহা উচ্চ গণিত-শাস্ত্রে প্রমাণিত সত্য। বাচ্য আর বাচক যখন অনন্তে পৌঁছায় তখন তাহারা একাকার হইয়া যায়। তখন "বাচ্য-বাচকয়োঃ সমানরসস্থিতিঃ"। যখন পরব্রহ্মে পৌঁছে তখন তাঁহাদের ব্যবধান রহিত হইয়া যায়। এই জন্য ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক ও পরব্রহ্মও। ইহা নির্দেশকও নির্দেশও। জল শব্দ উচ্চারণে পিপাসা যায় না বটে, কিন্তু প্রণব জপ করিলে ব্রহ্ম দর্শন হয়। সন্দেশ সন্দেশ বলিলে মুখে মিষ্টি লাগে না বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিলে কৃষ্ণে যে রসমাধুর্য আছে তাহার আস্বাদন হয়। এই কথাই বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন —

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি।।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন — "হরি,' এই শব্দ উচ্চারণমাত্র 'হরি' শব্দ-বাচ্য যে পুরুষ তাঁহার উদয় হয়।" পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মের এই তত্ত্বরহস্য বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

ব্রহ্মবস্তুর নাম তিনটি 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'। এই নাম ব্রহ্মকে শুধু বুঝায় না, দেখাইয়া দেয়, পাওয়াইয়াও দেয়। অগ্নি একটি শব্দ, অগ্নি বস্তু হইতে ইহা পৃথক্। অগ্নি লিখিলে কাগজ কলম পুড়িয়া যায় না। অগ্নি-শব্দ অগ্নি-বস্তুকে বুঝায়, কিন্তু পাওয়াইয়া দেয় না। ওঙ্কার সেইরূপ

শব্দমাত্র নহে; উহা ব্রহ্মের নাম; কিন্তু উহা ব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝায়, সেই পরমতম বস্তুও বটে। এখানে শব্দ ও বস্তু পৃথক্ নহে। বাচ্য-বাচক, নাম-নামী এখানে অভিন্ন।

ওঙ্কার আনন্দস্বরূপ, জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক বলিতে প্রধানতঃ তিনটি স্বরূপে পরিব্যাপ্তি বুঝাইবে। ব্যক্তস্বরূপ বা বহির্জগৎ, অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অন্তর্যামীর অব্যক্ত স্বরূপ বা অন্তর্জগৎ, আর সকল কিছু অতিক্রম করিয়া (অত্যতিষ্ঠৎ) সৃষ্টির ঊর্ধ্বে নিজস্বরূপে অবস্থিতি বা নিত্যলীলাজগৎ। বহির্জগতে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহা 'সৎ'। অন্তর্জগতে যে প্রকাশ তাহা 'তৎ'। আর সর্বাতীত লীলাজগতে যে প্রকাশ তাহা 'ওঁ হরিঃ' বা লীলা পুরুষোত্তম।

'ওঁ তৎ সৎ' বাক্যে ব্রহ্মের ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পরমস্বরূপ বুঝায়। ইহাতে জগৎ, জীব ও ঈশ্বর বুঝায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বুঝায়। বেদান্তের সৎ, চিৎ ও আনন্দ বুঝায়। সাধনমার্গের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বুঝায়। সৎএর সঙ্গে কর্মযোগের, চিৎ এর সঙ্গে জ্ঞানযোগের, পুরুষোত্তমের সঙ্গে ভক্তিযোগের সম্বন্ধ। শ্রুতিতে 'তত্ত্বমসি' (তৎ + ত্বম্ + অসি) মহাবাক্যে এই তৎ-এরই নির্দেশ আছে। তৎ বলিতে জীবের চিৎ স্বরূপটি বুঝায়। ইহা কূটস্থ অক্ষর। এই চিদংশে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা আছে। তৎ বস্তুর অনুভূতি জাগিবে জ্ঞানদ্বারা। জ্ঞানের কার্য হইল তৎ-স্বরূপ বা চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে বা আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করা।

জ্ঞান বস্তুটিও নিজে অব্যক্ত, জ্ঞানকে দেখা যায় না। 'তৎ' বা জ্ঞান ব্যক্ত হয় সৎ-এর মাধ্যমে, সৎ-এর আচরণে। যেমন জ্ঞানীর জ্ঞান রূপ পায় তাঁহার আচরণে। তৎ আছে অন্তর্জগতে অব্যক্ত অবস্থায়। সৎ হইতেছে তাহার ব্যক্তাবস্থা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বা ওঙ্কারের ব্যক্তাবস্থা, সৎ হইল স্থূলাবস্থা, তৎ হইল সূক্ষ্মাবস্থা, ওঙ্কার হইল কারণাবস্থা, পুরুষোত্তম হইলেন তুরীয়াবস্থা। ওঙ্কার সর্বময় বলিয়া স্থূল-সৎ ও সূক্ষ্ম-তৎ উভয়েই। ওঁ পুরুষোত্তমের জ্যোতির স্বরূপ। জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় অভিন্ন ভাবনা করিলে ওঙ্কারই পুরুষোত্তম। ভিন্ন ভাবনা করিলে ওঙ্কারের অভ্যন্তরে পরমপুরুষ। জ্ঞান অভিন্ন দেখে। ভক্ত ভক্তির চোখে ভিন্ন দেখে।

বৈশ্বানর অগ্নি

অগ্নির কথা বলিতে বলিতে আমরা দেখিয়াছি অগ্নিই গায়ত্রী মন্ত্রের ভর্গ। এই জন্য গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করা হইয়াছে। আবার অগ্নির কথা বলিব। যে অগ্নির কথা প্রথমাবধি বলিয়াছি সেই অগ্নি নহে, বৈশ্বানর অগ্নি। অগ্নি আর বৈশ্বানর অগ্নিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, আবার আছেও। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই দুই শব্দে একই বস্তুতত্ত্ব বুঝায়; আবার কিঞ্চিৎ পার্থক্যও মনে হয়। পরব্রহ্ম শব্দ যেন ব্রহ্ম হইতে একটু ভারী মনে হয়। বৈশ্বানর অগ্নি অগ্নিই, তবে একটু ভারী। অগ্নির তিনটি স্থান—ভূলোকে বা পৃথিবীতে পার্থিব অগ্নি, ভুবর্লোকে বা অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ ও বায়ু আর স্বর্লোকে বা দ্যুলোকে সূর্য। এই তিন প্রকার রূপ যাঁহার, তিনিই বৈশ্বানর অগ্নি। ইনি মূল অগ্নি।

বৈশ্বানর অগ্নির কথা গীতায় নিজমুখে ভগবান্ বলিয়াছেন—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।"— আমি বৈশ্বানর রূপে প্রাণিগণের দেহের মধ্যে থাকি। দেহের মধ্যে কি করেন? "প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।" আমি জীবের ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রতে পরিণত করি। বিশ্বের সকল নরনারীর জঠরে আছেন বলিয়া নাম বৈশ্বানর। বেদের অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে প্রায় ২০০ (দুইশত) টি সূক্ত আছে। অগ্নির স্তুতিতেই বৈশ্বানরের স্তুতি হইয়াছে; তথাপি বৈশ্বানরকে দেবতাস্বরূপ ভাবনা করিয়া বেদে কয়েকটি বৈশ্বানর স্তুতিও আছে।

কুৎস ঋষি ঋ. ১/৯৮ সূক্তে বলেন, "আমরা যেন বৈশ্বানরের কৃপায় স্থির থাকি। বৈশ্বানর ত্রিভুবনের সেবনীয়। তিনি কাষ্ঠদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সূর্যের মধ্যে চলেন। সম্যক্ উদ্দীপিত তোমার তেজ সর্বেন্দ্রিয় পরিচালিত করুক। তোমার তেজ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অনুভব করে।" ঋ. ৩/২/৯ সূক্তে অমর দেবগণ অগ্নিকে কামনা করিয়া মহান্ জগদ্ব্যাপক পার্থিব বৈশ্বানর, বিদ্যুৎ ও সূর্য তিন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেহের মধ্যে যে অগ্নি আছে তাহা গায়ে হাত দিলেই বুঝা যায়। ৯৮° ডিগ্রী তাপ দেহে সর্বদাই থাকে। ইহা বেশী বাড়িলে বা কমিলে মৃত্যুর আশঙ্কা। অগ্নির সমতা রক্ষা করে বায়ু। বায়ু ভিতরে এবং বাহিরে। বায়ু দেবতা

প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচ রূপে আমাদের রক্ষার বিধান করেন।

ঋগ্বেদে ঋষি বিশ্বামিত্রের ৩/২,৩ সূক্ত, ভরদ্বাজ ঋষির ৬/৭, ৮,৯ সূক্ত এবং বসিষ্ঠ ঋষির ৭/৫,৬,১৩ সূক্তে বৈশ্বানর দেবতা। নোধা ঋষির ঋ. ১/৫৯,৯৮ সূক্ত অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও মূলতঃ বৈশ্বানরের স্তুতিই হইয়াছে।

ঋ. ১/৯৮ সূক্তে কুৎস ঋষি বলিতেছেন—"আমরা যেন বৈশ্বানরের কৃপায় স্থির থাকি। বৈশ্বানর ত্রিভুবনের সেবনীয়। বৈশ্বানর কাষ্ঠদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াই বিশ্ব অবলোকন করেন। সূর্যের সাথে চলেন। ইনি পৃথিবীতে, স্বর্গে ও আকাশে বিরাজমান। সমস্ত শস্যে বর্তমান। বলযুক্ত বৈশ্বানর দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করেন।"

"তোমার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ সার্থক হউক। আমরা যেন মূল্যবান্ ধন পাই। সম্যক্ উদ্দীপিত তোমার তেজ নমস্কারের সহিত সর্বেন্দ্রিয় পরিচালিত করুক। তোমার তেজ প্রত্যেক অঙ্গে অনুভবযোগ্য।"

ঋ. ৩/২/৯ মন্ত্রে অমর দেবগণ অগ্নিকে কামনা করিয়া মহান্ জগৎ ব্যাপক পার্থিব বৈশ্বানর, বিদ্যুৎ ও সূর্য, তিন মূর্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। পার্থিব বৈশ্বানরকে মর্তে রাখিয়া অন্য দুইজন অন্তরিক্ষে গমন করিয়াছেন। দেবতাদের প্রসাদ আসে উপর হইতে নীচে জলধারারূপে। তাই জল সদা নিম্নগামী; তদ্বিপরীত অগ্নি সর্বদা ঊর্ধ্বগামী। আমাদের প্রার্থনা নিবেদন লইয়া অগ্নি ঊর্ধ্বে গমন করেন, সকল দেবতা, পরম দেবতার কাছে। অগ্নির ঊর্ধ্বশিখা কেবল আমাদের প্রার্থনা নহে, আমাদিগকেও ঊর্ধ্বে তুলেন। ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ তপস্যা দ্বারা। অগ্নি পরব্রহ্মের তপঃশক্তি। কোন বিশিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির জন্য মানুষ তপস্যা করে। আর্য ঋষিরা কিসের জন্য তপস্যা করিবেন? আর্যগণের কি কামনা ছিল? বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করিলেই সহজেই বুঝা যায়, তাঁহাদের একটি মাত্র কামনা ছিল—তাহা হইল আলোর জন্য। অন্ধকার হইতে আলো প্রাপ্তি। বাহিরেও ভিতরেও। বাহির ভিতরের কোন পার্থক্য তাঁহাদের ভাবনায় ছিল না। পার্থিব অন্ধকার আর মনের অজ্ঞানতা অন্ধকার তাঁহাদের ভাবনায় একই বস্তু।

অন্ধকার হইতে আলোতে যাইবার জন্য তাঁহাদের প্রবল আর্তি। আলো, আরও আলো, আরও আলো চাই, আরও আলো—যাহা চরম আলোর আলো, জ্যোতিগণের জ্যোতি— তাঁহার সাযুজ্যই আর্য, আর্য ঋষির একমাত্র মৌলিক কামনা। আর যত ছোট ছোট কামনা দৃষ্ট হয়, তাহা মূলতঃ আলোর জন্য। উপনিষদের ঋষিদের শ্রেষ্ঠ কামনা, অন্ধকার হইতে

আমাদের আলোতে লইয়া যাও; "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। অন্তরে বাহিরে ঐ একটিই কামনা। বাহিরে যাহা মহাকাশ, অন্তরে তাহাই চিদাকাশ। যাহা সূর্যের আলো, তাহাই পরমপুরুষের জ্ঞানের আলো। সূর্য ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি। আর্যদের এই বৈশিষ্ট্য, তাঁহারা আলোককে সর্বদা চক্ষুর সামনে রাখিতেন। অগ্নিহোত্রী দ্বিজাতির গৃহে কখনও অগ্নি নির্বাপিত হইত না। নিভিয়া গেলে তাঁহারা অগ্নিবীজ জপ করিয়া বীজমন্ত্র দ্বারাই অগ্নি জ্বালাইয়া লইতেন। এই যে সর্বদা আলোর জন্য আর্তি, ইহার মূল কারণ, অগ্নি সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী; সততই উৎশিখ। গভীর অন্ধকারে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতেই ঋষিরা আলোর অপেক্ষা করিতেন। মানুষের হৃদয় মধ্যে যে আলোর আকৃতি তাহার সার্থক চরিতার্থতা ঐ পরমপদে পৌঁছানো।

আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িতাম তখন দুইজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত আমাদের বেদ পড়াইতেন। তাঁহাদের নাম শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী ও শ্রীঅনন্ত শাস্ত্রী। তাঁহাদের বাড়ী মহারাষ্ট্রে ও মাদ্রাজে। তাঁহারা উভয়েই অগ্নিহোত্রী ছিলেন। নিত্য হোম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন। আমরা তাঁহাদের পায়ের ধূলি লইয়া বেদপাঠ আরম্ভ করিতাম।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে দেবতা অগ্নি। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সূক্তটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্ত্র যথা—

"বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্ যযন্থ।।১
মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোইজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্যায়।।২
দিবশ্চিৎ তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ।।"৫

এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য এইরূপ—

"... হে বৈশ্বানর! তুমি মানুষের নাভিস্বরূপ, তুমি নিখাত স্তম্ভের ন্যায় লোকেদের ধারণ কর।১। অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। হে বৈশ্বানর! তুমি দেব, দেবগণ আর্যের জন্য তোমাকে জ্যোতিরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ২। হে বৈশ্বানর! তুমি সমুৎপন্ন সকল প্রাণীকেই জান। তোমার মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক; তুমি মানব প্রজাদিগের রাজা। ৫।"

ঋ. ১/৯৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

"বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ।।১
পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ।

বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্ঠো অগ্নিঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্।।২
বৈশ্বানর তব তৎ সত্যমস্ত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।।৩''
এই মন্ত্রগুলির ভাবার্থ এইরূপ —

''আমরা যেন বৈশ্বানরের অনুগ্রহে থাকি, তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা। বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হতে জন্মগ্রহণ করেই এই বিশ্ব অবলোকন করেন এবং সূর্যের সাথে একত্রে গমন করেন।'' বৈশ্বানর তেজ সূর্যতেজই। ১। অগ্নি দ্যৌ-তে সূর্যরূপে বর্তমান, আকাশে বিদ্যুৎরূপে বর্তমান পৃথিবীতে গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে বর্তমান এবং সমস্ত শস্যে (অর্থাৎ সকল ওষধিতে) বর্তমান, তাহাতে প্রবেশ করেছেন। সেই বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি, দিবা ও রাত্রে আমাদের শত্রু হতে রক্ষা করুন। ২। হে বৈশ্বানর! তোমার উদ্দেশ্যে এ যজ্ঞ সফল হোক, আমরা যেন বহুমূল্য ধন প্রাপ্ত হই....। ৩।''

ঋ. ৩/১/২ মন্ত্র।। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ছন্দ।
''প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতং গীঃ সমিদ্ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসুর্বিদথা কবীনাং গৃৎসায় চিত্তবসে গাতুমীষুঃ।।''

অর্থাৎ ঋ. ৩/১/২ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন—''সর্বাঙ্গ তেজদ্বারা (অগ্নি দ্বারা) উদ্দীপিত হইলে আমরা পুরঃস্থিত যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিব। (এই সূক্তে হবি আহুতির উল্লেখ নাই। সুতরাং 'যজ্ঞ' অর্থে স্তুতি ধ্যান ও কর্ম বুঝিতে হইবে।) সম্যক্ রূপে উদ্দীপিত অগ্নি, উদ্দীপ্ত বা অভীপ্সারূপ তেজ, নমস্কারের সহিত সর্বেন্দ্রিয় পরিচরিত করুক। সেই তেজ অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করিব।'' (বিনোদভাষ্য) সুতরাং এই অগ্নি অন্তরগ্নি বৈশ্বানর।

ঋ. ৩/২/৭ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।
''আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্।
সো অধ্বরায় পরি ণীয়তে কবিরত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ।।''৭

অর্থাৎ, ''বৈশ্বানর অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকেও পরিপূর্ণ করেছিলেন, যজমানগণ নবজাত এই অগ্নিকে ধারণ করেছিলেন। সর্বত্র প্রাপ্ত অন্ন (দেহ, মন ও প্রাণের অন্ন) দাতা এই অগ্নি অন্নলাভের জন্য আনীত হন।''

ঋ. ৩/২/৯।। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।
''তিস্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনোঽগ্নেরপুনন্নুশিজো অমৃত্যবঃ।
তাসামেকামদধুর্মর্ত্যে ভুজমু লোকমু দ্বে উপ জামিমীয়তুঃ।।''

অর্থাৎ, ''মৃত্যুরহিত দেবগণ (বৈশ্বানর) অগ্নিকে অভিলাষ করে মহান্

জগদ্ব্যাপক অগ্নির পার্থিব (অর্থাৎ বৈশ্বানররূপ), বৈদ্যুত ও সূর্যরূপ তিনটি মূর্তিকে শোধিত করেছেন (অর্থাৎ স্তুতি অর্চনা করেছেন)। তাঁরা তাঁদের মধ্যে জগৎপালিকা পার্থিব মূর্তিকে মর্ত্যলোকে রেখে অন্য দুটি অন্তরিক্ষে গমন করেছেন।"

ঋ. ৩/২/১০।। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ। "বিশাং কবিং বিশ্‌পতিং মানুষীরিষঃ সং সীমকৃণ্বন্ত্স্বধিতিং ন তেজসে। স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ স গর্ভমেষু ভুবনেষু দীধরৎ।।" অর্থাৎ, "ধনাভিলাষী প্রজাগণ প্রভু, মেধাবী অগ্নিকে অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সংস্কৃত করেছিলেন। (অর্থাৎ, অন্তরের তেজ উদ্দীপিত করেছিলেন। তিনি উন্নত ও নিম্ন সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত করে গমন করেন। তিনি সমস্ত ভুবনের গর্ভ ধারণ করেন (অগ্নি হইতে সমস্ত জাত)।"

ঋ. ৩/২/১৩।। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

"ঋতাবানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্‌থ্যমা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্।

তং চিত্রযামং হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে।।"১৩

অর্থাৎ, বলবান্, যজ্ঞার্হ, মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা দ্যুলোক হতে এনে পৃথিবীতে সংস্থাপন করেছেন, আমরা সেই নানাবিধ গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ. কিরণযুক্ত, দীপ্তিমান্ অগ্নির নিকট নূতন ধন (তেজ, শক্তি) যাচ্ঞা করি।

ঋ. ৩/১/২০।। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

"এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্।

মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা জন্মন্‌জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ।।"

অর্থাৎ, "হে অগ্নি, তুমি পুরাতন, তোমার উদ্দেশ্যে আমি এ সকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করছি। সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছেন (ইহাই বৈশ্বানর)........।"

ঋ. ৩/১ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্নির স্বরূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন —বৈশ্বানর অগ্নির তিন স্পষ্টরূপ—(১) সর্বব্যাপী সর্বাত্মা অগ্নি, (২) তিনিই জঠরের অগ্নি (জঠর উপলক্ষণাত্মক, বস্তুত সর্ব অঙ্গের; শোণিতের, চক্ষুরাদি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বাক্ হস্ত-পদাদি সকল কর্মেন্দ্রিয়ের)। (৩) চিত্তের বা মনের ও বুদ্ধির তেজ বল স্মৃতিশক্তি জ্ঞান। বিশ্বের স্রষ্টা; ধাতা, নেতা বা অধ্যক্ষ বলিয়াই বৈশ্বানর সংজ্ঞায় অভিহিত।

ঋ. ৬/৭/৩ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, হে বৈশ্বানর অগ্নি! তোমা হইতে হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয় (অর্থাৎ বুদ্ধির তেজ লাভ করে) বীরগণ তোমা হতেই শত্রুবিজেতা হয়। (দেহের তেজ, শক্তি, বল লাভ করে)।

ঋ. ৬/৭/৭ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষির উক্তি— "শোভন কর্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সকল নির্মাণ করেছেন, তিনি জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অন্তরিক্ষের দীপ্তিশালী নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করেছেন, এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক সে বৈশ্বানর বিরাজ করছেন।" ব্যাপ্ত করেছেন অর্থ তিনিই সর্ব, ঐ ঐ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই জগতের আত্মা, তিনিই সর্বের ধাতা পাতা। তিনি অজেয় অর্থাৎ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ নাই।

ঋ. ৬/৮/৪ মন্ত্রে উক্ত ঋষির অভিমত—"বলশালী মরুদ্‌গণ অন্তরিক্ষ মধ্যে এঁকে পূজনীয় নৃপতিরূপে (অর্থাৎ সর্বশক্তির অধিপতিরূপে) স্বীকার করেছিলেন। দেবগণের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্যমণ্ডল এই বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে এনেছেন। (অর্থাৎ সূর্য, মাতরিশ্বা, পৃথিবী, মনুষ্যাদি জীব, স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বৈশ্বানর; আত্মারূপে।)"

ঋ. ৬/৯/২ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি আরও বলিয়াছেন, "আমি তন্তু (টানাসূত্র) অথবা ওতু (পোড়েন সূত্র) জানি না; কিংবা সতত চেষ্টা দ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তার কিছুই অবগত নই। ইহলোকে অবস্থিত পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে কার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্যসমূহ বলতে সমর্থ?"

ঋ. ৬/৯/৩ মন্ত্রে উক্ত ঋষি বলিয়াছেন—একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু ও ওতু অবগত আছেন। (উপরোক্ত বচনগুলির অর্থ – সৃষ্টিকর্তা বৈশ্বানর অগ্নিই সৃষ্টির রহস্য অবগত আছেন; কারণ, সৃষ্টিকালে একমাত্র তিনিই ছিলেন। অন্য সব তৎপরবর্তী।)

ঋ. ৬/৯/৪ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষির অভিমত প্রকাশিত। এই বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা। হে মানবগণ! তোমরা এ অগ্নিকে ভজনা কর। অক্ষয় এই অগ্নি এই নশ্বর দেহে অবস্থান করেন। নিশ্চল, সর্বব্যাপী অক্ষয় এই অগ্নি শরীর ধারণ পূর্বক (অশরীরী যেন স্থূল শরীর পরিগ্রহ করেছেন) জাত ও বর্ধিত হন।

ঋ. ৬/৯/৬ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষির প্রার্থনা—হে বৈশ্বানর অগ্নি! তোমার গুণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার কর্ণদ্বয় ও তোমার রূপ দর্শনার্থ আমার চক্ষু ধাবিত হচ্ছে। হৃদয়ে যে বুদ্ধিস্বরূপ জ্যোতি নিহিত আছে, তাহা তোমার স্বরূপ অবগত হবার জন্য সমুৎসুক হয়েছে। (আত্মাকে কী করে জানিবে? "বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"।)

ঋ. ৭/৫/৬-৭ মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি অগ্নির স্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন, "বৈশ্বানর আর্যের জন্য অধিক তেজ উৎপন্ন করে দস্যুগণকে স্থান থেকে নির্গত করেছেন। বৈশ্বানর পরম ব্যোম্ প্রদেশে প্রাদুর্ভূত।"

ঋ. ৭/৬/৭ মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষির প্রকাশিত অভিমত— "বৈশ্বানর দেহ, সূর্য উদয় হলে অন্তরিক্ষ হতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরিক্ষ হতে তমঃ গ্রহণ করেন, পরে সমুদ্র হতে তমঃ গ্রহণ করেন।" (অর্থাৎ, নূতন সৃষ্টিকালে তমোময় অব্যক্ত'কে অপসারিত করিয়া প্রকাশিত হন। অগ্নি বা সূর্য সকল অন্ধকার বিনাশ করেন। সর্ব আলোকিত করেন অর্থাৎ প্রকাশিত করেন।)

অধিকতর বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বৈশ্বানর অগ্নির দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট পরিচয় আছে। পরমেশ্বরের ভর্গ বা জ্যোতি স্থূল পার্থিব জগতে বৈশ্বানর সংজ্ঞায় অভিহিত। বৈশ্বানর পৃথিবীস্থিত অগ্নি। ইহাকে উপনিষদ্ 'লোকাদি' সর্বলোকের আদি বলিয়াছেন।

('ঋগ্বেদ ভাষ্য-পরিচয়', সুকোমল দত্ত, পৃ. ১৩৯-১৪২)

বৈশ্বানর সম্বন্ধে এই গেল বৈদিক ঋষিদের উক্তি। ব্রহ্মসূত্রেও বৈশ্বানর সম্বন্ধে সূত্র রহিয়াছে। 'বৈশ্বানরাধিকরণ' নামে একটি অধিকরণ রহিয়াছে। তাহার প্রথম সূত্র— "বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ।।" ১/২/২৫

শ্রুতিতে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই। কারণ, প্রাচীনশাল প্রভৃতির প্রশ্নেই আছে, আমাদিগকে আত্মাস্বরূপ বৈশ্বানর সম্বন্ধে বলুন। শুধু বৈশ্বানর সম্বন্ধে বলুন, এইরূপ প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

জৈমিনি আশ্মরথ্য প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণও বলিয়াছেন—

সূত্র—"সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।।" ১/২/২৯

জৈমিনি বলেন, ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থতেও বৈশ্বানর পদে পরমাত্মা বুঝায়।

বিশ্বে (সকল) নর (মনুষ্যজাতি), কর্মধারয়; বিশ্বানর (সমস্তমানব) অন্ (জঠরে) স্থিতার্থে। বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ ব্রহ্মা।

সূত্র— "অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।।" ১/২/৩০

আচার্য আশ্মরথ্যও বলেন, শ্রুতিতে অপরিমিত পরমাত্মাকেও প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্বানর পরমাত্মাই। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বৈশ্বানর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় যদি আপত্তি কর যে, উহা পরমাত্মা নহে; তাহা বলিতে পার না। কেননা, উপাসনার জন্যই ঐ প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারণ, ঐ শ্রুতিতেই (ছাঃ ৫/১৮/২) বৈশ্বানরের— "মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ।।"

—উক্ত হইয়াছে শির দ্যুলোক, চক্ষু আদিত্য, প্রাণ বায়ু, আকাশ

দেহের মধ্যভাগ, জল বস্তিস্বরূপ, পৃথিবী পাদদ্বয়, বক্ষস্থল বেদি, লোমসকল বর্হি, ইত্যাদি উপাসনার জন্য বলা হইয়াছে। পরমাত্মা ভিন্ন অন্যে ইহা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ বাজসনেয়-শাখীরা এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। ইহা পুরুষসূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ।।"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে "অগ্নির্মুখং যস্য" বলা হইয়াছে। ইহাতে অগ্নির সহিত পরমাত্মা শ্রীভগবানের সমানাধিকরণ বুঝিতে হইবে। তিনি যাহা, অগ্নিও তাহাই।

কঠ উপনিষদে ১/১/১৩ মন্ত্রে নচিকেতা যমকে বলিয়াছেন—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।।"

অর্থাৎ, " হে যমরাজ, স্বর্গকামী যজমানগণ যে অগ্নিবিদ্যাসহায়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, আপনি তাহা জানেন; সুতরাং শ্রদ্ধাযুক্ত আমায় উহা বলুন— আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করি।"

যম উত্তরে বলিলেন—

"প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্।।"১৪

অর্থাৎ, যমরাজ বলিলেন, "অগ্নির কথা বলি, শুন। অগ্নি অনন্তলোক প্রাপ্তির উপায়। অগ্নি সর্ব জগতের বিধারক। অগ্নি সর্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় বাস করেন।"

যম নচিকেতাকে জগতের কারণস্বরূপ প্রসিদ্ধ অগ্নিতত্ত্ব বলিলেন, যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ ও তাহার সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি বলিলেন। যমের সমস্ত কথা নচিকেতা পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহার প্রত্যুচ্চারণে তুষ্ট হইয়া যম কহিলেন, "তোমার উচ্চারণে প্রীতিলাভ করিয়া তোমাকে আর একটি বর দিতেছি। এই অগ্নিবিদ্যা জগতে 'নাচিকেত' অগ্নি নামে খ্যাত হইবে। এই নাচিকেত-অগ্নিবিদ্যা যাহারা অধ্যয়ন করিবে, যাহারা অর্চন করিবে, যাহারা অনুষ্ঠান করিবে, তাহারা জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবে। এই

অগ্নিদেবকে আত্মস্বরূপ জানিয়া পরাশান্তি লাভ করিবে।'' এই অগ্নির পরিচয় দিয়াছেন ''ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যম্'' হিরণ্যগর্ভ-জাত সর্বাগ্রে দ্যোতনীয় ও স্তবনীয়। এই অগ্নি মূলতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি।

বৈশ্বানরাধিকরণে ১/২/২৬ সূত্র— ''স্মর্যমাণমনুমানং স্যাদিতি।।'' স্মর্যমান অর্থ 'স্মৃতিতে বর্ণিত'। স্মৃতি শব্দে এখানে মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতা। গীতা বলিয়াছেন—

''অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।'' (গীতা, ১৫/১৪)

অর্থাৎ, ''আমি বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি)-রূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া চর্ব্যচূষ্যাদি চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি।''

''দেহ-যন্ত্রে একখণ্ড রুটি ফেলিয়া দিলে উহাও রক্তে পরিণত হয়। দেহাভ্যন্তরীণ কি কি প্রক্রিয়াদ্বারা এই পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা জড়বিজ্ঞান বলিতে পারে। কিন্তু কোন্ শক্তি বলে এই কার্য সাধিত হয় তাহা জড়বিজ্ঞান জানে না। উহা ঐশ্বরিক শক্তি।'' (শ্রীগীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ৪৫৮)।

শ্রীভগবানের উক্তিতে গীতায় আছে বৈশ্বানররূপে সকল প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের খাদ্যাদি পরিপাক করিয়া তাহাদের দেহের পুষ্টি বিধান করি। আর তাহার পূর্বে বলিয়াছেন, আমি অমৃতরসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ব্রীহি ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। কী বৃক্ষজগৎ, কী প্রাণীজগৎ, ইহার মধ্যে পরমাত্মার শক্তি নিরন্তর কাজ করিতেছে এবং তাহার পুষ্টি ও বর্ধন সমাধান করিতেছে। এই শক্তিকে বেদান্তশাস্ত্র মহাপ্রাণের কার্য বলিয়াছেন। এই মহাপ্রাণ শক্তিটি ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ 'Elan Vital' বলিয়াছেন। ইনি বিশ্বের মধ্যে এই Vital energy কেই নিয়ত ক্রিয়াপরায়ণ দেখিয়াছেন। এই শক্তিই নিখিল বিশ্বে গতি-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই শক্তিকে তিনি "Ultimate reality" বলিয়াছেন। গীতার মন্ত্র এই শক্তিকেই ঈশ্বর-শক্তি বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়াছেন। (গীতা, ১৫/১৩-১৪)

আমরা গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় সবিতার বরেণ্য ভর্গকেই এই অগ্নিদেব বলিয়াছি। ইহা অনেকের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। এইজন্য উপর-উক্ত বৈশ্বানর অগ্নির স্বরূপ প্রকাশ করিলাম। সংহিতার মন্ত্র, ব্রহ্মসূত্রের সূত্র, ভাগবতের শ্লোক এবং ভগবদ্গীতার দ্বারা স্থাপন করা হইল বৈশ্বানর অগ্নিই ব্রহ্ম। বৈশ্বানর অগ্নির মূর্ত প্রকাশ। ইহার অন্তরিক্ষ প্রকাশ—বিদ্যুৎ বায়ু ও ইন্দ্র। আর দ্যুলোক বা স্বর্গলোকে প্রকাশ — সবিতা, উষা, ভর্গ

ও মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড। এই শেষ স্বরূপটিকে ঋগ্বেদ-সংহিতা বিষ্ণু বলিয়াছেন।

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার পরব্রহ্মের প্রতীক ও বাচক। ইহা জগদ্বীজ। এই ওঙ্কারবীজেরও দেবতা অগ্নি। নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম, অগ্নির্দেবতা,গায়ত্রী ছন্দঃ, পরমাত্মা স্বরূপম্, সাযুজ্যে বিনিয়োগঃ।" সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় নিত্য এই কথা বলিতে হয়। "ওঙ্কারস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নির্দেবতা, সর্ব কর্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।" এই অগ্নিদেবতা মূলতঃ বৈশ্বানর অগ্নি। এই অগ্নির কথা কিছু বলা হইল। প্রণবের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

ইন্দ্র

বৈদিক সাধনার প্রধান একটি লক্ষ্য মনে হয় অগ্নিচেতনাকে আদিত্যচেতনায় তুলিয়া লওয়া। এতক্ষণ অগ্নি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে মনে হয়, অগ্নিই বেদের মুখ্য দেবতা; কিন্তু ইন্দ্রসূক্তগুলি পড়িলে এই ধারণা থাকে না। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ইন্দ্রসূক্তের সংখ্যা সর্বাধিক। সংহিতার দশহাজার মন্ত্রের এক-চতুর্থাংশ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত। ইহা উপেক্ষণীয় নহে।

তাই বেদে ইন্দ্রের স্থান সকলের উপরে। ইন্দ্রের পরেই অগ্নির স্থান। ইন্দের প্রায় সূক্তই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ৪৪ অক্ষর। ইন্দ্র পরমেশ্বর, সকলের অধিপতি। ইন্দ্র সর্বজ্ঞ ও শাসক। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে চতুর্থ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ!
উপপ্রয়ন্ দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ শ্রবসে নাম দধে।।"

ইন্দ্রের নাম কীর্তনীয়। ইন্দ্রের নাম-কীর্তনে শক্তি জাগে, আলো ফোটে। বেদমন্ত্রের মধ্যে অগ্নি এই মর্ত্যলোক হইতে তাঁহার জ্যোতি, তাঁহার শক্তিকে ঊর্ধ্বে প্রসারিত করেন। আর ইন্দ্র ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার জ্যোতি মর্ত্যের জীবনে নামাইয়া আনেন।

ইন্দ্র 'গো'। গো অর্থ আলো করা। গোদা অর্থ আলোক দাতা। ইন্দ্র সত্যের আধার। সত্য হইতে আনন্দ। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। ইহা তাঁহার প্রধান কাজ। বৃত্র আবরিকা শক্তি। বৃত্র, বৃত বা আবৃত — একই কথা। যাহার দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার আবরিত, তাহাই বৃত্র। যাহা অনিত্য বস্তু, তাহাই জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে। ইন্দ্র এই অনিত্য বস্তুকে নাশ করেন। ইন্দ্রের কাজ অসুর নাশ অর্থাৎ অন্ধকারের বিনাশ। ঋষিগণ ইন্দ্রের রূপের বর্ণনায় চারু ওষ্ঠাধর, সুস্পষ্ট চিবুক, উন্নত নাসিকা ও উজ্জ্বল বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন — "Indra is the power of pure existence, self-manifested to the mystic fire"। বৃত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন — "Vritra is the personification of darkness." (On the Veda, p. 200)। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি ঋ. ১/৫৩/২ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "সখা সখিভ্যঃ"। সখাদের মধ্যে উনিই শ্রেষ্ঠ সখা।

ইন্দ্র দেবরাজ। তাঁহার কি কাজ সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐশ্বর্যবাচক "ইন্দ্" ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ। পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র জগতের ঈশান বা ঈশ্বর। আবার ইন্ধ্ ধাতু হইতেও ইন্দ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ব্যুৎপত্তিতে ইন্দ্র অর্থ দীপ্তিশালী। ইন্দ্র রাজা। রাজা ক্ষত্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন। ক্ষত্রিয় অর্থ ক্ষত হইতে যিনি ত্রাণ করেন। যেখানে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে সেখানে তাহা পূরণ করিবার দায়িত্ব ইন্দ্রের। ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় দুর্জনেরা। ইন্দ্র দুর্জনের শাস্তা। দুর্জন কাহারা? আর্যদিগের যে জীবন-সাধনা, জ্যোতির দিকে ঊর্ধ্ব যাত্রা, তাহাতে যাহারা বাধার সৃষ্টি করে তাহারা দুর্জন। যাহারা জ্যোতিপ্রকাশের পক্ষে বাধক, তাহারা সমাজের শত্রু। ইন্দ্র বীরের মত সকল বাধা, সকল অন্ধতা দূর করেন।

যাহারা আলো ও জলের বাধা প্রদানকারী, তাহারা বৃত্র বা অসুর। (অসুর বৃত্র সমার্থক শব্দ। নিঘণ্টু, ১/১০, মেঘনাম) ইন্দ্র সর্বদা অসুর বধে নিরত। বৃত্র, অহি, নমুচি, শম্বর, পণি — ইহারা অসুর। বৃত্র আবরণকারী অন্ধকার। অহি জলধারার বাধা প্রদানকারী দুর্বৃত্ত। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রের বধসাধন করিয়া জ্যোতির প্রসারতা বিধান করেন। অহিকে বধ করিয়া পৃথিবীতে জলধারা বহাইয়া দেন। নমুচি শম্বর অনাবৃষ্টি দ্বারা শুষ্কতা (শুষ্ম) সৃষ্টি করে। তাহাদিগকে বধ করিয়া ইন্দ্র জ্যোতির জয়যাত্রা সুগম করিয়াছেন। বৃত্র বিশাল পর্বতের মত দেহধারী, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করিয়া দেন। তাই ইন্দ্রের এক নাম 'বৃত্রঘ্ন'। অসুর বা দানবদের দুর্গ বা পুর ইন্দ্র ধ্বংস করেন, এইজন্য ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর'। পণিরা দস্যুদল। তাহাদের বাসস্থান পাতালে, রসাতলের এক দুর্গম পাহাড়ে। গোসমূহ অর্থাৎ আলোরাশি অপহরণ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। ইন্দ্র পণিদের নির্জিত করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। বৃত্র হইতেছে আবরণকারী মায়া অন্ধকার, আর পণিরা অবচেতন জড়শক্তি। বৃত্র অবিদ্যা, আর পণিরা আত্মম্ভরী জড় বুভুক্ষু। শুদ্ধ ও সিদ্ধ মনের দেবতা ইন্দ্র ঐ সব শত্রু বিনাশ করেন।

ইন্দ্রের অসীম শক্তি, তাই তিনি সর্বত্র কৃতকার্য। ইন্দ্রের এই শক্তির উৎস কোথায়? এই শক্তির উৎস সোম। ইন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন— "কুবিৎ সোমস্যোপচিতি" — আমি অনেকবার সোমপান করিয়াছি। বৈদিক সূক্তে ইন্দ্র পরমপুরুষ। পরমপুরুষ পরমতত্ত্বের ঘন বিগ্রহ। বেদান্তে এই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম। তাঁহার অনুভব পরাক্ ও প্রত্যঙ্ — দুই প্রকারেই হয়। বেদান্ত পরাক্ ক্ষণ উজ্জ্বলান্। বৈদিক সৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্য এই, জগৎ কোন জগৎবাহ্য সত্তার কৃতি নহে; তাহা জগতের, অতিষ্ঠা, কোন পুরুষের বিসৃষ্টি বা উৎসারণ। জগৎ এবং জগৎকারণ কেহ নাই। এই হেতু উজ্জ্বল

সবই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" — ব্রহ্মই এই সব কিছু হইয়াছেন।

নৈরুক্তেরা বলেন, দেবতা তিন জন — অগ্নি পৃথিবীস্থান, ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান ও সূর্য দ্যুস্থান। ইন্দ্রের কার্য দুইটি — বৃষ্টিপাত করা ও বৃত্রবধ। জীবনের শুষ্কতা দূর করিতে অন্তরিক্ষ হইতে প্রাণের ঢল আনয়ন, আর অন্ধকার ঘুচাইতে দ্যুলোকে আলো প্রদান।

বৃত্রবধ ব্যতীত ইন্দ্রের "সামর্থ্যের আরও বিচিত্র নিদর্শন আছে। গৃৎসমদের একট সূক্ত (ঋ. ২/১৫) হইতে জানিতে পাই— "যিনি জন্ম নিলেন এক মনস্বী হইয়া, দেবতাদের মধ্যে যিনি পরিভূ, যাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাসে রোদসী (অন্তরিক্ষ) উঠে থরথরিয়া; হে জনগণ! শুন, তিনিই ইন্দ্র (স জনাস ইন্দ্রঃ)।"

উপনিষদ্ ইন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইন্দ্র দেবতাদের অধিপতি। তিনি দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বদেবতা। অধিজ্যোতিষ দৃষ্টিতে ইন্দ্রই সূর্য। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ইন্দ্র হইলেন প্রাণ, তিনি অক্ষিপুরুষ তিনি ব্রহ্ম। ইন্দ্র বিশ্বরূপ। পুরুষসূক্তে যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের কথা আছে তাহা বিশ্বরূপ ইন্দ্রেরই বিভূতি। ইন্দ্র বিশ্বভূ ও বিশ্বরূপ — এই দুইটি কথার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ভূ-ধাতুর প্রয়োগে বিশ্বভূ বুঝায়, অর্থাৎ বিশ্ব হওয়া; আর বিশ্বরূপ শব্দে বুঝায় হওয়ার পরিণাম। ইন্দ্র সাক্ষাৎভাবে দু'য়েরই নিমিত্ত।

ইন্দ্রের পারম্যের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বিশ্বরূপ হইয়াছেন, আবার বিশ্বের বাইরেও আছেন, দুইটিই পূর্ণরূপ।

বৃষাকপি সূক্তে (ঋ. ১০/৮৬) ইন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়। ইন্দ্র-পত্নী পতি-সোহাগিনীদের মধ্যে অনন্যা। পতিগর্বে গর্বিতা, পতির সুখে সুখী ও সচিবা (প্রিয়া, সখী, সহায়)। তিনি স্বাধীনভর্তৃকা এবং সুরতপণ্ডিতা। তিনি প্রাণ ও প্রেমের মহিমায় নারীর আদর্শ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র-পত্নী আমাদের ধী, মতি এবং মনীষা। তিনি আমাদের দেবাভিসারী বচন, মনন ও ধ্যান এবং ইন্দ্রের শক্তির বিভূতি। ইন্দ্র-পত্নী অধিদৈবত দৃষ্টিতে এক। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে কখনও এক, কখনও বহু। বৈষ্ণবশাস্ত্রের লক্ষ্মী ও শ্রীরাধার মত। লক্ষ্মী একা, শ্রীরাধা স্বরূপশক্তিবশত এক হইলেও সখীরূপ কায়ব্যূহে বহুরূপা।

বেদানুগত ভক্তিবাদে মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক সাযুজ্যে ও সখ্যে। পতি-পত্নী সম্পর্কও সমান-সমানে (On equals)। সাযুজ্যের ভাবনায় সমান অথবা সমানধর্মী (Same)। বৈদিক উৎস হইতে জ্ঞানীর সোঽহংবাদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিবাদ ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ আঙ্গিরসের একটি ইন্দ্রসূক্তে প্রথমেই এই ভাবের অভিব্যক্তি

ব্রজলীলা স্মরণ করায়। ঋ. ১০/৪৩/১ সূক্তটির ঋষি কৃষ্ণ আঙ্গিরস। ছান্দোগ্যে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের আচার্য ঘোর আঙ্গিরস। ইন্দ্রসূক্তে মতিঃ নহে, মতয়ঃ আছে। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য আলো পাওয়া। মননেরা একত্রে সকলে উতলা হইয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল ভাবপ্রসাদ পাইবার জন্য। মতিরা এখানে সখীরূপা মনোবৃত্তি। সকলেই এক জোট শ্রীরাধাতে। অপালার কাহিনীতে মধুর রস অতি সুস্পষ্ট। মননের দ্বারা আত্মনিবেদন, আর মনীষা দ্বারা সম্ভোগ। বেদে ইন্দ্রপত্নীর নাম নাই। তবে ইন্দ্রের একটি বিশেষণ আছে--- 'শচীব', যাঁহার শচী আছে। নিঘণ্টুতে শচীর তিনটি অর্থ--- বাক্ (মন্ত্র), কর্ম (যজ্ঞ) ও প্রজ্ঞা (সাধনার ফল)। শচী 'শচ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'শচী' অর্থ ইন্দ্রাণী বা কর্ম। ইন্দ্র শক্তিমান, শচী তাঁহার স্বরূপশক্তি। শচীর তাত্ত্বিক পরিচয় পরমপুরুষের পরমাপ্রকৃতি।

চিত্তবৃত্তিরূপিণী এই ইন্দ্রপত্নীদের সম্পর্কে সান্ধ্য ভাষায়শেষ কথাটি বলিয়াছেন বামদেব (ঋ. ৪/১৯/৭) — ওরা কুমারী, ঝরণার মত কলস্বনা, (কোথায় যেন) মিলিয়ে যায়; যুবতী ওরা — ঋতকে জানে; ওদের প্রপীনা (অর্থাৎ গর্ভিণী) করলেন (ইন্দ্র)। মরু আর প্রান্তরেখা তৃষিত ছিল, তাদের ভরে তুললেন, দোহন করলেন ইন্দ্র সেই বন্ধ্যা ধেনুদের — ঘরের যারা কল্যাণী পত্নী, সংসারে ওরা পরকীয়া; কিন্তু দেবতাকে ওরা যখন চায় বা তাঁর কাছে যায়, তখন ওরা তাঁর স্বকীয়া, ওরা কুমারী।'' ..... (বেদ-মীমাংসা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭)।

অনুরূপ ভাবনা ভাগবতেও পাই।

''গোপকুমারীগণ বস্ত্রহরণে শুদ্ধা হইলেন। প্রায় বৎসরান্তে শারদীয়া রাসরজনীতে ভগবান্ বাঁশির ধ্বনিতে তাঁহাদের আকর্ষণ করেন। তাঁহারা সকলেই কুমারী ছিলেন না, স্বামী-পুত্র লইয়া সংসার করিয়াছিলেন অনেকে। তথাপি তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রিয়া, এই হেতু কুমারী।'' (ঐ)

পরমপুরুষের পরিচয় — তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। তিনি বিশ্বের প্রতিষ্ঠা-অতিষ্ঠা দুইই। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণু ও বরুণের সহচারিতা। বিষ্ণু দিবসের আলো, বরুণ রাত্রির অন্ধকার। বিষ্ণু আলো, বরুণ কালো। ইন্দ্র আলো ও কালো দুইই। দীর্ঘতমা একটি সূক্তে ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণু ও বরুণকে মিলাইয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রই সূর্য, সূর্যই বিষ্ণু। তিনটি তাঁহার পদনিধান — প্রভাতে সমারোহণে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুপদে (মধ্যগগনে), সন্ধ্যায় গয়শিরসি — গয়শিরঃ পরব্যোম বারুণীশূন্যতা। ইন্দ্র ও বিষ্ণু এখানে লোকোত্তীর্ণ।

ইন্দ্রের দুইটি বিশেষণ প্রায় রূঢ়ি। গো-পতি, আর নৃতু। 'গো' পদের চারিটি অর্থ। যথা, গাভী, পৃথিবী, বাক্ ও রশ্মি। দীর্ঘতমা বিষ্ণুসূক্তে বিষ্ণু ও বরুণকে জড়াইয়া দিয়া বলিয়াছেন --- আমরা তোমাদের

বাস্তুভূমিতে যাইবার জন্য উতলা। সেখানে গো-যূথ আছে, তাহাদের ভূরিশৃঙ্গ। গো-যূথ মনে করাইয়া দেয় গোলোক বৃন্দাবনের কথা। ইন্দ্র 'গোপা' দৃষ্ট হয় বহু সূক্তে।

অপর বিশেষণটি নৃতু। আদিত্য ইন্দ্র বিষ্ণুপদে সহস্র রশ্মি। রশ্মিগুলি সতত নৃত্যপরায়ণ। ইহা আলোর নাচন। কম্পমান আলোকরশ্মির বর্ণনা। ইন্দ্রকে এক স্থানে নৃত্যমান অমর্ত (ঋ. ৫/৩৩/৬) বলা হইয়াছে। এই নৃত্য চলিয়াছে নিত্যকাল ব্যাপিয়া। ইহা যেন বিশ্বনৃত্য। হে দেবগণ, তোমরা কারণ-সলিলে পরস্পর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। তারপর তোমাদের নৃত্যারম্ভ। নৃত্যের ঘূর্ণি হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অজস্র রেণু। নৃত্যের প্রসঙ্গ পুরাণের দুই স্থানে পাই। শিবের তাণ্ডবনৃত্যে ও গোপী-গোবিন্দের রাসনৃত্যে। নটরাজের নৃত্য প্রাণের, কৃষ্ণের নৃত্য প্রেমের। দিনের আলোয় বৃত্রঘাতী সংগ্রামের নৃত্য ইন্দ্রের। আর চাঁদিনী রাতে প্রফুল্লিত জ্যোৎস্না আলোয় কৃষ্ণের মধুর রাসোৎসব নৃত্য। বিশ্বনৃত্যের দুইটি ছন্দ।

ইন্দ্র বেদের পরমদেবতা, তাই তাঁহার উৎস পাইবার উপায় নাই। উৎস খুঁজিতে গেলে বুদ্ধি খেই হারাইয়া পৌঁছায় নাদসীয় সূক্তের অপ্রাকৃত গহন গভীরে, যেখানে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্'। যেখানে সব অনির্বচনীয় নীহারের মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন। এক স্থানে বলা হইয়াছে — অজর ইন্দ্রকে আমরা স্তব করি একমাত্র পরমা ধী দিয়া। কেননা তিনি "ধিয়া পরময়া পুরাজাম্ অজরমং ইন্দ্রম্ অভ্যনূষ্যর্কৈঃ" — অভিনমন করি, সোচ্চার হই তাঁহার উদ্দেশ্যে, 'অর্কৈঃ' — অর্চি দিয়া, আগুনের সুর দিয়া। (ঋ. ৬/৩৮/৩)

পূর্বে অগ্নিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এখন আবার ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতেছি। বস্তুতঃ এই সদ্‌বস্তুর 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি', দুই নাম পুরুষসূক্তে বলা হইয়াছে। পুরুষের মুখ হইতে জন্মাইলেন ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ এবং শীর্ষ হইতে দ্যৌ। এখানে ইন্দ্র ও অগ্নি সহজন্মা এবং সর্বমুখ্য। বৈদিক ধর্মের মূল স্তম্ভ — ইন্দ্র-অগ্নির চর্চা। পৌরাণিক ইন্দ্রের ধারণা লইয়া বেদের ইন্দ্রকে বুঝা যাইবে না।

ইন্দ্র ও অগ্নি — উভয়কেই প্রধান বলা হইয়াছে। ইহার এক সমাধান বলা হইল। আর এক সমাধান বলিয়াছেন যাস্ক। তিনি বলিয়াছেন, দেবতারা ইতরেতর-জন্মা। মানুষের ক্ষেত্রে পিতা হইতে পুত্র জন্মায়, পুত্র হইতে পিতা হয় না। কিন্তু দেবগণের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। কারণ তাঁহারা ইতরেতর জন্মা। বেদে সূর্য হইতে অগ্নি জাত। আবার অগ্নি হইতে সূর্য জাত, একথাও আছে। দেবগণের বিশেষ বিশেষ নাম-রূপের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা ভিন্ন। অপর এক মহাসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা অভিন্ন। দেবগণ সকলেই পরমাত্মাস্বরূপ।

ইন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "Indra, the Puissant next, who is the power of pure Existence self-manifested as the Divine Mind. As Agni is one pole of Force instinct with knowledge that sends its current upward from earth to heaven, so Indra is the other pole of Light instinct with force which descends from heaven to earth. He comes down into our world as the Hero with the shining horses and slays darkness and division with his lightnings, pours down the life-giving heavenly waters, finds in the trace of the hound, Intution, the lost or hidden illuminations, makes the Sun of Truth mount high in the heaven of our mentality." (*Hymns To The Mystic Fire*, Foreword, p.xxxi)

ইন্দ্র স্তোত্র

ঋগ্বেদ, ২য় মণ্ডল, ১২ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ।।" ১

— অর্থাৎ, "হে জনগণ, যিনি জাত হইয়াই শ্রেষ্ঠ মনস্বী, দ্যুতিমান্, (তিনি) (অন্য) দেবগণকে জ্ঞানের দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন, যাঁহার শারীরিক শক্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইয়াছিল, বলের মহত্ত্বের দ্বারা, তিনিই ইন্দ্র।"

"যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ।।" ২

— অর্থাৎ, "হে জনগণ, যিনি কম্পমান পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, যিনি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র।"

"দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহু র্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।।" ১৩

— অর্থাৎ, "হে জনগণ, দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার প্রতি প্রণত হয়, যাঁহার পরাক্রম হইতে পর্বতসকল ভীত হয়, যিনি সোমপানকারী (রূপে) প্রখ্যাত, বজ্রের মত (দৃঢ়) যাঁহার বাহু, বজ্র যাঁহার হস্তে, তিনিই ইন্দ্র।"

বায়ু

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "বায়ুঃ প্রাণঃ"— বায়ু প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বায়ু অন্তরিক্ষের দেবতা, 'বা' ধাতু হইতে বায়ু অর্থাৎ যাহা বহিয়া যায়। সর্বদাই বহমান বায়ু এক মুহূর্ত না থাকিলে জীবন ধারণ অসম্ভব।

প্রাকৃত বায়ু দেয় বিষয়ানন্দ, অপ্রাকৃত বায়ু দেয় বস্তুর অন্তর্নিহিত দিব্য আনন্দ। ঈশোপনিষদে বায়ুকে অমৃতময় বলিয়াছেন —'বায়ুর-নিলমমৃতম্'। (১৭)

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে প্রথম তিনটি মন্ত্র বায়ু দেবতার উদ্দেশে বলা হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে "বায়ুর্বৈ সর্বেষাং," এবং তাহাই নহে, কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, "অয়ং বৈ ব্রহ্ম যোঽয়ং (বায়ুঃ) পবতে।" যিনি সর্বদাই প্রবাহিত হইতেছেন সেই বায়ুই ব্রহ্ম, তাঁহার উদ্দেশে বলা হইতেছে, হে বায়ু। আসুন, আমন্ত্রিত হউন। আমাদের দেওয়া সোম অর্থাৎ ভাগবতীয় রস পান করুন। আপনি সর্বদা বহমান, তাহা হইলে আবার ডাকা কেন? বায়ু সর্বত্রই বহমান, তবুও আমরা গ্রীষ্মে তাপদগ্ধ হইয়া পাখা দিয়া তাঁহাকে ডাকি কেন?

ঋগ্বেদে ১০ মণ্ডলে ১৬৮ সূক্তের বায়ু দেবতা, দ্রষ্টা অনিল ঋষি। ঋষির নাম অনিল — অনিল শব্দের অর্থ বায়ু। মনে হয় বায়ুদেবতার ধ্যান করিতে করিতে ঋষিই বায়ু হইয়া গিয়াছেন। ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন।

"অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব।।"৩

অন্তরিক্ষলোকের দেবতাদের মধ্যে বায়ুই প্রধান। ইনি আকাশে পাতালে গতিবিধি করেন। ত্রিভুবনে রাজার ন্যায় চলিয়া যান। তিনি চলার পথে কখনও এক মুহূর্তও বসিয়া থাকেন না। ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন কোথা হইতে ইহার আগমন হইল? "ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুতো আ বভূব?" স্থবির পদার্থ অর্থাৎ পাহাড় পর্বত পর্যন্ত বায়ুর দ্বারা কম্পিত হইতে থাকে। এই বায়ুদেব দেবগণের আত্মাস্বরূপ, ত্রিভুবনের সন্তানস্বরূপ।

"আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ" (ঋ. ১০/১৬৮/৪)।

তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করেন, অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি বায়ু লোকের কল্যাণকর কর্মে সতত নিযুক্ত আছেন। "যথাবশং চরতি দেব একঃ"।

ঋ. ১০ম মণ্ডলের ১৮৬ সূক্তে ১ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে -

"বাত আ বাতু ভেষজং শংভু ময়োভু নো হৃদে।
প্র ণ আয়ূঁষি তারিষৎ।।"

ঋষি বায়ুকে পিতা ও ভ্রাতারূপে সম্বোধন করিয়াছেন, আবার সখাও বলিয়াছেন। বায়ুধামে অমৃতের নিধি আছে বলিয়াছেন। সেই অমৃত আনিয়া আমাদের জীবন দান করে। 'ততো নো দেহি জীবসে।।' ৩

বায়ু জগতের সর্বত্র বিরাজমান। বায়ু ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত জীবন ধারণ করা অসম্ভব। কি আশ্চর্য! তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দর্শন-ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না বটে কিন্তু স্পর্শন-ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। বায়ুকে পূর্বে জলের সখা বলা হইয়াছে, 'অপাং সখা'। আবার জলের পূর্বে বায়ু জন্মিয়াছেন, এইরূপ কথাও বলা হইয়াছে। যখন কেহ ছিল না, তখন কে ছিল ? জগৎ ছিল না, জলের পূর্ববর্তী বায়ু ছিল কিনা সংশয় আছে। মন্ত্রের ঋষি বলিয়াছেন, এক চৈতন্যময় সত্তা ছিলেন। তিনি বায়ু ছাড়া শ্বাস প্রশ্বাস চালাইতেন (আনীদবাতং)। তাহাতে বুঝা যায়, বায়ু ছিল না তিনি বায়ুর সহায়তাব্যতীত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। সুতরাং বায়ু ছিল না। ঋষির কথার ভাবে মনে হয় ব্রহ্মের শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে বায়ুর জন্ম। *On The Veda* গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন — 'Vayu is always associated with Prana or Life-Energy which contributes to the system all the ensemble of those nervous activities that in man are the support of the mental energies governed by Indra. Their combination constitutes the normal mentality of man." (p. 84)

"Vayu, the wind— God, who in the Vedic system is the Master of Life, insipirer of that Breath of dynamic energy, called the prana."

"বায়ুর অসীম প্রাণসমুদ্রে আমরা আছি। সমস্ত বিশ্বজুড়ে মহাপ্রাণের অসীম বিস্তার — প্রাণের আয়াম — প্রাণায়াম হয়ে চলেছে। আমাদের সকলের অন্তরে ও বাহিরে এই প্রাণের সমুদ্র প্রবহমাণ।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৫৮)

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে যেখানে বায়ু দেবতার কথাই বলা হইয়াছে সেই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির সায়ণকৃত ভাষ্যের ও তাহার

অনুবাদের নমুনা দেওয়া হইল।

"বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।
তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্।।" (ঋ. ১/২/১)

মন্ত্রটির অর্থ — হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। সোম সুধা সুসংস্কৃত হইয়া আছে। আপনি তাহা পান করুন। আর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

এই মন্ত্রটির সায়ণ ভাষ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"দর্শত হে দর্শনীয় বায়ো কর্মণ্যেতস্মিন্নায়াহি আগচ্ছ। ত্বদর্থমিমে সোমা অরংকৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোঽলঙ্কারঃ। তেষাং তান্ সোমান্। যদ্বা। তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিবেত্যর্থঃ। তৎ পানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি শৃণু। অত্র যাস্কঃ — 'বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা অলঙ্কৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানং। নি. ১০/২/ ইতি।।..."

নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন— "হে দর্শনীয় বায়ু! তুমি আগমন কর। এই সোমরস সকল অলঙ্কৃত রহিয়াছে। তাহাদের তুমি পান কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।"

স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই ঋক্‌টির বিশদার্থ করিয়াছেন এইরূপ— "হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! তোমার জন্য স্বর্গের সুধা সজ্জিত আছে। তুমি সেই সুধা পান কর। আমাদের দেয় সামগ্রী, পূজার উপকরণ কিছুই নাই। তুমি কেবল কৃপা পরবশ হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।"

ভক্ত এই ঋকে একভাবে বিভোর হইবেন। কবি এই ঋকে ভাবরাজ্যের আর এক অভিনব সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিবেন।

পূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রকৃতির প্রফুল্ল আননে হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুস্নিগ্ধ মলয় মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। চন্দ্রের সুধা-ধারা দিকে দিকে ঝরঝর ঝরিতেছে। ফুলে ফুলে প্রমত্ত মধুকরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, পিক-কণ্ঠে কুহরণগীতি গীত হইতেছে। যিনি সকল সৌন্দর্যের আধার, ইহা কি তাঁহার আবির্ভাব সূচনা করিতেছে না ? এমন সুখের দিনে এমন আনন্দের হিল্লোলের মাঝে যদি তিনি না আসিবেন, তবে আর কবে আসিবেন। এমন দিনে যদি তাঁহাকে না ডাকিব, তবে আর কবে ডাকিব ?

ভক্ত সাধক তাই কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন — "এস দেব! স্নিগ্ধ বায়ু-রূপে এস, তোমার বিরহে আমার প্রাণ-বায়ু যে বিগতপ্রায়। তোমার স্নিগ্ধ হিল্লোলে সুধাধারে এসে, তারে সজীব কর।"

এই যে আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাখ্যা ইহাকে অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন। কবির তো কল্পনাই সম্বল। পারিপার্শ্বিকের একটি

বিশেষত্ব না থাকিলে হঠাৎ একটি মন্ত্র প্রকট হইতে পারে না। সকল ব্যাখ্যাতৃগণই পারিপার্শ্বিকের অপরিসীম মূল্য দিয়াছেন। বেদপুরুষ শ্রীঅনির্বাণ দিয়াছেন । একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি — "বৈদিক ভাবনায় আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রসঙ্গ সহচারিত।"

পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি ঋষির পৃথিবী দেবতার প্রথম ঋক্‌টিতে পৃথিবীর দিব্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনির্বাণ ব্যাখ্যারম্ভে বলেন, "যেন তিরস্করণীর অন্তরাল হইতে এক মহিমময়ী অপরূপার আবির্ভাব ঋষির চোখের সামনে। সত্যিই এ তো তাই-ই। পর্বতের অবিচ্ছিন্নতা বহন করিতেছ — হে পৃথিবী, তুমি যে ভূমিকে, ওগো নির্ঝরবতী, তোমার মহিমায় প্রস্ফুটিত করিয়াছ; হে মহিমময়ী পর্বতের তরঙ্গায়নে বিপুলা, বিপুলা পৃথ্বীর অভ্রভেদী যে উত্তুঙ্গতা, তা তাঁহার দিব্য মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের চোখের সামনে। আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে দ্যুলোকে যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, পৃথিবীর শিখরে শিখরে তখন মেঘমালার শৈল সমারোহ" ইত্যাদি। পঞ্চম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের পৃথিবী দেবতা ঋষি অত্রির পুত্র ভৌম।

"বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি।।" (ঋ. ৫/৮৪/১)

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যানে শ্রীঅনির্বাণের ভূমিকার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি করিলাম। দেখা যায়, গভীর তত্ত্বগর্ভ ঋকের বর্ণনায় পারিপার্শ্বিকের গাম্ভীর্যদ্যোতক ভূমিকার বর্ণনা অপরিহার্য। এইপ্রকার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের বিশদ ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় নারদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন বাল্মীকিকে—

"নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

বরুণ

ঋগ্বেদের মুখ্য দেবতাদের মধ্যে বরুণ একজন। 'বৃঞ্‌' ধাতু হইতে বরুণ শব্দ। যিনি সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন তিনি বরুণ, "বৃঞ্‌ বরণে, বৃঞ্‌ আবরণে"। আবৃত অর্থ 'cover' বা আচ্ছাদন নহে, 'encompass', অর্থাৎ ব্যাপিয়া আছেন। অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের দেবতা বরুণ, ঋষি নাভাক্‌, ছন্দ মহাপংক্তি, ৯টি মন্ত্র।

৪২ সূক্তের তিনটি মন্ত্রও বরুণের উদ্দেশ্যে। বরুণকে সমস্ত ভুবনের সম্রাট্‌ বলা হইয়াছে (অসীৎ ভুবনানি সম্রাট্‌)। তিনি অমৃতের রক্ষক (অমৃতস্য গোপাম্‌)। আমরা তাঁহার ক্রোড়ে বর্তমান। "দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে।" ড. রাধাকৃষ্ণন্‌ বলিয়াছেন : "Varuna is the most moral God of Veda. He is capicious God, but a 'dhritabrata' (ধৃতব্রত) one of fixed resolve, Other Gods obey his orders."

বরুণ করুণাময়। যাহারা অপরাধ করে তাহাদেরও তিনি করুণা করেন।

বসিষ্ঠ ঋষি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের সাতাশি সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে বলিয়াছেন :

"যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।"

বরুণের নিকট বরুণমন্ত্রের সাধক ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন : "Absolve us from the sins of our father and from those which we cimmitted with our own bodies"। প্রফেসার ম্যাকডোনাল (Macdonell) বলেন যে, "Varuna's character resembles that of the divine ruler in a monotheistic belief of an exalted type."। (*Vedic Mythology*, p. 2)

বরুণকে অসুর বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন : "Asura; a word used in the Veda as in the Avesta for the Deva (Ahura Mazada) but also for the Gods." পার্শীদের ধর্মশাস্ত্রের 'অসুর' শব্দ আর বেদের 'অসুর' শব্দ একই। 'অসুর' অর্থ প্রাণরক্ষক; সুর-বিরোধিতা নহে।

ইন্দ্রকে দেবরাজ এবং বরুণকে দেবসম্রাট্ বলা হইয়াছে। যেমন, ইংরেজ আমলের ছোটলাট ও বড়লাট। এখনকার দিনের যেমন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। *On the Veda* গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন :

"The kingship of great Varuna is an unbounded empire over all being He is Mighty world ruler, an emperor samrat."

ইন্দ্র শুদ্ধ-বুদ্ধি। তাঁহার পিছনে আছেন ভূমা বরুণ। উপনিষদে যাহা 'ভূমা', সংহিতায় তাহার প্রতিশব্দ 'বৃহৎ'। বরুণ বৃহতের দেবতা। 'বৃ' ধাতু হইতে বরুণ, 'বৃ' ধাতুর অর্থ বেষ্টন করা। তিনি আছেন সব কিছু বেষ্টন করিয়া। সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক তাঁহার উজানে ব্যোম - মহাব্যোম - মহাকাশ। তারপর শূন্যতা। অব্যক্ত বরুণ অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা। তিনি তৎ স্বরূপ। তৎ স্বরূপেই 'সৎ' স্বরূপের প্রকাশ। অব্যক্ত অসৎ তাই মহাশূন্য। এই অসৎ হইতেই সতের প্রকাশ। অধ্যাপক ড. রাধাকৃষ্ণন্ বরুণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (*Indian Philosophy*, vol.I pp. 77- 78) :

"Varuna is the God of say the Name is derive from the root 'var' to cover or compass. He is identical with the greek 'ouranos' and Ahurmazda of the Avesta and His physical origin is manifest. He is coveror the enfolder. He covers the whole starry expanse of heaven as with a robe, with all the creatures therof and their dwellings."

নাভাক্ ঋষি ঋগ্বেদের ৮/৪২ সূক্তে এই কথা বলিয়াছেন— বরুণ অন্তরিক্ষ ও দ্যাবা-পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন।

'ঋত' বলিতে বুঝায় order অর্থাৎ শৃঙ্খলা। ঋতের অধিপতি বরুণ। সমস্ত বিধির বিধানের তিনি কর্তা। বিধানের সম্বন্ধেরই বিধাতা। বরুণ বিধাতা, তাঁহার হস্তে পাশ। উহা নিয়ম ও শৃঙ্খলার পাশ। ঐ পাশ হইতে কাহারও মুক্তি নাই। সকলে ঐ পাশের অধীন। তিনি নিজেও। বরুণের বিধান কঠোর, কিন্তু তাহার মঙ্গল রূপও আছে। ঐ করুণা বরুণের সখা, মিত্র, মিত্র অর্থাৎ বন্ধু। মিত্র ও বরুণের একত্র উল্লেখ হয় মিত্রাবরুণে। কঠিনতা ও কোমলতা, নিষ্ঠুরতা ও দয়ালুতার একত্র সমাবেশ। শাস্তি বিধান ও ক্ষমা-মূর্তি একাধারে। চণ্ডীর মা দুর্গার মত :

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।" (চণ্ডী)

বসিষ্ঠ ঋষি ঋগ্বেদের ৭/৮৭ ঋকে এই কথা বলিয়াছেন। ঋ.১/২৪/৮ মন্ত্রে ঋষি শুনঃশেপ ঐ একই কথা বলিয়াছেন। ঋ. ২/২৮/১ সূক্তে বরুণ সম্বন্ধে গৃৎসমদ ঋষির উক্তি আছে। তিনি বলিয়াছেন, বরুণের বিধানেই

বিশ্বের সমস্ত ক্রিয়া, গতি - স্থিতি সম্পন্ন হয়, নদী প্রবাহিত হয়, বায়ু বহে, বৃষ্টি পড়ে, বৃক্ষ-লতা জন্মে, ঋতু আবর্তিত হয়, প্রাণীকুল সঞ্জীবিত হয়। তপন তাপ দেয়। চন্দ্র ও নক্ষত্রবর্গ যথা নিয়মে স্ব স্ব গতিপথে ধাবিত হয়। Professor Macdonell বলেন।

"Varunas character resembles that of the divine ruler in monotheistic belief of an exalted type." (*Vedic Mythology*, p.8)

সূর্য বা সবিতা

সূর্যের কথা বলিতে গেলে সবিতার কথা প্রসঙ্গত কিছু বলি। পূর্বে গায়ত্রী মন্ত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে সবিতা ও সূর্য এক-ই (Same) দেবতা। কেহ কেহ ইঁহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য ভাবনা করেন এবং বলেন— সূর্য বহিরাকাশ ও সবিতা অন্তরাকাশ আলোকিত করেন। বহিরাকাশের সূর্যকে আমরা সকলেই জানি। সবিতা সর্বার্থক আত্মা। বহিরাকাশে সূর্যমণ্ডলের অন্তস্থিত যে পুরুষ তিনি নারায়ণ। তিনি সকল প্রাণীর হৃদাকাশে জীবাত্মা হইয়া বাস করেন। বাহিরের সূর্য তেজোময় জ্যোতিঃপিণ্ড, আর সবিতা জ্যোতিরও জ্যোতি। তাঁহার কথা কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন —

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।"
"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।" ২/২/১৫

—তিনি প্রকাশমান বলিয়া সমস্ত বস্তু দীপ্তিমান। তাঁহারই দীপ্তিতে সমুদয় প্রকাশমান। বস্তুত বেদপাঠে সবিতা ও সূর্যে বিশেষ কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। দুইটি সাবিত্রী মন্ত্রেই 'সবিতা' শব্দটি আছে।

"আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।"
(ঋ. ১/৩৫/২)

কোন কোন পণ্ডিতদিগের মতে এই মন্ত্রটিই ক্ষত্রিয়জাতির সাবিত্রী মন্ত্র। আর "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" — ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সাবিত্রী (গায়ত্রী)। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তে সূর্য দেবতা, কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, ১৩টি মন্ত্র। প্রথম মণ্ডলেরই ১১৫ সূক্তে, সূর্যদেবতা, অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি, ছয়টি মন্ত্র। এই সূক্তে সূর্য উদয়ের এক অপূর্ব শোভা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূক্তে ভাষার মধুরিমা ও অলঙ্কারের ধ্বনি কাব্য-রসোচিত। সকল দেবতার কান্তি-সমন্বিত অত্যুজ্জ্বল দেবতার বর্ণনা করা হইয়াছে।

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্।।"

— "এই বসুন্ধরা, আকাশ, স্বর্গকে সূর্যদেবতা পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহার দীপ্তি ও তেজের দ্বারা। মিত্র, বরুণ এবং অগ্নিদেবতার দর্শনেন্দ্রিয় স্বরূপ এই দেবতা ।" (ড. যোগীরাজ বসু)

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তে অগস্ত্য ঋষি বলিতেছেন —

"সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে অস্য
যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার।।"১০

— "পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।" (রমেশচন্দ্র দত্ত)

আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, সূর্য 'দ্যুস্থানম্' — সূর্য দ্যুলোকের দেবতা। তাঁহার "কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্লিতমাদিত্য কর্মৈব তৎ' (নিরুক্ত, ৭/১১) — রসপ্রদান ও রশ্মি দ্বারা রসধারণ, রসদান বলিতে বৃষ্টিদান বুঝাইতেছে। রশ্মিদ্বারা রস ধারণ করেন অর্থ — সূর্যের রশ্মির দ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পায়িত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। আবার সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়ে। (বেদের পরিচয়)।

ঋগ্বেদে সপ্তম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তে সূর্যকে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্যই সকলের প্রযোজক ও বরদাতা। সূর্যের তেজ হইতে প্রাণিবর্গের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। সর্বলোকের শীর্ষস্থানীয় সূর্যকে বহু বিশেষণে বিঘোষিত করা হইয়াছে। দিবাভাগে সূর্যের প্রখর তাপ শস্যাদি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত সহায়ক।

সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে ঋষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন — বৈদিক সকল দেবতার মূল সূর্য।

"এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।'

মিত্র বরুণ সবিতা অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনৌ) উষা ভগ বিষ্ণু সকলই সূর্যের এক একটি অবস্থার নামান্তর মাত্র। দিবাভাগে যিনি সূর্য, রাত্রিকালে তিনি বরুণ। সুকক্ষ ঋষি ঋ. ৮/৯৩/৪ মন্ত্রে ইন্দ্রকে সূর্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

"যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে।।"

অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ঋ. ১/১১৫/১ মন্ত্রে সূর্যকে স্থাবর-জঙ্গমের

আত্মা বলিয়াছেন — "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"

প্রস্কণ্ব ঋষির ঋ. ১/৫০ সূক্তের সূর্য দেবতা, কুৎস ঋষির ঋ. ১/১১৫ সূক্তে সূর্য দেবতা, দীর্ঘতমা ঋষির ঋ. ১/১৬৪/৪৬, ৪৭, ৫১ মন্ত্রের দেবতা সূর্য।

বামদেব ঋষি ঋ. ৪/৪০/৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।।"

'হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করেন। বসু অন্তরিক্ষে অবস্থিতি করেন। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করেন। অতিথি গৃহে অবস্থিতি করেন। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করেন। বরণীয় স্থানে অবস্থান করে যজ্ঞস্থলে অবস্থান করেন, অন্তরিক্ষ স্থলে অবস্থান করেন, জলে, কিরণে, সত্যে ও পর্বতে জন্মেছেন।'

এইটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক্। সায়ণ বলেন, এই হংসবতী ঋকে, আদিত্য মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্বপ্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মা আছেন এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম তাঁহাদের তিনজনের একতা এই সৌরী ঋক্ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।'

যজুর্বেদে এই ঋক্‌টি দুইবার আছে। ১০/২৪ ও ১২/১৪ মন্ত্রের টীকায় টীকাকার মহীধর বলেন, এই মন্ত্রে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। সূর্যের কল্যাণতম রূপ তাঁহারই প্রতীকরূপে সূর্যকে উপাসনা করা হইয়াছে। পরমপুরুষের উপাসনার অবলম্বনরূপে, প্রতীকরূপে বৈদিক ঋষিগণ সূর্যকে উপাসনা করিয়াছেন।

হংসবতী ঋকের দেবতা সূর্য। এই ঋক্ দ্বারা সূর্যকে ঈক্ষণ করিলে ও জপ করিলে সাধক ব্রহ্মের শাশ্বতলোকে গমন করেন। জমদগ্নি ঋষি ঋ. ৮/১০১/১১-১২ মন্ত্রে বলিয়াছেন — সূর্য সত্য সত্যই মহান্, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তিনি তেজে মহান্, বীর্যে মহান্, বলে মহান্।

সর্বপ্রকারেই মহান্ দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহিমময় তিনি। শ্রবণ-দ্বারেও তিনি মহান্ ; উপাসকের প্রার্থনা সর্বাপেক্ষা অধিক ও শীঘ্র শোনেন। তাই মনুষ্যগণ ঐ মহানের স্তুতি করে।

"সূর্য আমাদের আলোকোজ্জ্বল ধী। যার মন আলোকিত তাঁকে বলা হয় "সুরি"। (বেদমন্ত্র- মঞ্জরী, পৃ. ২৬৬)

শ্রীঅরবিন্দ বলেন — "The Godhead of the supreme Truth and Knowledge and his rays are the light emanating from the supreme Truth and Knowledge."

(*Vedic Symbolism*. p. 76)

বসিষ্ঠ ঋষি ঋ. ৭/৬৩/৪ - ৫ মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়াছেন — হে সূর্য, তুমি দেবগণের, বিশ্বগণের অভিমুখে, মনুষ্যগণের অভিমুখে, স্বর্লোকস্থ দেবগণের, ত্রিলোকস্থ সকলের অভিমুখে উদিত হও। অর্থাৎ ত্রিলোকস্থ জনগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিমুখে বলিয়া যেন সূর্যকে মনে করে।

সূর্য সর্বাত্মক , বস্তুত সকলই সূর্য। সেই হেতু সর্বদেবতা সূর্য। দীর্ঘতমা ঋষি বলেন — এই সূর্যকেই বিদ্বান্‌গণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলেন। তিনিই দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্, তিনি এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বহু নামে অভিহিত করেন; তাঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন। (ঋ. ১/১৬৪/৪৬)

সূর্য আবার এক মুহূর্তে জগৎ ধ্বংস করিতে পারেন। স্রষ্টাও তিনি, ধ্বংসকর্তাও তিনি। সূর্য একটি ভীষণ তপ্ত পিণ্ড; ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্তে এই পৃথিবী দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যে-কোন বস্তু যে-কোন মুহূর্তে সূর্য হইতে সৃষ্টি করা যায় তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের সমসাময়িক কালে কাশীধামে শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজ নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেন যে, যেকোন দ্রব্য সূর্যরশ্মি হইতে যেকোন ক্ষণে তৈয়ারী করা যায়। তাঁহার শিষ্য ছিলেন কাশীধামের 'চলন্ত বিশ্বনাথ' মহাজ্ঞানী মহামহোপাধ্যায় ড. গোপীনাথ কবিরাজ। তিনি বিশ্বাস করিতেন সৃষ্টিরহস্য সমাধানের চাবিকাঠি আছে সূর্যের কাছে। আইনস্টাইনের $E = mc^2$ থিয়োরী অনুযায়ী এক বিশেষ অবস্থায় matter (জড় পদার্থ) গতিযুক্ত হইয়া (C^2) Energy-তে পরিণত হয় (জ্যোতিতে)। অতএব Energy পুনরায় matter-এ পরিণতও হয়। matter বলিতে যে কোন জীব-অজীব। শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী সেই প্রক্রিয়া জানিতেন আইনস্টাইনের থিয়োরীর অপেক্ষা না করিয়া।

বেদে সূর্যোপাসনা একটি প্রাকৃত জড় সূর্যের উপাসনা নহে, তদন্তর্গত পুরুষেরই উপাসনা। কঠশ্রুতির ভাষায়, যে পুরুষ সূর্যের কল্যাণতম রূপ তাহারই প্রতীকরূপে সূর্যকে উপাসনা করা হইয়াছে। পরমপুরুষের উপাসনায় অবলম্বন রূপে — প্রতীকরূপে বৈদিক ঋষিগণ সূর্যকে উপাসনা করিয়াছেন।

মহাভারতে সূর্যোপাসনার কথা আছে। পাণ্ডবদিগের পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য হৃতরাজ্য যুধিষ্ঠিরকে সূর্যের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। সূর্যের ১০৮ টি নাম কীর্তন করিতে বলেন। ঐ নামের মধ্যে দেখা যায় বেদে যত দেবতার নাম আছে সকলেই আছেন। যেমন—

"সূর্যোঽর্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ।।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ।
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈন্ধনস্তেজসাং পতিঃ।
ধর্মধ্বজো বেদকর্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ।।"

(মহাভারত, বনপর্ব ৩/১৬, ১৮, ১৯)

ইহাতে বুঝা যায়, সূর্যই সমস্ত বৈদিক দেবতা। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ ও সূর্য এই পঞ্চদেবতার কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। উদাহরণ স্বরূপ এই দেবতাদের কথা লিখিলাম। দেখা যায়, ঋষি যখন যাঁহার কথা বলিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতমরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে। একটি ন্যায় আছে, 'বরকন্যা ন্যায়'। বিবাহের আসরে যত লোকই উপস্থিত হউন না কেন, সর্বাপেক্ষা সুন্দর আসন ও বসন থাকিবে বর-কন্যার জন্য। সর্বাপেক্ষা সুন্দর আসনে বর বসিয়াছেন। বরের পিতা প্রভৃতি গুরুজনেরা, এমন কি হয়ত আচার্য গুরুও সেখানে উপস্থিত আছেন, তথাপি সর্বাপেক্ষা সুন্দর আসনখানি বরকেই দেওয়া হয়, পিতা বা গুরুদেবকে নহে। বিবাহের দিনে বরেরই আসন বড়। কন্যার জননী বরকে আরতি করেন, বরণ করেন। বরের পূজনীয় বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদিগকে করেন না। ইহাই হইল বর-কন্যা ন্যায়। বেদে যখন যাঁহার কথা ঋষি বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মনোবুদ্ধি-অভিনিবেশ সেই দেবতাতেই নির্দিষ্ট, তাঁহারই মহিমা তখন মনে সর্বদা জাগ্রত। তথাপি বেদে প্রত্যেককেই এইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ বলায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ এই বিষয়ের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান বেদের ঋষিরাই করিয়াছেন। যাস্ক প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন, অগ্নি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। আবার কাত্যায়নের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন সূর্যই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মূলদেবতা, এই বিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় যাস্কই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই জগতে পিতা হইতে পুত্র জন্মায় কিন্তু পুত্র হইতে পিতা জন্মায় না, কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজ্য নহে। দেবতারা ইতরেতরজন্মা। বেদে আছে অগ্নি হইতে সূর্য জন্মিয়াছেন ; আবার সূর্য হইতে অগ্নির জন্ম হইয়াছে। 'অগ্নের্যাবাঃ আদিত্য জায়তে' — এইরূপ ঋষির বাক্য আছে। আবার সূর্য হইতে যে অগ্নি জন্মে তাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত। আতস কাচের মধ্য দিয়া সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দিয়াশলাই এর কাঠির মত জ্বলিয়া উঠে। কাঠ পোড়াইলে আগুন হয়। ইহার কারণ

কাঠের মধ্যে সূর্যের রশ্মি বিদ্যমান ছিল — ইহা বিজ্ঞানসম্মত। দেবতারা পরস্পর হইতে পরস্পর জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং সূর্য ও অগ্নির মধ্যে কে বড় কে ছোট এই পার্থক্য করা সম্ভব নহে। দীর্ঘতমা ঋষি চরম সমাধান দিয়াছেন —

'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'।

এক মহাসত্তার পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেবতাই অভিন্ন। সুপ্রসিদ্ধ ১০৮ খানি উপনিষদের মধ্যে একখানি উপনিষদ্ আছে। তাহার মতে — "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। সূর্যাদ্বৈ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।।"

সূর্য স্থাবর জঙ্গমের আত্মা। সমস্ত ভূতবর্গ সূর্য হইতে উৎপন্ন হয়, সূর্য দ্বারা পালিত হয় এবং সূর্যে লয় প্রাপ্ত হয়। সূর্য চিদচিৎ সর্বাত্মক, সূর্যই প্রত্যক্ষ কর্মকর্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঋক্, যজু, সাম, সমস্ত ছন্দ সূর্য সর্বগ সর্বত্র বর্তমান, জীবের সব দিকেই সূর্য আছেন। সবিতা পশ্চাত্তাৎ, সবিতা পুরস্তাৎ, উত্তরত্তাৎ, সবিতা অধরত্তাৎ — এই প্রকার ব্রহ্মের সকল লক্ষণ সূর্যে থাকা হেতু সূর্য ব্রহ্মই। অসৌ আদিত্য এব ব্রহ্ম।

সুনীল বারিধিলাঞ্ছিত তটভূমি শ্রীক্ষেত্রের তীরদেশের শোভা ও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়া বিরাজিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের মন্দির। সুরম্য এই মন্দিরের বিপুলত্ব, স্থাপত্য, কারুকৃতি ও সৌন্দর্য অতুলনীয়। উহার অল্প দূরবর্তীতে অবস্থিত কোনারকের পূর্বোল্লিখিত সূর্যমন্দির অনুরূপ খ্যাতি সম্পন্ন ও মহিমান্বিত।

আষাঢ় মাসে সূর্যের অবস্থান ভারতবর্ষের সর্বোচ্চভূমিতে। ৮ই আষাঢ় দিন ও রাত্রের সময়ের পরিমিতি সমান । ইহার আগে ও পরে পনেরো-কুড়ি দিন সূর্য পৃথিবীর উত্তরাংশে থাকেন। ফলে ঐ সময় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। গরমের দিনে উত্তাপজনিত ক্লেশ নিবারণের উপায় স্নান ও বিহার। পৃথিবী ও মানবের তপ্ততার জন্য মনে হয় এই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা। শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়ায় সূর্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করেন। দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। ইহাতে বুঝা যায় শ্রীজগন্নাথ ও সূর্য পৃথক্ নহেন।

সুতরাং খৃষ্টানদের যে যীশু খৃষ্টের অর্চনা, মূলত তিনিও সূর্যদেবতা। বড়দিন অর্থাৎ ২৫ শে ডিসেম্বরে সূর্যের ব্যাপক প্রকাশ শুরু হইল। ইহার কিছু পূর্ব পর্যন্ত ছিল ছোটদিন। এক সময় সূর্যপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দ্বিজাতির শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গায়ত্রী। সূর্যার্ঘ্য প্রদান না করিয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জলগ্রহণ করিতেন না।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ যে সূর্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া আহার করেন সেই সূর্যার্ঘ্য প্রদানের মন্ত্র —

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ।"

ইহা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

সূর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীঅনির্বাণ বলেন, "একটা সূর্য একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যদি সেই কেন্দ্রের সঙ্গে এক হতে পারি, তাহলে আমিও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হতে পারি। বৈদিক রহস্যবিদ্যার এই হল মূল সূত্র — নিজেকে সৌরশক্তির বিদ্যুৎ কূটে রূপান্তরিত করা। এরই নাম সূর্যবিজ্ঞান।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ২৮)

পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে সূত্র দিয়াছেন, "ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।" (বিভূতিপাদ, ২৬)

অনুবাদ : সূর্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। অর্থাৎ সূর্যে মনঃসংযমের দ্বারা বিশ্বভুবনের জ্ঞান আমাদের অন্তরঙ্গলোকে সহজেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"'বাহিরে যিনি সূর্য, অন্তরলোকে তিনিই হলেন সবিতার ভর্গ— জ্যোতির্ময় মহাসূর্য প্রণব ওঙ্কার। তিমির বিদারী তিনিই হলেন অজ্ঞান-অন্ধকার দুঃখ অবসাদ অপনোদনকারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ — যিনি যুগপৎ সৌরজগতের অধীশ্বর এবং আমাদের অন্তরস্থ পরমাত্মা। বেদের ঋষির সুদৃঢ় প্রত্যয় -- "যোঽসাবসৌ পুরুষো সোঽহমস্মি।"'(ঈশোপনিষদ্) ('আকাশ ব্রহ্ম,' অযাচক, পৃ. ১৫১)

বাংলার গ্রামাঞ্চলে মাঘ মাসে কুমারী পূজা ও মাঘমণ্ডলব্রত প্রচলিত ছিল। মাঘমণ্ডল অর্থ সূর্যমণ্ডল। একটি চলিত কথা আছে—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শংকরাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেদ্ জনার্দনাৎ।।"

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন সূর্যের আলোয় বহু ব্যাধি নিরাময় হয়। তাঁহারা সৌরচিকিৎসা প্রণয়নের চেষ্টায় আছেন।

যীশু খ্রীষ্টকে সূর্য বলিবার কারণ মিশর ও ব্যাবিলনের সূর্যপূজা, এবং ঐ ধারায় আসিয়া খ্রীষ্টধর্মমত পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে — ইহা প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছে। পঞ্চদেবতার পূজার মধ্যে সূর্য একজন প্রধান দেবতা। এই পৃথিবীর ও সৌরমণ্ডলের যাহা কিছু সকলই সূর্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথা বেদ বহু পূর্বে বলিয়াছেন। বর্তমান বিজ্ঞানও তাহাই বলে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

বৃন্দাবনেও সূর্যদেবতার মন্দির ছিল। গৌড়ীয় আচার্যদের ও পদকর্তাদের অনেক গ্রন্থে আছে রাধারাণী সূর্যমন্দিরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে

মিলিত হইতেন। রাধারাণীর পিতার নাম বৃষভানু রাজা। তাঁহার ভাইদের নাম চন্দ্রভানু বৃষভানু প্রভৃতি নামে বুঝা যায় তাঁহাদের গোষ্ঠীও সূর্যপূজক ছিলেন।

শ্রীরাধারাণী সূর্যপূজার ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে নিধুবনে মিলিত হইতেন। একটি মহাজনীপদ —

"সুরুজ আরাধন, ছল করি সুন্দরী,
নিধুবন করল পয়ান্।
গোধন সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা তটে,
বিহরই নাগর কান।।"

এই সকল পদ হইতে বুঝা যায় ঐ সময় সূর্যপূজার খুব ব্যাপকতা ছিল। তাহা না হইলে ঐ পূজার ছল করিয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। শ্রীবৃন্দাবনে চৌরাশীক্রোশ পরিক্রমা মণ্ডলের মধ্যে অদ্যাপি কয়েকটি সূর্যমন্দির আছে।

সকালে আমরা যে সূর্য দেখি তাহা আসলে প্রতিবিম্ব। বেদ উহাকে রথের চাকা বলিয়াছেন। সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন বিষ্ণু বা বামন। বিষ্ণুর চরণে মধুর উৎস। বামনরূপে সূর্যের রশ্মি আমাদের হৃদয়াকাশে প্রবেশ করে ইহা প্রাণ। এই শক্তির দ্বারা জগৎ সঞ্জীবিত — "যয়েদং ধার্যতে জগৎ" (গীতা)। সূর্যের আলোয় যে সাতটি রং তাহা বেদ বলিয়াছেন সাতটি ঘোড়ার রূপকে।

এই জগৎটা জড় নহে, প্রাণবন্ত। এই প্রাণশক্তি সূর্য হইতে আসিয়া আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত। এই দেহমধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎকণা, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বামন বা আত্মা আছেন। দেহরথে বামন দর্শন করিলে, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি হইলে তাঁহার জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না — 'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' হৃদয়স্থ এই প্রাণশক্তিকে গীতা পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন — 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।'

সূর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য বৈদিক ঋষিদের পরিজ্ঞাত ছিল। যেমন চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নাই, সূর্যের আলোয় আলোকিত। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, সকলেই সূর্য-আলোয় আলোকিত। ইহারা সকলেই সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণরত। সূর্য হইতে ইহাদের উৎপত্তি। প্রাচীন শাস্ত্রে শনির পরে আর কোন গ্রহের উল্লেখ নাই। দূরবর্তী বলিয়া সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে শনির ২৯ বৎসর ৬ মাস সময় লাগে। তাহার পর মহাকাশ, এই মহাকাশে আকাশ গঙ্গা বা 'Milky way' দৃষ্ট হয়। এই মহাকাশের অধীশ্বর বরুণ। বরুণ সব আবরণ করিয়া বিদ্যমান। বেদের একস্থানে বরুণ ও সূর্য একই বলা হইয়াছে। দিবাভাগে যিনি সূর্য,

রাত্রিকালে তিনিই বরুণ। ইহা হইতে অনুমান করা যায় সৌরজগতের ব্যাপকতা কত বিশাল। এই সৌর মণ্ডলের সত্তায়, সমস্ত জীবজগৎ, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গের সত্তা ও প্রাণবত্তা। সকলেই একান্তভাবে নির্ভরশীল সূর্যের উপর। সূর্য আছেন বলিয়া আমরা সঞ্জীবিত আছি।

বেদে আছে, মিত্র, বরুণ, সবিতা, উষা, সূর্য, বিষ্ণু এই সকলই আদিত্যের এক একটি অবস্থার নাম মাত্র। দিনের বেলায় আদিত্যের নাম সূর্য। রাত্রিকালে আমরা না দেখিলেও সূর্য থাকেন। তখন তাঁহার নাম বরুণ। মিত্র অহরভিমানী দেবতা, বরুণ রাত্র্যভিমানী দেবতা। রাত ১২টা থেকে শুরু হয় তমোভাগের অশ্বিদ্বয়ের (অশ্বিনৌ)। রাত ৩টা থেকে শুরু হয় জ্যোতির্ভাগের অশ্বিদ্বয়ের কাল। যখন আকাশ লাল হইয়া উঠে তখন আদিত্যের নাম উষা। উদয়মাত্র আদিত্যের নাম ভগ, তাহার পরের অবস্থার নাম সবিতা এবং অতঃপর সূর্য। বেলা যখন বাড়িতে থাকে তখন পূষন এবং মধ্যগগনে যখন সূর্য থাকেন তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু। নিরুক্তকার এই কথাই বলিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে আদিত্য যখন অস্ত যান তখন নিজ তেজ অগ্নিতে নিহিত করেন। ইহা এক অপূর্ব সমাধান।

দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের নাম পুরুষ সূক্ত। এক বিরাট্ পুরুষের কথা উহাতে কথিত হইয়াছে। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উদিত হইলেন।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।।" (ঋ. ১০/৯০/১৩)

সুতরাং দেবগণ যে সকলই এক, ইহা সুস্পষ্ট। পুনরায় বলি — অষ্টম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে —

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।।"

'ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্', অর্থাৎ এক-ই সর্বপ্রকার হইয়াছেন।

এই সকল মন্ত্রে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের বীজ নিহিত আছে। বহু জ্ঞানী ব্যক্তির ধারণা, কোন এক বস্তুর একই সঙ্গে একত্ব ও বহুত্ব সম্ভব নহে, ইহা পরস্পর বিরোধী। কোন এক বস্তু এক হইলে বহু হইতে পারে না — এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমি একটি মানুষ— One personality; কিন্তু আমার দেহে ৭০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = শত কোটি)কোষ বা cell আছে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত। ইহাদের মধ্যে বিরোধিতা কিছু নাই। একই বহুকে রক্ষা করিতেছে বা বহুই এককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যেমন, একটি বৃক্ষ — উহার একটি স্কন্ধ ; কিন্তু শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প অগণিত। এই বহুত্বকে ছিন্ন করিলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব লোপ পায়।

সুতরাং এক ও বহু বিরোধী কিছু নহে , অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত এক। একের মধ্যে বহুত্ব ও বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই বৈদিক ঋষির চরম দর্শন। ইহাই সম্যক্ দর্শন। এক ঈশ্বর স্বীকার করিলে আর বহু দেবতা মানা যাইবে না, আবার বহু দেবতা মানিলে এক ঈশ্বর স্বীকার করা যাইবে না — এইরূপ ভাবনা ভ্রমাত্মক। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে বহুত্ব একত্বের বিভূতি, বহুদেবতা একই পরব্রহ্মের বিভূতি। আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

বহু ফুলে গাঁথা সুন্দর একটি মালা। কোন রসিক ব্যক্তি সাধ করিয়া গলায় পরিলেন। সাধক ভক্ত ভক্তিভরে দেবতার গলায় অর্পণ করিলেন। মালার সূত্রটি ছিঁড়িয়া গেলে ফুলগুলি সব ছড়াইয়া পড়িবে, সকলে ফুলগুলি মাড়াইয়া যাইবে। ফুলবিহীন মালার সূত্রটি কেহ গলায় পরিবে না। ভারতের শতকোটি লোক যদি এক জাতি এক প্রাণ হইতে পারে তবেই দেশের অশেষ কল্যাণ। যদি শতকোটি লোকের শত প্রকার মতভেদ দেখা দেয়, তবে দেশের পক্ষে মহা অকল্যাণ, মহতী বিনষ্টি। ইহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। এই যে একত্ব — এই একত্বের ভিত্তিভূমির মূলে সূর্যদেবতার প্রতি যথার্থ অনুভূতি।

ঋক্-সংহিতায় পরম আকাঙ্ক্ষিত দেবতা

উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদী। বেদ-সংহিতা দেববাদী। দেবতার সংখ্যা বহু। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে সূক্ত আছে বেদে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সকলের আকাঙ্ক্ষিত কোন্ জন? এক এক স্থলে এক এক জনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; যথা, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও সোম। এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? অগ্নি-সূক্ত দ্বারা বেদের আরম্ভ। তবে কি অগ্নি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ? এক মন্ত্রে অগ্নিকে 'অবম' বলা হইয়াছে। 'অবম' অর্থ সকলের নীচে, ছোট। প্রথমে উল্লিখিত হইলেই যে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহা নহে। উপরে থাকিলে, প্রথম শ্রেণী বা প্রথম স্তরভুক্ত হইলেই যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা না হইতেও পারে। প্রথমে থাকিলেও অগ্নিকে 'অবম' বলা হইয়াছে। ঊর্ধ্বগামী সিড়ির সর্ব নিম্নটি অন্য সকল সিড়িগুলিকে ধরিয়া রাখে। সে নিম্নস্থ (অবম) হইলেও তাহার মূল্য সর্বাধিক। আর ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে পরম। কারণ ইন্দ্রকে লক্ষ করিয়া সর্বাধিক সূক্ত আছে দেখা যায়। সংখ্যার আধিক্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার সুন্দর নহে। সংখ্যার আধিক্য বা অঙ্কের বিচারে কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের নির্ধারণ পণ্ডিতোচিত নহে। যাঁহার শিষ্য সর্বাধিক সেই গুরুই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং যাঁহার শিষ্য অতি অল্প তিনি তদপেক্ষা ছোট, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহার দেহের ওজন সকলের চাইতে বেশী বা ধনসম্পদ্ যাহার সকলের হইতে অধিক, সেই হেতু তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

অনেকের মতে বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রী। গায়ত্রীর মধ্যে যে বরেণ্য ভর্গ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা অস্বীকার করিতে চাই না। যাঁহাকে সকলের আরাধনা করা উচিত, তিনিই শ্রেষ্ঠ— ইহা মন মানিতে চায় না। উচিত-অনুচিতের বিচার গ্রহণীয় নহে। তাহা হইলে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মান বা নির্ণায়ক (criterion) কি হইবে?

আমি বলি, (মনে হয় শাস্ত্র আমার সহিত একমত হইবেন)—সকলেই যাঁহাকে চায়, না চাহিয়া থাকিতে পারে না; কোন কারণ নাই অথচ সকলেই সকল সময় যাহাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কে তিনি? উত্তর খুব দুর্লভ নহে। সেই বস্তুটির নাম—'আনন্দ'। এই আনন্দকে

চায় সকলেই, বিনা কারণেই চায়। যে কোন বস্তু চাওয়ার পিছনে কোনও না কোনও কারণ থাকে। কেন চায় তাহা প্রশ্ন করা যায় এবং উত্তরও তাহার পাওয়া যায়। কিন্তু যদি বলা যায়— আনন্দ চাই; তবে আর প্রশ্ন থাকে না। দুঃখের বিপরীত সুখ আনন্দ জীবের চির কাম্য। গায়ত্রীর বরেণ্য ভর্গ বা ব্রহ্মকে চাই। কেন চাই? তাঁহাকে পাইলে আমার সত্তা আনন্দপূর্ণ হয়, তাই চাই। সুতরাং ব্রহ্ম হইলেন অপ্রধান (Secondary) ; প্রধান (Primary) হইল আনন্দ। ''আনন্দং ব্রহ্ম'', ব্রহ্মে আনন্দ আছে, তাই ব্রহ্মকে চাই আনন্দ প্রাপ্তির আশায়।

এই আনন্দের দেবতা কে? তাঁহাকে চিনিব কেমন করিয়া? কোনও সভায় প্রধান কে, তাহা তাঁহার বসিবার আসন দৃষ্টে বুঝা যায়। বেদের দশটি মণ্ডল। প্রথম মণ্ডলে অগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন দেবতার নাম আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে ঋষি গৃৎসমদ ও তাঁহার গোষ্ঠী, দেবতা অনেক।তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র ও তাঁহার গোষ্ঠী, দেবতা অনেকেই আছেন। চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব ও তাঁহার গোষ্ঠী, সূক্ত আছে অনেক দেবতার। পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি অত্রি ও তাঁহার গোষ্ঠী, সূক্তে আরাধ্য অনেক দেবতা আছেন। ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজ ও তাঁহার গোষ্ঠী, সূক্তে অনেক আরাধ্য দেবতা আছেন। সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ ও তাঁহার গোষ্ঠী, আরাধ্য দেবতা আছেন বহু। অষ্টম মণ্ডলের ঋষি কণ্ব ও তাঁহার গোষ্ঠী। প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডল কোন একজন ঋষির নহে। প্রত্যেক স্থলেই আরাধ্য দেবতা বহু। একমাত্র নবম মণ্ডল, যাহার সূক্ত সংখ্যা ১১৪টি, আরাধ্য দেবতা সোম; সম্পূর্ণ এই একটি মণ্ডলে একজন আরাধ্য থাকায় বুঝা যায় তাঁহার গুরুত্ব সর্বাধিক ও আসন সর্বোপরি।

সোম চন্দ্রের এক নাম। সোম অর্থ আনন্দ। সাধারণত আমরা মনে করি সোমের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে। সোমকে চন্দ্র ভাবিবার কারণ এই যে, চন্দ্র আনন্দদায়ক। পূর্ণচন্দ্রের দর্শনে সকলের আনন্দ হয়। এই আনন্দের পশ্চাতে কোন কারণ নাই। অনেক মানুষের নামের মধ্যে চন্দ্র শব্দ আছে, ইহার কারণ চন্দ্র আনন্দদায়ক, দেখিলে জাগে, আনন্দের স্ফূর্তি।

চন্দ্রের কথা কিছুটা বিশেষ করিয়া বলিব ঋ. ১০/৮৫/১-৪ মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

''সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ।। ১
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ।। ২
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন।। ৩
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।

গ্রাব্ণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ।।" ৪

অনুবাদ— "সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, ওরই প্রভাবে সোম সে-স্থান আশ্রয় করে আছেন। ১। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হয়েছে, অপিচ, এ'সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রেখে দেওয়া হয়েছে। ২। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে তখন লোকে ভাবে, তার সোম পান করা হল। কিন্তু স্তোতাগণ যা প্রকৃত সোম বলে জানেন, তা কেউই পান করতে পায় না।৩। হে সোম! স্তোতাগণ গোপন করবার ব্যবস্থা করে তোমাকে গোপন করে রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনতে থাক পৃথিবীর কেউই তোমাকে পান করতে পায় না। ৪।" (ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র)

গভীর সত্যকে মুখোশ পরাইয়া অন্যরূপে দেখানো ঋষিগোষ্ঠীর এক স্বভাব। এই কথা পূর্বে বলিয়াছি। শিলার উপর পাতা ছেঁচিয়া যাহারা মনে করে সোমরস আহরণ করা হইতেছে, বেদ তাহাদিগকে আকাট মূর্খ বলিয়াছেন। বৈদিক ঋষি রেণু এই সোমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, সোমের অনন্ত মহিমা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গও অনুধাবন করিতে পারে না। কোন পর্বত ইহার মহিমা স্পর্শ করিতে পারে না। কোন সমুদ্র পারে না ইহার বিপুলতাকে স্পর্শ করিতে —

"ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ।
যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীলু রজতি স্থিরাণি।।"

(ঋ.১০/৮৯/৬)

যে উজ্জ্বল নির্মল আনন্দধারা সাধকের চিত্তে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ সোমরূপে নামিয়া আসেন, তাহার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ *On the Veda* গ্রন্থে বলিয়াছেন— "...illumined Ananda that descends from above"... "Soma, the ambrosial wine of the Veda, wine of delight or wine of immortality."।

এই আনন্দকে উপনিষদ্ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র নাম দিয়াছেন 'ভক্তিরস'। ভাগবতের মরমিয়া নিষ্কিঞ্চন সাধকের নিকট উহা 'ভক্তিমদিরা'। ভাগবতীয় ভক্তগণ এই মদিরা পান করিয়া উন্মাদের মত কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও গান, কখনও বা নৃত্য করেন। লোকে দেখিলে কি ভাবিবে, তাহার কোন অপেক্ষা নাই—

"হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"

(ভাগবত, ১১/২/৪০)

এই ভক্তিমদিরা পান করিয়া তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মত্ত হইয়া গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসিয়া ওষ্ঠ, বদন, নাসিকা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিতেন। ঐ

ভক্তিমদিরা আস্বাদনে তন্ময় এক নৈষ্ঠিক শুদ্ধ-সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে আলো-বাতাস-জানালাবিহীন ক্ষুদ্র এক মাটির কুটিরে লোক চক্ষুর অন্তরালে ১৬ বছর ৮ মাস ভাবতন্ময় ছিলেন। ছিল না তাঁহার কোনরূপ বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন বা লোকাপেক্ষা।

"জীবনসত্তার গভীরে অস্তিত্বের যে আনন্দ সেই রসনির্যাসের নাম হইল সোম।" (শ্রীঅমলেশ)

আমাদের জীবনে যে দেহগত সুখ তাহা সোমের প্রাকৃত রূপ। স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয়জ সুখকে রূপান্তরিত করিতে হইবে শুদ্ধ সত্ত্ব আত্মিক আনন্দে। ইহাই হইল বৈদিক ঋষিদের 'সোমরস পান'। যে সোমলতার পত্র পেষণ করিয়া সোমরস নিষ্কাষণ করত যজ্ঞে অর্পণ করা হয়, তাহা হইল আধ্যাত্মিক অমৃতায়নের প্রতীক মাত্র। সোমরস পেষণে পাষাণের শব্দই পাওয়া যায়, সোমরসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যাস্ক বলেন, সোমলতা পেষণ করিলেই সোমপান হইল না, সোমরস আসলে সোম নয়, সোম অন্য বস্তু, সোম হইল চন্দ্র। বৈষ্ণবরা বলেন ব্রজের অপ্রাকৃত চন্দ্র নন্দকুলচন্দ্র। তাঁহার রস সোম। এই মাধুর্য যে কত রমণীয় তাহা ইন্দ্রও জানেন না। তাহা আস্বাদন করিবার জন্য গৌররূপে আসিতে হইল। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্তরের অনুভূতি।

তিনি বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাঁহাকে সকলের চাওয়া উচিত এমত কথা নহে, স্বাভাবিকভাবেই সকলে তাঁহাকে চায়। এই বস্তুকে লাভ করিবার জন্য সকলের হৃদয়ে একটি আকূতি বা অভীপ্সা আছে। ভাগবতীয় ভাষায় 'লৌল্য' বা লালসা আছে। এই লালসার প্রতীক অগ্নি। চরম প্রাপ্য বস্তু সোম। বেদের আরম্ভ 'অগ্নি' দিয়া এবং উপসংহার সোম। এই আদ্যন্ত চিন্তা করিয়া বেদশাস্ত্রকে অগ্নিষোমীয় শাস্ত্র বলা যায়। শেষ মন্ত্রের দেবতা সংজ্ঞান, সংজ্ঞানই সোম। এই সংজ্ঞান সূক্তকে কেহ কেহ মহামিলন স্তোত্র বলিয়াছেন। সোম ব্যতীত আর কাহার আশ্রয়ে এই মহামিলন সম্ভব?

পূর্বে সাত্ত্বত সংহিতার নিবন্ধে আমরা দেখিয়াছি এই সোমই শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের এই ধারণা অর্থাৎ সোম যদি কৃষ্ণ হয় তবে সহস্র বেদ-শাস্ত্রকেই বৈষ্ণবশাস্ত্র বলা যায়। কেননা বিষ্ণু ও কৃষ্ণ একই ইহাও আমরা দেখিয়াছি। বেদজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যারণ্যজীও এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

সোম

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা, সোম এক প্রকার মদ। ম্যাক্সমুলারের মত জ্ঞানী ব্যক্তিও লিখিয়াছেন, "সোমরস অন্যান্য রস হইতে মদ্য প্রস্তুতের সময় মসল্লা হিসাবে ব্যবহৃত হইত।" অধিক কি

বলিব, ভারতের দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌ও সোম বস্তুটিকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন— "Soma, The god of inspiration, the giver of immortal life is analogous to the Haoma of Avesta and the Dionysos of Greece, the God of the wine and the grape. All these are the cults of the intoxicants." (*Indian Philosophy*, Vol-I p. 83)

এই কথাগুলি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে লেখা। যে দেশের ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয় ও প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর পানাসক্ত তাহারাই এমন কথা বলিতে পারেন যে, যজ্ঞে ব্রতী ঋষিরা সোম নামক মদ্য পান করিতেন। আর্যশাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। বিশেষত ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান বিষবৎ ত্যাজ্য।

বেদশাস্ত্র (ঋ. ৯/৯৬/৫-৬) সোম সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—

"সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ।।
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্।।"

"সোম ক্ষরিত হইতেছেন। উহা ইন্দ্রিয়সমূহ, দ্যুলোক, ভূলোক, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উৎপাদক। সোম দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণের মধ্যে ঋষি, পশুদিগের মধ্যে মহিষ, পক্ষীদিগের মধ্যে শ্যেন ও অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্বপ্রধান অস্ত্র। সোম তত্ত্বদর্শিগণের মধ্যে পরমাগতি। সোম শব্দ করত স্পর্ধাসহকারে সমস্ত বস্তুকেই অতিক্রম করেন।" অন্যত্র (২/৪০/১) বলিয়াছেন, সোম সমস্ত ভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের একটি মণ্ডল (৯ম মণ্ডল) সোমের উদ্দেশ্যেই প্রকটিত। ১১৪টি সূক্ত সোমকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে। এই মণ্ডলের ঋষি অনেকে। যথা, মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, হিরণ্যস্তূপ, অসিত, দেবল, দৃঢ়চ্যুত, ইধ্‌মবাহু, নৃমেধ, প্রিয়মেধ, গোতম, শ্যাবাশ্ব, ত্রিত, প্রভুবসু, কবি প্রমুখ বহু।

সূক্তগুলির দেবতা সোম। কোথাও বা পবমান সোম। কেবল নবম মণ্ডলে নহে অন্যান্য মণ্ডলেও সোমের মহিমা কীর্তিত। ১০ম মণ্ডলের ১১৯ সূক্তের বিষয় লব-রূপী ইন্দ্রদেবতা স্বয়ং বলিতেছেন লব ঋষির রূপ ধরিয়া। ১৩ বার বলিয়াছেন—আমি লব ঋষির রূপ ধরিয়া অনেক বার সোমপান করিয়াছি। ইন্দ্র (লবরূপী ইন্দ্র) নিজে বলিয়াছেন—আমি মহতেরও মহৎ। আমি পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারি। কিসের শক্তিতে পারি? অনেক বার সোমপান করিয়া। যাস্ক বলিয়াছেন, উপরে লিখিত

মন্ত্রদ্বয়ের তাৎপর্য অনুধ্যান করিলে অধিদৈবত পক্ষে সোম সূর্য, অধ্যাত্ম পক্ষে সোম আত্মা।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন— "Soma, Lord of the Ananda is the true creator who possesses the soul and brings out of it a divine creation. For him the mind and hearts, enlightened; have been formed into a purifying instrument, freed from all narrowness and duality the consciousness in it has been extended widely to receive the full flow of the sense life and mind life and turn it into pure delight of the true existence, the divine, the immortal Ananda." (*The Secret of the Veda*, Vol. I, p. 342)

পবমান সোম পবিত্রকারী। সোম প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মানন্দরস, সোম সচ্চিদানন্দের আনন্দ বিভাব।

আবার জলের সারকেও সোম বলা হইয়াছে। গৃৎসমদ ঋষি ঋ. ২/৩৫/৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন —'অপ্‌সু স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্' — জলের সারভাগ অর্থাৎ জীবনের সারভূত আনন্দ রস সোম। জীবন সলিলের অন্তর্নিহিত যে দেবত্ব, জলের সারভূত অমৃত অর্থাৎ সোম তিনি পান করেন।

ঋষি রেণু ঋ. ১০/৮৯/৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "সোমের অনন্ত মহিমা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গও অনুধাবন করিতে পারে না। সোমরস হইতেছে তুরীয়ানন্দ, অমৃতত্ব — আনন্দম্ অমৃতং দেবতাঃ, দিব্য সত্তার চিদ্‌ঘন জ্যোতির্ময় রসায়ন।' (শ্রীনলিনীকান্তের 'রচনাবলী')

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ 'সোম' বস্তুটির বিশেষণ দিয়াছেন 'রসাত্মকঃ'। ভাষ্যকার তাহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন অমৃত-রসাত্মক। ধান্য, যব, গম — যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করে তাহাদিগকে বলে ওষধি। যাহাদের ফল পাকিলে গাছগুলি আর বাঁচে না, ফলের মধ্যে বৃক্ষ তাহার সত্তা আহুতি দেয়, সেই সমস্ত ওষধিগণের মধ্যে অমৃতরস স্বরূপ সোমরূপে বিরাজমান থাকিয়া পুরুষোত্তম তাহাদিগকে পোষণ ও পরিবর্ধন করেন। এই রস লৌকিক রস নহে; আনন্দ রস। শ্রুতি বলেন — 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (তৈঃ, ২/৭) রস পাইলেই জীব আনন্দপূর্ণ হয়। ব্রহ্মই রসস্বরূপ, 'সোম' সেই আনন্দ। উপনিষদে আনন্দ শব্দ বহুবার আছে। ব্রহ্ম বস্তু যে আনন্দময় তাহার প্রমাণ দিয়াছেন বেদান্ত-সূত্র — 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।' (১/১/১৩) পুনঃপুনঃ উল্লেখের কারণে।

ব্রহ্মবস্তু আনন্দময়। এই 'আনন্দ' শব্দ বেদে নাই বলিলেই হয় তবে

একটিবার মাত্র আছে এবং তাহাও ইন্দ্রের সোমরস পান প্রসঙ্গে। মনে হয় উপনিষদে যাহা 'আনন্দ', সংহিতায় তাহাই 'সোম'। উপনিষদে বলিয়াছেন — "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি।

দেহমন প্রাণের যে অবস্থাটি আমরা আনন্দ শব্দদ্বারা প্রকাশ করি, তাহা ঋষিরা সোম শব্দদ্বারাই প্রকাশ করিতেন। গীতায় আর একটি স্থানে আছে (৯/২০) 'সোমপা পূতপাপাঃ' সোমপান করিয়া যাঁহারা পাপশূন্য হইয়া পূত হইয়াছেন। বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হইলে মানুষ পাপশূন্য হইতে পারে। বৈষয়িক আনন্দে কেহ পাপশূন্য তো হয়ই না বরং পাপস্পর্শের সম্ভাবনা থাকে। সোম বস্তুটিকে গীতার বক্তা নিশ্চয়ই মদ বা মদের মত কোন উত্তেজক পানীয় মনে করেন নাই। সংহিতায় ব্রহ্ম শব্দও উক্ত হইয়াছে। মনে হয় সংহিতার বৃহৎ শব্দটিও উপনিষদে ব্রহ্ম। সেইরূপ সোম শব্দটিই সুখ বা আনন্দ প্রকাশক। শ্রীঅরবিন্দ সোমকে বলিয়াছেন— "Illumined Ananda that descends from above"। "জীবনসত্তার গভীরে অস্তিত্বের যে-আনন্দ তারই রস নির্যাস সোম।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ২৭১)

সংহিতা বলিয়াছেন — সোম হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় সোমই সংহিতায় আনন্দবাচী।

শ্রীঅমলেশ আবার বলেন — "চিন্ময় আলোকে উদ্ভাসিত যে আনন্দধারা সাধকের সত্তায় নেমে আসে, দেবতার আশীর্বাদ ও প্রসাদ হয়ে, তাই হল সোম।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ২৭১)

আত্মারামের ভাগবত রসানন্দ আস্বাদনে ঐ সোমই ব্রজরস —শুদ্ধ সুনির্মল প্রীতিরস নির্যাস। গঙ্গার যেমন তিনটি ধারা — পাতালে ভোগবতী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও স্বর্গে মন্দাকিনী (আকাশগঙ্গা); তদ্রূপ সোমেরও তিনটি ধারা — পাতালে অর্থাৎ হীন ভোগভূমিতে শুধু ইন্দ্রিয় সুখভোগী জীব, তাহারা ইন্দ্রিয়ারাম। স্বর্গে আকাশগঙ্গায় সোম পবমান, পবিত্রতাকারী কল্যাণময় ব্রজপ্রেম। মধ্যস্থলে ভাগীরথী— 'ভা' অর্থ জ্যোতি, 'গী' অর্থ শব্দ বাক্ বেদবাণী এবং 'রথী' অর্থ রথারোহণকারী।

সংক্ষেপে পুনরায় বলি, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে 'সোম' একটি লতা — পাতার রস; তাহাতে মৃদু মাদকতা আছে। যেমন তামাক, ভাঙ, আফিঙ্ ও বেশী মসল্লাযুক্ত পানে আছে। আধিদৈবিক দৃষ্টিতে সোম একজন বৈদিক দেবতার নাম। সোম ও সূর্য একার্থক। সাধারণ মানুষ সোমবার বলিতে চন্দ্রের বার, রবিবার বলিতে সূর্যের বার বুঝেন । চন্দ্রের আর এক নাম ইন্দু। সোমকে অনেক স্থলে ইন্দু বলা হইয়াছে। বেদের মন্ত্রে আছে "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ"। ইহাতে বুঝা যায় সোম মনের দেবতা।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সোম বলিতে আমাদের দেহ অভ্যন্তরে যে একটি আনন্দরসের প্রবাহ আছে তাহাকে বুঝায়। এই রসপ্রবাহ একটি নদীর প্রবাহের মত। ইহাতে জোয়ার ভাটা আছে। যখন এই স্রোত ভাটার টানে নীচে নামিয়া যায় তখন মানুষ নশ্বর ইন্দ্রিয়ের ভোগে মত্ত হইয়া ওঠে। হীন ভোগ-লালসা ইহারই পরিণতি। আবার এই রসপ্রবাহ যখন জোয়ারে ঊর্ধ্বগামী হয় তখন তাহা মন বুদ্ধি চিত্ত উল্লসিত করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যভূমিতে লইয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষায় নিম্নগামী প্রবাহের স্থান মূলাধারে, আর ঊর্ধ্বগামী প্রবাহের স্থান সহস্রারে। ঊর্ধ্বগামী চৈতন্য তখন পরমচৈতন্য ভূমিতে আরোহণ করে।

অন্তরের এই রসপ্রবাহের মধ্যে ঐ ঊর্ধ্বগামী বেগ (Tendency) সর্বদাই আছে। পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিলে, ব্রহ্মচর্যব্রত নিষ্ঠার সহিত দৃঢ়ভাবে পালন করিলে এই রস ও বেগ অতি সহজেই ঊর্ধ্বমুখে আরোহণ করে।

বৈদিক বাঙ্ময়ে অগ্নিষোমীয় কথা অনেকবার উক্ত হইয়াছে। সমগ্র সৃষ্টিরহস্যই অগ্নিষোমাত্মক। অগ্নি শুষ্ক করে, সোম সরস করে। সূর্য ভূমিকে তাপ দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে, মেঘ সোমধারা ঢালিয়া সরস করিয়া ফেলে। সংগীতের কড়ি ও কোমলে যেমন মাধুর্য সৃষ্টি, জগতে অগ্নি ও সোমও সেইরূপ সৌন্দর্য রক্ষা করে। আমাদের জীবন যখন ত্রিতাপে শুষ্ক হইয়া যায় তখন রসাত্মক সোম তাহাকে সরস করিয়া সৌন্দর্যময় করিয়া রাখে।

চন্দ্র সম্বন্ধে কোনও সূক্ত সংহিতায় না থাকিলেও ব্রাহ্মণে চন্দ্র বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রের বিশেষ স্থান আছে। চন্দ ধাতুর অর্থ 'হ্লাদনে দীপ্তৌ চ' মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই চন্দ্র নাম। চন্দ্র দর্শনে সকলের আনন্দ হয়। সূর্যের আলোর মধ্যে একটি তীক্ষ্ণতা আছে। চন্দ্রে তাহা নাই, আছে একটি স্নিগ্ধতা। এইজন্য চন্দ্রের আলো আমাদের আনন্দ দেয়। চন্দ্রের আরোহ অবরোহ আছে। আরোহ করিতে করিতে একদিন পূর্ণিমা হয়, আবার অবরোহণ কার্যে নামিতে নামিতে অমাবস্যায় শূন্য হইয়া যায়। অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য এক রাশিতে থাকে। পূর্ণিমায় চন্দ্র আর সূর্য মুখোমুখী অবস্থান করে। সূর্য অগ্নি ও চন্দ্র সোম — এই অগ্নিষোমের গতাগতিতে কর্মময় সংসারচক্র চলিতেছে! এই জন্য সৃষ্টিক্রিয়াকে বলে অগ্নিষোমীয়। যেদিন চন্দ্রহীন গাঢ় অন্ধকার, সেই দিনই গগনমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলীর শোভায় ঝলমল। নক্ষত্ররাজী শোভা ফুটাইয়া তোলে অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে। যদি সর্বদা অগ্নির উৎস সূর্যদেব থাকিতেন তাহা হইলে মহাকাশের নক্ষত্রের রহস্য সম্বন্ধে আমরা বিন্দু-

বিসর্গও জানিতাম না। সুতরাং অগ্নিষোম মিলনে অমিলনে জগৎ-সংসারের বৈচিত্র্য রূপায়িত হইল।

পূর্বে বলিয়াছি, সোম অর্থ আনন্দ। আনন্দ তিন প্রকার— দৈহিক, জৈবিক ও আত্মিক। দৈহিক আনন্দ নাভির নীচে সীমাবদ্ধ। মূলাধারেই তাহার স্থান। এই আনন্দের অনুভব জীবমাত্রেরই অল্প বিস্তর আছে। যে উন্নত হইয়াছে, মনন ভূমিতে জাগ্রত হইয়াছে, তাহার মনের আনন্দই অধিক আদরণীয়। মনের আনন্দ, শিল্পকলা, কাব্যসাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহার স্থান হৃদয়ে মণিপুরে। অনাহত চক্রে ইহার কেন্দ্র। যাঁহারা হৃদয় দিয়া মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের কল্যাণকর্মে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখেন, নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলিয়া পরের জন্য জীবন দান করেন, তাঁহাদের আনন্দ ঐ ঊর্ধ্ব ভূমিকায়। ইহা হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরে স্থিত, আজ্ঞাচক্র সহস্রার কেন্দ্র মাধ্যমে যাঁহাদের অনুভূতি, যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বমানবের পরম কল্যাণচিন্তাই তাঁহাদের চিত্তে প্রবল। যাঁহারা সর্বজনের পরম আরাধ্য ধন শ্রীভগবানের সঙ্গে সতত যুক্ত তাঁহাদের আনন্দ আত্মিক — ভাগবতীয় আনন্দ। তাঁহাদের মানবপ্রেম এই ভাগবত আনন্দের ফলস্বরূপ। তাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন বলিয়াই তাঁহার সন্তানদের ভালবাসেন অথবা সর্বজীবের মধ্যে সেই পরম সত্তাকে অনুভব করিয়া সকলকে ভালবাসেন — 'সর্ব জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' সম্মান দিবে অর্থ আপনজন ভাবিয়া তাহাদের সুখ দুঃখে অংশীদার হইবে। ভগবান্‌ই যাঁহাদের প্রেম প্রীতির উৎস, মূল আশ্রয়, তাঁহাদের আনন্দ, আত্মিক বা ভাগবতরসানন্দ, জাত। সোমকে ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়া প্রীতি রসের মধ্যে একটি ভাগবতীয় বস্তু আছে— তাহা বাহির করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত আত্মারাম ভূমিতে সেই পরমানন্দ আস্বাদনই করেন তাঁহারা।

বেদে অনেক যজ্ঞের কথা আছে। তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ 'সোমযাগ'। কারণ এই যজ্ঞটি সৃষ্ট জগৎ ও মানুষের জীবনের উজ্জ্বল প্রতীক। এই যজ্ঞটি বিরাট। যজ্ঞে অনেক সময় ও পণ্ডিত পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। বিস্তর অর্থসাপেক্ষও বটে। উহা আবার সামান্যভাবেও অনুষ্ঠান করা চলে। আজকাল যেমন খুব আড়ম্বরে সর্বজনীন দুর্গোৎসব হয়, আবার দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে অনাড়ম্বরে সহজভাবে ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ সোমযাগ খুব আড়ম্বরের সহিতও হয়, আবার সহজ সরলভাবে গৃহমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য একই— আত্মার ঊর্ধ্বমুখী প্রধাবনকে ত্বরান্বিত ও রসায়িত করা।

নবম মণ্ডলের অনেক ঋকের দেবতা পবমান সোম। পবমান শব্দটি 'পূ' ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, যাহার রূপ হয় 'পুনাতি .

অর্থাৎ পবিত্র করা। পবমান সোম যজমানকে ও নিকটবর্তী সকলকে পবিত্র করেন। ঊর্ধ্বরেতা সাধক আর মানব থাকেন না, পবিত্র হইয়া যান দেবতা হইয়া যান।

"যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্‌লোকে স্বর্হিতম্‌।
তস্মিন্‌মাং ধেহি পবমানাঽমৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।"
(ঋ. ৯/১১৩/৭)

"যে ভুবনে সর্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমায় লইয়া চল, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজার একটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কামগায়ত্রী। এই মন্ত্রের কৃষ্ণই কামদেবতা। তাঁহাকে কামনা করিলে অন্য জাগতিক কামনা আর থাকে না, সকল কামনা পূর্ণ হইয়া যায়।

'কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি'। (ঋ. ৯/১১৩/১১) — যেখানে সকল কামনা পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে অমর কর।

সোমমণ্ডলের শেষের পূর্ব সূক্তটির প্রতিটি মন্ত্রের শেষে একটি ধুয়া আছে — 'কৃষ্ণীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব'। এখানে 'ইন্দ্র' পদে ভাগবতের দৃষ্টিতে গোকুলানন্দ বুঝানো যাইতে পারে। গোকুলানন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণই ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রে ইন্দ্র পদে যদি গোকুলানন্দ বুঝি তাহা হইলে এই অর্থ হয় — হে সোম! তুমি গোকুলানন্দ ইন্দ্রের জন্য কৃষ্ণের জন্য ক্ষরিত হও। যাঁহার সকল বাসনা কৃষ্ণের তরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণের জন হইয়া যান।

বিষ্ণু

ঋক্‌সংহিতায় বিষ্ণুসূক্তের সংখ্যা, মাত্র তিনটি। ইহা ছাড়া অন্য দেবতার সূক্তমধ্যে কয়েকস্থানে বিষ্ণু দেবতার কথা দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের দেবতাও বিষ্ণু, ঋষি দীর্ঘতমা। ইহাতে মাত্র ছয়টি মন্ত্র। পরবর্তী ১৫৫ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্র, দেবতা বিষ্ণু। ১৫৬ সূক্তের দেবতাও বিষ্ণু। ছয়টি মন্ত্র, ঋষি দীর্ঘতমা। ইহা ছাড়া প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি; দেবতা অশ্বিদ্বয়। এই সূক্তে ১৭ হইতে ২১ মন্ত্রে বিষ্ণুর মহিমা আম্নাত হইয়াছে।

আর্যদিগের প্রত্যেক পূজার্চনার পূর্বে আচমন করা বিধি। এই আচমনের একটি বিখ্যাত মন্ত্র ঋগ্বেদের অন্তর্গত।

''তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।।'' (ঋ. ১/২২/২০)

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিজন (সূরয়ঃ) বিষ্ণু দেবতার পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন। অন্যেরা করে না কেন? অন্য সাধারণের চক্ষু অল্প গভীরে দেখে। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা অতি গভীরে দেখেন। যাঁহাদের দৃষ্টি বিস্তৃত তাঁহারা ভূমা দেখেন। আকাশের মত বিস্তৃত তাঁহারা। উর্ধ্বে নিম্নে গভীরে তাঁহারা ভূমা দেখেন। আকাশের মত ব্যাপক তাঁহাদের চক্ষু। শুধু জ্ঞানীজন দিব্য চক্ষুদ্বারা বিষ্ণুর পরম পদ সর্বদাই দর্শন করেন।

যাঁহারা সর্বদা বিষ্ণুদেবতার স্তুতিগানে নিমগ্ন থাকেন ও জিতনিদ্র হয়েন, কখনও তমোগুণাচ্ছন্ন হয়েন না,তাঁহারা বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন আলো জ্বালাইয়া। বিষ্ণুর সাতটি কিরণ। তাহাদ্বারা তিনি সপ্ত-লোক সমুজ্জ্বল করেন। সপ্তলোক — ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য। বিষ্ণু সপ্ত ভুবনে বিচরণ করেন। ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। বিষ্ণু তাঁহার যজ্ঞকারী যজমানকে রক্ষা করেন। তিনি যাঁহাকে রক্ষা করেন, কেহ তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে না। ঋষি বলিতেছেন, তোমরা বিষ্ণু দেবতার সকল কর্ম অবলোকন কর। তাঁহার গুণকীর্তন কর, তাঁহার কর্মকে সদা লক্ষ্য করিয়া চল।

দীর্ঘতমা ঋষি বিষ্ণুদেবতার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন — উরুক্রম বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস।'

''তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।"

(ঋ. ১/১৫৪/৫)

এত বড় মহিমা আর কাহারও সম্বন্ধে বলেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন — "The highest step of wide - moving Vishnu is the foundation of the sweetness" বিষ্ণুর পরম পদ ভাস্বর জ্যোতিতে দিব্য আলোকে ও মাধুর্যে বিরাজিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ত্রিবিক্রম সম্বন্ধে বলেন, "যৎ বিক্রান্তবৎ তৎ বিনীতবৎ তদ্ বৈষ্ণবম্।"

বিষ্ণু ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রম শব্দের তাৎপর্য ঊর্ণনাভের নিরুক্ত (১২/১৯) অবলম্বনে শ্রীঅমলেশ বলেন, "ত্রিবিক্রম তিনটি বিক্রম — এই তিন স্থানের দিক্ থেকে : ভূলোক ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক; কালের দিক্ থেকে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান; আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে দেহ, প্রাণ ও মন; অন্তরে, বাহিরে এবং ঊর্ধ্বে; প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়। সব সময় সর্বত্র তাঁর দিব্য মহিমা ও শক্তি বিরাজিত। বিষ্ণু দ্যুলোকের দেবতা। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি মূর্ধন্য চেতনা। মাধ্যন্দিন সূর্য যাঁহার প্রতীক। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ উদয় সূর্যের পূর্বাচলে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যগগনে এবং তৃতীয় পদক্ষেপ গয়শীর্ষে মহাশূন্যের অস্তাচলে।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৬৫)

"পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত নাগের উপর যোগ নিদ্রায় শয়ান — এই ভাবটি সম্পূর্ণ প্রতীকী। শাশ্বত সত্যের অসীম অব্যক্ত অনন্ত প্রসারের মধ্যে পরম দিব্য আনন্দ স্বরূপ বিষ্ণু, তিনি সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে সমাহিত আত্মস্থ হয়ে আছেন। লক্ষণীয়, অনন্ত নাগ নামটি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন 'Coils of Infinity'— আর সমুদ্রও সাধারণ সমুদ্র নয়, ক্ষীর সমুদ্র, রসের আনন্দের সুখসাগরের ঘনীভূত অসীম বিস্তার, পুরাণে তাকে বলেছে 'কারণ-সলিল'। (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৬৬)

'বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস' — এই একটি মহাসঙ্কেত বাক্যই বিষ্ণুর স্থান যে সর্বোপরি এই তত্ত্বের ইঙ্গিত। বৈদিক ঋষিদের কাছে এই মধু হইতেছে পরব্রহ্মের পীযূষধারা, আনন্দ-অমৃত-ধারা, যাহা ঋষি-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ২/৫/২ মন্ত্রে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দিয়াছেন এই মধুর সংবাদ। ঋষি উদ্দালকের মধুবিদ্যায় এই মধুরই কীর্তন। নবম মণ্ডলে ১১৩ সূক্তে কশ্যপ ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন সোমদেবতার কাছে — যেখানে সকল বাসনার চরমতম তৃপ্তি, সেই আনন্দলোকে, অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও, ইহাই ঋষিবর্গের চরম অভীপ্সার পূর্ণতম সার্থকতা। সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্তে এই মধু চেতনার সাধনা। মধুচ্ছন্দা ঋষির ১/১০/৬-৮ বিখ্যাত মন্ত্রে এই মধুরই সন্ধান।

'মধু বাতা ঋতায়তে' — এই মধুর আস্বাদন বিশ্বব্যাপী। এই মধু যাঁহার পরম পদের উৎস-ভূমি হইতে নিরন্তর বহমান, সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। ব্যাপ্তি-অর্থক 'বিষ্' ধাতু হইতে বিষ্ণু শব্দ। তিনি সর্বব্যাপক। ব্রহ্ম বলিতেও বুঝায় বৃহত্ত্ব (বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ)। গোতম ঋষি ঋ. ১/৭৫/৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন, সাধনার লক্ষ্য প্রিয়, ঋত ও বৃহৎ। যাহা সর্বাধিক প্রিয়, যাহা সত্য স্বরূপ — তাহাই বৃহৎ, তিনিই পরব্রহ্ম। যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার সাধ থাকে না, আর কোন কিছুকেই অধিক মনে হয় না (যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। গীতা, ৬/২২), তাহাই আস্বাদন হয় ঐ 'মধু' বস্তুটির প্রাপ্তি ঘটিলে। ইহা দ্বারা অনুভব হয় যে, ঋঙ্‌মন্ত্রে যাহাকে পুনঃপুনঃ 'একো দেবঃ' বলা হইয়াছে, তিনি বিষ্ণুই। অনেক স্থলে এই বিষ্ণুকেই 'একং সৎ' ও 'একং তৎ' বলা হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন, 'সৎ' ও 'তৎ' ব্রহ্মেরই বাচক। ব্রহ্মের বাচক একাক্ষর বীজ প্রণব। 'প্রণবঃ সর্ববেদেষু'। প্রণব যাঁহার বাচক তিনি বিষ্ণুই। গায়ত্রী মন্ত্রের যিনি ভর্গ তিনি বিষ্ণুরই অঙ্গজ্যোতি। পুরুষসূক্তের পুরুষ যিনি, তিনি এই বিষ্ণুই। ঋ. ৩/৫৫ সূক্তের "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং" — এই 'একম্ অসুরত্বম্' বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। কারণ বিষ্ণুর পরমপদেই মধুর উৎস, আর সবই বিষ্ণুর বিভূতি। মধুর উৎস যখন বিষ্ণুর পদে তখন শ্রীবিষ্ণুই সর্বোত্তম ভূমি। মহাভারত তাই বিষ্ণুকে বলিয়াছেন 'মাধবো মধুঃ' (অনুশাসন পর্ব, ১৪৯/৩১)। এই মধুই আনন্দ। আনন্দই রস (রসং হ্যেবায়ং)। ইহাই Highest Beautiful। সুতরাং বেদে যত দেবতার কথাই বলা হইয়াছে, সকলের মূল বিষ্ণু। বিষ্ণুর মহিমায় সমগ্র ভুবন পরিব্যাপ্ত।

বৃহস্পতি

ঋষি বামদেব ঋ. ৪/৫০/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন বৃহস্পতি দেবতার কথা। তিনি শব্দ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ভূলোক দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক তাঁহার অধীন। তিনি বিশিষ্ট জিহ্বাযুক্ত। প্রাচীন ঋষিগণ বৃহস্পতিকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়াছেন।

"তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্।"

বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 'ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ'। অগস্ত্য ঋষি ঋ. ১/১৯০/৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন— বৃহস্পতির কীর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপ্ত। বৃহস্পতি সূর্যের ন্যায় পূজিত, হব্য ধারণ করেন ; প্রাণী চৈতন্য সমুৎপাদন করেন ও ফল প্রদান করেন।

ঋ.৪/৫০/৮ মন্ত্রের 'যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি' — 'The Soul Power goes in front' অবলম্বনে শ্রীঅমলেশ বলেন, "মন্ত্র ব্রহ্ম যখন বাণীময় হন তখন তিনি মূর্ত বৃহস্পতি।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৫৬) *On the Veda* গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "The master of the Inspired Word" (*On the Veda*, p.531) হইতেছেন বৃহস্পতি।

"অন্তরাত্মার চিন্ময় শক্তিই ব্রহ্ম। আত্মশক্তির সুদীপ্ত বাণীমন্ত্র ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী)। ইহাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দর্শন। বামদেব ঋষি বৃহস্পতিকে অন্ধকার নাশক বলিয়াছেন। মায়ান্ধকার ঘুচিলেই ব্রহ্মদর্শন সম্ভব।

বৈদিক বাঙ্ময়ী ব্রহ্মশক্তি বৃহস্পতি পরবর্তী কালে পুরাণশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনরূপ পাইয়াছেন— তিনি দেবগুরু, আকাশে উজ্জ্বল গ্রহ 'Jupiter'(গ্রীক দেবতা জ্যুপিতর) ও জাতকের গুরু। গুরু তুঙ্গস্থ থাকিলে জাতক হয় সর্বত্র জয়ী। যাঁহার হৃদয়ে মন্ত্র চৈতন্য হইয়াছে তিনি গুরুর আসনে উপবিষ্ট। দেবগণের গুরু বৃহস্পতি, তিনিই জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরুস্থান ও গগনে উজ্জ্বল গ্রহ।

পূষা

সূর্যের আর এক রূপ পূষণ। তিনি পথিক ও গৃহপালিত পশুদের পথপ্রদর্শক । তাহাদের দস্যু ও নেকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

পূষা সব কিছুর অধিপতি। দ্রষ্টা দীপ্তিমান অশিথিল গতি। পূষা সব কিছু পোষণ করেন, বৃদ্ধিসাধন করেন। পূষণ হারানো দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করেন। ভরদ্বাজ ঋষি ঋ. ৬/৫৪/১০ মন্ত্রে বলেন — 'পুনর্নো নষ্টমাজতু।'

শ্রীঅমলেশ বলেন, "আমাদের চেতনার অন্ধকার গুহায় যে জ্যোতির্ময় রাজা লুকিয়ে রয়েছেন পূষণ তাঁকে অন্বেষণ করে আনেন। অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে যে গুপ্ত দিব্যচেতনা পূষণ তা ব্যক্ত করে ধরেন।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৩৯)

দেবশ্রবা ঋষি ঋ. ১০/১৭/৬ মন্ত্রে বলেন, পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। "উষা সত্যের যে পথখানি উদ্ভাসিত করে ধরেন, পূষণ তাকে বিস্তৃত সুখবাহী করে তোলেন।" (তদেব)

যাস্ক বলেন, পূষা আদিত্যেরই এক রূপ। যে পূষ ধাতু হইতে পূষা — সেই ধাতুর রূপ পুষ্ণাতি। গীতা প্রয়োগ করিয়াছেন,

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।" (১৫/১৩)

দধিক্রা

সায়ণ বলেন, অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। যুদ্ধের অশ্বকেও দধিক্রা বলিয়া স্তুতি করা হয়। অগ্নি বা সূর্য যেন দীপ্ত অশ্ব, তাই অগ্নিকেও দধিক্রা বলে। অগ্নি দেববাহন অশ্ব। "Fire is like a horse that carries the Gods." (*Hymns to the Mystic Fire*, p. 175)

"যজ্ঞের অশ্ব যেমন অশুভ বৈরিতাকে পরাস্ত করিয়া শুভ ও মঙ্গল জয় করিয়া আনে তেমনি দীপ্ততেজ অগ্নিও বীর্যবান্ অশ্বের মত দেবতাদের বিজয় বহন করিয়া আনেন।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ১১০)

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৪০ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে দধিক্রা দেবতার উল্লেখ পাই। ঋষি বামদেব। যাস্ক দধিক্রা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন (নিরুক্ত, ২/৭) "তত্র দধিক্রা ইতেতদ্দাধৎক্রামতীতি বা দধৎ ক্রন্দতীতি বা দধদাকারী ভবতীতি বা।"

দধিক্রা এই নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সন্দেহ আছে। 'দধৎ' আরোহীকে ধারণ করত 'ক্রামতি' সুষ্ঠু গমন করে। 'দধৎ' আরোহীকে ধারণ করত 'ক্রন্দতি' ক্রন্দন করে 'হতের্বা'। 'দধৎ' আরোহীকে ধারণ করত, 'আকারী' সুন্দরাকৃতির্ভবতি, সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

> "দধিক্রাব্ণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুযসঃ সূদয়ন্তু।
> অপামগ্নেরুষসঃ সূর্যস্য বৃহস্পতেরাঙ্গিরসস্য জিষ্ণোঃ।।
> সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষস্তুরণ্যস্যাৎ।
> সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতঙ্গরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ।।"
>
> (ঋ. ৪/৪০/১-২)

অনুবাদ : "আমরা বারবার দধিক্রার স্তুতি করব। উষাসমূহ আমাকে কর্মে প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, উষা, সূর্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর স্তুতি করব। ১।"

"গমনশীল, পোষাক, গাভীপ্রেরক এবং পরিচারকগণের সাথে নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় উষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগবান্ এবং লম্ফ দ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন। ২।"

ঋভু

ঋভুগণ ঠিক দেবতা নহেন, ইঁহারা মানুষ ছিলেন। ঋ. ১/১১০/২ মন্ত্রে ঋষি কুৎস কয়েকবার ঋভুগণকে সুধন্বার পুত্র বলিয়াছেন। তাঁহারা মানুষ হইয়াও তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন ভাই — ঋভু, বিভু ও বাজ। ইঁহারা তপস্যাবলে দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্যরশ্মিসমূহ রূপতা প্রাপ্ত হন। সূর্যরশ্মি রূপে ইঁহারা জগতে আসিয়া সাধকদের কল্যাণ বিধান করেন। "সাধকের অন্তরে সত্যের এষণা জাগিয়ে তাঁকে অমৃতসন্ধানী করে তোলে।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ৫৭)

তিন ভাইয়ের বড় ভাই ঋভু, তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় — 'The skillful Knower and Shaper of knowledge'। দ্বিতীয় ভাই বিভু—'the pervading self-diffusing'। তৃতীয় ভাই বাজ— 'the plenitude' (*On the Veda*, p. 386)। ঋভু , বিভু ও বাজ এই তিনে মিলিয়া এক দেবসংঘ।

'ঋভু প্রথমে মানুষের মধ্যে আস্পৃহা ও সুসংগঠন শক্তি এনে ধরেন। তারপর বিভু ওই শক্তি ও তার সৃষ্টিশীলতাকে আমাদের সত্তার মধ্যে প্রসারিত বিস্তৃত করিয়া ধরেন। বাজ তখন ঐ পরিব্যাপ্ত দিব্যসৃষ্টির মধ্যে ঐশ্বর্য ঢেলে দেন। সব কিছুকে ঋদ্ধ করে তোলেন। সাধনায়, ভাগবত জীবন গঠনে, ঋভু, বিভু ও বাজ হলেন পরম সহায়।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ৫৮)

সায়ণ দুই স্থানে ঋভুদের দুই রকম পরিচয় দিয়াছেন।

"ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ'।

আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।"

ঋভুরা সূর্যরশ্মি। মনে হয় দেবত্ব লাভ করিয়া ইঁহারা সূর্যরশ্মির সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। রশ্মির সঙ্গেই তাঁহারা মর্তে আসিয়া সাধকের সাধনায় সহায়ক হন।

ঋভুরা জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) জানিতেন। মহাভারতে ঋভুদের সুকর্মের জন্য সশরীরে স্বর্গবাসের কথা আছে।

যম

যম দেবতার উপর দশম মণ্ডলে তিনটি সূক্ত আছে। যম বিবস্বানের পুত্র। ঋ. ১০/১৪/৫ মন্ত্রে যম ঋষি বলিতেছেন— "বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তে", তোমার পিতা বিবস্বৎ, তাঁহাকে আহ্বান করছি।

ঋ. ১/৬৬/৪ মন্ত্রে পরাশর ঋষি বলিতেছেন—'যমো হ জাতো যমো জনিত্বম্' —যাহা জন্মিয়াছে, যাহা জন্মিবে, জগতের সম্ভূতি ও সম্ভাবনার বীজ হইতেছেন যম। পার্থিব প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও নিয়ম প্রতিষ্ঠার রক্ষক সূর্যের যে জ্ঞানশক্তি তাহাই যম। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "Yama is the master of law in the world and he therefore the child of the sun, the luminous Master of Truth."।

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যান যম দেবতাকে লইয়া বিরচিত। নচিকেতার পিতা তাঁহাকে যমকে দান করেন। মৃত্যুতত্ত্ব সম্যক্ অবগতির জন্য বালক যমরাজার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। যম তাঁহাকে বলেন, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব মানুষ কি দেবতা সকলেই অজ্ঞ। সকলেই জানিতে উৎসুক। কিন্তু এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অতিশয় দুরধিগম্য। নচিকেতার ঐকান্তিক আগ্রহে ধর্মের নিকট হইতে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হন। আত্মা অমৃতময় — ইহাই মূল কথা। দশম মণ্ডলের দশম সূক্তে যম ও তাঁহার ভগ্নীর একটি সংলাপ আছে। যমী ভাই যমকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছুক। যম এই অসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণে নারাজ। যমী অনেক কটূক্তি ও যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিলেও যম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন। যমের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে যমীর বিবেক উদয় হইল। বিবেকের উদয়ে যমীর কুভাব তিরোহিত হইল।

অপাং নপাৎ

'অপাং নপাৎ' দেবতার বাহিরের রূপ হইল বিদ্যুৎ। তিনি বিদ্যুতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার আকৃতি স্বর্ণবর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়। তাঁহার বেশভূষা হিরণ্যবর্ণ।

ঋ. ২/৩৫ সূক্তের দেবতা অপাং নপাৎ। ঋষি গৃৎসমদ এই সূক্তে দশম মন্ত্রে তাঁহার রূপের বর্ণনা দিয়াছেন—

হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ।" ১১শ মন্ত্রে তাঁহার পরিচয় বলিয়াছেন— 'নপ্তুরপাম্'। বৈদিক সংস্কৃতে নপাৎ শব্দের অর্থ পুত্র — ন পততি বংশঃ যস্য হেতোঃ।

সুতরাং জলই অপাং নপাতের উদ্ভব স্থান। অগ্নির বিদ্যুৎপ্রভাই অপাং নপাৎ। ম্যাকডোনাল তাঁহার *Vedic Reader* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Apam Napat appears to represent the lightning form of Agni which lurks in the cloud"। তিনি তেজ দ্বারা সর্বদা দীপ্তিযুক্ত। তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে দানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হউন। ইনি কুটিল গতি মেঘের মধ্যে স্বয়ং ঊর্ধ্বভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুৎ পরিধান করিয়া অন্তরিক্ষে আরোহণ করেন।" (ঋ. ২/৩৫/৮) বর্ষাকালে এই দেবতা প্রভূত জলদান পূর্বক উত্তম অন্ন উৎপাদনের পথ সুগম করিয়া দেন।

ত্বষ্টা

তক্ষ্ বা ত্বক্ষ্ ধাতু হইতে ত্বষ্টা শব্দ। ত্বক্ষ্ ধাতুর অর্থ তক্ষণ করা। তক্ষণ করাকে কথিত বাংলায় বলে 'কুঁদে বের করা'। একখণ্ড কাঠ হইতে কুঁদে মূর্তি বাহির করা। ত্বষ্টার কাজ হইতেছে রূপহীন উপাদান হইতে রূপ করা। অব্যক্তকে ব্যক্ত করা, অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করা। ত্বষ্টা রূপকৃৎ। ত্বষ্টা তাহা হইলে স্রষ্টা পরমেশ্বরই। ত্বষ্টা একজন সুদক্ষ শিল্পী। দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র ত্বষ্টাই তৈয়ারী করেন। ইন্দ্রের বজ্রও ত্বষ্টার হাতে নির্মিত। হিরণ্যস্তূপ ঋষি ইন্দ্র দেবতার সূক্তে বলিয়াছেন (ঋ. ১/৩২/২, 'ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।' মেধাতিথি ঋষি অগ্নিসূক্তে (ঋ. ১/১৩/১০) ত্বষ্টাকে আহ্বান করিয়াছেন— ''ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে।'' বহুবিধ রূপসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি। ''স্যুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান্, সত্যসংকল্প, ত্বষ্টাদেব আশ্রয় দানের জন্য আমাদের সে সকল অভিলষিত দান করুন।'' (ঋ. ৩/৫৪/১২)।

মেধাতিথি ঋষি ঋ. ১/২০ সূক্তে বলিয়াছেন, 'হে দেব ত্বষ্টা! তুমি শ্রীমূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি অঙ্গিরাদের সহায় হইয়াছ। তুমি জান, কোন্ দেবতাদের কোন্ ভাগ। তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি তাহা সর্বদা দান কর।'

জমদগ্নি ঋষি ঋ. ১০/১১০/৯ মন্ত্রে হোতাকে বলিয়াছেন — ''তুমি ত্বষ্টা দেবতাকে পূজা কর; কারণ তোমার মত যজ্ঞ কেহ করিতে পারে না। তুমি বিজ্ঞ।''

ত্বষ্টা যে সৃষ্টি করেন, তাহা কোন উপাদান লইয়া নহে। তিনি নিজেই হইয়া যান। তাই তিনি বিশ্বরূপ।

ঋ. ১০/১৮৪ সূক্তে ত্বষ্টা ঋষি নিজেই নিজের কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণু নারীর অঙ্গকে গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত করুন। ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানেরে স্থির করিয়াছেন।

শ্রীঅমলেশ বলেন, ''জগতের যা কিছু অপ্রকাশ অব্যক্ত, তার রূপকৃৎ গঠনকৃৎ হলেন ত্বষ্টা।'' শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ''ত্বষ্টা the Fashioner of things''।

ত্বষ্টা বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ আর বিশ্বকর্মার মধ্যে পার্থক্য কি? ''ত্বষ্টা সব হয়েছেন। বিশ্বকর্মা সব করেছেন।'' (বেদ মীমাংসা, পৃ. ৪৭৯)

তনূনপাৎ

নিজ স্বরূপ বুঝাইতে দুইটি শব্দ আছে আত্মা আর তনু। বিশ্বপ্রাণ সর্বত্র বিদ্যমান। আকর্ষণ করি। তাহা আত্মা। আর আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত আধার তনু। আত্মা পুংলিঙ্গ আর তনু স্ত্রীলিঙ্গ। আত্মাতে তনুতে ভেদ নাই, পুরুষ প্রকৃতির মত।

"তনূনপাৎ' অর্থ আত্মস্বরূপের পরিণতি। মহাশূন্য শিবতনু। আমাদের মধ্যে তাঁরই আত্মজ তনূনপাৎ। নপাৎ অর্থ পুত্র।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ৪৪৫)

ইনি যজ্ঞকে মধুমান করেন। তিনি আমাদের মধুধারা — সোম। অদিতি-বরুণ আদি মিথুন। তাঁহাদের কুমার তনূনপাৎ। দেহের মধ্যস্থলে তিনি আছেন, মধু পান করেন। মূলতঃ তনূনপাৎ জীবাত্মা। মনে হয় গীতায় তিনি জীবভূত পরাপ্রকৃতি। তিনি এই জগৎটা ধরিয়া আছেন। ইনি তনূর পালক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, পবনরূপে যিনি বহিয়া চলেন তাহার শক্তি তনূনপাৎ।

মুখ্য প্রাণের একটি বৃত্তি প্রাণ, আর একটি বৃত্তি উদান। প্রাণ দ্বারা জীবধর্ম রক্ষা হয়। আর উদান ঊর্ধ্বস্রোত। আমাদের মধ্যে লোকোত্তর চেতনা জাগাইয়া রাখে। তনূনপাৎ প্রাণের সুষম দ্বন্দ্বের প্রবর্তক।

আপ্রীদেবগণ

ঋগ্বেদে আপ্রীসূক্তগুলির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। দশটি আপ্রী সূক্ত দৃষ্ট হয়। এক এক জন ঋষির নামে এক একটি (মেধাতিথির ১/১৩, দীর্ঘতমার ১/১৪২, অগস্ত্যের ১/১৮৮, সুমিত্রের ১০/৭০, জমদগ্নির ১০/১১০, গৃৎসমদের ২/৩, বিশ্বামিত্রের ৩/৪, আত্রেয়ের ৫/৫, বসিষ্ঠের ৭/২ ও কাশ্যপের ৯/৫)। প্রত্যেকটি আপ্রীসূক্তে ১১টি করিয়া ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকের দেবতা আলাদা — সমিদ্ধঃ, নরাশংস, ইলঃ, বহিঃ, দেবীদ্বার, উষসা নক্তা, প্রচেতস, সরস্বতী, ত্বষ্টা, বনস্পতি ও স্বাহাকৃতি।

সূক্তগুলির নাম আপ্রী কেন? এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাদের প্রীতিসাধন করিতে হয় এই জন্য আপ্রী। আত্মা আপ্যায়িত করা হয় বলিয়া নাম আপ্রী। আপ্ ধাতু ও প্রীঞ্ ধাতু হইতে আপ্রী। দেবতাদেব পাওয়া যায় কিংবা তাঁহাদের আপ্রী — প্রীতি সাধক। এইরূপ আপ্রীর বহু প্রকার তাৎপর্য আছে।

আপ্রী সূক্তগুলির বিনিয়োগ পশুযাগে। পশুবধের একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে তাহা বলিতেছি। পশু বস্তুতঃ যজমানের নিষ্ক্রয়। নিষ্ক্রয় — দেবতার কাছে যেখানে নিজেকে আহুতি দিতে হইবে সেখানে নিজের প্রতিনিধিরূপে অন্য কিছু আহুতি দিবার নাম নিষ্ক্রয়। সকল যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা এই নিষ্ক্রয়বাদের উপর। তাহা হইলে পশুবলি আত্মবলিরই নামান্তর। পশুযাগ একটি দ্রব্যযাগ — কিন্তু তাহার ভিত্তি জ্ঞানযজ্ঞে। যে-কোন কর্ম করিতে হইলে আগে চাই অন্তরের একটি নিবিষ্ট ভাব। তারপর ভাবের অনুযায়ী ক্রিয়া। ক্রিয়ার দুই রূপ— বাচিক ও আঙ্গিক। বাচিক হইল মন্ত্রোচ্চারণ। আঙ্গিক হইল অনুষ্ঠান। একটি সূক্ত প্রবচন, আর একটি হব্যের আহুতি।

যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল বাহিরের সাধনা। মন্ত্র ভাবনা হইল ভিতরের সাধনা। মন্ত্রের বিনিয়োগ দুইটিতেই হয়। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান দুইয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মন্ত্র ভাবন — অর্থাৎ জ্ঞানযোগ প্রধান। বহির্যাগ আনুষ্ঠানিক, সেইজন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। অন্তর্যাগ ধ্যানের, তাহা সহজ। কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না।

আমাদের প্রাণটা সাধারণতঃ ছোট, তাহাকে বড় করিতে হইবে ।

তাহাকে বিরাট করিতে হইবে। সাধনার ইহাই লক্ষ্য, পণ্ডিতি ভাষায় প্রাণের ঊর্ধ্বায়ণই সাধনার লক্ষ্য। পশু প্রাণের প্রতীক, ইহা পশুযাগের অধ্যাত্মরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষায়, দেহের নাড়ীতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি-শক্তি সহায়ে প্রাণকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা।

প্রথমে অগ্নি সমিদ্ধ -- প্রত্যেকের মধ্যেই অগ্নি আছেন। একাগ্র মনন দ্বারা অগ্নি উদ্দীপ্ত হন। সেই উদ্দীপ্ত তপঃজ্যোতির মধ্যে ধ্যান করিতে হইবে একটি চিৎ বিন্দু। এই বিন্দুচেতনা ঊর্ধ্বমুখী শিখার মত ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিবে। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবে হৃদয়ে। সেখানে দেখা যাইবে আলোর তোরণ। শোনা যাইবে অনাহত ধ্বনি। একটি বিপুল আলোর তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে উজানে ভাসিতে ভাসিতে সিদ্ধি। সিদ্ধি হইবে স্বাহাকৃতিতে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণে। আপ্রীসূক্তের ইহাই রহস্য।

ঋগ্বেদে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। আপ্রী দিয়া আত্মাকে আপ্যায়িত করা হয়, এইজন্য নাম আপ্রী। দুইটি বাদে প্রত্যেকটি আপ্রীসূক্তে বারো-টি করিয়া ঋক্ আছে। মোট বারো জন আপ্রী দেবতা আছেন।

১। **ইধ্মঃ**। ''ইধ্মঃ সমিন্ধনাৎ।'' সমিদ্ধ অগ্নিই ইধ্ম। অগ্নির ধর্ম আর সমিদ্ধ অগ্নির ধর্ম একই। সমিদ্ধ অগ্নিকে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন — সমিধে সমিধে সুমনা হইয়া তুমি আমাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ হও। প্রত্যেকটি সমিধে জ্বলন্ত ইন্ধন। অধ্যাত্ম ইন্ধনে সব কিছুই ইন্ধন। সাধনার প্রথম পর্বেই হইল আগুনে এই ইন্ধন জ্বালানো, ভিতরেও। আমাদের যাহা কিছু সব ইন্ধন করিয়া তোমাকে সঁপিয়া দিয়াছি।

২। **তনূনপাৎ**। তনূনপাৎ অর্থ আজ্য। গাভীকে বলা হইয়াছে তনূ। গাভী হইতেই দুগ্ধ। দুগ্ধ হইতে ঘৃত — ঘৃতই আজ্য। ''শুদ্ধ সন্মাত্ররূপী মহাশূন্যের সিসৃক্ষা মাতা মহাপ্রকৃতির বুকে ঢেউ তোলে। সেই আদি মিথুনের সম্প্রয়োগে পরমের যে কামনা চিদ্‌বীর্যে ঘনীভূত হয় তাহাই তনূনপাৎ।'' (অনির্বাণ)

তনূনপাৎ অদিতি-বরুণের কুমার। উপনিষদের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই কুমার অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ। ইনি আছেন দেহের মধ্যে মধুভোজী জীবাত্মা হইয়া। গীতায় ইনি ঈশ্বরের জীবভূতা পরাপ্রকৃতি, যিনি জগৎকে ধরিয়া আছেন।

৩। **নরাশংস**। তনূনপাৎ পরম পুরুষের ভ্রূণ — নরাশংস জাতক। দুইই অগ্নি। নরাশংসের মহিমায় আমরা নিবিষ্ট হইয়া স্তব করি ।

৪। **ঈল বা ইড়**। ঈড় ধাতুর অর্থ স্তুতি করা অথবা দীপ্ত করা। অগ্নিকে বলা হয় 'ইড়াভিঃ ইড্যঃ'। ঈল উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্ত শিখা। তাহাকে জীবনের বেদীতে জ্বালাইতে হইবে।

৫। **বর্হিঃ**। যাস্ক বলেন, "বর্হিঃ পরিবর্হণাৎ।"দুর্গাচরণের মতে

পরিবর্হন শব্দের অর্থ ছিন্ন করা অথবা বৃদ্ধি পাওয়া। কুশ ছিন্ন হইল যজ্ঞের প্রয়োজনে দেবতার আসন বিছাইতে। ছিন্ন কুশ যজ্ঞের অঙ্গীভূত হইয়া বৃহৎ হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্হিঃ অর্থ ভূমা।

৬। **দেবীদ্বারঃ**। জ্যোতির্ময় দুয়ারেরা। দ্বার যেমন কোন কিছুকে আড়াল করিয়া রাখে, আবার খুলিয়া দিলে ভিতরের পথও খুলিয়া দেয়। অন্ধকারের আবরণ সরিয়া গেলেই রুদ্ধ দুয়ার হইয়া যায় দেবীদ্বার।

৭। **উষাসা নক্তা**। 'অহর-নক্তোষসা'। উষা ও সন্ধ্যা। উষা দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা রাত্রির। আলো আঁধার লইয়া সত্তার পূর্ণতা। উষা নক্তো দুইটি বোন। উষা মিত্রের দীপ্তি। সন্ধ্যা বরুণের দীপ্তি। উষা আর সন্ধ্যা একটি আলো একটি কালো।

৮। **দৈব্যৌ হোতারৌ**। এই দুই সাধক আর সাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, প্রাণ আর অপান।

৯। **তিস্রো দেবীঃ**। তিনটি দেবীর সমাহার—ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী। ইলা নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এষণা। এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নি শক্তি। এষণার সাধনা হইল যজ্ঞ। যাহাতে আমাদের নিজেকে হব্য রূপে আহুতি দিতে হয় দেবতাকে । দেবী ইলা এই এষণার সিদ্ধি। জ্যোতির্ময় তাঁহার কর ও চরণ।

ইলা পার্থিব চেতনার ঊর্ধ্বলোকাভিমুখী এষণা।

ইড়া — সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি।

সরস্বতী ও ভারতীর কথা আলাদা প্রবন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

১০। **ত্বষ্টা**। ছুতার যেমন কাষ্ঠ হইতে খোদাই করিয়া (কুঁদে) মূর্তি বাহির করে, ত্বষ্টা তেমনি বিশ্বের অরূপ উপাদান হইতে রূপ গড়েন। অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। তিনি রূপকৃৎ। স্রষ্টা ঈশ্বরের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাঙ্গীণ রূপ কল্পনা আমরা পাই ত্বষ্টাতে। আমাদের পরমার্থ যে সৌম্য আনন্দ ত্বষ্টা তার শতধার উৎস।

১১। **বনস্পতিঃ**। বনদের যিনি পালন করেন। সাধকের প্রাণের ধারা যখন উজান বয় তখন বনস্পতি অগ্নি, প্রাণ যখন দিব্য ভূমি হইতে নামিয়া আসে তখন তিনি সোম। ঋক্-সংহিতায় অশ্বত্থ দিব্য বৃক্ষ। ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বত্থ নহে, বট গাছ, ন্যাগ্রোধাকার, যাহার ঝুরি নীচের দিকে নামে। বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমের নীচে সিদ্ধি লাভ করেন। ন্যাগ্রোধ অর্থ বট।

১২। **স্বাহাকৃতয়ঃ**। প্রজাপতি হইতে স্বাহাকারের জন্ম। (প্রযাজ) যজ্ঞের শেষ আহুতি সমাপ্তির পর সকল দেবতার নামে স্বাহা উচ্চারণ করা হয় বলিয়া বিশ্বদেবগণ স্বাহাকৃতির দেবতা।

উষা

উষা সুন্দরী। তিনি জ্যোতির প্রকাশিকা। তিনি যখন উদিত হন আকাশ হইয়া উঠে সমুজ্জ্বল। মনে হয় বিশ্বের প্রাণ আর জীবন তাঁহারই মধ্যে। তিনি সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি। উষা 'দিবো দুহিতা' দ্যুলোক তনয়া। তিনি যে বসন পরা তাহা জ্যোতির, তিনি নর্তকীর মত। অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়ানো। তমিস্রা অপাবৃত করেন। বিশ্বজগতের জন্য জ্যোতি ফুটাইয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে পথের চিহ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে। উষা পথ করিয়া দিলেন জীবগণের জন্য। উষা আসেন রূপের ধারা ঝরাইতে ঝরাইতে ব্যক্ত হন কল্যাণময়ী নারীর মত। উষার আলোক-ধেনুরা অন্ধকার গুটাইয়া আনে। জ্যোতিকে করে উদ্যত — যেন সবিতার দুইটি বাহু। উষার জ্যোতি ঋতম্ভরা।

ঋ. ১/৯২/৫ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, 'দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ', দ্যুলোক-দুহিতা সূর্যকে করেছেন আশ্রয়। ঋ. ১/৪৮/৭ মন্ত্রে কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি বলিতেছেন, 'এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি' সূর্যের উদয়ের পরে তিনি আসেন। ঋ. ১/১২৩/১২ মন্ত্রে কক্ষীবান্ ঋষি এইবার বলিতেছেন, 'যতমানা রশ্মিভিঃ সূর্যস্য' — সূর্যের কিরণমালায় হয় তাহার শুভাগমন। ঋগ্বেদে সূর্য হইলেন পরম সত্যের প্রতীক, সুতরাং উষার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক অতীব নিকট।

অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি. ঋ. ১/১১৩/৯ মন্ত্রে উষাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্যস্য"। ওগো উষা, তুমি যখন অগ্নিকে সুপ্রজ্জ্বলিত কর, তখনই সত্যের দিব্যদৃষ্টির দুয়ার খুলিয়া যায়। সত্যশ্রবা ঋষি ঋ. ৫/৮০/২ মন্ত্রে বলিতেছেন — বরেণ্য দেব সবিতা প্রকাশ করেন স্বর্লোক এবং উষাকে অনুসরণ করিয়া বিরাজ করেন।

শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার *Indian Philosophy* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪। পৃষ্ঠায় উষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত রাসকিনের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন: "Ruskin says : 'There is no solemnity so deep to a rightly thinking creature as that of the dawn.' The boundless dawn from which flash forth

every morning light and life becomes the goddess Usas, the Greek Eos, the brilliant maid of morning loved by the Asvins, and the Sun, but vanishing before the latter as he tries to embrace her with his golden rays."।

শ্রীঅনির্বাণ বলেন, "উষা দ্যুলোকের মেয়ে ভগের বোন্, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা — জননী তনয়া জায়া সহোদরা, রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবুও উদ্ভিন্নযৌবনা ভাবোল্লাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ৪৬১) চলতি কথা আছে—

"পহেলা পহরমে সবকোই জাগে,
দোসরা পহরমে ভোগী।
তেসরা পহরমে চোর চোট্টা,
চৌথা পহরমে যোগী।।"

রাত্রের প্রথম প্রহরে সকলেই জাগরিত থাকে। দ্বিতীয় প্রহরে ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা কুখাদ্য কুসঙ্গ লইয়া কাটায়। তৃতীয় প্রহরে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে চোর-দস্যুরা নিজ অপকর্মের জন্য বাহির হয়। রাত্রের শেষ প্রহরে সকলেই নিদ্রিত থাকে। তখন জাগেন যোগীরা, সাধক-তপস্বীরা। এই সময় ভগবদ্ভজনের উপাসনার শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর হরি রায় নামক একজন প্রিয় ভক্তকে উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন। শেষ রাত্রে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া জলাশয়ের তীরে উষার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। উষা আসিলে স্নান করা উচিত। উষাকালে চতুর্দিকে শ্বেতরঙের আভা মিশ্রিত একপ্রকার বর্ণময়ী পৃথিবী হয়। সঙ্গে সঙ্গে অরুণোদয়ের সময় আসে। তখন পূর্বদিকে কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা প্রকাশ পায়। সেই সময় অধিকাংশ দিবাচর প্রাণীরা জাগ্রত হয়। ইহার নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই সময় প্রাতঃস্নানের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। ব্রাহ্মমুহূর্তে বিশ্বসংসার ব্রহ্মের ভাবে ভাবিত হয়।

যত সাধক মহাপুরুষ ঐ সময় স্ব-স্ব আরাধ্য দেবতার ধ্যানে, স্মরণে নামগুণকীর্তনে নিমগ্ন হন। সর্বত্র শুদ্ধ পবিত্র ভাব বিরাজ করে। ঐ সময় স্নান-সন্ধ্যা-বন্দনা করিলে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সকল সাধকের সাধনের সহায়তা লাভ করা যায়; ব্রহ্মসান্নিধ্য সহজে হয়। ঐ সময় গোবিন্দে দেহ-মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়া স্থিরভাবে ভজনে নিবিষ্ট হইতে হয়। উষাকালে যিনি জাগ্রত হন, বেদ তাঁহাকে বলিয়াছেন 'উষর্বুধঃ'। এই নাম দিয়াছেন বামদেব ঋ ৪/৪৫/৪ মন্ত্রে।

সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১৫ সূক্তে প্রথম মন্ত্রে কুৎস ঋষি বলিয়াছেন, "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং" ইত্যাদি। কয়েকটি মন্ত্রে বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ সূর্য উদয় হইতেছেন। দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিতেছেন। সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকল জীবের আত্মা স্বরূপ। মানুষ যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে সূর্য সেইরূপ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন। ...... হে দেবগণ! এই সময় আমাদের পাপ হইতে মুক্ত কর।

যিনি ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন। সর্বত্র ব্রহ্মের আনন্দময় রূপ দর্শন করেন। সমস্ত জগৎ মধুময় এইরূপ অনুভব করেন। এই অনুভবের অংশীদার হইবার জন্য প্রস্কণ্ব ঋ. ১/৪৮ সূক্তে উষা দেবীকে আবাহন করিয়া বলিয়াছেন অন্তরিক্ষস্থ সকল সোমপায়ী দেবগণকে যজ্ঞস্থলে বহন করিয়া আনিবার জন্য।

উষা জাগরণের প্রতীক। কেবল প্রাত্যহিক ঘুম হইতে জাগরণ নহে— দিব্য জাগরণ; ঊর্ধ্বমুখে ছুটিবার জন্য আত্মার জাগরণ। যেমন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অতুলনীয় স্বর্গীয় কবিত্ব শক্তি জীবন্ত হইয়া উঠিল। ব্যাস-বাল্মীকিকে বাদ দিলে এত বিশালত্বের অধিকারী মহাকবি ভারতে আর জন্মান নাই।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর।"

পড়িলে মনে হয় ঋগ্বেদের মন্ত্রের স্বর্গের 'ভাস্বতী নেত্রী' উষা দেবীর শুভ জাগরণেই কবিগুরুর এই নিরুপম কবিপ্রতিভার উদ্বোধন।

দিব্যধামের আলো দ্বারা সব কিছু ভাস্বর করিয়া তোলাই উষার কার্য। এই দৃষ্টিতেই আধ্যাত্মিক জগতের ঋষিগণ উষাকে দর্শন করিয়াছেন। উষাকে বাহিরেও দেখিয়াছেন পরাক্ দৃষ্টিতে, অন্তরেও দেখিয়াছেন প্রত্যক্ দৃষ্টিতে। বিশ্বামিত্র ঋষি ঋ. ৩/৬১/৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন— "উষার আলোতেই বিরাজিত বরুণের ব্যাপ্তি ও বিশালতা, মিত্রের মাধুর্য ও সুসঙ্গতি" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ৪৩)। শ্রীঅরবিন্দ *On the Veda* গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "The Divine dawn, daughter of heaven, as the bringer of the Truth, the bliss, the heavens of light, creator of the Light, giver of vision, maker, follower, leader of the paths of Truth, remover of the darkness, the eternal and ever youthful goddess of our godward journey." (p. 615)

ঋ. ১/৪৮ সূক্তে কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব বলিতেছেন — হে আলোক

দোহনকারিণী উষাদেবী, প্রভাত কর। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ কর। আমাদের অভীষ্ট কি বস্তু? আমাদের অভীষ্ট দিব্যজ্যোতি।

হে দেবী বিভাবরী আলোকদাত্রী, পূর্ণ দীপ্তিসহ এস, এস প্রভূত ধন, মহামঙ্গল ধন সহ। এস সমগ্র ঐশ্বর্য নিয়ে, যেন আমরা সুখ পাই, মঙ্গল লাভ করি।

ঋ. ১/৪৮ সমগ্র সূক্তটিই আস্বাদনীয়। ঋ. ৩/৬১ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন — "শোভনা নারীর মত তার তনুকে জানেন উষা। উন্নত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই আমাদের সামনে। স্নানরতা ষোড়শী তমিস্রাকে অভিভূত করেন। দিবোদুহিতা এসেছেন জ্যোতি নিয়ে। 'অকুণ্ঠিত যৌবনবতী' প্রচেতনা এনেছেন সূর্যের ও যজ্ঞের অগ্নি।"

যাস্কাচার্য নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে উষার রূপের তারতম্য ভেদে ষোলটি অভিধান প্রদর্শন করিয়াছেন : বিভাবরী। সুনরী। ভাস্বতী। ওদতী। চিত্রামঘা। অর্জুনী। বাজিনী। বাজিনীবতী। সুম্নাবরী। অহনা। দ্যোতনা। শ্বেত্যা। অরুষী। সূনৃতা। সূনৃতাবতী। সূনৃতাবরী।

উষা ঋগ্বেদের দেবীদের মধ্যে সর্বোত্তম সৃজন। উষার প্রশস্তি কুড়িটি সূক্তে আছে। উপমালংকারে ও সৌন্দর্যে এগুলি সকল বিদ্বান্ সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আমরা নিত্য ২৫/৩০ মিনিট কাল উষাকে দেখি। এতটুকু সময় মাত্র দর্শন লাভ করিয়া উষার রূপলাবণ্যের এত বর্ণনা সম্ভবপর মনে হয় না। মনে হয় অনেক সময় ধরিয়া ঐ বর্ণনাকারী ঋষিরা বা তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা উষাকে আকাশে দর্শন করিতেন। ঋগ্বেদে ৩/৬১/৩ মন্ত্রে ঋষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন — উষা 'বিশ্বোর্ধা তিষ্ঠসি'। উষা আকাশে উন্নতা হইয়া আছে। তারপর বলিয়াছেন— হে নবরূপা উষা, তুমি চক্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরাবৃত্ত হইতেছ। ইহাতে বুঝা যায়— উষা চক্রবাল হইতে গগনপথের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া বারংবার একই পথে চক্রের মত ঘুরিতেছে। আমরা মেরুবলয়ের $৬৬\frac{১}{২}^{\circ}$ ডিগ্রী মধ্যে বাস করিলে ধ্রুব নক্ষত্রকে মাথার উপর দেখিতাম এবং সপ্তর্ষি যেমন ধ্রুব নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরে সেইরূপে উষাকেও ঘুরিতে দেখিতাম। ইহাতে মনে হয় এই মন্ত্রের ঋষি বা তাঁহার পূর্বপুরুষেরা উত্তর মেরুমণ্ডলে বাস করিতেন। শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক ঋগ্বেদের ও ব্রাহ্মণের কতিপয় মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্যদের উত্তরমেরু মণ্ডলে কোন সময় বসবাস ছিল।

মেরুমণ্ডলে যেরূপ শীতের প্রকোপ তাহাতে মানুষের সেখানে বাস

করা সম্ভব কিনা ইহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, কয়েক সহস্র বৎসর পর পর মেরুমণ্ডল উষ্ণ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে সূর্য তাহার গ্রহ-পরিবারবর্গ লইয়া কোন বৃহত্তর সূর্যকে পরিক্রমা করে। তাহাতে একবার পরিক্রমায় ২৫ হাজার বৎসর লাগে। ইহার মধ্যে কোন এক সময় কয়েক সহস্র বৎসর পৃথিবী সূর্যের দিকে হেলিয়া যায়। মেরুমণ্ডল তখন উষ্ণ হইয়া মানুষের বাসোপযোগী হয়। সেই সময় আর্যদের সেখানে বাস করা সম্ভব হইয়াছিল। সেই সময় দেখা যাইত চক্রবালের বেশ কিছুটা উপরে উষা ধ্রুব নক্ষত্রকে পরিক্রমা করিতেছে। তখন তাঁহাদের অনেকক্ষণ ধরিয়া উষাকে দেখিবার সুযোগ হইত এবং উষার রূপে ও মাধুর্যে তাঁহাদের চিত্তে আলোড়ন আসিত। এই সকল বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন তিলক মহাশয় তাঁহার *Arctic Home in the Vedas* গ্রন্থে।

শ্রীদেবী বা লক্ষ্মী

বৈদিক উষাই পৌরাণিক লক্ষ্মী, বেদে অনেক স্থলে উষা সূর্যপ্রিয়া রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিষ্ণু সূর্যের নামান্তর মাত্র। সুতরাং সূর্যপ্রিয়া বৈদিক উষা বিষ্ণুপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন।

গ্রীক-রোমীয় উষার ন্যায় বৈদিক উষারও রথ আছে। শ্রীসূক্তে শ্রীকে 'অশ্বপূর্বা' 'রথমধ্যা' বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক শ্রী জলধি-দুহিতা, মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিতা। গ্রীক উষা সমুদ্র হইতে অশ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাতগগন রঞ্জিত করিয়া আসিতেন। বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অন্তরিক্ষ বুঝাইত, সেই বিচারে উষা সমুদ্র-দুহিতা।

বৈদিক স্ত্রী দেবতৃগণের মধ্যে উষার আসন সর্বাপেক্ষা উচ্চে। অথচ পৌরাণিক যুগে উষার উল্লেখ নাই। পুরাণে সে সুবর্ণকিরণ নির্বাপিতা, তবে সেই উষা পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, তিনি লক্ষ্মীরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন। উষাকে বেদে বাজিনীবতী বা অন্নবতী বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীও অন্নদাত্রী।

লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। ঋগ্বেদের খিল-অংশে (পরিশিষ্ট অংশে) 'শ্রীসূক্ত' আছে। উহা অতি উত্তম। বেদের শ্রীসূক্ত বলিতে উহাকেই বুঝায়। ঋগ্বেদের এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ ও ঐশ্বর্য অর্থে 'শ্রী' কথাটি পাওয়া যায়। যেমন — 'শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ' (ঋ. ১/৮৭/৬), 'শ্রিয়ে কং বো অধি তনূষু' (ঋ. ১/৮৮/৩), 'শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আ' (ঋ. ৯/৯৪/৪), 'শ্রিয়ে পূষন্নিষুকৃতেব দেবাঃ' (ঋ. ১/১৮৪/৩), 'শ্রীণামুদারো' (ঋ. ১০/৪৫/৫) ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত সর্বত্রই শ্রী বলিয়া কোন দেবীর উল্লেখ করা নাই। তবে শুক্ল যজুর্বেদের ৩১/২২ মন্ত্রে পাই— "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ।।" এখন শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর নিকট লোক প্রচুর শস্য অন্ন বস্ত্র ধন সম্পদের জন্য প্রার্থনা করে। বৈদিক যুগে আর্যগণ প্রচুর শস্য ও পার্থিব সম্পদের জন্য পুরন্ধ্রি ধিষণা প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। এখনকার আর্থিক অনটনের দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা করিতে সাহস করে না। কিন্তু

আর্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দল পুষ্টি করা যায়। শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কার্যে সহায়তার জন্য পুত্রের আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করিতেন। সেইজন্য তাঁহারা উপাস্য দেবদেবীর নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থনা জানাইতেন। কুহূ ও সিনীবালীর নিকট তাঁহারা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। অথর্ববেদে আছে, তাঁহারা সম্পদ্ ও বীরপুত্রের জন্য কুহূর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুপত্নী বলিয়া কাহারও উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদের শেষ অংশের একটি সূক্ত সুপ্রজননের জন্য বিষ্ণু ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা। বোধ হয় সেইজন্য অথর্ববেদে সিনীবালীকে বিষ্ণুপত্নী বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুপত্নী শ্রী বা লক্ষ্মীর নিকটে সন্তান সুপ্রসবের জন্য বা বহু সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা কেহ করে না। বৌদ্ধ যুগে যক্ষিণী হয়িতী সে ভার লইয়াছিলেন। আধুনিক যুগে জন্তনা রাক্ষসী, পাঁচু ঠাকুর ও ষষ্ঠী দেবী তাহা লইয়াছেন। তথাপি মনুষ্যগণ আশীর্বাদ করিবার সময় ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভের কথা এখনও উল্লেখ করে। শ্রীসূক্তে দেখা যায়, প্রার্থনাকারী ধন-ধান্য গো হস্তি রথ অশ্ব ও আয়ু প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের জন্যও কামনা জানাইতেছেন। কারণ পুত্র-পৌত্রও সম্পদ্ সৌভাগ্যের চিহ্ন।

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে ও শতপথে শ্রীদেবী রহিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বহুকেশবতী 'শ্রী'-এর উল্লেখ আছে।

শ্রী-সূক্ত শ্রীদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত। কারণ, 'বৃহদ্-দেবতা' গ্রন্থে মন্ত্রদ্রষ্টৃগণের নামের মধ্যে শ্রী নাম পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে শ্রী প্রধান দেবীগণের মধ্যে পরিগণিতা। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে সমুদ্রমন্থন হইতে শ্রীর উৎপত্তি। (গ্রীকদিগের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটি 'Aphrodtie'ও সমুদ্র-ফেনা হইতে উৎপন্না।) মহাভারতে আছে, মন্থনকালে শ্বেত পদ্মাসীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে বারুণীর নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীর নাম নাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে শ্রী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা এবং ধর্মের পত্নী। তাহার পর যখন রুষ্ট দূর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন, দেবগণ দানবহস্তে পরাজিত হইতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণ পুনরায় শ্রীকে পাইলেন বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা আছে তাহা বাস্তবিকই কবিত্বময়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ধন্বন্তরির পর স্ফুরৎ কান্তিমতী বিকশিত কমলে স্থিতা পঙ্কজহস্তা শ্রীদেবী সাগর হইতে উত্থিতা হইলেন। মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ

করিলেন। গঙ্গা আদি নদী তাঁহার সম্মুখে তাঁহার স্নানার্থে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজসকল হেমপাত্রস্থিত বিমল জল লইয়া সর্বলোক-মহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইতে লাগিলেন। ক্ষীরোদ-সাগর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। দেবী স্নাতা ভূষণভূষিতা ও দিব্যমাল্যাম্বরধরা হইয়া সর্বদেব সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আরও কবিত্বময় এবং আরও বিস্তারিত। কান্তি-প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া দেবী বিদ্যুন্মালার ন্যায় আবির্ভূতা হইলেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে অদ্ভুত আসন আনিয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠ নদীগণ মূর্তিমতী হইয়া হেমকুণ্ডে পবিত্র জল দিলেন। ভূমি দেবী অভিষেচন উপযোগী ওষধি সকল, গোগণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত মধুমাসের উৎপন্ন উপহাররাজি প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব কণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গল পাঠ্য নটীগণের নৃত্যগীতি মেঘের তুমুল নিস্বন, বাদ্যযন্ত্র বাদন, দিগ্‌গজগণ কর্তৃক পূর্ণকলস হইতে জলবর্ষণ ও দ্বিজগণ কর্তৃক সূক্তবাক্য উচ্চারণ — এই সকলের মধ্যে ঋষিগণ দেবীর অভিষেক কার্য সম্পাদন করিলেন। তারপর দেবীর সজ্জা, সমুদ্র দেবীর পীত কৌষেয়বাস বরুণ মধুমত্ত ভ্রমর গুঞ্জরিত কুসুমদাম, বিশ্বকর্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডল দিলেন। তাঁহার ভ্রমর গুঞ্জিত মালা লইয়া নূপুরসিঞ্চিত চরণে হেমলতার ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেবী নারায়ণের গলে সেই মাল্যপ্রদান করিয়া অপূর্ব ভঙ্গিতে লজ্জা বিভাসিত স্ফীত বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার বক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সরস্বতী

বেদে সরস্বতী দেবীর স্তব আছে। পাঁচটি সূক্তে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে। এই সরস্বতী কে, নদী না বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী? যাস্ক দুইই স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য সায়ণও দুইই বলিয়াছেন। সরস্বতী নদীর ন্যায়, আবার দেবতার ন্যায়। শ্রীঅনির্বাণ সমাধান করিয়াছেন — "অধিভূত দৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাই প্রাণের ধারা, আর অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎশক্তির প্রবাহ। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের কাছে গঙ্গা যেমন একাধারে নদী, নারী ও মা। গঙ্গার নারীরূপ যোগীদের কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে আছে।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ৪৭০) শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "The river inspiration flowing from the Truth Consciousness।"

"শত সহস্র ধারায় প্রবহমানা নদীর মত দেবী সরস্বতীও পৃথিবীতে ভাষার শত সহস্র ধারায় রূপায়িত।" (বেদের পরিচয়, পৃ. ২৩৯).

সরস্বতীকে ঋষি গৃৎসমদ "অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি" (ঋ. ২/৪১/১৬) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

অধিভূত দৃষ্টিতে যাহা জলের ধারা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাহাই জীবন-ধারা। জলকেও জীবন বলা হয়। ঐ ধারাই অন্তরে চেতনার ধারা। উপরোক্ত গৃৎসমদ ঋষির বাক্যটির অর্থ, "হে সরস্বতী, তোমার মত মা নাই, তোমার মত নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই।" নদী সরস্বতী আসেন আমাদের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া, সিন্ধু হইতে স্ফীত হইয়া, পর্বতের সানু ভগ্ন করিয়া—অতি নিকটতম হইয়া দূরের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেন। আবার মাতৃরূপা সরস্বতীর বক্ষঃস্থল হইতে দুগ্ধের মত ক্ষরণ হয় রত্ন আর আলো। আমাদের মায়ের মত আদরের বস্তু হইয়াও সরস্বতী ভীষণা, বৃত্রঘাতিনী আবর্ত রচনা করিয়া চলেন। যাহারা দেবনিন্দুক তাহাদের তিনি নির্মূল করেন। নিন্দুকের মুখে বিষ ঢালিয়া দেন।

সংহিতায় একটি নদীসূক্ত (ঋ. ১০/৭৫) আছে। এই সূক্তের ঋষি সিন্ধুক্ষিৎ। এই সূক্তে সিন্ধুনদীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, 'সাত সাত করিয়া তিন ধারায় চলিয়াছে।' অর্থাৎ একুশটি ধারার কথা আছে। তন্মধ্যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর নামও আছে (৫ম মন্ত্র)। আরও অনেক নদীর ধারার কথা আছে। ঋকে সিন্ধু নদের পূর্বদিকের অর্থাৎ পাঞ্জাব প্রদেশের

শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়।

এক সময় সরস্বতীর তীরে তীরে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ সংহিতাতেই দৃষ্ট হয়। এই নদী বিলুপ্ত হইয়াছে। আমাদের পরিচিত প্রয়াগ সংগমেও একটি সরস্বতী নদী ছিল, তাহাও বিলুপ্ত। সরস্বতী শব্দটিরও অর্থ আর মনে রাখি না। ভারতীও সরস্বতীর নামান্তর। ভারতী ভরতবংশীয়দের কুলদেবী ছিলেন। ভরতবংশ সরস্বতীর তীরবাসী ছিলেন, তাঁহারা সরস্বতীর উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের কুলদেবী সরস্বতী কালক্রমে ভারতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। (বেদ পরিক্রমা, পৃ. ১১৫)

আমাদের পূজিতা সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বীণাবাদিনী। ইনি মধ্যমা বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী — বাক্ এর চারিটি স্তর। মধ্যমার দেবতা সরস্বতী। সরঃ শব্দের অর্থই জল। ইহার বীজ সংহিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু বীণাহস্তার রহস্য কি? এক ভক্ত বলিয়াছেন, শব্দ সমুদ্র এত বিশাল ও গভীর, পাছে তাহাতে ডুবিয়া যান, এই ভয়ে তুম্বী (বাওয়াস, লাউয়ের খোল) ধরিয়া রহিয়াছেন। 'অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বীং বহসি বক্ষসি।' বীণার তাল শব্দব্রহ্মের প্রতীক।

মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋ. ১/৩/১০-১১-১২ মন্ত্রে বলিয়াছেন---

> ''পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
> যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।। ১০
> চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
> যজ্ঞং দধে সরস্বতী।। ১১
> মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।
> ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি।।'' ১২

সরস্বতী চিত্তমল-বুদ্ধিমল-কর্ম্মমল-শোধয়িত্রী। অন্নবতী বা ভর্গোবতী, কর্মপ্রেরণাদায়িনী, ধী প্রচোদয়িত্রী। কার্য ও বুদ্ধির উদ্‌বোধয়িত্রী, যজ্ঞ ধারণ করেন। সরস্বতী চিত্তরূপ সমুদ্র কেতু দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত করেন। (বিদ্যারণ্য স্বামী)

সরস্বতী বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধ জ্ঞান। তিনি ব্রহ্মের জ্ঞানবিভাব।

মেধাতিথি ঋ. ১/১৩/৯ মন্ত্রে বলিয়াছেন—

> ''ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
> বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ।।'' ৯

ইলা, সরস্বতী ও মহীকে একত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। ইলা— চেতয়িত্রী, সরস্বতী— বেদরূপা বাক্, মহী— মহতী ভারতী বৃহতী— এই তিন দীপ্যমানা দেবী যজ্ঞে অধিষ্ঠিত্রী হউন।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন-- ''Saraswati is the goddess of Word. The goddess of divine Inspiration''।

পৃথিবী

ক্ষ্মা — ক্ষমাময়ী, মৃন্ময়ী। অন্তরিক্ষ — প্রাণময়ী। দ্যুলোক — চিন্ময়ী। ভূমিতে যাহারা জন্মে সকলেরই প্রাণশক্তি আছে। আছে বলিয়াই তাহাদের বর্ধন আছে। আমরা জন্মগ্রহণ করি একটি ক্ষুদ্র আধারে। এই আধারে আবদ্ধ চেতনার মুক্তি হয় বিস্তারে। ইহাই বৈদিক ঋষির সাধনা ও মুক্তি।

'প্রথ্' ধাতুর অর্থ বিস্তার। এই বিস্তারার্থক প্রথ্ ধাতু হইতে পৃথিবী। ধীরে ধীরে ভাবের বিস্তার হয়। এই পৃথিবীতে, ক্ষুদ্র আধারে মানবশিশু জন্মে। ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া পরিণত যুবাপুরুষে উন্নীত হয়। পৃথিবীর আর একটি নাম ভূ বা ভূমি। অর্থাৎ যেখানে কিছু হইতেছে। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া। পৃথিবীর আর একটি নাম ক্ষিতি — যেখানে সকলে বাস করে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমাদের শরীরই পৃথিবী। বক্ষঃস্থল বেদী, হৃদয় অগ্নি। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে পৃথিবী যজ্ঞবেদী। পৃথিবী গো-রূপা। দ্যাবা-পৃথিবী আমাদের জনক-জননী। দ্যুলোক হইতে অমৃত-জ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়ে, তাহার বন্ধ্যাত্ব ঘুচায়।

দ্যুলোক বৃষ, পৃথিবী ধেনু। পৃথিবী একটি লোক। দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি। ভূলোক দেবতা অগ্নি। দ্যুলোক আর ভূলোক নিত্যসঙ্গত। পৃথিবী জুড়িয়া আছে আমাদের আদি অন্ত। আমাদের জন্ম, সাধনা ও মৃত্যু এই আদি মিথুনের বুকে আছে ঢেউয়ের উঠানামার মত। মাথার উপরে দ্যুলোকের, আর পায়ের নীচে ভূলোকের মহাবিপুলতা। দুইই আলো ও রসের নির্ঝর। ঋষি গোতম রহূগণের মুখে শুনি —

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।"

(ঋ. ১/৯০/৬-৭-৮)

"মধু হইয়া বাতাসেরা বহিয়া চলে যজমানের (ভক্তের) জন্য। মধু ক্ষরণ করে সিন্ধুরা। মধুমতী হউক আমাদের কাছে ওষধীরা। মধু হউক রাত্রি আর উষারা। মধুময় হউক পার্থিব লোক।"

"মধু হউক দ্যুলোক, আমাদের পিতা যিনি। মধুমান হউন, বনস্পতি। মধুমান হউন সূর্য। মধুমতী হউক ধেনুরা আমাদের কাছে।"

"এইখানে এই পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াই আকাশে বাতাসে সূর্যে জলে স্থলে স্থাবরে জঙ্গমে অহোরাত্রের আবর্তনে অনুভব করা এক অমৃত আনন্দের হিল্লোল। এই তো দেবহিত জীবনের অনুত্তম সম্ভোগ, পার্থিব জীবনের দিব্য রূপান্তর।" (বেদ-মীমাংসা, পৃ. ৪৯৯)

পৃথিবী তিন লোকেই বিদ্যমান। এইখানে তিনি মৃন্ময়ী, অন্তরিক্ষে তিনি প্রাণময়ী, দ্যুলোকে তিনি চিন্ময়ী। পৃথিবী দেবতা তিন লোকেই ওতপ্রোত।

সর্বত্রই পৃথিবীদেবী। তিনি অদিতি অখণ্ডিতা, অনন্ত চেতনা। পৃথিবীর আদি জননী অদিতিরা একরূপ।

ঋগ্বেদে পৃথিবী দেবতার সূক্ত একটিই। ঋষি অত্রির পুত্র ভৌম। সুললিত ভাষায় পৃথিবীর প্রশংসা আছে। সূক্তটিতে মাত্র তিনটি মন্ত্র। সুদূর অতীত কাল হইতে পৃথিবী মাতা আমাদিগকে সন্তান- সন্ততিরূপে স্বীকার করিয়া অসীম ধৈর্য সহকারে প্রতিপালন করিতেছেন। সূর্যকিরণে পৃথিবী উত্তাপিতা হন, আবার চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধা হন। ঋ. ১০/৩১/৯ মন্ত্রে কবষ ঋষি বলিতেছেন, কিরণসমূহধারী সূর্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করে না, বায়ু পৃথিবীকে ছিন্নভিন্ন করে না।

ভৌম ঋষি বলিতেছেন, যে সময় দীপ্তিশালী অন্তরিক্ষ হইতে তোমার মেঘে বৃষ্টি পতিত হয়, সে সময় তুমি দৃঢ়ভাবে বলপূর্বক সকলকে ধারণ করিয়া থাক।

'দ্যৌ'-এর সঙ্গে পৃথিবীর কয়েকটি স্তোত্র আছে। যজ্ঞের পুষ্টিবর্ধক এই দেবতাদ্বন্দ্ব আকাশ ও পৃথিবী। ঋ. ১/১৫৯/১ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, যজমানকে সুখ প্রদান করেন এই দুই দেবতা। ঋ. ৬/৭০/৫ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন — 'মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাম্।" দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধুদ্বারা পূর্ণ করুন। ঋ. ১/২২/১৫ মন্ত্রে পৃথিবী স্তোত্র —

"স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ।।"

— হে পৃথিবী, সুখদাত্রী নিষ্কণ্টকা নিবাসযোগ্যা হও। আমাদিগকে বিস্তীর্ণ আশ্রয় দান কর।।

গ্রীক কাব্যে অনেকস্থলে আকাশকে পিতৃরূপে ও বসুন্ধরাকে মাতৃরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। গ্রীক ভাষায় 'Zeus' এবং সংস্কৃত ভাষায় 'দ্যৌস্‌ত প্রায় একই শব্দ। Zeus piter এবং 'দ্যৌষ্‌পিতব্‌' প্রায় সমানার্থক। (বেদের পরিচয়, পৃ. ২৪১)

সায়ণাচার্য অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ড হইতে ষোড়শ কাণ্ড পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা রচনা করেন নাই, এই কারণে উক্তমন্ত্রগুলির রহস্যজাল ভেদ করা যায় না। [তবে সায়ণাচার্য না করিলেও ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।]

অথর্ব-বেদের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ৬৩টি মন্ত্র ভূমিসূক্ত। অপূর্ব পৃথিবীস্তুতি। প্রথম মন্ত্রটি এইরূপ

"সত্যং বৃহদ্ ঋতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।"
(অথর্ব. ১২/১/১)

বৃহৎ সত্য ও ওজস্বী ঋত, দীক্ষা আর যজ্ঞ তপস্যা, ইহারা পৃথিবীকে ধরিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহার ঈশ্বরী। যাহা আমাদের জীবনে হইয়া গিয়াছে, যাহা হইবে, পৃথিবী দেবতা তাহার দিশারী। তিনি আমাদের জন্য বিশাল লোক রচনা করুন। এই পৃথিবীকে ধরিয়াই আমরা দ্যুলোকের বিশালতা পার হইব।

পৃথিবী সমুদ্র মেখলা, তাহার গলায় সিন্ধুর হার। অন্নের জন্য মানুষ এই পৃথিবীকেই কর্ষণ করিতেছে। দ্যুলোক হইতে পৃথিবীতে ধারা ঝরিতেছে। তাহা হইতে নবজীবনের উচ্ছ্বাস। প্রাণের উদ্বেলন। পৃথিবী ও তাহার উন্নতির জন্য পূর্বপুরুষেরা কত করিয়াছেন। দেবতারা অসুরদের পরাভূত করিয়া কতই না কল্যাণ করিয়াছেন। এই পৃথিবীর আবেশ আর তেজ তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন।

পৃথিবী, তুমি বিশ্বম্ভরা। তুমি জ্যোতির আধার। সকলেরই প্রতিষ্ঠা তোমাতে। তুমি হিরণ্যবক্ষা, তুমি আবার জগৎটাকে অব্যক্তেও তলাইয়া দিতে পার। বিশ্বকবি পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র।
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্ট-বিদ্রূপে।।"

অথর্ববেদীয় এই পৃথিবী-সূক্তটির দেবতা পৃথিবী। অত্রি ঋষি। অত্রির একটি নাম ভৌম। মনে হয় ভূমির ধ্যান করিতে করিতে মাটির মতন মানুষ হইয়া গিয়াছেন ঋষি স্বয়ং। সূক্তের আরম্ভটা যেন হঠাৎ। যেন একটা পর্দার আড়ালে ছিল পৃথিবী। যেন দুই দিকের আবরণ সরাইয়া ঋষি পৃথিবীকে দর্শন করিলেন। আগে পর্জন্যসূক্ত, পরে বরুণসূক্ত। এই দুইয়ের মধ্যে পৃথিবী দেবতার সূক্ত। ঋষি যেন হঠাৎ পৃথিবীর অপরূপ স্বরূপ দেখিলেন। এই দর্শনের সময়টা কখন? শ্রীঅনির্বাণ সুন্দর অনুভূতির ভাষায় বলিয়াছেন, "আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে, দ্যুলোকে

যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, পৃথিবীর শিখরে-শিখরে তখন মেঘমালার শৈল-সমারোহ। প্রথম বর্ষণের ধারাসারে দ্যুলোকের আলোই যেন চিন্ময় প্রাণের ঢল নামিয়ে দিয়েছে পার্বতীর অঙ্গে-অঙ্গে অগণিত নির্ঝরের মুক্তাধারায়। তার ছোঁয়ায় এইখানে এই মৃন্ময়ী ভূমির অণুতে-অণুতে জাগল শ্যামল প্রাণের রোমাঞ্চ। দ্যুলোকের জ্যোতির্মহিমা নিষিক্ত হল ভূলোকের উচ্ছ্রিত আকুতিতে। দ্যাবাপৃথিবী তখন একাকার, দিব্য আবেশে পৃথিবী চিন্ময়ী কমলা। (বেদ-মীমাংসা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১)

প্রথম ঋকে অগ্নি বলিতেছেন পৃথিবী দেবতাকে— তুমি ভীষণ ঝড়ের সময় যে আনত থাকিয়া বনস্পতিকে ধরিয়া রাখ, তাহাতে তোমার অসীম ক্ষমা ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মেঘে বিদ্যুতে বৃষ্টি তোলপাড় করে — তখন তুমি তোমার সন্তানদের দৃঢ়ভাবে কোলে ধরিয়া রাখ। তুমি মহাসঙ্কট হইতে আমাদিগকে বাঁচাও। কোলে সাপটাইয়া ধরিয়া রাখ। ইহা তোমার করুণা ও মনস্বিতার পরিচয়।

পৃথিবী ত্রিভুবনেশ্বরী দ্যুলোকে মোহিনী, অন্তরিক্ষে বিচরণকারিণী আর মর্তলোকে সুদৃঢ়া যশস্বিনী। বর্ণনায় তোমার বর্ষণীয় রূপখানি কল্যাণময়। তুমি সোমের ধারায় অভিষিক্ত, আবার সৌরতেজে সমুজ্জ্বল, অগ্নিযোমের মিলনখেলা তোমার মধ্যে সতত বিদ্যমান। তৃতীয় ঋকেও ঐ অগ্নিষোমের ইশারা।

তৃতীয় ঋকে যে শত শাখাযুক্ত বনস্পতির কথা তাহাতে ঊর্ধ্বশিখ অগ্নির ধ্যান আছে, বৃষ্টিতে সোমের ধ্যান। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বভূমিতে উঠিবার প্রবল লালসা ও বৃষ্টিতে প্রসাদের ধারা। লালসা উজানগামী, প্রসাদ নিম্নমুখী। অগ্নিষোমের মিলনের মূর্তি আছে। পৃথিবীর কোলে বৃক্ষ-সকলের শাখায়, ঝড়ের মতন আবার বৃষ্টিধারায় ঊর্ধ্বলোক হইতে করুণার বর্ষণ। এই ভাবনা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত।

যাহার উপরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পূর্বে বিচরণ করিতেন, যাহার উপরে দেবতারা অসুরদের বিনাশ করেন, যাহার উপরে গাভী অশ্ব এবং পক্ষীরা বাস করে, সেই পৃথিবী আমাদের সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি দান করুন।। ৫

সেই পৃথিবীর ভূমি যাহা দেবতারা বিনিদ্রভাবে অপ্রতিহতভাবে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সেই পৃথিবী আমাদের প্রিয় মধু উৎপন্ন করুন এবং তাহার অনুগ্রহে আমাদের জীবনে সমৃদ্ধি আসুক।। ৮

অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাহাকে পরিমাণ করিয়াছেন, শক্তিধর ইন্দ্র যাহাকে নিজের জন্য শত্রুমুক্ত করিয়াছেন, সেই পৃথিবী আমাদের (পুত্রদের) নিকট মাতার তুল্যা হউন, এবং স্তন্য দান করুন।। ১০

হে পৃথিবী, তোমার গিরি তুষার পর্বত এবং অরণ্য মধুময় হউক। পিঙ্গল কৃষ্ণ এবং রক্তবর্ণরূপ পৃথিবী, যাহা ইন্দ্র রক্ষা করিয়া আছেন আমি তাহার উপরে অবিনাশিত অপরাজিত এবং অক্ষত দেহে অধিষ্ঠান করিতেছি।। ১১

হে পৃথিবী, যাহা তোমার মধ্য, যাহা তোমার নাভিদেশ, তোমার যে দেহ হইতে পুষ্টিকারক খাদ্য উৎপন্ন হয় — তাহার মধ্যে তুমি আমাদের অবস্থান করাইয়া পবিত্র কর। সেই পৃথিবীই আমাদের মাতা, আমরা সেই মাতারই পুত্র এবং পর্জন্যদেব আমাদের পিতা — তিনি আমাদের রক্ষা করুন।। ১২

তুমি সমস্ত ওষধী-সৃষ্টিকারিণী মাতা। তুমি চিরস্থায়িনী মৃত্তিকা — তোমাকে ধর্ম ধারণ করিয়া আছে। হে পৃথিবী, তোমার জন্য মনোরম ভূমিতে আমরা যেন সর্বদা বিচরণ করিতে পারি।। ১৮

তোমার যে গন্ধ নীলকমলকে আমোদিত করিয়াছে, যাহা সূর্য বিবাহে চয়ন করিয়া আনা হইয়াছিল, তোমাকে প্রথম যে গন্ধের দ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছিল, হে আমার পৃথিবী! তাহা দ্বারা আমাকেও আমোদিত কর। দেখিও, কেহ যেন আমাকে ঘৃণা না করে।।২৪

আমরা উঠিতে বসিতে, দণ্ডায়মান হইতে, দক্ষিণ এবং বাম পদে দ্রুত গতিতে চলিতে যেন এই ভূমির উপরে কোন যাতনা সৃষ্টি না করি।। ২৮

যাহার উপরে ঋষিগণ বসিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ করেন, যাহার উপরে বলির যূপকাষ্ঠ নির্মিত হয়, যাহার উপরে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্তব স্তুতি পাঠ করেন, যেখানে বসিয়া পুরোহিতগণ ইন্দ্রকে সোমরস পান করিতে আহ্বান করেন, সেই ভুমি পরম পবিত্র।। ৩৮

যাহা দেবতাদের সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল, যে ক্ষেত্রে মনুষ্যগণ বিচরণ করে, যাহা সকল চিন্তার গর্ভাধার, সেই পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দু প্রজাপতি মধুময় করুন।।৪৩

যাহা গুপ্তধনের আধার সেই পৃথিবী আমাকে স্বর্ণ, মণি-মাণিক্য দান করুন। উত্তম দ্রব্যের দাতা আমাদের উত্তম দ্রব্য দান করুন, তাহা দেবতাদের অনুগ্রহরূপে আমাদের কাছে আসুক।।৪৪

এই পৃথিবী-মাতার বহুস্থান ব্যাপিয়া নানা ভাষা এবং নানা ধর্মের (সৃষ্টির) লোকের বসতি। তিনি ধেনুর অফুরন্ত দুগ্ধের ন্যায় সহস্র ধারায় আমাকে সম্পদ্ দান করুন।।৪৫

যে গ্রাম, যে অরণ্য, যে সভাগৃহ পৃথিবীতে আছে— যেখানে সৈন্য এবং জনসমাবেশ হয়, তাহাদের প্রতি আমরা যেন তোমার প্রিয় চারু-বাক্য বলি।। ৫৬

শান্ত সুরভিত মধুময় ভূমি, যাহার স্তনে সুমিষ্ট দুগ্ধ, তিনি আমাকে দুগ্ধ দান করুন এবং আশীর্বাদ করুন।।৫৯

ঋষিও বলিয়াছেন — তুমি হিরণ্যবক্ষা, সকলকে ঐ বুকে আশ্রয় দেও, আবার অব্যক্তে তলাইয়া দেও। তোমার হৃদয়ে অমৃত। পরমব্যোমে তাহা অমৃত, সত্য দ্বারাই সত্য আবৃত। বাহ্য বস্তুর উজ্জ্বলতায় তুমি আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছ। উত্তম রাষ্ট্রে আমাদিগকে স্থাপন কর।

তোমার পাহাড় বন আমাদের সুখদায়ী হউক। ইন্দ্ররক্ষিত তোমার এই ভূমিতে যেন আমি অজিত, অহত ও অক্ষত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকিতে পারি।

হে পৃথিবী, তুমি আমার মাতা, আমি তোমার পুত্র, পর্জন্য আমার পিতা, তুমি আমাদিগকে আহরণ কর। বিশ্বকর্মীরা যে পৃথিবীর বেদীতে যজ্ঞ বিস্তার করেন, সেই ভূমিতে আমাদিগকে সংবর্ধিত কর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় পৃথিবীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

> "এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায় মুখপানে চেয়ে।
> জননী লহ গো মোরে যখন বন্ধন তব বহুযুগ ধ'রে।
> আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের
> তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
> উৎস উঠিতেছে সেথা যে গোপন সুরে
> আমারে লইয়া যাও — রাখিও না দূরে।"

বৈদিক যুগের ঋষি কোন্ অতীত কালে পৃথিবীকে মা বলিয়াছেন! আমরা সেদিন বাংলাদেশকে মা বলিতে শিখিয়াছি ঋষি বঙ্কিমের কৃপায়। ভারতবর্ষকে এখনও মা বলিতে শিখি নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের ঋষি মায়ের দেহ ৫১খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সারা ভারতময় ছড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ভারতের বাহিরে কোথাও পীঠস্থান হয় নাই। কত হাজার হাজার বছর পরে বিশ্বকবি, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে মা বলিতে শিখাইলেন। যদি শিখি যদি অনুভব করি তাহা হইলে পৃথিবীর অশান্তি এক মুহূর্তে দূর হইয়া যায়।

আবার বলি, বৈদিক যুগের ঋষি কি বলিতেছেন, এই মর্তবাসী জীব আমরা তোমাতেই জন্মগ্রহণ করি, তোমাতেই বিচরণ করি। তুমি সকলকে বহন কর। দ্বিপদ চতুষ্পদ সকলেই তোমার সন্তান, সকলকেই সমানভাবে দেখ। পাখীগুলি উড়িয়া ঊর্ধ্বে উঠে, আবার তোমার স্নেহের টানে চলিয়া আসে।

সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কেননা তাহারা পৃথিবীতে থাকিয়াই

অমৃতের সন্ধান পায়, সন্ধান পায় আদিত্য-জ্যোতিতে। সূর্য উদিত হইয়া এই পৃথিবীর উপর অমৃতের স্রোত ঢালিয়া দেন নিজ রশ্মিজাল দ্বারা।

এই পৃথিবীর উপর কত গ্রাম. কত অরণ্য, কত সভা, কত সমিতি, কত জনসংঘ— তুমি জননী পৃথিবী সর্বত্র সুচারু। যুগযুগান্ত হইতে কত কি আসিল গেল, উঠিল পড়িল; আবার ঘোড়া যেমন গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলে, তুমি সেইরূপ সব ঝাড়িয়া ফেলিয়াছ। তোমার মমতা অসীম, আবার নির্মমতাও নিদারুণ। তুমি সমভাবে নাচিয়া চলিয়াছ। কান্তি সৌরভে তুমি পৃথিবীর সকলের মা। তুমি বিশ্বজননী অদিতি। তোমার বুকে এত মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুমি কামধেনু, সকলে তোমাকে দোহন করিতেছে। তুমি দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্য যুক্তা, তুমি আমাদের প্রতি সর্বতোভদ্র হও।

হে পৃথিবী, তুমি ত্রিষধস্থ। ভূমিতে অন্তরিক্ষে আর দ্যুলোকে স্থিত মানুষ ও দেবতার মধ্যে তুমি দূত। তুমি দেবতাকে আনো মানুষের কাছে। আর মানুষকে তুলিয়া লও চেতনার চিন্ময় আকাশে। হে পৃথিবী, কবে আমাকে তুলিয়া লইবে ? পৃথিবীর অগ্নি-জ্যোতি সৌর-জ্যোতিতে পরিণত হইবে আর আত্মচৈতন্য বৃহৎ চৈতন্যে বিস্ফারিত হইবে।

অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডে প্রথম অনুবাকে এই ভূমিসূক্ত বা পৃথিবীসূক্তে ৬৩টি ঋক্ আছে। আনুপূর্বিক অনুবাদ না দিয়া অংশতঃ উল্লেখ করিলাম। প্রথম মন্ত্রটি প্রথমে লিখিয়াছি। শেষ মন্ত্রটি এই —

"ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্॥"

(অথর্ব, ১২/১/৬৩)

দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্য সঙ্গতা তুমি হে মাতঃ পৃথিবী, তুমি আমার প্রতি সর্বতোভদ্র হও। মন্ত্রটির মধ্যে শ্রীর কথাও আছে, ভূতির কথাও আছে। শ্রী হইল শ্রেয়, আর ভূতি হইল প্রেয়। শ্রেয় ও প্রেয় দুইই পৃথিবী জননীর কাছে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অচেতন বস্তু ও ইতর জীবে দেবত্ব ভাবনা

ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায়, যে সকল বস্তু প্রাণহীন এবং মনুষ্যেতর জীব, তাহাদিগকে দেবতা ভাবনা করিয়া তাহাদের উদ্দেশে ঋষিমুখে মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। ইহা এক রহস্য বটে!

স্বরূপ চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা অতি কঠিন। এইজন্য প্রতীকের সাহায্য লওয়া হয়। ব্রহ্মই সব, অতএব সকল বস্তুই তাহার প্রতীক হইতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১। **অশ্ব**— ঋষি দীর্ঘতমার দুইটি সূক্তে অগ্নির স্তুতি আছে। (ঋ. ১/১৬২ ও ১৬৩) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব দিব্য অশ্ব। অশ্ব সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত। ইন্দ্র তাহার অধিষ্ঠাতা। পৃথিবীর একটি প্রাণী হইয়াও অশ্ব ধ্যানের বিগ্রহ।

২। **পাখী**— ঋষি গৃৎসমদের দুইটি সূক্তে (ঋ. ২/৪২ ও ঋ. ২/৪৩) দুইটি ছোট পাখীর কথা উল্লেখ আছে। পাখী দুইটির গানে ঋষির চিত্ত আনন্দে বিগলিত। পাখী দুইটি সুমঙ্গল, ভদ্রবাদী। উহাদের গান যেন উদ্‌গাতার সামগান। ঋষি ইহাদিগকে দেবতারূপে ভাবনা করিয়াছেন।

৩। **ইতরপ্রাণী : মণ্ডূক** (ব্যাঙ)— ঋষি বসিষ্ঠের মণ্ডূকস্তুতি (ঋ. ৭/১০৩) বিখ্যাত। বৎসরের একটি দিন, যে দিন প্রথম বর্ষা নামে কানায় কানায় ভরা সরোবরের দিকে ব্যাঙগুলি নাচিতে নাচিতে চলে। ব্যাঙেরা নাচিয়াই চলে, হাঁটেই না। ওদের মধ্যে আকুলতা আছে, তৃষ্ণা আছে। খলখল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে এ ওদিকে ছোটে, এ ওকে জড়াইয়া ধরে। জড়াইয়া ধরিয়া লাফাইয়া উঠে। অদ্ভুত আনন্দ উল্লাস। ঋষি ইহাদের মধ্যে দেবত্ব দেখিয়াছেন। বছরের গ্রীষ্মতপ্ত সাধারণ লোকের কাছেও ইহা এক আনন্দের দিন। এইদিনগুলি আমরা অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছি গুরুপূর্ণিমায় ও অম্বুবাচীতে। বর্ষা দেবতার দান এই দুইটি তিথিকে আমরা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা আমাদের মুগ্ধ করে; যেমন, "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ঐ আসে ওই অতি ভৈরব হরষে/ জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে / ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা / শ্যামগম্ভীর সরসা।"

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একজন ভক্ত ছিলেন অতুল চম্পটী। তাঁহাকে

দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়াছি বর্ষা নামিলেই খালি গায়ে ও খালি মাথায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেন। বলিতেন, এই দেখ, দেবতার আশীর্বাদ! মাথা পাতিয়া লও। দেখ, বিশ্ব প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে। বৃক্ষলতা পশুপক্ষী সকলেই নীরবে আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেছে। তোমরা কি কুঁড়ে! ঘরে কাপড় জড়াইয়া বসিয়া আছ। প্রত্যেকেই সাদরে শিরে গ্রহণ কর।'' এই কথাগুলি ঠিক যেন বৈদিক ঋষির।

বর্ষা হইতে নববর্ষ আসে। বৎসরের প্রথম ঋতু বলিয়াই নাম বর্ষা। কিন্তু বর্তমানকালে আমরা ১লা বৈশাখ বা ১লা জানুয়ারীতে নববর্ষ ববণ করি। ব্রহ্মজ্ঞানীরা মণ্ডূকতুল্য। কেননা, তাঁহারা সর্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত, প্রমুদিত, মত্ত। মণ্ডূকের ডাক যেন ঋষির বেদ-স্বাধ্যায়। মণ্ডূক সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এই —

''সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণ ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ।।'' (ঋ.৭/১০৩/১)

ব্রতচারী স্তোতাদের ন্যায় সংবৎসর শয়ান থেকে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করছেন।

ঋগ্বেদের ৭/১০৩ সূক্তটির দেবতা মণ্ডূক। ইহার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারি না। এই মণ্ডূকদের মধ্যে যোগীর লক্ষণ আছে। যোগিগণ যে রূপ বহুকাল আহার-পানীয় ছাড়া বাঁচিতে পারেন, এই মণ্ডূকেরাও দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত আহারাদি না করিয়া মাটির নীচে সমাহিতবৎ অবস্থান করে। ঋষি বর্ষা-ঋতুতে মণ্ডূকগণের আনন্দময়তার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ লক্ষ্য করিয়াছেন; চাতুর্মাস্য মধ্যে বর্ষা ঋতুর উল্লাস বিশেষভাবে উপভোগ করিতেন। বৈষ্ণব কবিয়া ব্যাঙের ডাকের মধ্যে কৃষ্ণ-বিরহিণীর আকুল আর্তনাদ অনুভব করিয়া পদরচনা করিয়াছেন —

''মত্ত দাদুরী ডাকি ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।''

স্ত্রীজাতীয় ব্যাঙকে দাদুরী বলা হইয়াছে এই মহাজনীপদে।

৪। **অক্ষ** — অক্ষ অর্থ পাশা-খেলার ঘুঁটি। ঋক্-সংহিতার অক্ষসূক্ত বিখ্যাত। ঋষি কবষ। অক্ষসূক্তটি ঋষির আত্মবিলাপ (ঋ. ১০/৩৪)। এক সময় জুয়াখেলার প্রতি তাহার অত্যধিক আসক্তি ছিল। ইহার ফলে তাহার সুখের সংসারে আগুন লাগিয়াছিল। সবিতা দেবতার কৃপায় তাহার সুমতির উদয় হইয়াছিল। জুয়া-খেলা ছাড়িয়া চাষ-আবাদে মন দিবার সঙ্কল্প করে। ঋষির জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাগুলি সূক্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সপ্তম মন্ত্রটি এইরূপ —

''অক্ষাসো ইদঙ্কুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।

কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সংপৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা।।"

(ঋ. ১০/৩৪/৭)

অনুবাদ ঃ "পাশা ক্রমেই অঙ্কুশ বিকাশ করিয়া ক্রমশ তীব্র আকর্ষণ করিতে থাকে, সূক্ষ্ম তীরাগ্র দিয়া যেন হনন করিতে থাকে, ধারাল ছুরিকা দ্বারা যেন কর্তন করিতে থাকে; যখন জয়ের অবস্থা যখন পাশাগণ খুব দাতা ও যেন মধু দ্বারা রচিত মনে হয় — আবার হরণের সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তাহারা নিহন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে।"

সূক্তটির এই আপাত অর্থ ছাড়াও কোন গভীর অর্থ থাকিতে পারে।

৫। **উলূখল-মুসল**— ঋষি শুনঃশেপ। ঋ. ১/২৮ সূক্তে সোমকে বলা হইয়াছে উলূখলসুত। যজ্ঞে উলূখল-মুসল দিয়া পুরোডাশের জন্য ধান কোটা হয়। আর সোম-অভিষর হয় (অর্থাৎ ছেঁচা হয়)। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে উলূখল যোনি, আর মুসল শিশ্ন। শুনঃশেপ ঋষি বলিতেছেন, যজ্ঞকালে একটি নারী যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে ও তথা হইতে পুনঃ বহির্গমন অভ্যাস করে। এই রূপকের মাধ্যমে ঋষি বলিতেছেন অপচ্যুত হইল মুসলটি ছাড়িয়া দেওয়া আর উপচ্যুত হইল মুসলটি তুলিয়া লওয়া। এই নারীটি দেবজননী অদিতি। কোন কোন স্থলে মুসলের উঠানামাকে বলা হইয়াছে সার্পরাজ্ঞীর অপানন ও প্রাণন।

৬। **নদী** — নদীর মধ্যে দুইটিকে দেবতা চিন্তা করা হইয়াছে, বিপাট ও শুতুদ্র। পৌরাণিক কালে ইহারা বিপাশা ও শতদ্রু। সিন্ধুনদের সহিত এই দুইটি নদীর উল্লেখ পাই ঋক্-সংহিতায় তৃতীয় মণ্ডলের একটি সূক্তে। নদীসূক্তটি আছে দশমমণ্ডলে (ঋ. ১০/৭৫)। সরস্বতী যেমন নদী, তেমনি দেবীও। অধিভৌতিক দৃষ্টিতে উক্ত নদীদ্বয় সূর্যরশ্মির প্রতীক।

৭। **শ্রদ্ধা** — সংহিতায় শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে (ঋ. ১০/১৫১)। দ্রব্যযজ্ঞই হউক আর জ্ঞানযজ্ঞই হউক, দুইয়ের ভিত্তিই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার জন্ম কাম হইতে। এই কাম হৃদয়ের আকূতি। এই কাম দিব্য কাম। শ্রদ্ধাতেই সাধনার আরম্ভ। "আদৌ শ্রদ্ধা"। হৃদয়ের আকূতি দিয়া শ্রদ্ধায় উপাসনা যে করে, সে আলোর সন্ধান পায়। অপ্রাণীকে দেবতা কল্পনার দৃষ্টান্ত বহু আছে। উদাহরণ স্বরূপ সাতটি বলা হইল।

বেদ সংহিতায়
দেবতা সাকার কি নিরাকার

উপাসনা বলিলে সাকার উপাসনার কথাই মনে জাগে, আরাধ্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান বা শ্রদ্ধাপূর্বক কোন দ্রব্য অর্পণকে আমরা সাধারণত উপাসনা মনে করিয়া থাকি। ইহা যদি উপাসনার তাৎপর্য হয়, তবে নিরাকার উপাসনা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এক বিন্দু জল যদি ঈশ্বরকে নিবেদন করিতে হয়, তাহা হইলে আকার-ইঙ্গিতে তাহা সম্ভব নহে, ইহা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কথা। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, দেবতা নিরাকারই বটে, তবে উপাসনার সুবিধার্থে প্রথমদিকে সাকার কল্পনা করিতে হইবে, নচেৎ উপাসক কোন কিছুই ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। চলতি কথায় আছে — ‘‘সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।’’

এই কথা লইয়া ব্যাকরণের একটা বাগ্-বিতণ্ডা চলিতে পারে। রূপকল্পনা — এই কল্পনার কর্তা কে? যাঁহার আদৌ রূপ নাই, তাঁহার রূপ সাধক কি প্রকারে কল্পনা করিবে? যাহার রূপ নাই বা কোনদিন ছিল না, তাহার রূপকল্পনা কাহারও পক্ষে কি সম্ভব? সকলেই স্বীকার করিবেন, উহা আদৌ সম্ভব নহে। ‘ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা’— এই কল্পনা ক্রিয়ার কর্তা ব্রহ্ম হইতে পারেন, কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান আছে। পাণিনির সূত্র ‘‘কৃত্যানাং কর্তরি বা’’ অনুসারে কৃত্য প্রত্যয়ের কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; যথা শিষ্যস্য (শিষ্যেণ বা) বেদঃ পাঠ্যঃ। উপাসকের সুবিধার জন্য ব্রহ্মন্ যদি নিজের রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে সেই রূপ কোনপ্রকারেই অর্থহীন হইতে পারে না, উপাসকের নিকট সেই রূপ বিশেষ মূল্যবান্ ও গুরুত্বপূর্ণ।

কোনরূপ বিচার না করিয়া এই বিষয়ে বেদ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কি বলেন তাহা দেখা যাউক। বেদজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যোগদর্শন প্রবর্তক পতঞ্জলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর লাভের জন্য চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে-উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন সেই যম-নিয়মাদি ক্রিয়া যোগপ্রণালী-ভিত্তিক এবং অত্যন্ত বাস্তবানুগ (Practical)। এই হেতু পরবর্তী সকল

দার্শনিক উহা মানিয়া লইয়াছেন, কেহ খণ্ডন করেন নাই। ঈশ্বরকে তিনি পুরুষবিশেষ বলিয়াছেন; যথা— "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" (পাতঞ্জল যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ২৪)। এক বিশেষ পুরুষ যিনি দুঃখ,কর্ম, কর্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর। একথাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ মনঃসংযোগ সমাধি বা ঈশ্বরলাভের উপায়, কিন্তু কোন বস্তুর রূপ বা আকৃতি ছাড়া মনঃসংযোগ সম্ভব নহে! "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" (সমাধিপাদ, ২৩) সূত্রে পতঞ্জলি প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সাকারত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র সংবাদে ভিন্ন ভিন্ন যুগে কি নামে কোন্ বিধানে ঈশ্বর উপাসিত হয়েন, এই প্রসঙ্গে শ্রীকরভাজন বলিয়াছেন—
"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"
(ভাগবত, ১১/৫/৩৩-৩৪)

অনুবাদ— "হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! ধ্যানের যোগ্য, সর্বদা ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বগণের পরিভবনাশক, মনোরথপূরক, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি।"

"হে মহাপুরুষ! হে ধর্মিষ্ঠ! আপনি দেববাঞ্ছিত অন্যের সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বাক্যানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রিয়তমা সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।।"

শ্লোকদ্বয়ে মহাপুরুষ ও চরণের উল্লেখে রূপের স্বীকৃতি হইল। পুনশ্চ, শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতে তাঁহাকে আদিপুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (ভাগবত, ১১/২৯/৪৯)
"ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্‌বেদসারম।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।।"

"হে নিগমকর্তা! ভবভয় অপহরণের নিমিত্ত ভ্রমরের ন্যায় বেদসার জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ সমুদ্র হইতে সাররূপ অমৃত আহরণ করত ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদি পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-সংজ্ঞক ঈশ্বরকে নমস্কার করি।"

ঈশ্বরকে 'মহাপুরুষ' বা আদিপুরুষ বলিয়া উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একটি রূপের ভাবনা মনে উদিত হয়। ঋক্-সংহিতায় পরমদেবতার একটি সংজ্ঞা হইল পুরুষ। সংহিতার পুরুষ-সূক্তটি একটি বিখ্যাত সূক্ত।

শ্রীভাগবত শাস্ত্রানুসারে, শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করত নিজে নিদ্রিত হইলেন। প্রকৃতি একের পর এক সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জীবকে বলিলেন, পরমপিতাকে ডাক। কাহারও ডাক সফল হইল না। পরিশেষে পরমপুরুষের ছকে অর্থাৎ রূপানুরূপে মানব সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার ডাকে তিনি জাগ্রত হইলেন। প্রকৃতির সৃষ্টি এখানে সার্থক হইল। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র বাইবেলে অনুরূপ উক্তির পরিষ্কার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা— "God made man after his own image"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহুস্থানে পুরুষ শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন —

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" ৩/৮

স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি।

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।" ৩/৯

— যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে নিজ প্রকাশাত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্তকঃ।" ৩/১২

— ইনি মহান্, সামর্থ্যশালী অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" ৩/১৩

তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, হৃদয-পুরশায়ী, সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" ৩/১৪

— সেই পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন ও অনন্ত চরণ।

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" ৩/১৫

যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ তৎসমস্তই পুরুষ।

শ্রীগীতা শাস্ত্রে তাঁহাকে 'পুরুষ' ও 'পুরুষোত্তম' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।" ১০/১২

আপনি স্বপ্রকাশ, দেবগণের আদি, জন্মরহিত, সর্বব্যাপী পুরুষ।

"ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।" ১১/১৮

আপনি নিত্য, সনাতন ধর্মের রক্ষক ও চিরন্তন পুরুষ — ইহা আমার অভিমত।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।"
১১/৩৮

— আপনি দেবগণের আদি, অনাদি, এই বিশ্বের লয়স্থানরূপী পুরুষ।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম 'পুরুষোত্তম যোগ'। এই অধ্যায়েও পরমেশ্বর একাধিকবার 'পুরুষ' রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। যেমন—

"উত্তমঃপুরুযস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" ১৫/১৭

উত্তম-পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন।

"অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।" ১৫/১৮

—পুরাণে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।

মানুষ যে ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন, তন্মধ্যে পুরুষের একটি ভাবনা বা ছাপ (impression) আসিয়া পড়িবে। মনে হয় বৈদিক ঋষিগণ ইহা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অত্রি ঋষি অগ্নিকে বলিতেছেন (ঋ. ৫/৪৩/১০) —

"আ নামভির্মরুতো বক্ষি বিশ্বানা রূপেভির্জাতবেদো হুবানঃ।"

হে জাতবেদঃ! তুমি আমাদের দ্বারা আহূত হইয়া সমস্ত দেবগণকে নামসমূহ ও রূপসমূহ দ্বারা আহ্বান কর। মন্ত্রের তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বুঝা যায়, দেবগণের নাম ও রূপ আছে।

গর্গ ঋষি ইন্দ্রকে বলিয়াছেন (ঋ. ৬/৪৭/৮)—

"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপস্থেয়াম্ শরণা বৃহন্তা।।"

— হে ইন্দ্র! তোমার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার নিমিত্ত আমরা নির্ভর করি। ইন্দ্রের মনোহর বাহুর উল্লেখে রূপের অর্থাৎ তাঁহার সাকারত্বের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া গেল। ঋ. ৩/৫৩/৬ মন্ত্রে ইন্দ্রের স্ত্রীর কথাও আমরা প্রাপ্ত হই। "অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।" ইন্দ্রের গৃহে কল্যাণকারিণী স্ত্রী আছেন।

মেধাতিথি ঋষি বলিয়াছেন (ঋ. ১/২২/১৭-১৮) —

"ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূল্হমস্য পাংসুরে।।
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।"

বিষ্ণু তিনপ্রকারে পদবিক্ষেপে এই জগৎ পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

এই প্রকার দৃষ্টান্ত অর্থাৎ দেবগণের যে মানুষের ন্যায় আকার বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আছে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদ দেবগণকে নিরাকার বলিয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। বেদশাস্ত্র কোন প্রকারেই সাকার উপাসনার বিরোধী নহেন।

শুক্ল যজুর্বেদের চত্বারিংশ অধ্যায়টিই ঈশোপনিষদ্ ইহা পৃথক্ কোন উপনিষদ্ নহে। উহার ১৫ ও ১৬ মন্ত্রে পরমেশ্বরের রূপের ও উহা

দর্শনের স্পষ্টোক্তি রহিয়াছে, ইহার ব্যাখ্যান্তর করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার যে রূপ আছে এবং তাহা যে দর্শন করা যায়, তাহাতে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যথা—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্‌সমূহ তেজো
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।।"১৬

"জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে; হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা, আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন।" ১৫

"হে পূষন্, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন; আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ, তাহা আপনার কৃপায় দর্শন করিব। সেই পুরুষ যিনি, আমিও তাহাই।" ১৬

বেদে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, প্রচলিত এই ধারণা যে অমূলক তাহা প্রতিপন্ন হইল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শেষ মন্ত্রে (৬/২৩) আছে— পরমেশ্বরে যেরূপ পরা ভক্তি সাধকের, অনুরূপ ভক্তি তাঁহার শ্রীগুরুদেবে যদি লাভ হয়, তবে সেই মহাত্মার নিকট উপনিষদুক্ত সকল বিষয় অনুভবযোগ্য হয়।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

গুরুদেব নৈর্ব্যক্তিক সত্তা কিছু নহেন। তাঁহার দেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই আছে। পরমেশ্বরে যেরূপ ভক্তি, গুরুর প্রতি অনুরূপ ভক্তি হইলে সাধক কৃতকৃতার্থ হয়েন। গুরু যেমন ব্যক্তিসত্তা, সাকার বিগ্রহ; অনুরূপ ভক্তির বিষয় পরমেশ্বরও সাকার নিরাকার হইতে পারেন। বেদে সাকার উপাসনা যে সমর্থিত তাহা উপরে উক্ত মন্ত্রগুলি হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩/১৯ মন্ত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উহাতে আপাত নিরাকারত্বের মধ্যে সাকারত্ব বিদ্যমান, তাহা সংশয়াতীত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; যথা—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

এই মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, তাঁহার হস্ত-পদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, অচক্ষু ও অকর্ণ হইলেও তিনি দেখেন এবং শোনেন। মন্ত্রে যখন 'পশ্যতি শৃণোতি' প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার

কথা আছে, তাহাতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল আছে, যাহার দ্বারা তিনি দেখেন শুনেন চলেন, সব কিছু করেন। 'অপাণি-পাদঃ' শব্দের অর্থ প্রাকৃত নশ্বর হস্ত-পদ নাই; অপ্রাকৃত হস্ত-পদ ইন্দ্রিয়াদি আছে বলিয়াই উহাদের কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়। হস্ত-পদাদি আদৌ না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না, ইহাই মন্ত্রটির তাৎপর্য। উপনিষদের এই মন্ত্রে পরম পুরুষ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অসুবিধা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্পষ্টোক্তি—

"তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।।" (চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি)

পুনশ্চ, মহাপ্রভু বলিয়াছেন— "অপাণি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।" ইহা যাঁহারা জানেন না বা মানেন না তাঁহারা নিরাকার ভাবিয়া ভুল করেন। ব্রহ্মের সত্তা, স্বরূপ ও দেহ সবই চিন্ময়, অপ্রাকৃত, কিছুই প্রাকৃত বা প্রকৃতির বিকারজ নয়।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে দেখা যায় ঈশ্বরকে পুরুষবিধ বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি মানিয়া লইলে ইহার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে। তবে অপ্রাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন করিতে অপ্রাকৃত নয়নের প্রয়োজন, তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, পরাভক্তির উদয়ে সাধকের নয়ন অপ্রাকৃত হয়, তখন তাঁহার যত্রতত্র ইষ্টদেব দর্শন হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে ইহাই বলিয়াছেন—

"রাধা-কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাহা তাহা রাধা-কৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়।।"

ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন — দর্শনীয় বরুণ-দেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার যে দর্শনলাভ হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে। যিনি মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর আকার দিয়াছেন, তিনি কখনই আকারহীন নহেন, তাঁহার অপ্রাকৃত তনু বিদ্যমান। দর্শনযোগ্য, ভক্তিভাবমণ্ডিত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাঁহার রূপের দর্শন মিলে। পরব্রহ্ম অন্যের কাছে অদৃশ্য ও নিরাকার হইলেও ভক্তের কাছে তিনি সাকার ও পরমশোভন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" তাঁহার দিব্য রূপমাধুরী সর্বচিত্তাকর্ষক। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যার এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন।।
সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।।" (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য)

"মাধুর্য ভগবত্তা সার"। রূপের মানুষেই মাধুর্য প্রকটিত। নিরাকারে মাধুর্য নাই বা অব্যক্ত। দেখা যাইতেছে, সকল শাস্ত্রই ঈশ্বরের সাকার রূপই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বর নিরাকার নহেন, তিনি সাকার — ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।

বৈদিক উপাসনার পরিণতি জ্যোতি দর্শন। যদি জ্যোতি দর্শনই শেষ কথা হয়, তবে সাকার নিরাকার এই সকল কথার কোন অর্থ থাকে না। আমরা এই নিবন্ধে যে সাকার ও নিরাকার শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছি, ইহা বৈদিক পরিবেশে নহে। বৈদিক পরিবেশে ব্যবহৃত হইয়াছে— পুরুষবিধ ও অপুরুষবিধ শব্দ। পুরুষবিধ অর্থ সাকার, অপুরুষবিধ নিরাকার। এই বিষয়ে নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক বিচার করিয়াছেন। উহাতে প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পুরুষের আকার আছে। প্রশ্ন হইল, আকার মানুষের মত কি না? এক পক্ষ বলেন — হ্যাঁ, যাঁহাদের স্তব করা হইয়াছে তাঁহাদের সত্তা ঠিক মানবের অনুরূপ। মানুষের মত তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও কর্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর পক্ষ বলেন — না, তাহা নহে; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, ইত্যাদি দেবতাদের ঠিক আমাদের মত আকার বলা যায় না, যদিও মন্ত্রে মানুষের মতই অঙ্গসমূহ, তাদৃশ দ্রব্যসংযোগ এবং মানুষের অনুরূপ কর্মসমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা— যাস্কের ৭/৬/৫ নিরুক্ত — "অথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে।" দেবতাদের মানুষের মত অঙ্গসমূহ। তাহার প্রমাণস্বরূপ ঋগ্বেদের উদ্ধৃতি—

"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহুঃ।" (ঋ. ৬/৪৭/৮)

"যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে।" (ঋ. ৩/৩০/৫)

প্রথম মন্ত্রাংশে দর্শনীয় বাহু (ঋষ্বা বাহু) এবং দ্বিতীয় মন্ত্রাংশে মহান্ মুষ্টি (কাশিঃ ইৎ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে।

নিরুক্ত ৭/৬/৭-এ দেবতাদের মানুষের মত দ্রব্যসংযোগের কথা বলা হইয়াছে; যথা — "অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ।" ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি।"

"কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।।"

এখানে অশ্বাদি উপকরণ ও জায়াদি ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করা হইল। নিরুক্ত ৭/৬/৯-এ মানুষের অনুরূপ কর্মসমূহের কথা বলা হইয়াছে — 'তথাপি পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ।' ঋগ্বেদের প্রমাণ যথা—

"অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য।।" (ঋ. ১০/১১৬/৭)

"আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্।" (ঋ. ১/১০/৯)

ইহাতে ইন্দ্রকে মনুষ্যবৎ পান, ভোজন ও শ্রবণাদি কর্মের কর্তা বলা হইল। অতঃপর যাস্ক অপুরুষবিধ সত্যটি মানিয়া লইয়া একটি সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন।

মহাভারতে পৃথিবীর স্ত্রীরূপ ধারণ পূর্বক ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা ও অগ্নির ব্রাহ্মণ রূপ (পুরুষরূপ) ধারণ করত খাণ্ডববন দাহনকার্যে সিদ্ধান্ত এই — "স্থূলে পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নানা রূপ ধারণ করিয়া তত্তৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। কাজেই বলা যাইতে পারে, মহাভারতাদি আখ্যানগ্রন্থও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ।

দেবতাদের আকার সম্বন্ধে এখানে আমরা চারিটি মতের সমাবেশ দেখিতে পাই— (১) দেবতারা পুরুষবিধ, (২) দেবতারা অপুরুষবিধ, (৩) দেবতারা উভয়বিধ এবং (৪) দেবতারা উভয়বিধ হইলেও একে অন্যের কর্মাত্মা। এই মত-চতুষ্টয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। দেবতাদের নিরতিশয় ঐশ্বর্যবশঃ তাঁহারা এক দুই বহু, মূর্ত অমূর্ত, পুরুষবিধ ও অপুরুষবিধ প্রভৃতি সবই হইতে পারেন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যখন যেভাবে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, তখন সেই ভাবেই তাঁহাদের স্তব করিয়াছেন। (নিরুক্তম্, ৭/৭/৯, শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, পৃ. ৮৫৮)

মোটামুটি সকল কথা আলোচনা করিয়া আমাদের অনুভব এই যে, বেদের পুরুষ চৈতন্যাকৃতি বা চিদাকার।

দেবচরিত : দেবতা কয়জন ?

প্রথমে দেবগণের কথা বলি, তাঁহারা এক নাকি বহু? অনেক বিজ্ঞ লোকের ধারণা, এক ও বহু বিরোধী শব্দ। হয় এক সত্য, না হয় বহু সত্য। ঈশ্বর যদি এক হন, তবে বহু হইতে পারেন না। দেবতা বহু হইলে একেশ্বরবাদ হইতে পারে না।

আর্য ঋষিদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এক শব্দ বহু শব্দের বিরোধী নহে। পরস্পর পরিপূরক। এক যদি বহুর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ না করে, তবে সে এক নিরেট শব্দ মাত্র (abstract); বহু বাগাড়ম্বর মাত্র, যদি তাহা একে সংহত না হয়। একটি ফুলের মালায় বহু ফুল। সূত্রটি ছিঁড়িয়া গেলে কতকগুলি ছিন্নভিন্ন আবর্জনা তুল্য। শুধু একগাছি সূতার কোন মূল্য নাই। কেহ গলায় পরিবে না। বহু ফুল একটি সূত্রে সংহত হইলে কণ্ঠে গ্রহণযোগ্য একটি মালা হয়।

একটি বৃক্ষ। তাহার শাখা, পল্লব, পত্র, কাণ্ড, শিকড় বহু। এই বহুত্ব লইয়া বৃক্ষের একত্ব। ঐ সব বাদ দিয়া একটি বৃক্ষের কোন সত্তা নাই। মূল শিকড় মাটি হইতে রস টানিয়া বৃক্ষকে পুষ্ট করে। পত্রগুলি রৌদ্র বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষকে পুষ্ট করে। বৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, সে শাখা, পল্লব, শিকড়, সব বাঁচাইয়া রাখে। ইহাদের সম্বন্ধ পারস্পরিক। বহুত্বের প্রাণ একের মধ্যে ও একের সম্যক্ প্রকাশ বহুত্বের মধ্যে।

বেদের বহু দেবতার পর্যবসান এক ব্রহ্মে। বহু সত্তা এক ব্রহ্মেরই বিভূতি। বহু দেবতা মূলত একই। ইহা বেদের ঋষি মন্ত্রের মধ্যে বহু বহু বার প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং সর্বত্রই বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বের প্রকাশ। শুধু একটি নিরেট (abstract) এক কোথাও দৃষ্ট হয় না। abstract অংক শাস্ত্রেও ১, ২, ৩, ৪-এর মধ্যেও তাঁদের ভগ্নাংশ (fractions) আছে। প্রত্যেকের মধ্যেও $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৬}$, $\frac{১}{৮}$ ইত্যাদি অগণিত আছে।

জ্যামিতিতে বস্তুত বিন্দু বা point-এর কোন আয়তন (magnitude) নাই। কিন্তু কালো বোর্ডের গায়ে চক দিয়া একটি বিন্দু (point) আঁকিয়া

দেখাইলে তাহার ভিতর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া আঁকা অগণিত চকের গুঁড়ার সমষ্টি চোখে পড়ে।

শুধু এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহার বহুত্বের মধ্যে প্রকাশ নাই, এইরূপ একটি অযৌক্তিক ভাবনা বৈদিক ঋষি ও তাঁহার সন্তান হিন্দুগণের মনে স্থান পায় নাই। একের একত্ব বহুর মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত। এই আর্যভাবনা সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়।

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়াছি — আমাদের দেবতারা তেত্রিশ কোটি। একটু বড় হইলে জানিয়াছি, আমাদের ভারতের লোক সংখ্যাও তেত্রিশ কোটি (তখন তেত্রিশ কোটি ছিল)। মনে করিতাম প্রত্যেকটি মানুষই একজন দেবতা। সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন। তাই তেত্রিশ কোটি মানুষ প্রত্যেকেই দেবতা। মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন তাহা ঠিকই। (তবে জাগ্রত নাই, ঘুমন্ত আছেন। তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই মানুষের ভজন-সাধনের উদ্দেশ্য)। যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা দেবমানব, মানবদেহে দেবতা। রামায়ণ মহাভারত পড়িলেও অনেক দেবতার সংবাদ পাই। গীতায় আছে — দেবগণের মধ্যে আমি 'বাসব' বা ইন্দ্র। বুঝা যায়, অনেক দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র। সুতরাং অনেক দেবতাই স্বীকৃত।

বেদ-সংহিতাতে অনেক দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। ''যস্য বাক্যঃ স ঋষিঃ, যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।'' (অণুক্রমণী) প্রত্যেক সূক্তেরই দেবতা আছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইঁহাদের দেবতা ভাবিতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এক খণ্ড প্রস্তর, সোমলতা, একটি ঝিনুক কিংবা একটি মণ্ডূকও কিভাবে দেবতা হয় তাহা বোধগম্য হয় না। সূক্তের বিষয়- বস্তুকেই দেবতা বলা হইয়াছে। সাধারণত যাঁহারা দেবলোক বা স্বর্গবাসী — তাঁহারাই দেবতা।

বেদের ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন, বেদে দেবগণের তিনস্থানে বাস — পৃথিবী-স্থান, অন্তরিক্ষ-স্থান ও দ্যুলোক-স্থান। পৃথিবী-স্থান দেবতা—অগ্নি, পৃথিবী ও সোম। অন্তরিক্ষ-স্থান দেবতা — ইন্দ্র, চন্দ্র, পর্জন্য ও বিদ্যুৎ। দ্যুলোক-স্থান দেবতা — সূর্য, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীযুগল ও বিষ্ণু। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রের নামে সূক্ত প্রায় ২৫০, অগ্নির নামে ২০০, সোমের নামে ২০০ এবং সর্বাপেক্ষা কম সূক্ত পৃথিবীর নামে। ইঁহাদের মধ্যে গুণে বড় বরুণ। ইন্দ্র দেবতার রাজা। বরুণ রাজ-চক্রবর্তী। অথর্ব-সংহিতায় (১০/৪/৩৫) বৈবস্বত মনু বলিয়াছেন — হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ ক্ষুদ্র নহ, তোমরা সকলেই মহৎ। ঋষি দীর্ঘতমা ঋ. ১/১৬৪ সূক্তে ৪৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন

''ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।''

তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়। তিনি দিব্য সুপর্ণ

গরুত্মান্। তিনি এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করেন। তাঁহাকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন।

সকল দেবতার মূল একজনই। অন্য দেবতা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অথর্ববেদে পাই —

"স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্।..."
"সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ।।..."
"সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ।..."

(অথর্ববেদ, ১৩/৪/৩-৫)

অর্থাৎ, তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা, তিনি বায়ু এবং তিনি ঊর্ধ্বস্থিত নভ। তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মহাদেব। তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এবং তিনিই মহাযম।

কয়েকটি মন্ত্র পরে আছে (অথর্ব, ১৩/৪/১২)—

"তমিদং নিগতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব।।"

এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ তদুৎপন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ) সহঃ, উহা এক, এক-বৃদ্ এবং একই। এই দেবতাসমূহ উহাতে 'এক-বৃৎ' হয়।

কিঞ্চিৎ পরে বলিয়াছেন (অথর্ব, ১৩/৪/৪৪)—

"তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃশতম্।"

"হে মঘবন্! তোমার মহিমা ঐ প্রকারই। তোমার তনুসমূহ শত শত।"

অর্থাৎ সমস্ত দেবতা, বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, "অগ্নির্বা এতা সর্বাস্তনো যদেতা দেবতা।"

ঋষি বিশ্বকর্মা বলেন, ঋ. ১০/৮২/৩ মন্ত্রে -

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।।"

যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা, যিনি বিশ্বের সকলের ধাম জানেন, যিনি এক হইয়াও সকলের নাম ধারণ করেন, অপর সকল ভুবনের লোকেরা তাঁহার বিষয় সম্যক্ প্রশ্ন করেন, জিজ্ঞাসাযুক্ত হন।

সধ্রি ঋষি বলিয়াছেন ঋ. ১০/১১৪/৫ মন্ত্রে —

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্সোমস্য মিমতে দ্বাদশ।।"

"সুপর্ণ (সোনার পাখাবিশিষ্ট পরম ঈশ্বর) একই আছেন। কবিরা তাঁহাকে বহুরূপে কল্পনাপূর্বক বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন।" অর্থাৎ, মেধাবিগণ তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাকে বাণী দ্বারা বহু প্রকারে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

গৃৎসমদ ঋষি — যিনি দ্বিতীয় মণ্ডলের সকল মন্ত্রেরই ঋষি, তিনি প্রথম সূক্তে ১৬টি মন্ত্রে একটি কথাই বলিয়াছেন, হে অগ্নি! তুমিই সব। তুমি ধৃতব্রত, রাজা বরুণ, তুমি শত্রু-বিজয়ী মিত্র, তুমি সৎপতি অর্যমা, তুমি সকল যজ্ঞের ফলদাতা, তুমি ত্বষ্টা, রুদ্র, মরুৎ ও পূষণ। তুমি সবিতা ও ভর্গ, তুমি ঋভু, অদিতি, সব। ইহাতে বুঝা গেল, ঐ সকল নাম একজনেরই।

বসিষ্ঠ ঋষি ঋ. ৭/১২/৩ মন্ত্রে বলিয়াছেন —"হে অগ্নি; তুমিই বরুণ, তুমিই মিত্র।"

এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য এই যে, সমস্ত দেবতার নামই অগ্নি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে — "অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ"। ঋষি দীর্ঘতমাও মনে করিতেন, পরম দেবতার নাম অগ্নিই।

বিশ্বামিত্র ঋষি ঋ. ৩/৫/৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন, অগ্নি যখন সমিদ্ধ হন তখন তিনি মিত্র। কোন কোন ঋষি মনে করেন, একই দেবতার কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ। অগ্নিই সন্ধ্যাকালে বরুণ হন। প্রভাতে উদিত হইয়া মিত্র হন, তিনি সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষ দিয়া গমন করেন। তিনি ইন্দ্র হইয়া দ্যুলোকে তাপ দিতে থাকেন। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে আচার্য শৌনক বলিয়াছেন কর্মভেদেই দেবতার নামভেদ। "সর্বাণি নামানি কর্মতঃ"— সমস্ত নাম কর্মভেদ হেতু।

আচার্য কাত্যায়ন, 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থে বলিয়াছেন (১৩/৪) —

"কণ্ঠপৃথক্‌ত্বাৎ হি পৃথগভিধানাঃ স্তুতয়ো ভবন্ত্যেকৈব বা মহানাত্মা দেবতা।"

পূর্বে বলিয়াছি — ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোক — তিনস্থানে দেবতাগণের বাস। এইজন্য দেবতা তিনজন বলা যায়। কিন্তু ঋ. ১/১৩৯/১১ মন্ত্রে পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন, এই তিনলোকে ১১জন করিয়া দেবতা আছেন। মুখ্য একজন ও ১০ জন তাঁহার বিভূতি বা পরিকর। এই হিসাবে ১১ + ১১ + ১১ = ৩৩ জন দেবতা হইয়াছেন। মূলতঃ দেবতা একজনই। বহুদেবতা একেরই বিভূতি — তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। তাঁহাদের তৃপ্তি সমান, আনন্দ সমান। বেদে সকল দেবগণকে 'বিশ্বদেবগণ' বলা হইয়াছে। বিশ্বদেবগণের মধ্যে সকল দেবতার সমাহার। বিশ্বদেব সূক্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় — ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোক (দ্যুলোক) সকলই চিন্ময়। বহুর মধ্যে এক — আবার একের মধ্যে বহু। বহু হইতে একে গিয়া আবার সেই এককে বহুর মধ্য দিয়া পাওয়া, ইহাই বৈদিক দেবতাদের রহস্য।

দেবতাদের স্থান তিন লোকে বলা হইয়াছে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ।

নৈরুক্তগণের মতে তিনজনই দেবতা। পৃথিবী-স্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষ-স্থান ইন্দ্র বা বায়ু আর দ্যৌ-স্থান সূর্য। কিন্তু দেবতাদের স্থান নির্দিষ্ট থাকিলেও তাঁহারা ত্রিলোকেই বিচরণশীল। এখান হইতে উজানে যান ওখানে। আবার ওখান হইতে নামিয়া আসেন এখানে। চৈতন্য আলোর মত। এক কেন্দ্র হইতে সর্বদিকে তাঁহার বিচ্ছুরণ হয়। সুতরাং কোন দেবতা কেবল এক লোকেরই, ইহা নির্দেশ করিয়া বলা যায় না। তিন লোকের মধ্যে পৃথিবী সর্বনিম্ন এবং দ্যৌ সর্বোচ্চ। আদি জনক-জননীরূপে 'দ্যাবা-পৃথিবী' একটি দেবমিথুন।

এই তিন লোকের উপরে আর একটি লোক আছে 'স্বঃ'-লোক। 'স্বঃ' লোক জ্যোতির্লোক। এই 'স্বঃ'-জ্যোতির লোক ঋষিগণের পরম পুরুষার্থ। এই স্বর্লোকে পৌঁছিলে জীবের হৃদয়ে এক পরমবস্তু ছাড়া আর কোন কামনা থাকে না। এই 'স্বঃ'-লোককে পাওয়া যায় কি উপায়ে?

অশ্বসূক্তে ঋষি (ঋ. ৮/১৫/১২ মন্ত্রে) বলেন — 'নৃভিঃ' অর্থাৎ পৌরুষ দ্বারা; আর যমী ঋষি বলেন (ঋ. ১০/১৫৪/১২ মন্ত্রে) তপস্যা দ্বারা। এই স্বর্লোককেই বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন, 'স্বর্মহৎ' (ঋ. ৩/২/৭) এবং বসুকর্ণ ঋষি বলিয়াছেন, 'স্বর্বৃহৎ' (ঋ. ১০/৬৬/৪)। এই মহৎ ও বৃহৎ দুই বিশেষণে ইহাই যে পরমার্থ ভূমি তাহা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 'স্বঃ'-এর ঊর্ধ্বে আর একটি লোক তাহাকে বলা হইয়াছে 'নাক'। স্বর্লোকের পর 'নাক' মহাশূন্য — সেখানে সৌম্য আনন্দের ধারা। 'স্বঃ' এবং 'নাক' দ্যুলোকেরই বিভাব, 'অন্তরিক্ষ' সাধনার ভূমি। 'স্বঃ' আর 'নাক' সিদ্ধির ভূমি। মোটামুটি এই তিনলোকে দেবতার বাস-পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ। তাঁহাদিগকে তাই 'ত্রিদিব' বলা হয়।

পৃথিবী-স্থানের প্রধান দেবতা অগ্নি। মূল জ্যোতির আধার হইতেছেন সূর্য। রশ্মির মাধ্যমে তাঁহাকে পৃথিবীতে পাই অগ্নিরূপে। অগ্নির আছে আলো আর তাপ। আলোক প্রজ্ঞার প্রতীক আর তাপ তপঃশক্তির প্রতীক।

বেদের বহুদেবতার পর্ব

ঋষি প্রজাপতি ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে পঞ্চান্ন সূক্তে লিখিয়াছেন —

"উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ব্যূযুর্মহদ্‌বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।।" ১

"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" এই কথাটি বাইশটি মন্ত্রে বাইশবার গানের ধুয়ার মত আছে। বাইশটি ঋকে ঋষি নানা দেবতার নানা কার্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক ঋকের শেষে আছে "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্। " সমস্ত দেবতাগণের অসুরত্ব একই। অসুরত্ব শব্দের অর্থ — প্রাণদাতৃত্ব।

অসুর শব্দের অর্থ প্রাণ। 'রা' ধাতুর অর্থ প্রাণ। অসুরাতি— যিনি প্রাণ দান করেন। সকল দেবতার মধ্যেই একটি মহৎপ্রাণশক্তি সমাহিত। ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন যে, একই পরমা শক্তি নানা দেবাধারে নানা প্রকারে কার্য করিতেছেন। সমস্ত দেবতার সমস্ত শক্তিসমূহ একই পরমা শক্তির বিভূতিসমূহ মাত্র।

পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা' গ্রন্থে 'অহুর' শব্দ পাওয়া যায়। 'অহুর' শব্দের অর্থ পরম দেবতা। সম্ভবতঃ বেদের অসুর শব্দ হইতে 'অহুর' শব্দ আসিয়াছে। সংস্কৃতের 'স' শব্দকে পার্শীরা 'হ' বলিত। সুরবিরোধী অসুর এই অর্থে অসুর-শব্দ-প্রয়োগ বেদে কোথাও নাই। উক্ত মন্ত্রে প্রজাপতি ঋষি অতি সুদৃঢ়ভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, সমস্ত দেবগণের মধ্যে একটি প্রাণশক্তি। ইহাতে বুঝা গেল — একত্বও সত্য, বহুত্বও সত্য। দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে, একশত চৌষট্টি সূক্তে, ছেচল্লিশ মন্ত্রে —

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।"

তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়। তিনি, দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্। (তিনি) এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বহু বলেন।

ঋগ্বেদে পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে প্রথম মন্ত্রে অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি বলিয়াছেন —

"ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায়।।"

"হে অগ্নি! তুমি জাত হয়ে বরুণ হয়ে থাক, তুমি সমিদ্ধ হয়ে মিত্র হয়ে থাক। সমস্ত দেবগণ তোমাতে অবস্থিত থাকেন। হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র।"

ষষ্ঠ মণ্ডলের সাতচল্লিশ সূক্তে আঠারো মন্ত্রে গর্গঋষি বলিয়াছেন —

"রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।।" ১৮

অনুবাদ — "সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং বহুরূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হন।" ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে সাতাশ সূক্তে তৃতীয় মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন,

"নহি নু তে মহিমনঃ সমস্য ন মঘবন্মঘবত্ত্বস্য বিদ্ম।
ন রাধসোরাধসো নূতনস্যেন্দ্র নকির্দদৃশ ইন্দ্রিয়ং তে।।"

অনুবাদ — "হে মঘবা, আমরা কারও তত্তুল্য মহিমা অবগত নই।

তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য বা শ্লাঘ্যধনও অবগত নই। হে ইন্দ্র! কেহ তোমার মত সামর্থ্য দর্শন করেনি।

ঋগ্বেদে সপ্তম মণ্ডলে নিরানব্বই সূক্তে প্রথম মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন —

"পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে।।"

অনুবাদ — "হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হলে তোমার মহিমা কেউ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না। পৃথিবী হতে আরম্ভ করে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরম লোক অবগত আছ।"

এক দেবতা (একো দেবঃ)

আমাদের প্রথম প্রত্যক্ষ দেবতা—এক আকাশ। তারপর সেই আকাশে এক সূর্য। আকাশে এক সূর্যের আলোর উন্মেষ ও আলোর নিমেষ — দেবতার এই নিত্য প্রত্যক্ষ হইতেই প্রথম একত্বের জ্ঞান অনায়াসে উৎসারিত হইয়াছে।

বসিষ্ঠ ঋষি ঋ. ৭/৬৩/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন — "সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্।" সকল মানুষের সাধারণ সূর্য দেবতা। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই —

"উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেবযঃ সমবিব্যক্তমাংসি।।"

সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ দেবতা, মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ দ্যুতিমান সূর্য উদিত হইতেছেন। ইনি তমোরাশি বেষ্টন করেন চর্মের ন্যায়। ইনি সকলের পক্ষে সমান। নিজের তেজ সংকুচিত করেন না।

"এষ মে দেবঃ সবিতা চচ্ছন্দ যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম।।"
(ঋ. ৭/৬৩/৩)

ঋ. ১০/৫১/১ মন্ত্রে অগ্নি দেবতা, আবার অগ্নিই ঋষি। ঋষি বলিতেছেন — হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি নানা স্থানে ব্যক্ত, কিন্তু "দেব একঃ।"

এই সূক্তেরই ৩য় মন্ত্রে বলা হইয়াছে— তুমি দশ স্থানে আছ, তাহা অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানেও বিরাজমান আছ। একই অগ্নি, তাঁহার প্রকাশ দশটি স্থানে। দশস্থানের নাম আচার্য সায়ণ বলিয়াছেন— পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপ তিন দেবতা এবং জল, ওষধি ও বনস্পতি, ৩ + ৩ + ৩= ৯, আর প্রাণী মাত্রেরই শরীর—এই ১০।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে — স্পষ্ট ভাবেই তুমি তোমার দশস্থানে অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ।

যে নামেই থাকুন , দেবতা যে একজন, এই কথা সংহিতায় বহু স্থানে কথিত আছে। যেমন —

"অস্যেক ঈশান ওজসা"। (ঋ, ৮/৬/৪১)

"একো বসূনি পত্যতে"। (ঋ. ৬/৪৫/২০)

"একঃ সুপর্ণঃ"। (ঋ.১০/১১৪/৪)

"একঃ পুরুষঃ"। (ঋ. ১০/৯০)

"একঃ বিষ্ণুঃ"। (ঋ. ১/১৫৪/৪)

গোতম ঋষি ঋ. ১/৮৯/১০ মন্ত্রে বলিতেছেন—

"অদিতি-র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।"

এই পঞ্চজনাঃ কে কে— এই সম্বন্ধে নানা মত আছে। মনে হয় পঞ্চজনাঃ শব্দ পাঞ্জাব (পঞ্চ অপ্) প্রদেশ ও পঞ্চনদ কূলবাসী সমস্ত আর্যজাতি।

উক্ত মন্ত্রে বলা যায় অদিতিই প্রধান। তাহা হইতেই সকল। তিনিই যা কিছু সমস্ত।

বামদেব ঋষি ঋ. ৪/৫৩/৫ মন্ত্রে সবিতাদেব সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন —

"ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।
তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি ত্রিভির্ব্রতৈরভি নো রক্ষতি ত্মনা।।"

সবিতৃদেব মহিমা দ্বারা পরিভব করিয়া অন্তরিক্ষত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান এই তিনলোককে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতদ্বারা অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে পরিপালন করেন। তিন ব্রত অর্থ সায়ণ বলিয়াছেন, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হিম। সমগ্র ঋক্ জুড়িয়া সবিতার কথা। সবিতাই যাহা কিছু সব।

আবার নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবতার কথা। বিশ্বের যাহা কিছু ছিল, আছে, হইবে — সবই সোম। অনন্ত বিশ্বের ধাতা পাতা সংহর্তা সবই সোম। সোম ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই নাই।

২য় মণ্ডলের প্রারম্ভে গৃৎসমদ ঋষি অগ্নি সম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন, ১৬টি সূক্তে। ঋষি গৃৎসমদ অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মণস্পতি, তুমি মিত্র, বরুণ ও অর্যমা। তুমি ত্বষ্টা, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ; তুমি পূষা, সবিতা, তুমি ভগ ইত্যাদি।

৪র্থ মণ্ডলে ঋষি বামদেব ইন্দ্রদেবতারও ঠিক ঐ রূপ বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা অতি সহজেই বুঝা যায় যে, মূল দেবতা একজনই তাঁহাকে নানা নামে বলা হইয়াছে।

মূর্ধন্বান্ ঋষি ঋ. ১০/৮৮/১৮ মন্ত্রে প্রশ্ন তুলিয়াছেন —

"কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ।

নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম্।।"

"হে পিতৃগণ! তোমাদের নিকট তর্ক-বিতর্কের কথা বলছি না। উত্তমরূপে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে, অগ্নি ক'জন? সূর্য ক'জন? উষা ক'জন? জল অর্থাৎ জলদেবী বা ক'জন?"

এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন মেধ্য কাণ্ব ঋষি ঋ. ৮/৫৮/২ মন্ত্রে।

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।

একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।।"

"এক অগ্নি বহুপ্রকারে সমিদ্ধ হয়েছেন। এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন। এক উষাই এই সকলকে প্রকাশ করছেন। এই একই সব হয়েছেন"।

— "একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।" ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় দেব একজন।

চোখের সম্মুখে নিত্য দেখি একের খেলা— বহুরূপে। বহু আর এক ভিন্ন নহে। বহু আর এক বিরোধী নহে। পরমেশ্বর এক হইলে আর বহু হইতে পারেন না, বহু হইলে আর এক হইতে পারেন না — এই মত ভ্রান্ত।

হয় monotheism সত্য, না হয় Polytheism সত্য— এই মত ভাবনা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের। বেদমতে এই ধারণা ভুল। এই ভুল মাঝে মাঝে আমাদের প্রাচ্য পণ্ডিতদেরও পাইয়া বসে। বৈদিক ঋষিরা বহুর মধ্যে একত্বের সার্থকতা দেখিয়াছেন। একের মধ্যে বহুত্বের সার্থকতা পাইয়াছেন। 'একো দেবঃ' এই কথাটি সংহিতায় শত শত বার আছে।

যদি প্রশ্ন হয় কে সেই 'একো দেবঃ'? তাহার যথার্থ উত্তর — বহু এক পরম দেবতার বিভূতি। যে কোন বিভূতি আমাদের ইষ্ট হইতে পারে। যাঁহাকে ধরিয়াই যাও— ঐ একে, ঐ মূল স্বরূপে পৌঁছনো যাইবে। গীতার দৃষ্টান্তে 'ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্' যে বৃক্ষটি তাহার নিম্নদিকের যে-কোন একটি পত্র অবলম্বন করিয়া যদি একটি পিপীলিকা ঊর্ধ্বে উঠিতে তবে থাকে সে মূলে পৌঁছাইবে। আবার গীতার ভাষায় —

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

অগ্নিও, ঊর্ধ্বশিখার মত যে তাঁহার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, নিম্নগামী জলধারার মত তাঁহার অনুগ্রহ তাহার দিকে নামিয়া আসিতেছে। এই জন্যই যে কোন বিভূতি ধরিয়া তাঁহাকে পাওয়া সম্ভবপর। তথাপি যিনি যাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ইষ্ট বা আরাধ্য দেবতা।

তথাপি ঋষিগণ ঋক্‌সংহিতায় অনেক দেবতার মধ্যে চার দেবতাকে ঐ একের মর্যাদা দিয়াছেন— অগ্নি, ইন্দ্র, সবিতা ও বিষ্ণু। ইঁহাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, আর সবিতা দ্যুস্থান

দেবতা। বিষ্ণু মূর্ধন্য চেতনা, মাধ্যন্দিন সূর্য তাঁহার প্রতীক। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক তাঁহার তিন পদক্ষেপ। অর্থাৎ, ত্রিভুবনকে বিশ্বভুবনকে এক হইয়া ধরিয়া আছেন যিনি তিনি বিষ্ণু, যাঁহার পদ মধুময় পরমানন্দের উৎস। উপাসকের উপাস্য যে কোন দেবতা হউন না কেন তাঁহার পরমা গতি মধুর উৎসে।

শ্রীঅনির্বাণ বলেন, সাধনার গোড়ায় পথের ভেদ থাকতে পারে এবং তা থাকাও সঙ্গত, কেননা রুচিতে ও সংস্কারে সব মানুষ এক নয়। কিন্তু চক্রের নাভিতে শলাকার মত সব পথের গন্তব্য যদি হয় এক তাতেই অদ্বৈতবাদের 'সার্থকতা' — "সর্বেষামবিরোধেণ।"

বৈদিক দেবতা যে একজন, 'ইহা একো দেবঃ' তত্ত্বে বিচার দ্বারা বলা হইল। এখন আবার "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"— এই আলোতে বিচার করা হইতেছে। 'একং সৎ' ঋক্ সংহিতায় অনেকস্থানে আছে। দুইটি স্থলে খুব স্পষ্ট। একটি দীর্ঘতমা ঋষির উক্তি আর একটি সধ্রি ঋষির উক্তি। দীর্ঘতমার কথা ঋ. ১/১৬৪/৪৫ মন্ত্রে, সধ্রি ঋষির উক্তি ঋ. ১০/১১৪/৫ মন্ত্রে। একটি প্রথম মণ্ডলে, মন্ত্রের দেবতা বাক্। অপরটি দশম মণ্ডলে, দেবতা বিশ্বদেব। একটি আদিতে, অপরটি অন্তে। একই কথা, একটু ভিন্ন ভাবে।

দীর্ঘতমা বলিয়াছেন — "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" সধ্রি বলিয়াছেন — "বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একং বহুধা কল্পয়ন্তি।" সধ্রি সুপর্ণকে 'একং' বলিয়াছেন। 'একঃ দেবঃ'। সুপর্ণ সুন্দর আলোর পাখী। আদিত্য বা সূর্য দ্যুলোকের আলোর পাখী।

কল্পনার এক অর্থ আছে, অবাস্তব ভাবনা। এখানে সে অর্থে নহে। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ঐ চলতি কথাতে 'ব্রহ্মণঃ' এই ষষ্ঠী বিভক্তিকে যদি "কর্তরি ষষ্ঠী" বলি — তাহা হইলে ইহাও অবাস্তব কল্পনা হয় না। ঋ. ১০/১১৪/৫ মন্ত্রের কল্পনা অর্থ ভাবের রূপায়ণ। ভাবের রূপায়ণকে ঋষিরা বলেন, 'বিসৃষ্টিঃ'। নাসদীয় সূক্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।'

ঋ. ১০/১৯০/৩ মন্ত্রে অঘমর্ষণ ঋষি বলিয়াছেন —

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।"

এখানেও কল্পনা অর্থ সৃষ্টি।

বিপ্র অর্থ যাঁহাদের হৃদয় ভাবের আবেগে কম্পমান। কবি কূ-ধাতু হইতে অর্থ আকৃতি বহনকারী। বেদে পরম দেবতা স্বয়ং কবি। ভাগবত শাস্ত্র প্রথম মন্ত্রে স্রষ্টাকে আদি কবি বলিয়াছেন। পরম দেবতার আকৃতি সৃষ্টির, সাধকের সেই আকৃতি দৃষ্টির। তাই ভক্ত ভগবান্ উভয়েই কবি।

দীর্ঘতমা ও সপ্ত্রি দুই ঋষি কবি একই কথা বলিয়াছেন।

বহু দেবতা একই স্বরূপের বিভূতি। বিভূতি অর্থ বিশেষভাবে হওয়া। স্বরূপতঃ বস্তুটি হইতেছে 'সৎ' 'একং সৎ'। 'সৎ' 'একং' হইয়াই বহুধা বিকল্পিত। গীতায় দশম অধ্যায়ে বিসৃষ্টি অর্থেই বিভূতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিজমুখেই বলিয়াছেন — ''বিভূতের্বিস্তরো মম''। গীতা দশম অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে বলিয়াছেন —''যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ'' তৎ তৎ আমারই তেজের অংশ হইতে জাত। 'মম তেজোঽংশসম্ভবম্'। প্রত্যেকটি বিভূতির মধ্যেই তাঁহার সত্তা বিদ্যমান। বৈদিক ঋষির ভাবনায় যে একদেবতা — অতি গভীরে তাঁহার দুইটি রূপ, একটি বিশ্বময় আর একটি বিশ্বোত্তীর্ণ। যাহা বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপ, তাহা 'একং সৎ'। যাহা বিশ্বোত্তীর্ণ তাহা 'একং তৎ'। 'একং তৎ' 'একং সৎ'-এরও অতীত, পরম মূল। অসৎ হইতেছে অব্যক্ত সৎ। এই অসৎ সত্তাহীন নহেন। অসৎ অব্যক্ত অনির্বচনীয়। সকল সত্তার মূল। সকল সতের মূলে আছেন অসৎ। ঋ.১০/৭২/২ মন্ত্রে বৃহস্পতি ঋষি পরম উল্লাসে জানাইতেছেন — 'অসতঃ সদজায়ত'। দেবগণের উৎপত্তির পূর্বতন কালে অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তু-তত্ত্ব আবির্ভূত হইল। ইহাতে কত যেন উল্লাস, ঋষি বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না।

'একং তৎ' বুঝাইতে শ্রীঅনির্বাণ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, আকাশে এক সূর্য তাহা যেন 'একঃ দেবঃ'। সেই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত আকাশ, তাহা যেন 'একং সৎ'। আকাশে কখনও আলো থাকে কখনও থাকে না। যখন কিছু থাকে না — নিরুপাধিক আকাশ 'একং তৎ'। এই অনুভব অসৎকল্প কিন্তু সতের অধিষ্ঠান। (বেদ-মীমাংসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮)

নাসদীয় সূক্তে (ঋ. ১০/১২৯) ভাবনা, যখন কিছুই ছিল না — সৎ না, অসৎ না, মৃত্যু নাই, অমৃত নাই। কোন লোক নাই, সলিল নাই, নাই বলিতে কিছু নাই, আছে শুধু অন্ধকারে ঢাকা গাঢ় অন্ধকার, ছিল শুধু 'স্বধয়া তদেকং' স্বরূপে স্থিত — আপনাতে আপনি স্থিত 'তৎ একং'। বায়ু নাই তবু শ্বাস বহিতেছিল। ইহা অসংখ্য নয়, অব্যক্ত — সৎ-এর ভিত্তিভূমি।

কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, অন্যান্য সকল দেবতা একই দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। অথর্ববেদে ১৩/৭/১৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন, ''তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্।'' অর্থাৎ, ''হে মঘবন্, তোমার মহিমা ঐ প্রকারই, তোমার তনুসমূহ শতশত, অপর সমস্ত দেবতা একজনেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।''

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩/৪) সাক্ষাৎভাবে তাহা বলা হইয়াছে —

''অগ্নির্বা এতা সর্বাস্তনো যদেতা দেবতা।''

ঋ. ১০/৮২/৩ মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমা বলিয়াছেন —

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

"যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যান্ত্যন্যা।।"

এই মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদেও আছে। কিঞ্চিৎ পাঠভেদে আছে। থাকিলেও তৃতীয় চরণের "যো দেবানাং নামধা এক এব" সর্বত্র একই।

কোন কোন ঋষি মনে করেন একই দেবতা অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। শ্রুত আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন (ঋ. ৩/৫/৪)—

"মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎ সমিদ্ধো
মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।"

ঋষি আবার বলিতেছেন, হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হও, এবং সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হও। সমস্ত দেবগণ তোমাতে অবস্থিত। তুমি হবির্গ্রহীতা ইন্দ্র। কন্যাগণের সম্বন্ধে তুমি অযথা হও। তুমি বহু গুহ্য নাম ধারণ কর।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩/৪) আছে — সেই অগ্নি যে প্রবেশ হইয়া দহন করে তাহা তাঁহার বায়ব্য রূপ। অগ্নি যে হৃষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে উঠেন তখন তাঁহার বৈশ্ব্যদেব রূপ। সুতরাং সমস্ত দেবতা অগ্নিরই রূপভেদ মাত্র।

কোন কোন ঋষি মনে করেন, কালভেদেই একই দেবতার বহু নামকরণ—

"স বরুণঃ সায়মগ্নিঃ স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্।

স সবিতা ভূত্বাহন্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্।"

আচার্য শৌনক মনে করেন, কর্মভেদেই দেবতার নামভেদ। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, "সর্বাণ্যেতানি নামানি কর্মতঃ।" (১/২৭)

সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে আচার্য কাত্যায়ন বলিয়াছেন — "কর্ম্মপৃথক্ত্বাদি পৃথগভিধানাঃ স্তুতয়ো ভবন্ত্যেকৈব বা মহানাত্মা দেবতা।" (সর্বানুক্রমণী, ১৩/৪) অর্থাৎ, কর্মের ভিন্নতা হেতুই স্তুতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে হইয়া থাকে। পরন্তু মহানাত্মা দেবতা একই।

পরব্রহ্মের একত্ব লইয়া আলোচনা চলিতেছে। কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, ঋগ্বেদেই ৩৩ জন দেবতার কথা আছে। ঋ. ১/৩৪/১১ মন্ত্রে হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন,

"আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং তং মধুপেয়মশ্বিনা"।

"হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রি-গুণ একাদশ দেবগণের সাথে মধুপানার্থ এখানে এস, আমাদের আয়ু বর্ধন কর।"

আবার ঋ. ৩/৬/৯ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন —

"পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব।"

"৩৩ জন দেবতাকে পত্নীগণের সাথে অন্নের জন্য আন।"

আবার মনু ঋষি ঋ. ৮/২৮/১ মন্ত্রে বলিতেছেন —

"যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।"

ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন।

এইরূপ ৩৩ দেবতার কথা আরও অনেক স্থলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ৩৩ দেবতার ১১ জন পৃথিবীতে, ১১ জন দ্যুলোকে ও ১১ জন অন্তরিক্ষে। এই কথা ঋ. ১/১৩৯/১১ মন্ত্রে পরুচ্ছেপ ঋষি কহিয়াছেন —

"যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সু ক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্।।"

— যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ, অন্তরিক্ষে একাদশ জন বাস করেন, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞসেবা করেন। এই ৩৩ জন ৩ জনেরই মহিমা, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য। অগ্নি পৃথিবীতে, বায়ু অন্তরিক্ষে ও আদিত্য দ্যুলোকে অবস্থিত। এই দেবতাত্রয় আবার এক দেবতারই রূপভেদ বা কার্যভেদ মাত্র।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২/১/৬/১) উক্ত আছে —

"প্রজাপতিরকাময়ত আত্মান্বন্মে, জায়েতেতি। সোজুযৎ তদাহ আত্মন্বদজায়ত অগ্নিবায়ুরাদিত্যঃ।"

প্রজাপতি কামনা করিলেন আমার আত্মরূপ উৎপন্ন হউক। তিনি যজ্ঞ করিলেন তাহাতে আত্মরূপ উৎপন্ন হইল। অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য। সুতরাং অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্রয় একজনেরই প্রকাশ মাত্র।

শাকল্য-যাজ্ঞবাল্ক্য-সংবাদে শাকল্য, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বারংবার একই প্রশ্ন করেন, "দেবতা ক'জন?" মহর্ষি বিভিন্নবারে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেন। দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬, ৩৩, ৬, ৩, ২, ১$\frac{১}{২}$, ও ১। শাকল্য প্রতিবারে তাহা স্বীকার করেন। এক সংখ্যায় পৌঁছিলে শাকল্য জিজ্ঞাসা করেন, সেই এক দেবতা কে? মহর্ষি বলেন —

"স ব্রহ্ম ত্যদিতি আচক্ষতে।"

তিনি ব্রহ্মই, তাহাকে ত্যৎ বলা হয় (শতপথ, ১৪/৬/৯/১০) বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ঐ শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ আছে (৩/৯/৯)। শাকল্য যখন বলিলেন, "এক দেবতা কে?" মহর্ষি বলিলেন — "প্রাণ ইতি বা ব্রহ্মেত্যাদিত্যাচক্ষতে।"

বেদের দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন, (নিরুক্ত, ৭/৫/১৪), "নিরুক্তকারদের মতে দেবতা তিনটি— অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। ইঁহাদের প্রত্যেকের বহু নাম। অথবা যেমন কার্যভেদ হেতু একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা বহুনামে অভিহিত হন— সেইরূপ একই দেবতা কার্যভেদ হেতু বহুনামে অভিহিত হন। ঐ দেবতাত্রয় একই পরম দেবতার রূপভেদ মাত্র। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে দেবতা একই। তিনি আত্মা বা ব্রহ্মই।

"স এষ মহানাত্মা সত্তালক্ষণঃ।
তৎ পরং তৎ ব্রহ্ম।"

বৈদিক দেবগণকে 'ইতরেতরজন্মা' বলা হয়। অর্থাৎ পরস্পরকে পরস্পরের কারণ বলা হয়। অর্থাৎ উহাদিগকে কর্মজন্মা বা কর্মভেদে উৎপন্ন বলা যায়। বস্তুত সকলেই আত্মজন্মা, তাই সকল দেবতা একই ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথর্ববেদ (১০/৭/২৭) বলিয়াছেন —

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশতদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।।"

দেবতা স্বরূপত এক, তাঁহার বিভূতি বহু। এখন বহুদেবতার সংখ্যা কত তাহা আলোচ্য। ঋ. ৩/৬/৯ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র বলেন, "ত্রিংশতং ত্রীং চ দেবা" দেবতার সংখ্যা ৩৩ জন। ঋ. ১/৩৪/১১ মন্ত্রে হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন, "ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতম্" — "ত্রিগুণ একাদশ দেব দেবগণের সাথে এস।" নিরুক্তকার যাস্কের মতো দেবতা তিন জন— পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র (বা বায়ু) ও আকাশে সূর্য। তিনটি ভূমির অনুরোধে দেবতা তিনজন। তারপর তাঁহাদের বিভূতিকে পর পর তিন বার দশগুণ করা হইয়াছে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়। তিনটি ভূমিতে তিন দেবতার ঐশ্বর্য বিস্তার বুঝাইবে।

আর এক দৃষ্টিতে বেদের মন্ত্রই দেবতার শরীর। প্রত্যেকটি মন্ত্রই ছন্দোময়। তিনটি ছন্দ প্রধান—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। গায়ত্রীর প্রত্যেক পাদে অক্ষর ৮টি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রত্যেক পাদে অক্ষর ১১টি, আর জগতী ছন্দে ১২ টি অক্ষর। ৮ +১১ +১২ = ৩১। ইহাতে পাওয়া যায় ৩১ জন দেবতা। অন্য এক দৃষ্টিতে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য ৮ +১১ +১২ = ৩১। বসু শব্দের অর্থ আধার শক্তি। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ আর নক্ষত্র ইহা লইয়া ৪, এবং অগ্নি বায়ু আদিত্য ও সোম — এই চারি লোকপাল — মোট আট। দশটি প্রাণ ও আত্মাকে লইয়া একাদশ রুদ্র। আর দ্বাদশ মাসের আদিত্য (সূর্যের) দ্বাদশ রূপ লইয়া দ্বাদশাদিত্য। বহু দেবতা যখন একেরই বিভূতি তখন সংখ্যায় কিছু যায় আসে না। একই চৈতন্য বহুধা বিচ্ছুরিত হইয়া বহু দেবতা সৃষ্টি।

দেবতারা থাকেন দেবলোকে। তিনটি লোক — পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ। পৃথিবী সর্বনিম্ন (অবম), দ্যৌ সর্ব-উচ্চ পরম, দুয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষ মধ্যম।

দেবতা এক আবার বিভূতি বহু। এঁরা সকলে আসিয়া একস্থানে মিলিত হন। কোন বিরোধ নাই, যে স্থানে সকলে একত্রে থাকেন সে স্থানের নাম 'সধস্থ'।

'সধস্থ' আপনার ধাম (ঋ. ৫/৬৪/৫)। সধ সহ বা একত্রে, স্থা অর্থ

থাকা। সকলে একসঙ্গে যেখানে থাকেন তাহাই সধস্থ। চিৎশক্তি সকলের এই সাযুজ্য এক অভিনব কথা। দেবতারা যখন সৎমাত্র তখন তাঁহারা স্বধা — আপনাতে আপনি থাকেন। তখন দেবতাদের সমাবেশ একই স্থানে দেখা যায়। স্বধা অর্থ আত্মরতি। পরমপুরুষ স্বধাবান্। দেবানাম্ অসুরত্বম্ও স্বধায়। সধাই সুধা। ত্রিসধস্থ — ত্রি লোকের দেবতা একস্থানে থাকেন। সাধকের দেহে তিনটি সধস্থ — মূর্দ্ধা, নাভি ও হৃদয়। যা ভাণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এই দেহেই সকল দেবতা অধিষ্ঠিত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন— "The body in here in the microcosm the mirror and the representative of the whole universe of macrocosm."।

বেদের একেশ্বরবাদ

মনে করুন আপনি একখানি বই পড়িতে পড়িতে তাহার মধ্যে একস্থানে পাইলেন, কলিকাতার সিমুলিয়ার দত্ত বংশের বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র বীরেশ্বর দত্ত। তাঁহার বুদ্ধি ও মেধাশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি হারবার্ট স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদের উপর লেখা একখানি বই-এর একটি অংশের কঠোর সমালোচনা করিয়া মন্তব্যটি স্পেন্সারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সমালোচনা পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বিনয়ের সহিত উত্তর দিয়াছিলেন হারবার্ট সাহেব।

আরেকদিন আরেকখানি বই পড়িলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী আমেরিকায় এক বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ম্যাক্সমুলর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কঠিন পরিশ্রম করিয়া ম্যাক্সমুলর ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ অংশতঃ করিয়াছিলেন।

দু'খানি বই পড়িয়া আপনার মনে হইল, বীরেশ্বর দত্ত ও বিবেকানন্দ দু'জন লোক। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, ইঁহারা একজন ব্যক্তিই। ভাল প্রমাণ না পাইয়া আপনি বিশ্বাস করিলেন না।

সেইরূপ বেদের অগ্নিসূক্ত পাঠ করিয়া আপনার মনে হইবে যে, বেদোক্ত দেবগণের মধ্যে অগ্নি সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার ইন্দ্রসূক্ত পাঠ করিলে মনে হইবে, ইন্দ্রই সর্বদেবতার মধ্যে রাজা। আবার বরুণসূক্ত পাঠ করিয়া মনে হইবে, বরুণ বিশ্বজগতের সকল স্থিতিগতির নৈতিক রক্ষাকর্তা। বরুণই দেবতার মধ্যে সম্রাট্। আপনার মনে হইবে, ইঁহারা তিনজন দেবতা। কিন্তু কোন বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি বলিবেন, ইঁহারা তিনজন নহেন, একজনই। বেদের বহু দেবতা মূলতঃ একজনই। ইহা বেদের মধ্যেই বহু স্থানে বলা হইয়াছে। 'একো দেবঃ' এই কথাটি বেদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে —

"মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ।।"

(ঋ. ১০/৫১/১)

'একো দেবঃ' কথাটি স্পষ্ট। ঋ. ১/১৫৪/৪ মন্ত্রে দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন —

''যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা।।''

আবার ঋ. ১০/১১৪/৫ মন্ত্রে সধ্রি ঋষি বলিয়াছেন —

''সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্ সোমস্য মিমতে দ্বাদশ।।''

আবার ঋ. ১০/৯০/২ মন্ত্রে নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন—

''পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।''

'একো দেবঃ' কথা বেদ শাস্ত্রে বহুস্থানে বলা হইয়াছে। ইহা হইল এক প্রকার সংকেত। আর এক প্রকার সংকেত হইল, 'একং সৎ'। মন্ত্রে দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন —

''ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।''

এই মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন, ইন্দ্র, মিত্র বা অগ্নি ও দ্যুলোকের সুপর্ণ, সকলেই সৎ স্বরূপের প্রকাশ।

'একং সৎ' এই মন্ত্রে সুস্পষ্ট। এইরূপ আরও বহু মন্ত্রে 'একং সৎ' উক্ত হইয়াছেন।

আর একটি সংকেত হইল 'একং তৎ'। ঋ. ১০/১২৯/২ মন্ত্রে প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন,

''ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।''
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।''

এই বিশ্বজগৎ শব্দটি প্রকাশিত হইবার পূর্বে অসৎকে বা অব্যক্তকে বলা হইয়াছে 'তদেকম্'। ''তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত না হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।''

পূর্বোক্ত এক যখন প্রকাশিত, তখন 'সৎ'; যখন অপ্রকাশিত তখন 'তৎ'। উপনিষদে বলা হইয়াছে অস্তিরূপ। এই অস্তিজ্ঞান চক্ষু দ্বারা হয় না। শুধু মনীষা দ্বারা হয়। সকল দেবতা এই সৎ-স্বরূপের বিভূতি। দেবতাদের ধরে সৎ স্বরূপে পৌঁছে যায়। আবার সৎ- স্বরূপ ধরে দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়।'' (বেদ-মীমাংসা, পৃষ্ঠা ২৫১) ঋষিরা একত্বে পৌঁছিয়াছেন বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বের প্রত্যক্ষ দর্শনে। পশুদের

মেরুদণ্ড মাটির সঙ্গে সমান্তরাল। মানুষের মেরুদণ্ড লম্বমান (Perpendicular) লম্ব হইয়া দাড়াইয়া মানুষ উপরের দিকে তাকাইতে শিখিল। তাকাইয়াই দেখিল এক সূর্য, এক আকাশ। এই দুইটি প্রত্যক্ষ দর্শনের পরেই মানুষের একত্বের জ্ঞান জন্মিল। বহু নক্ষত্র বহু বৃক্ষ লতা পাতা দেখিয়া বহুত্বের জ্ঞান। একের জ্ঞান ও বহুর জ্ঞান সমসাময়িক।

ঋ. ৭/৬৩/১ মন্ত্রে বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, ''সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্''।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের প্রায় সকলেরই ধারণা, ঋষিরা প্রথমে বহু দেবতার কথাই বলিয়াছেন। পরে অনেক শেষের দিকে একত্ব দেখিয়াছেন। অনেক পরে অর্থ দশম মণ্ডলে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এক সূর্য ও এক আকাশ দেখিয়া একত্বের জ্ঞান পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই মন্ত্র মণ্ডলে নহে, এই একত্বের কথা প্রথম মণ্ডলে (ঋ. ১/১৬৪/৪৬)। ঋগ্‌বেদকে মণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন অনেক পরে বেদব্যাস। পূর্বে কোন মণ্ডল-বিভাগ ছিল না। মন্ত্রগুলি ঋষি পরিবারগণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। মন্ত্রগুলি অপৌরুষেয়। এই মন্ত্র আগে, এই মন্ত্র পরে, এই পৌর্বাপর্য্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত।

তিনটি সংকেতের কথা বলিলাম, 'একো দেবঃ', 'একং সৎ', এবং 'একং তৎ'। বেদে বহুবার অসুর শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কোথাও অসুর অর্থ সুরবিরোধী নহে। ঐ অর্থ পুরাণাদিতে পরে প্রবেশ করিয়াছে। পুরাণে প্রায়ই অসুর অর্থ সুর-বিরোধী। বেদে অসুর অর্থ প্রাণ। এই প্রাণ-শক্তির দাতা অসুর (রা ধাতুর অর্থ দান)। প্রাণ-শক্তির দাতা এই অসুর কথার তাৎপর্য প্রাণশক্তিরই মূল উৎস। উপনিষদে প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। গীতায় একটি পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে যিনি বিশ্বজগৎ ধারণ করিয়া আছেন ''যয়েদং ধার্যতে জগৎ।'' নিখিল বিশ্বময় প্রাণশক্তি বিরাজিত। প্রাণশক্তির তরঙ্গেই বিশ্ব সঞ্জীবিত। এই প্রাণশক্তির যাহা মূল তাহাই অসুরত্ব। ''অসুরত্বম্ একম্''।

গৃৎসমদ ঋষি দ্বিতীয় মণ্ডলের আরম্ভে বলিয়াছেন — ''অগ্নিই মূল; তাহা হইতে বিশ্বে যাহা কিছু প্রকটিত। কয়েকটি সূক্তেই এই কথা। চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ঋষি ইন্দ্র সম্বন্ধে বহু সূক্তের এইরূপ একই কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রই মূল — বিশ্বে যাহা কিছু তাহা হইতে। গোতম ঋষি বলিয়াছেন (ঋ. ১/৮৯/১০) অদিতিই সব। অদিতি হইতে নিখিল বিশ্বের যাহা কিছু সবই প্রকাশিত। তৃতীয় মণ্ডলে প্রজাপতি ঋষি ৫৫ সূক্তে মূল এক দেবের কথা যে অভিনবভাবে বলিয়াছেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রীঅনির্বাণ বলেন, ''সকল দেবতার রাহস্যিক সংজ্ঞা 'অসুর'। 'অসুর' অর্থ

দেবই। সুরবিরোধী অসুর, এই অর্থে অসুর শব্দেরপ্রয়োগ সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। 'অসু' শব্দ হইতে 'অসুর'। অসু শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রাণ, জার্মান দার্শনিক বার্গসনের elan-vital। রা-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা, প্রাণকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই অসুর। অসুরত্ব অর্থ প্রাণশক্তির যে উচ্ছলতা তাহার দাতৃত্ব।

সকল দেবতাগণের (ঋ. ৩/৫৫ মন্ত্রে) সমষ্টি দেবতা বিশ্বদেবগণ-মধ্যে একটি মহৎ বস্তু আছে তাহা হইল অসুরত্ব। প্রাণের উদ্বেলতা দানকারিত্ব। যেখানে প্রাণ সুপ্ত সেখানে প্রাণ জাগাইয়া তোলে সে। জড়বস্তুর মধ্যেও প্রাণ আছে সুপ্ত নিদ্রিত। সেই শক্তিকে যে জাগ্রত করিয়া চৈতন্যময় করিয়া তোলে — সেই সত্তাকে নাচাইয়া তুলিবার সামর্থ্য একটিই। তাহা সকল দেবতাতেই আছে। অথবা ঐ শক্তির বিদ্যমানতাই তাহাদের দেবত্বের মূল হেতু । এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেবতাই এক। এই অসুরত্বে, শক্তির একত্বে নিখিল দেবতাই এক। ইহাই মূল বস্তু 'একং তৎ'।

আর এক দৃষ্টিতে 'অসু' শব্দে বরুণ বুঝায়। বরুণ শূন্যতার দেবতা। শূন্যত্ব, সকল যেখানে শেষ, সেখান হইতে সকলের আরম্ভ। যাহা অনির্বচনীয় অব্যক্ত তাহাই 'তৎ'।

এই সূক্তে ঋষি প্রাপ্তপরম্পরার মধ্যে ঐক্যের অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দেবগণের সকল কার্যের একতা ও সকল ঐশ্বর্য-বলের ঐক্য প্রকাশ করিতেছেন। ঋষি এই সূক্তে ৪র্থ ঋকে বলিয়াছেন, অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন। ৫ম ঋকে বলিয়াছেন, তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন। ৬ষ্ঠ ঋকে বলিয়াছেন, সূর্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়া পূর্বদিকে উদিত হন; ৭ম ঋকে বলিয়াছেন, আকাশে বিচরণ করেন; ভূমিতে বাস করেন ১১শ ঋকে বলিয়াছেন, দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে; ১২শ ঋকে বলিয়াছেন, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রসদান করিতেছে এবং ১৭শ ঋকে বলিয়াছেন, যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হইতেছে, সে নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হইতেছে; ১৯শ ঋকে বলিয়াছেন, একই নির্মাণকর্তা মনুষ্য ও পশুপক্ষীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ২২শ ঋকে বলিয়াছেন, তিনি শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টিদান করেন ও ধনধান্য উৎপন্ন করেন।

বিশ্বের অনন্ত কার্য-পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে স্তুতি করা হয়। সে কার্যসমূহ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের দৈব ক্ষমতা ও ঐশ্বরিক বল একই। ''মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'' কথার অর্থ সায়ণ বলেন, ''দেবানাম্ একং মুখ্যম্ অসুরত্বম্ .... প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যম্।''

"একত্বের এই পটভূমি না থাকলে সৃষ্টির বহুবর্ণ রূপের বৈচিত্র্য ফুটত না। বহুর বৈচিত্র্য যে প্রতীয়মান হয় তা কেবল একত্বের পটভূমি আছে বলেই।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ১৯৭)

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে *The Secret of the Veda* (p.547) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The self-luminous One is the goal of the Aryan-minded: therefore the seers worshipped him in the image of the Sun. One existent, him have the seers called by various names, Indra, Agni, Yama, Matarishawn."

শ্রীঅরবিন্দের লেখনীর আলোকে— "অগ্নি হইল ভগবানের ইচ্ছাশক্তি" (illuminated mentality)। 'গো' হইল জ্ঞানের দীপ্তি, 'উষা' হইল মানবমনের প্রজ্ঞা-দীপ্তির প্রথম উদয় (Dawn of illumination in the human mind)। অদিতি — অখণ্ডতা, অনন্ততা (Infinity)। 'সোম' হইল দেবতার অমৃত, ভাগবত আনন্দ-মদিরা, স্বর্গের সুধা 'তৎ যৎ অমৃতম্ সোমঃ।" এই অর্থগুলি শ্রীঅরবিন্দ ভাষাতত্ত্বের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন নাই, বেদশাস্ত্রে গভীর অর্থানুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৈদিক সত্যগুলি জানিতে হইবে মন দ্বারা, মনীষার দ্বারা ও হৃদয়ের দ্বারা। ('হৃদা মনসা মনীষা', ঋ. ১/৬১/২)।

মন দিয়া জানিলে ব্রহ্ম দেবতা, মনীষার দ্বারা জানিলে 'একং সৎ', আর হৃদয়ের দ্বারা জানিলে 'একং তৎ'। এই পথেতেই সৎ-এর উৎপত্তি। তৎকে কখনও অসৎ বলা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি। ঋষি একটি বটের বীজ ভাঙ্গিয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। একটি নারিকেল গাছ। তাহার বয়স ৫০ বৎসর। এই ৫০ বৎসর সে অন্তত দশ হাজার নারিকেল দিয়াছে। ইহা হইল সৎ। আর 'তৎ' কথার অর্থ নারিকেলের ভিতরে জাত যে অঙ্কুর (ফোঁপল) থাকে তাহা হইতে নারিকেল গাছের উৎপত্তি। প্রথম অবস্থায় নারিকেলের মধ্যে শুধু জল থাকে, মধ্য অবস্থায় নারিকেলের মালার মধ্যে একটা সুন্দর খাবার থাকে। তখন ফোঁপল দেখা যায় না। তারপরে কোথা হইতে ফোঁপলের উৎপত্তি হয়। এই ফোঁপলের অস্তিত্ব ছিল তৎকালে অব্যক্ত। তাহা হইতেই নারকেল গাছ জন্মিয়াছে তাহা সৎ। নারিকেলের ফোঁপলের মধ্যে যে 'Potentialities' ছিল যাহার ফলে দশ হাজার নারকেলের সৃষ্টি হইয়াছে উহাই 'তৎ'।

ঐ Potentiality-কে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতেপাই না। ফোঁপলের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে তাহা আমরা ভাবনা বা ধ্যানের

দ্বারা বুঝি না। উহার ক্রিয়াকারিত্ব কিছু কিছু দেখি। ফোঁপলটা বড় হইয়া নারকেলের ভেতরটা ভরিয়া দেয়। নারিকেলের যে শাঁসটি আমরা খাই সেইটি ফোঁপল খাইয়া ফেলে। তারপর শক্ত মালাইটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ছোবরাটাকে ছিড়িয়া মাথা তোলে। তখন রৌদ্র জল বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই অব্যক্ত 'তৎ' সম্বন্ধে প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন, 'স্বধয়া তদেকম্'। (ঋ. ১০/১২৯/২) তিনি ছিলেন স্বদেহে 'তৎ'।

'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি'। এই কামনার কথা উপনিষদে বলা আছে বিস্তারে। "সোঽকাময়ত।" এই 'তৎ'-এর রহস্য যিনি প্রভুস্বরূপে বিদ্যমান তিনি জানেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

"যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।"
(ঋ. ১০/১২৯/৭)

তিনি অনন্তানন্তময় কিনা তাই নিজেকে নিজে আস্বাদন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। 'তৎ' শব্দের নিজভূমি ওঙ্কার। ওঙ্কারের মধ্যে 'তৎ'। মনে হয় ইহাই শঙ্করের 'কূটস্থ', ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের 'শূন্য'।

বৈদিক সাহিত্যে একত্ব ও বহুত্বের আপাত-বিরোধিতা ও সমাধান।

বেদশাস্ত্রে ভাব, ভাষা ও তাৎপর্য একটি রহস্যময়তার আবরণে ঘেরা। গুরু-শিষ্য সংবাদ, ঋষিদের আলাপন, তর্কযুদ্ধ ইত্যাদিতে বহু প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া এই রহস্যময়তার আবরণ কিঞ্চিৎমাত্র উন্মোচিত হয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া শাস্ত্র-রহস্য উন্মোচনের আর কোন পথ থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদটি পুনঃ বিস্তার করিয়া স্মরণ করিতেছি।

বিদগ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিতেছেন পরম প্রাজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যকে — "হে যাজ্ঞবল্ক্য, বেদে দেবতা কত জন?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন — "নিবিদে আছে দেবতা ৩০৩ ও ৩০০৩ জন" (ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি)।

শাকল্য — হ্যাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ?)
যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, তেত্রিশ জন। (ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইত্যোমিতি)
শাকল্য — হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্য — ছয় জন (ষড়িত্যোমিতি)।
শাকল্য — হাঁ, ঠিক কতজন? (কত্যেব দেবা যাজ্যবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্য — তিন জন। (ত্রয় ইত্যোমিতি)

শাকল্য — হাঁ, দেবতারা ঠিক কত জন (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্য — দুইজন। (দ্বাবিত্যোমিতি)
শাকল্য — হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্য — দেড়জন। (অধ্যর্ধ ইত্যোমিতি)
শাকল্য — হাঁ, ঠিক কত জন? (কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি?)
যাজ্ঞবল্ক্য — একজন। (এক ইত্যোমিতি)

দেবতা একজন কিংবা বহুজন। এক যদি হন, তবে বহু হইতে পারেন না; যদি বহু হন, তবে এক হইবেন কিরূপে? ইহা এক গভীর প্রশ্ন।

এশিয়ায় বিদ্যমান ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে দ্বিবিধ চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের বলা হয় সেমেটিক (Semitic) ও এরিয়ান (Aryan)।

অভিধান মতে Semitic অর্থ 'descended from shem, including Hebrew, Arabic and Syriac,' অর্থাৎ ইহুদী আরব প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধীয়; এবং Aryan অর্থ belonging to race using an Aryan language — আর্য ভাষা বলে এই জাতীয় লোক।

বাইবেলের দুই ভাগ *Old Testament* ও *New Testament* । যাঁহারা *Old Testament* -এর অনুগামী তাঁহারা ইহুদী (Jew)। আর যাঁহারা *New Testament* -এর অনুগামী তাঁহারা ক্রীশ্চান বা খ্রীষ্টান। জ্যু, খ্রীষ্টান ও পরবর্তী ইসলাম ধর্মমত — এই তিন ধর্মমতকে বলা হয় সেমিটিক। বৈদিক ও বৌদ্ধ ধারা প্রভৃতি সব Aryan বা আর্য। এই দুই ধারার মধ্যে বহুপ্রকার পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্য একত্ব ও বহুত্ব লইয়া। যাঁহারা সেমেটিক তাঁহাদের বিশ্বাস, একত্ব ও বহুত্ব পরস্পর বিরোধী। ঈশ্বর এক, সুতরাং তিনি বহু হইতে পারেন না; আর আর্যচিন্তায় এক আর বহু বিরোধী নহে।

এক ঈশ্বর আছেন, সুতরাং অন্য দেবতা নাই, ইহাই ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মর্মগত বিশ্বাস। কিন্তু বৈদিক ধারায় এক আর বহু দেবতায় কোন বিরোধিতা নাই। তাঁহাদের অনুভব একের ভাবনা বহুকে লইয়া, বহুকে বাদ দিয়া নহে। বৈদিক ভাবনায় বহুদেবতা একই ঈশ্বরের প্রকাশ বা মহিমা। এক আর বহু পরস্পর বিরোধী (contradictory) নহে। বহু একেরই বিভূতি। ভূতি অর্থ হওয়া। বিভূতি অর্থ বিশেষ কিছু হওয়া।

পূর্বোক্ত উপনিষদের আলোচনায় আমরা দেখিলাম দেবতাদের সংখ্যা কত এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন— ৩০৩ ও ৩০০৩ জন। তাহার পর নানা রকম উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মনে ইহার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। একটি বৃক্ষ; তাহার কাণ্ড একটি, তাহার স্কন্ধ দুইটি, শাখা শত শত, প্রশাখা সহস্র সহস্র, পত্র লক্ষ লক্ষ। এই বহুত্ব ও একত্বের মধ্যে

যেমন কোন বিরোধিতা নাই সেইরূপ। একই বৃক্ষের জন্য শিকড়ও আহার্য আহরণ করে, পত্রেরাও আহার্য তৈরী করে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন দেড় জন বলিলেন — তখন মনে হয়, শক্তি ও শক্তিমান্ বলিয়াছেন। শিকড় ও পত্র পরস্পর পরস্পরকে পুষ্ট করে। সুতরাং এক ও বহুর মধ্যে বিরোধিতা কোথায়? যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "দেবো দানাদ্ বা। দীপনাদ্ বা। দ্যোতনাদ্ বা। দ্যুস্থানো ভবতীতি বা" বিশ্বভুবনই আলোর প্রকাশ। অনন্তের প্রকাশ। একই শক্তি বিশ্ব-জগৎকে প্রকাশ করিয়াছে। আবার বহুর মধ্যে একই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন —"They manifest the cosmic and are manifest in it."।

একই ইচ্ছা করিয়া বহু হইয়াছেন, আবার বহুর মধ্যে একই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। তাই ঋষিরা বলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', আবার বলেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

একই সর্ব, আর সর্বই এক। গঙ্গার স্রোতোধারা ধরিয়া যদি প্রয়াগ হইতে উৎসের দিকে যাত্রা করি তাহা হইলে একটি ধারা পাওয়া যাইবে। যদি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করি তাহা হইলে দেখা যাইবে একটি ধারা বহু শাখা নদী, নালায় বিভক্ত হইয়া বিরাট রূপ পরিগ্রহ করতঃ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। একই বহু হইয়াছেন আবার বহু প্রকাশের মধ্যে একই বিরাজমান আছেন, তাইতো ঋষিদের বাক্য "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা" এবং "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" (কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপঃ, ২/২/১২)।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যাঁহারা গত দুই শতাব্দী বেদাদিশাস্ত্র লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই ঋষি-ভাবনায় যে একত্ব-বহুত্বের সমাধান তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তি কি একেশ্বরবাদ, নাকি বহু ঈশ্বরবাদ ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বৈদিক চিন্তাধারায় Polytheism ও monotheism-এর মধ্যে যে মূলগত ব্যবধান তাহা তাঁহাদের রক্তের মধ্যে নিদারুণভাবে বিদ্যমান। ম্যাক্সমূলার দিশাহারা হইয়া Henotheism বা Kethenotheism এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সৃষ্টি করিয়া বৈদিক একত্ব বহুত্বের সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তিনি যে আবার প্রবেশ করিতে পারেন, ইহা পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলদের মনে কিছুতেই প্রবেশ করে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য কিছুতেই তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির এই বাণী তাঁহাদের নিকট একটি প্রহেলিকার মত। এক যদি বহুর মধ্যে প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে

অনুস্যূত হইয়া থাকেন তাহা হইলে একত্ব-বহুত্বের দ্বন্দ্ব কোথায় থাকে? বৈদিক সৃষ্টি যে একটি কুম্ভকারের মত বা ইঞ্জিনের মত নহে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। বৈদিক সৃষ্টি কবির সৃষ্টির মত। ইহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই যে তিনি অনুস্যূত, ইহা যাঁহারা বৈদিক ভাবনার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট নহেন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না।

বৈদিক ঋষি চিত্তে যে একত্ব-বহুত্বের অভূতপূর্ব সমাধান তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬/১১ মন্ত্রটি অনুধাবনীয়।

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।"

কঠোপনিষদের ২/২/১২ মন্ত্র --

"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।"

উপনিষদের উক্তি দিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, উপনিষদ্ ও সংহিতার মধ্যে একটি বিরুদ্ধতা আছে। সংহিতার মতের বিরুদ্ধে উপনিষদ্ উক্তি করিয়াছেন --- এইসব কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কোনও সমালোচনা না করিয়া একটি কথা বলিলে যথেষ্ট যে, উপনিষদ্ সংহিতার বিরোধী — এই উক্তি নিতান্তই হাস্যাস্পদ। কাণ্ব ঋষি ঋ. ৮/৫৮/২ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।।"

"এক অগ্নি বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন। এক উষা এ সকলকে প্রকাশ করেছেন। এ একই সর্বপ্রকার হয়েছেন।"

বাক্ ঋষি ঋ. ১০/১২৫/৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

"অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব।।"

"আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।"

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে যে কোন স্থিরবুদ্ধি লোক বুঝিতে পারেন যে, একত্ব ও বহুত্ব সম্বন্ধে সংহিতার মত ও উপনিষদের মত হুবহু এক। বিরোধিতার বিন্দুমাত্র স্থান নাই।

বৈদিক ঋষির দিব্য দৃষ্টিতে এক ও বহুর মিলনাত্মক রূপটি প্রকটিত; যথা, ঋষি গভীর ধ্যানে সমাধি স্তরে ধ্যান-তন্ময় নেত্রে অন্তরে দেখিতে পান, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। আবার চক্ষু মেলিয়া দেখেন বিশ্বজোড়া বহুত্বের সমাবেশ। বৈষ্ণব কবি, শ্রীরাধার চক্ষু বন্ধ করিয়া ও চক্ষু খোলা রাখিয়া একই কৃষ্ণকে দর্শনের মধুর বর্ণনা করিয়াছেন —

"যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিলে দেখি শ্যামে।"

ঋষি দর্শন করিয়া ধন্য হয়েন, সকল বস্তুর মধ্যে একই ইষ্টদেবতার প্রকাশ, আলোর মধ্যে তাঁহাকে প্রকট দেখা যাইতেছে। বায়ুর মধ্যে তাঁহারই দেওয়া প্রাণের অভিব্যক্তি। অগ্নির মধ্যে তাঁহারই তপস্যার ঔজ্জ্বল্য। সর্বভূতে ঈশ্বরের অনুভবে হৃদয় তাঁহার আনন্দপূর্ণ। তাইতো ঋষি নিঃসংশয়ে বলিয়াছেন — "সর্বম খলু ইদং ব্রহ্ম।" "ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং" — সকল কিছু আচ্ছাদিত করিয়া সেই এক ঈশ্বর বিরাজিত।

অদ্বৈত বেদান্তের সাধনায় সিদ্ধপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য অনুভব সর্বজন পরিজ্ঞাত। এই তত্ত্ব আধুনিক ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের মাধুর্যমণ্ডিত দিব্য অনুভূতির স্পর্শে উজ্জ্বল, আরাধ্য দেবতাকে প্রাণের অন্তরতম রূপে প্রাপ্তিতে এবং জগতে বহুত্বের মধ্যে সেই একের অনুভূতিতে। যথা,

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।"

কান্ত কবির ভাষায় —

"আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে।
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে।"

যিনি অন্তরতম তাঁহাকেই সর্বত্র দেখিতেছেন। ইহাই দিব্য দৃষ্টি বা ঋষি দৃষ্টি।

পূর্বে বলা হইয়াছে বহুত্ব একত্বের বিভূতি। বিভূতিগুলি সেই এক-এর ইচ্ছায় প্রকাশিত এবং তাঁহারই সেবায় রত। বৈষ্ণব কবির ভাষায়, ঈশ্বর একজন, আর সব তাঁহার বিভূতি, প্রকাশ এবং তাঁহারা ঈশ্বরে সেবাপরায়ণ, সকলেই তাঁহার ভৃত্য

"একেল ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে করে তৈছে নৃত্য।।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ৫)

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে একদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া দেখেন, অসংখ্য ফুল ফুটিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মনে হইল বিশ্ব প্রকৃতি ফুল সম্ভারে আরাধ্য দেবতা বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিতেছে।

অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় প্রকৃতির প্রকাশসমূহ এক আরাধ্য দেবতারই পূজারী। একেরই বহুবিধ প্রকাশ, বহুভাবে একেরই সেবা-পরায়ণ। পদ্ম ঊর্ধ্বে মুখ তুলিয়া ধ্যানাবিষ্ট, কুন্দলতা তাঁহার চরণ পাইবার আশায় হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, শেফালী ফুল বিছাইয়া তাঁহার বসিবার আসন প্রস্তুত করিয়াছে। ফলভারে নত বৃক্ষ প্রণতি জানাইতেছে বিশ্বেশ্বরকে, যেন তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত না হয়। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি দেবী বিবিধ সম্ভারে তাঁহার সেবা করিয়া সৌন্দর্যময়ী হইয়া বিরাজিত আছেন।

একটু মনোযোগ সহকারে চক্ষু মেলিয়া ধীরে ধীরে পাঠ করিলে দেখিতে পারা যায় যে, বেদ-সংহিতার ঋষি বহু দেবতার কথা বলিতে বলিতে বহুবার উক্তি করিয়াছেন 'একং সৎ' ও 'একং তৎ'। ইহা পুনঃ উদ্ধৃতির বাহুল্য হইতে বিরত হইলাম। কিন্তু প্রজাপতি ঋষির একটি বিশিষ্ট মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। ঋক্-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সূক্তটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে একত্ব-বহুত্বের একটি অভূতপূর্ব সমাধান পরিলক্ষিত হয়। এই মন্ত্রের দেবতা বিশ্বদেবগণ সূক্তটিতে মোট ২২টি মন্ত্র আছে। সূক্তটিতে উষা, সূর্য, অগ্নি, সোম, মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি দেবগণের কথা ও তাঁহাদের মহিমার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সকল দেবগণের শক্তি এক। সকল দেবশক্তির একত্ব প্রতিপাদন হেতু এবং উহার বারংবার উল্লেখে সংশয়রাহিত্য হেতু সূক্তটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং সবিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত। ঋষি উপলব্ধি করিয়াছেন দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নহে। তাঁহাদের দৈবী ক্ষমতা বা ঐশ্বরিক বলের মধ্যে পৃথক্ত্ব কিছু নাই। সকলের মধ্যে যে চৈতন্যশক্তি তাহা এক। সকল দেবগণের একত্ব ও তৎ শক্তিসমূহের অভিন্নত্ব ব্যক্ত করার ফলে এই সূক্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।" অসুরত্ব শব্দটির তাৎপর্য আলোচনীয়, অসুর বলিতে স্বভাবতই মনে হয় সুরবিরোধী, অর্থাৎ দৈত্য বা দানব।

অসুরত্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য—অসু শব্দের অর্থ প্রাণ। আমরা চলিত কথায় বলি 'তিনি গতাসু হইয়াছেন' — অর্থাৎ তাঁহার প্রাণটি বাহির হইয়া গিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, "গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ", এই ক্ষেত্রেও অসু অর্থ প্রাণ।

গীতায় ভগবান্ অসু শব্দকে প্রাণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অসু অর্থ প্রাণ পাওয়া গেল। (অসু- শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় র-যোগে অসুর শব্দ নিষ্পন্ন)। অসুরত্ব হইল প্রাণের সার। প্রাণের সার হইল চেতনা। যখন প্রাণের চেতনা নাই — তখনই আমরা বলি গতাসু। প্রাণের মূল হইল চৈতন্য। অসুরত্ব অর্থ চৈতন্য। মহৎ অসুরত্ব অর্থ পরম চৈতন্য। সকল দেবতাগণের মহৎ অসুরত্ব এক। ইহাতে বুঝাইল সকল দেবতাগণের পরম চৈতন্য বস্তুটি একই, বহু নহে। অসুন্ রাতি ইতি অসুর। রা ধাতু অর্থ রক্ষা করা। আমাদের প্রাণশক্তিকে যিনি রক্ষা করেন তিনি — চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নহেন।

দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্। অর্থাৎ সকল দেবতাগণের মধ্যে প্রাণকে ধরিয়া রাখিয়াছেন যে শক্তি, তিনি চেতনা শক্তি , তিনি এক। এক চেতনা-শক্তির দ্বারা বিধৃত জীব মানব সকল কিছু। মহৎ দেবানাম্ এই মহৎ শব্দটি দেবানাম্ শব্দের বিশেষণ নহে। সকল দেবগণের মধ্যে যে মহান্ চৈতন্য-শক্তি তাহা একই, দুই নহে। জীবগণের মানবগণের ও দেবতাগণের মধ্যে যে মহান্ চৈতন্য শক্তি তাহা একটিই। সায়ণ বলিয়াছেন, একম্ মুখ্যম্ অসুরত্বম্ মহৎ ঐশ্বর্যম্। Wilson বলিয়াছেন — "Great and unequalled is the might of the Gods." Max Muller বলিয়াছেন— "The great divinity of the Gods is one. Muir অর্থ করিয়াছেন — "The divine power of the Gods is unique"।

ঐ মন্ত্রাংশটিতে বৈদিক দেবগণের একত্ব ও বহুত্বের সমাধান অতুলনীয় ও সর্বজনগ্রাহী।

পুরুষ-সূক্ত

ঋগ্বেদ, ১০/৯০।।

উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম, সংহিতাতে তিনি পুরুষ। তিনি সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট। উপনিষদে ''তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'' যজ্ঞই সৃষ্টির মূল কারণ। পরম পুরুষ এই বিরাট বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে আত্মাহুতি দিয়া এই বিশাল সৃষ্টিকর্ম চালু রাখেন। কোন মহৎ কার্যই আত্মবিলোপ ছাড়া হয় না। তিনি পুরুষ, এই সৃষ্টির মধ্যে আত্মদান করিয়াও ফুরাইয়া যান নাই। তিনি পূর্ণ তাই ফুরাইয়া যান না। এই সকল কথা যজ্ঞতত্ত্ব প্রসঙ্গে পূর্বে কিছু আলোচিত হইয়াছে।

সর্বদা অনুস্যূত আছেন, আবার তদতিরিক্ত হইয়া বিরাজমান আছেন। এই মাটির জগতের সঙ্গে এক হইয়াও তিনি চিন্ময়ত্ব হারান না। ইহা একটি প্রাগৈতিহাসিক তথ্য নহে — নিত্য কথা। বর্তমানকালে সংকলিত তত্ত্ব। সৃষ্টি-স্থিতি লয় নিরন্তরই চলিতেছে।

পুরুষ-সূক্তের মূলতত্ত্বগুলি চারিটি বেদেই পাই। যেমন ঋগ্বেদে ১০/৯০ সুক্ত, যজুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ের ১-৬ মন্ত্র, সামবেদে ৬১৭-৬২২ মন্ত্র অথর্ববেদে ১৯ কাণ্ডে ষষ্ঠসূক্তের ৪র্থ মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি প্রায় অবিকল একই প্রকার। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের আলোচ্য এই ৯০তম পুরুষ সূক্তটিতে মোট ১৬টি মন্ত্র রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা বারংবার উদ্ধৃত এই পুরুষ-সূক্তটির এই স্তবের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়াছে সৃষ্টি-যজ্ঞের কাণ্ডকারখানা। নিখিল বিশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াই ইহার যে সর্বাঙ্গীণ কাণ্ডকারখানা তাহা বিস্ময় জাগায়।

পুরুষ-সূক্তের প্রথম মন্ত্রে নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন,

> ''সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
>
> স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।'' (ঋ. ১০/৯০/১)

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

একটি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, যিনি সহস্র সহস্র মস্তক, চক্ষু ও চরণ বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত ভূমিকে আবরণ করিয়া বাহিরে দশাঙ্গুল পরিমাণে অবস্থান করেন।

পূর্বে বলিয়াছি — আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ঋগ্বেদ-সংহিতার সহিত উপনিষদের মন্ত্রগুলির যেন কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই সূক্ত পড়িলে মনে হইবে, শ্রুতির অনেক কথা উপনিষদের পরিপুরক।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১৪-১৬ মন্ত্রে একই কথা বলিয়াছে,

''সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।''

সহস্র শব্দ শত সংখ্যার দশগুণ হয়। সহস্র অর্থ অসংখ্য। সেই পুরুষের মস্তক অসংখ্য, নয়ন অসংখ্য, চরণ অসংখ্য। এই সংসারে অসংখ্য জীবের অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য চরণ, উহা সব তাঁহারই। সকলের বুক, মস্তক, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা কিছু সব তাঁহারই।

মনে কল্পনা কর্ষিত ক্ষেত্রে অসংখ্য ধানের বীজ রহিয়াছে। একদিন বৃষ্টি-পাতের সঙ্গে সঙ্গে সব অঙ্কুরিত হইল। সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় জীবগণ তাঁহার মধ্যে অব্যক্তভাবে ছিল। হঠাৎ এক মুহূর্তে সব ব্যক্ত হইল। তখন সূক্ত বলিলেন, বিশ্বের সমুদয় জীবের শির, মুখ, বাহু, ইন্দ্রিয়, উরু, পাদ অগণিত সংখ্যায় তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন এই পুরুষেরই দর্শন। অর্জুন বলিয়াছেন, ''অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।'' শ্রীভাগবতে

''সহস্রোর্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্।।'' (ভাগবত, ২/৫/৩৫)
''তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি।।'' (ভাগবত, ২/৬/১৫)
উক্ত শ্লোকার্ধদ্বয় এই কথাই বলিয়াছে।

গীতায় এই কথাই দশম অধ্যায়ে ভাষণ দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ 'তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং' — একস্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখা। ইহাতে বুঝা গেল নিখিল বিশ্ব তাঁহাতেই বিরাজিত। পুরুষসূক্ত আর একটি নূতন তথ্য খবর দিয়াছেন — 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।' এই পুরুষ কেবল বিশ্বময় নহেন, বিশ্বাতীতও। বিশ্বকে সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্গুল পরিমাণে বিরাজমান আছেন। এই দশাঙ্গুলিকে ভাগবত ২/৬/১৪ শ্লোকে এক 'বিতস্তি' বলিয়াছেন। আমরা বাংলা ভাষায় যাহাকে 'বিঘত' বলি তাহারই সংস্কৃত নাম 'বিতস্তি'। পুরুষ তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেহকে প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও দশাঙ্গুলস্থানে বিরাজিত আছেন। দশ শব্দটি পূর্ণতাজ্ঞাপক । তিনি বিশ্বের মধ্যে পূর্ণভাবে আছেন, বিশ্বের

বাহিরেও পূর্ণভাবে আছেন। তিনি পূর্ণভাবে বিশ্বগ ও বিশ্বাতীত। বিশ্বের বাহিরে যাহা তাহা স্থানবাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশিত নহে। কোন পরিমাণবাচক শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না। সুতরাং দশাঙ্গুল বলাও যা দশ সহস্র মার্গ বা পথ বলাও তাহা। এইজন্য বলিয়াছি দশ শব্দ পরিমাণবাচক শব্দ নহে, পূর্ণতাবাচক শব্দ।

দশাঙ্গুল শব্দের অন্য এক প্রকার অর্থ করেন আচার্যপাদগণ। পরম-পুরুষ বিশ্বে থাকিলেও তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। গীতার ভাষায়—

> ''ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।'' (গী. ১৮/৬১)

শ্রুতি বলিয়াছেন — অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অন্তরাত্মা- পুরুষ আছেন সর্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। তিনি জ্ঞানাধীশ। তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় হৃদয় দ্বারা। তাঁহাকে জানার অর্থ অমৃতত্ব লাভ করা।

তিনি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং রবিতুল্য রূপশালী একথা এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই আরও একবার বলা হইয়াছে (৫/৮)। কঠশ্রুতিতে দুইবার এই কথা আছে। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ' (২/১/১৩)।

এই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষের স্থান হৃদয়াকাশ-পুরীতে। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রত্ব নিরূপণের এক অধিকরণ আছে। তাহাতে দুইটি সূত্র—

১। ''শব্দাদেব প্রমিতঃ।।'' ১/৩/২৪

২। ''হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।।'' ১/৩/২৫

শ্রুতিতে শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠমাত্র। বস্তুতঃ পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী, তথাপি উপাসকের অন্তরে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান আছে। আপত্তি হইতে পারে যে, সকল জীবের হৃদয়েই তিনি আছেন — সকল অন্তরের স্থান তো সমান নহে। উত্তর দিতেছেন 'হৃদ্যপেক্ষয়া' এই সূত্রে। মানুষের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানুধ্যানে মানুষেরই অধিকার বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের কথা কঠশ্রুতিতেও আছে।

তন্ত্রশাস্ত্র দশাঙ্গুলির অন্য প্রকার অর্থ করে। যাঁহারা তন্ত্রসাধক, তাঁহারা গুরূপদেশে দৃঢ়সাধনা দ্বারা মূলাধারচক্রে অবস্থিত 'কুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দৃঢ়-অভ্যাস ও সাধনাবলে তাঁহাকে ক্রমশ মূলাধাব হইতে স্বাধিষ্ঠানে, তথা হইতে মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধি চক্রের মধ্য দিয়া ললাটদেশে স্থিত আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত উন্নীত করেন। গুরূপদেশ এবং সাধকের প্রচেষ্টার গতি এই পর্যন্ত। আমাদের সমগ্র দেহ পঞ্চভূতে বিনির্মিত হইলেও ক্ষিতিতত্ত্বের কেন্দ্রীভূত অধিষ্ঠান স্থান মূলাধারে; অপ্ তত্ত্বের উক্তরূপ

অধিষ্ঠান লিঙ্গমূলে বা স্বাধিষ্ঠানে; তেজস্তত্ত্বের অবস্থান নাভিমূলে অবস্থিত মণিপূরচক্রে, বায়ুতত্ত্বের অবস্থান হৃদয়দেশে অবস্থিত অনাহতচক্রে এবং আকাশতত্ত্বের অবস্থান কণ্ঠদেশে অবস্থিত বিশুদ্ধচক্রে। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র এবং শিরোদেশে সহস্রার অবস্থিত। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারী পঞ্চভূতের প্রভাবের বহির্ভূত। মায়ার প্রভাব উক্ত উভয়চক্রে কার্যকরী হয় না। এ কারণে আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্যন্ত পথনির্দেশ গুরুদ্বারা সম্ভব নহে এবং সাধনাদ্বারা এই পথ অতিবাহন করা যায় না। আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যবধান দশাঙ্গুল মাত্র, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ। (ত. 'ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত', রামপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৫)

শ্রীঅমলেশ তাঁহার, 'মর্তেষু অমৃত' গ্রন্থে বলেন, "এই দশ অঙ্গুলী একটা আধ্যাত্মিক মুদ্রা। আমাদের সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয় হাতের অঙ্গুলী দিয়ে— অর্থাৎ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক। জ্ঞানক্রিয়াত্মক জাগতিক কর্ম আবার তার উপরেও আছে দুইটি অনুরূপ ক্রিয়াত্মক জগৎ। তাই দশাঙ্গুলম্।

আবার পাঁচটি আঙ্গুল নির্দেশ করে জগতের পঞ্চতত্ত্ব। যেমন, অঙ্গুষ্ঠ আকাশ তত্ত্ব, তর্জনী = বায়ুতত্ত্ব, মধ্যমা = অগ্নিতত্ত্ব, অনামিকা = জল বা রসতত্ত্ব, কনিষ্ঠা = ক্ষিতিতত্ত্ব; অর্থাৎ পাঁচ অঙ্গুলীতে রয়েছে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম। পার্থিব সৃষ্টির ঊর্ধ্বে দশ অঙ্গুলী অর্থাৎ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আরো দুইটি জগৎ, অব্যক্ত ও অক্ষর। বেদে তাই বারবার বলা হয়েছে 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' 'ত্রিনাকঃ'।

হাতের পাঁচটি আঙ্গুল প্রসারিত করে অঙ্গুষ্ঠ উপরের দিকে আর কনিষ্ঠা নিচের দিকে রাখলে যে পরিসর হয় তাই হল তান্ত্রিক মুদ্রায় পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ব্যাপ্তির আধ্যাত্মিক প্রতীক। এইরকম বিশ্বসৃষ্টির উপরে দশ আঙ্গুল প্রসারিত করলে আমরা পাই আরো দুইটি স্বর্গ, দুইটি আকাশ, বেদের পরিভাষায় 'দ্যৌ' এবং 'বৃহৎ'।" (পৃ. ৭৫)

এই 'আব্রহ্ম ভুবনান্ লোকান্" যিনি পূর্ণ করে আছেন তিনিই পুরুষ।"

পুরুষসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র —

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।" (ঋ. ১০/৯০/২)

"যা হয়েছে এবং যা হবে সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঠিক এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ১৫ ও ১৭ শ্লোকার্ধ দ্বয়ে।

"সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।"
"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।"

'যদ্‌ভূতং' যাহা কিছু অতীত এই কল্পে বা পূর্ব অনুকল্পে, 'যচ্চ ভব্যম্' ভবিষ্যৎকালে যাহা কিছু হইবে, বর্তমানকল্পে এবং অনাগত ভবিষ্যৎ কল্পে যাহা কিছু হইয়াছে হইবে সকলই পুরুষ। 'উত' — অধিকন্তু, 'অন্যেন' অর্থাৎ অন্নময় জগৎ, অর্থাৎ ভোগময় জগতে যা কিছু, 'অতিরোহতি' অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া বিরাজমান থাকেন। কিভাবে থাকেন? 'অমৃতত্বস্যেশানো' হইয়া। অমৃতত্বের অধীশ্বর স্বামী হইয়া। অমৃতধামে থাকেন আপন স্বরূপে বিরাজমান।

পূর্ব অনুকল্পে ও ভবিষ্যৎ কল্পে যাহা কিছু সমুদয় পুরুষেরই, পৃথক্ কিছু নহে। ইহার অমৃতলোকের যাহা কিছু সমুদয়ের কে প্রভু? পুরুষের বিভূতি চার ভাগ করা হইলে তাহার মধ্যে একভাগ মাত্র এ জগতে বিদ্যমান। আর বাকি তিন ভাগ ঊর্ধ্বে অমৃতলোকে। এই কথাই পরবর্ত্তী তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন—

"এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াঁশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।"

"তাঁহার এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর, বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার এক পাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশে তাঁহার তিন পাদ।"

'এতাবান্' — এতখানি, অস্য—এই পুরুষের 'মহিমা' — মাহাত্ম্য ও বিভূতিরাশি। 'অতঃ'— এই মহিমা হইতেও, 'জ্যায়ান্' - - অধিকতর, মহত্তর। তাঁহার মহিমা অপেক্ষা তিনি অনেক অনেক বিশাল। এই বিশালতা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন— 'বিশ্বা'(=বিশ্বানি) সকল, 'ভূতানি'— ভূতসমূহ — অনন্ত বিশ্বের যাহা কিছু ছিল আছে হইবে তাহা সকল পুরুষের 'পাদঃ'— এক পাদ। আর 'ত্রিপাদ' অর্থ আর তিন চতুর্থাংশ। 'অমৃতং দিবি' — দিব্যলোকের অমৃতময় স্বরূপে, নিখিল বিশ্বের ঊর্ধ্বে ইহার স্বরূপাভিন্ন চিরশাশ্বত লোকে।

এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক পাদ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। আর উচ্চের তিন পাদ -শৌর্য বীর্যময় ও চির- নির্মল অঙ্গময়। পুরুষের অপার মহিমার কথা বলিয়া ঐ একপাদ ও অমৃতময় তিন পাদের যে কি সম্বন্ধ তাহা বলিয়াছেন পরবর্তী চতুর্থ মন্ত্রে —

"ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।"

"পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন রহিত (চেতনে ও অচেতনে) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।"

ত্রিপাদবিশিষ্ট অমৃতলোক ঊর্ধ্ব মায়াময় সংসারের 'উৎ' — উৎকর্ষতার সহিত।'ঐৎ' — দীপ্ত বিরাজমান, অন্য এক পাদ অর্থাৎ

চতুর্থ পাদ, 'ইহ' মায়াময় সংসারে, 'অভবৎ' — বর্তমান। 'তৎ' — মায়াময় সংসার সৃষ্টির উপর 'বিষ্বঙ্' — বিবিধ প্রকারে বিভক্ত হইয়া, 'ব্যক্রামৎ' — বিবিধ প্রকারে ব্যাপ্ত হইলেন। এই মায়াময় সংসার সৃষ্টির পর পুরুষ সাগর জঙ্গম প্রভৃতি নামে ও রূপে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 'সাশনানশনে', যাহারা অশন ও অনশনের সহিত; অশন অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে, প্রাণযোগ্য; আর অনশন অর্থ — যাহারা অন্ন আহার না করিয়া জীবনধারণ করে — অচেতন পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী। 'অভি'— সর্বতোভাবে। অথবা অশন অর্থ ভোগী জীব, অনশন অর্থ ভোগাতীত মুক্ত জীব। বদ্ধ ও মুক্ত জীবের সহিত।

পঞ্চম মন্ত্র—

''তস্মাদ্বিরাড জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।।''

''তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।''

'তস্মাৎ', সেই পুরুষ হইতে, 'বিরাট্ অজায়ত', বিরাট্ উৎপন্ন হইলেন, 'বিরাজঃ' — বিরাট পুরুষ হইতে, 'অধি'— বিরাট্ দেহ আশ্রয় করিয়া সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া বা প্রকাশ করিয়া বাহিরে উহা অতিক্রম করিয়া বা বিরাট্ ব্যতিরিক্ত দেব-তির্যক-মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিলেন। 'স জাতঃ' সেইপুরুষ উৎপন্ন হইয়া 'অত্যরিচ্যত' — অতিরিক্ত হইলেন বাহিরে উহা অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিলেন, 'পশ্চাদ্ভূমিং' — দেবাদি জীবভাব প্রাপ্তির পর তাহাদের অবস্থিত স্থান, 'অথো' — তারপর, 'পুরঃ' — জীবাদি শরীর।

আচার্য সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'তস্মাৎ' — আদিপুরুষাৎ, বিরাড্ — ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ, অজায়ত — উৎপন্নঃ । বিবিধানি রাজন্তে বস্তূনি অত্র ইতি বিরাট্। 'বিরাজঃ অধি' — বিরাড্ দেহস্য উপরি তমেব দেহমধিকরণং কৃত্বা, পুরুষঃ — তদ্দেহাভিমানী কশ্চিৎ পুমানজায়ত, সোহয়ং সর্ববেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা স্বয়মেব স্বকীয়য়া মায়য়া বিরাড্ দেহং ব্রহ্মাণ্ডরূপং সৃষ্টা তত্র জীবরূপেণ প্রবিশ্য ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবঃ অভবৎ।''

এই পঞ্চম মন্ত্রে তিনটি পুরুষের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। প্রথম সূক্তের প্রতিপাদ্য পুরুষ। দ্বিতীয়ে, 'তস্মাদ্বিরাডজায়ত' বিরাট্ পুরুষ। সেই বিরাট্ হইতে জাত অধিপুরুষ, ইনি তৃতীয় পুরুষ। ভাগবতীয়েরা এক একটি পুরুষের নাম দিয়াছেন যথা, প্রথম পুরুষ কারণোদকশায়ী,

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী ও তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ২/৬/৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—
"যচ্চোক্তম্

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।"

যিনি মূল কারণ তিনি প্রথম পুরুষ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী যিনি, তিনি দ্বিতীয় পুরুষ। আর তাঁহা হইতে জাত তৃতীয় পুরুষ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তৃতীয় পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করিয়া স্থূল জগৎ প্রকট করেন।

এই পুর বা শরীর নির্মাণ করিয়া অন্তর্যামীরূপে ঐ পুরসকলে শয়ন করেন। শয়ন অর্থ হইল সঞ্জীবিত রাখিয়া পালন করেন। এই তিন পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ শব্দ তিনজনই সমভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ মন্ত্রটি এইরূপ—

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।" (ঋ. ১০/৯০/৬)

"যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।"

দেবা — দেবতাগণ, যজ্ঞম্ — মানসযজ্ঞ, অতন্বত পুরুষেণ হবিষা — পুরুষকে কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সৃষ্টিযজ্ঞে পুরুষ আত্মাহুতি দিয়াছেন। এই যজ্ঞে গ্রীষ্ম ঋতু যজ্ঞের কাষ্ঠ, শরৎ ঋতু হোম সাধন হবি, আর বসন্ত ঋতু আজ্য। আজ্য অর্থ যাহা যজ্ঞে অগ্নির উজ্জ্বলতা বিধান করে। বসন্তে বৃক্ষলতা পত্র-পুষ্পে সরস হয়, এই জন্য তাহাকে আজ্য ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে। গ্রীষ্মযজ্ঞের কাষ্ঠ হইতে রস লইয়া যায় তাহাতে যজ্ঞ কার্য সমাধা হয়। তাই গ্রীষ্মকে ইন্ধন কল্পনা করা হইয়াছে। শরৎকালে প্রায় সব ওষধি পাকে। ওষধি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। এই জন্য শরৎকে হোম সাধন হবি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কি কারণ আছে বুঝা যায় না।

যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, যজ্ঞের অর্থ সমর্পণ, আত্মবলিদান। যাহা তুমি আছ, যাহা তোমার আছে, ভবিষ্যতে স্বচেষ্টায় বা দেবকৃপায় হইতে পারে, যাহা কর্মপ্রবাহে অর্জন বা সঞ্চয় করিতে পার, সবই সেই অমৃতময়ের উদ্দেশে হবিরূপে তপঃ-অগ্নিতে ঢাল। ক্ষুদ্র সর্বস্বদানে অনন্ত সর্বস্বলাভ করিবে। যজ্ঞে যোগ নিহিত। যোগে আনন্ত্য, অমরত্ব ও ভাগবত-

আনন্দ প্রাপ্তি বিহিত। ইহাই প্রকৃতি হইতে উদ্ধারের পথ।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫/২৪/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন, সমস্ত জীবনটাই এই যজ্ঞ। এই তত্ত্ব না জানিয়া যে যজ্ঞ করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে। এইজন্য যজ্ঞের তত্ত্ব কিছু বুঝা দরকার।

ছান্দোগ্য ৫/১৮/২ মন্ত্রে বলিয়াছেন — মানুষের বক্ষস্থলই যজ্ঞের বেদী। লোমগুলি তাহার বর্হি। আর হৃদয় হইল গার্হপত্য অগ্নি। এই শ্রুতিতে ঋষি অশ্বপতি বলিয়াছেন — মানবাত্মাও বৈশ্বানর। মানবদেহও বৈশ্বানর। অন্নভোজন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানুষ যখন আহার করে তখন বৈশ্বানরকেই অন্ন আহুতি রূপে অর্পণ করা হয়। সুতরাং মানুষ নিজেই এক যজ্ঞ। সমস্ত জীবনটাই এক যজ্ঞাহুতি। শ্রুতিতে তাই বলিয়াছেন, 'পুরুষো বাব যজ্ঞঃ', পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ।

পরমার্থ-বুদ্ধি, মানবসেবা-বুদ্ধিই যজ্ঞ। ভোগলিপ্সাই মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিতে সংকুচিত করে। ত্যাগবুদ্ধিই পরার্থে পরমার্থে উন্নীত করে। এই ত্যাগই যজ্ঞ। পরার্থ ও জীবসেবা বুদ্ধি হইলে ত্যাগব্রতের উন্মেষ হয়। তারপর উহা ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইতে পরিশেষে কৃষ্ণসেবায় অমৃতত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। যজ্ঞ দ্বারা ক্রমশঃ সর্বাবস্থাতেই ব্রহ্মবস্তুর বিকাশ অনুভূত হয় — এই কথাই গীতা বলিয়াছেন। 'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।' (গীতা, ৩/১৫) (মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, 'গীতা ধ্যান', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯-২০) "সৎস্বরূপে যজ্ঞের নাম কর্মযোগ, চিৎস্বরূপে যজ্ঞের নাম জ্ঞানযোগ, আনন্দস্বরূপে যজ্ঞের নাম অনন্যা ভক্তি।"

সপ্তম মন্ত্রে নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন —

"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।"

"যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।"

সৃষ্টিসমর্থ প্রজাপতিগণ ও ঋষিগণ সেই পুরুষের দ্বারা মানসযজ্ঞ করিয়াছিলেন পুরুষকে বলিরূপে ভাবনা করিয়া। ইহাই পুরুষযজ্ঞ। সৃষ্টির মধ্যে পুরুষ আপনাকে আহুতি দিয়াছেন। সকল যজ্ঞের আদি যজ্ঞ হইল মানসযজ্ঞ। এই যজ্ঞে কোন উপকরণ লাগে না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে এই যজ্ঞ চলিতেছে। গীতা বলিয়াছেন — যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'। ভগবান ও মানুষের মধ্যে যজ্ঞ যোগসূত্র। ভোগলালসা অযজ্ঞ। যজ্ঞসমাপ্তি হইল আত্মসমর্পণে। তাহার মৌলিক কারণ, ভগবান্ এই বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন। ভগবানের আত্মসমর্পণের দ্বারাই যজ্ঞের সৃষ্টি। এইজন্য আত্মসমর্পণের অর্থ

নিজেকে একেবার বিলাইয়া দেওয়া। সংকীর্ণ আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করিতে পারিলেই তাহা হইলে পারমার্থিক আমিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া যায়। আমি যখন নাই, তখনই আমি আছি। আমাকে নাই করিয়া দেওয়ার নামই যজ্ঞ। বৈষ্ণব ভক্তরা বলেন, একমাত্র কৃষ্ণার্থেই আত্মসমর্পণ করিলে ক্ষুদ্র আমিত্ব ঘুচিয়া যায়। ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৩৫ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

''ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম।।''

যজ্ঞ হইল অনন্ত বিশ্বের নাভি। মাতৃগর্ভে শিশু নাভির সঙ্গে যুক্ত থাকে। যজ্ঞের দ্বারাই আমরা যুক্ত বিশ্বের সঙ্গে। অযজ্ঞ সে, যে অযুক্ত। গীতায় বলিয়াছেন,

''নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।''

অ-যজ্ঞ ব্যক্তিরাই অ-যুক্ত। অ-যুক্ত লোকই শান্তিহারা।

অষ্টম মন্ত্রে বলিয়াছেন —

''তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্ তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারাণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।।''

''সেই সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য।''

পুরুষকে মানস যজ্ঞে বলি দেওয়া হইল। তাহা হইতে জীবের ভোগের যত দ্রব্য উৎপন্ন হইল। আর অরণ্যচর, গ্রামচর, খেচর উৎপন্ন হইল। 'পৃষদাজ্যম্' — ইহার অর্থ আচার্যরা করিয়াছেন দধিমিশ্রিত ঘৃত। দধি হইল জ্ঞানের ঘনীভূত রূপ। ঘৃত অর্থ আলোক । ঘৃ ধাতুর অর্থ দীপ্ত হওয়া। দধিমিশ্রিত ঘৃতের অর্থ হইল ঘনীভূত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন আলো। অনির্বাণ বলেন, ঘৃত অর্থ জ্যোতির ধারা, যিনি সেই দিকে চলিয়াছেন তিনি ঘৃতাচী। এই শাশ্বত জ্ঞানধারা ও তদভিমুখে চলিবার অভীপ্সা এই পুরুষযজ্ঞ হইতে জাত।

নবম মন্ত্রে বলিয়াছেন —

''তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত।।''

''সেই সর্ব-হোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্-সামসমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ-সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজু তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল।''

ঋগ্-বেদের তত্ত্ব হইল সত্য ঋত। সামবেদের তত্ত্ব হইল উদ্গীথ অর্থ-প্রবণ। যজুর্বেদের তত্ত্ব হইল সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এই তত্ত্বসকল উৎপন্ন হইল মূল যজ্ঞ হইতে।

দশম মন্ত্রে বলিয়াছেন —

''তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।''

''ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভিগণ, ছাগ ও মেষগণ জন্মিল।''

সেই মানস যজ্ঞ হইতে অশ্ব অশ্বতর গর্দভ প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। বেদশাস্ত্রে সর্বত্র অশ্বশব্দ শক্তির প্রতীক। অশ্বশব্দ প্রধানত বীর্যশক্তি বুঝায়। বেদে গো পদে আলো বুঝায়। এই গো ও অশ্ব, আলো ও শক্তি, যাহা বিশ্বভুবন, ব্যপ্ত হইয়া আছে, অশ্বের কাছে প্রার্থনা করিতেছে আলো ও সামর্থ্যের জন্য। অজা অর্থে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময় প্রকৃতি। পুরুষ বহু হইবার কামনা করিয়াছেন। এই পুরুষযজ্ঞের মধ্য দিয়া সেই কামনা পূর্তি হইল। পুরুষ বিশ্বাত্মা হইলেন।

একাদশ মন্ত্রে বলিয়াছেন —

''যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।।''

''পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল। কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই-ঊরু, দু-চরণ কি হইল?''

এই মন্ত্রে একটি প্রশ্ন মাত্র। মানসযজ্ঞে পুরুষ যখন আত্মবলি দিলেন তাঁহার অবয়ব কত ভাগ করা হইয়াছিল? বিশেষ করিয়া জানিতে চাওয়া হইয়াছে তাঁহার মুখ, বাহু, ঊরু, পদদ্বয় কি নামে কথিত হইয়াছে। পরবর্তী দ্বাদশ মন্ত্রে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ, বাহু ক্ষত্রিয় ঊরুদ্বয় বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

দ্বাদশ মন্ত্রটি এইরূপ —

''ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।''

''এঁর মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা ঊরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুইচরণ হইতে শূদ্র হইল।।''১২

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'মর্তেষু অমৃত' গ্রন্থকার বলেন,

''এই চাতুবর্ণ্য কোন জাতিগত ভেদ নয়। তাহা হইল বিশ্বযজ্ঞপুরুষের আপনস্বরূপের গুণকর্ম বিভাগ মাত্র। পুরুষের আপন সত্তারই চারটি অংশ, মর্যাদা গৌরব সমান কিন্তু ক্রিয়াশীলতা চারপ্রকার। জ্ঞান মেধা সত্যের বাণীর উদ্‌গাতৃস্বরূপ ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ বলে কল্পনা করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের বল ক্ষাত্রশক্তি হল তাঁর দুই বাহুস্বরূপ। আর ধনসম্পদ্ কৃষি বিপণন ইত্যাদি সমাজের সম্পদ্ যার উপরে ভর দিয়ে সমগ্র সমাজ বা বিশ্বপুরুষ দাড়িয়ে আছেন সেই ঊরুদ্বয়স্বরূপ হলেন বৈশ্য এবং তাঁর

চরণযুগল বিশ্বসৃষ্টির আশ্রয়, বিশ্বের গতি ও শুচিতা স্বরূপ যে সেবা ও আত্মত্যাগ তাই হল শূদ্র। লক্ষ্য করবার বিষয় ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও শূদ্রের সেবা এই দুইই নিঃস্বার্থ। কেবল শরীর ধারণের জন্য আহার ছাড়া শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের কোন পারিশ্রমিক নেই। বৈরাগ্য ও ত্যাগের ব্রত তাঁদের, কিন্তু সম্পদের ভোগের অধিকার নির্দিষ্ট কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ত্যাগের ও ভোগের এই আশ্চর্য সমতা রক্ষা করেছেন ভূমা পুরুষ তাঁর আপন স্বরূপে।''

অতঃপর চারটি মন্ত্র (১৩-১৬)—

''চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।।১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্য সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ।।১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।''১৬

''মন হতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।''১৩

''নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুইচরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হল।''১৪

''দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদনকালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হইল এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল।''১৫

''দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন তাহাই সর্বপ্রথম ধর্মানুষ্ঠান, যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।''১৬

পুরুষসূক্ত ও ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে বেদ-বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলা হয়। এই পুরুষ-সূক্তের তাৎপর্য শ্রীমদ্ভাগবত কিভাবে শ্লোকে আস্বাদন করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিব।

।। ১ ।।

''স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্‌ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্।।'' (ভাগঃ, ২/৫/৩৫)

এই অন্তর্যামীপুরুষ সমষ্টি-ব্যষ্টি শরীরাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক সমন্বিত মূর্তিতে বাহিরে প্রকাশিত হন (তখন ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে পুরুষ অবস্থিত হন)।

"তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতষ্ঠতি।।" (ভাগঃ, ২/৬/১৬)

সেই পুরুষ এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এবং তিনি সকলের উপরে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত।

"স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমান্।।" (ভাগঃ, ২/৬/১৭)

সূর্য যেমন নিজ মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া মণ্ডলের বাহিরের স্থানও আলোকিত করেন, সেইরূপে শ্রীভগবান্‌ও অন্তর্যামীরূপে বিরাট দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহের অন্তরে ও বাহিরে থাকিয়া সর্বত্র চেতনা সঞ্চার করেন।

।। ২।।

"অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরা নাগাঃ খগা মৃগসরীসৃপাঃ।।
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ।।
অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ।।
সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।"

(ভাগবত, ২/৬/১৩ - ১৬)

সেই বিরাট পুরুষের চিত্ত হইতে ধর্মের আমার তোমার, সনক - সনন্দনাদি কুমার ঋষিগণের, রুদ্রের এবং সর্ব জীবের চিত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। হে নারদ! আমি, তুমি, রুদ্র, তোমার অগ্রজ সনক-সনন্দনাদি এবং মরীচ্যাদি ঋষিবৃন্দ, দেব-অসুর, মনুষ্য-নাগ, পক্ষী, মৃগ- সরীসৃপ, গন্ধর্ব অপ্সর, যক্ষ-রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর-চারণ, বৃক্ষগণ, ইহা ছাড়াও নানাজাতীয় জলচর, স্থলচর, খেচর প্রভৃতি প্রাণিবৃন্দ, গ্রহ, নক্ষত্র, কেতু, তারকা, বিদ্যুৎ, মেঘ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু এমন কি ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান যে-সমস্ত বস্তু আছে, তাহার কিছুই পুরুষ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে।

"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।" (ভাগঃ, ২/৬/১৮)

সেই পরমেশ্বর কর্মফলের অতীত এবং অক্ষয় অব্যয় পরমানন্দ ভোক্তা।

।।৩।।

''পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু।।'' (ভা. ২/৬/১৯)

সর্বভুবনৈকনিলয় শ্রীভগবানের একপাদে ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোক ও জীবসমূহ অবস্থিত। তিনি মহর্লোকের উপরিতল জন, তপঃ ও সত্যলোকে যথাক্রমে অমৃত অভয় এবং মোক্ষসুখ নিহিত রাখিয়াছেন।

।।৪।।

''পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ।।'' (ভা. ২/৬/২০)

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসাশ্রমী ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ত্রিলোকের বহিঃস্থিত শ্রীভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির পরমানন্দ উপভোগ যোগ্যতা লাভ করেন। সংসারমুক্ত ব্যক্তিগণ ত্রিলোকমধ্যস্থ একপাদ বিভূতির অধিকারী।

''সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ।।'' (ভা. ২/৬/২১)

বিশ্বব্যাপী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ জীবের অবিদ্যা ও বিদ্যা-নিমিত্তক ভোগ ও অপবর্গপথের অতীত এবং স্বয়ং তাহার আশ্রয়।

।।৫।।

''যস্মাদণ্ডং বিরাড়্জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ।
তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য ইবাতপন্।।'' (ভা. ২/৬/২২)

সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং ভূত- ইন্দ্রিয় এবং গুণময় বিরাড়্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য যেমন নিজ মণ্ডলে থাকিয়া কিরণজালে জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও নিজধামে থাকিয়াই বিরাড়্দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্য সঞ্চার করেন।

।।৬।।

'' .... যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।'' (গীতা, ৩/১৪)
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।''
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।। (গী. ৩/১৫)

এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড একটি বিরাট যজ্ঞক্ষেত্র। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই বিরাট-ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞের উপকরণ সৃজনে নিযুক্ত। বিষ্ণু উক্ত উপকরণগুলি

যথাযথভাবে পালন, রক্ষণ ও বর্ধন করিয়া বিশ্বযজ্ঞে আহুতি দিবার উপযোগী করিতে ব্যস্ত। রুদ্র এই যজ্ঞের প্রধান হোতা। তিনি, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট এবং বিষ্ণু কর্তৃক পালিত, রক্ষিত ও বর্ধিত স্থাবর-জঙ্গম,ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম চরাচর সমুদয় বিরাট্ বিশ্বরূপ মহাকালের করাল-বদনে আহুতি-দান করেন। এই যজ্ঞ প্রতিক্ষণে সংসাধিত হইতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ হইয়া প্রলয় পর্যন্ত সর্বকালে সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় চলিতেছে।

"যদাঽস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বাদৃতে।। (ভাঃ, ২/৬/২৩)
তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ।। (ভাঃ, ২/৬/২৪)
বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম।। (ভাঃ, ২/৬/২৫)
নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সঙ্কল্পস্তন্ত্রমেব চ।। (ভাঃ, ২/৬/২৬)
গতয়ো মতয়ঃশ্রদ্ধা প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া।।" (ভা, ২/৬/২৭)

হে নারদ! আমি যখন গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন কোনও যজ্ঞ-সম্ভার (মন্ত্র, তন্ত্র, যজমান, কুশ, পশু, সমিধ্ প্রভৃতি) দেখিতে পাই নাই, তদনন্তর যখন আমি যজ্ঞসম্ভারের অনুসন্ধানে রত হইলাম, তখন গর্ভোদকশায়ী পুরুষের অবয়ব হইতে যজ্ঞীয় পশু, যূপ (পশু বন্ধনার্থ কাষ্ঠ) কুশ, যজ্ঞভূমি, বসন্তাদি কাল, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞার্থ ব্রীহি প্রভৃতি, ঘৃতাদি স্নেহবস্তু, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, চাতুর্হোত্র (হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্যু) এই সমস্ত চতুর্বেদীয় হোতৃগণের কর্ম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের নাম) স্বাহাকারাদি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, অগ্নি সোমাদি দেবগণের যথাযথ উদ্দেশ, কল্প (বোধায়নাদি কর্মপদ্ধতি গ্রন্থ), সংকল্প, তন্ত্র (অনুষ্ঠান পদ্ধতি), গতি (বিষ্ণু ধ্রুব প্রভৃতি লোক) মতি (নানা দেবতার ধ্যান) প্রায়শ্চিত্ত ও সমর্পণ (কৃতকর্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ) প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞসম্ভার যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিলাম।

'ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্।।" (ভাঃ, ২/৬/২৮)

এইরূপ যজ্ঞ-পুরুষ শ্রীভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করিয়া তাহারই দ্বারা আমি সেই যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করিয়াছিলাম।

"ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ।।" (ভাঃ, ২/৬/২৯)
ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্।।" (ভাঃ, ২/৬/৩০)

হে নারদ! তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়জন ভ্রাতা সমাহিতচিত্তে ইন্দ্রাদি যজ্ঞীয়-দেবতারূপে ব্যক্ত ও স্বরূপে অব্যক্ত পরমপুরুষের অর্চনা করেন, তদনন্তর যথাসময়ে বৈবস্বত প্রভৃতি মনুগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ এবং মনুষ্যগণ নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করিলেন।

।।১২।।

"পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽভ্যজায়ত।।" (ভাঃ, ২/৫/৩৭)

এই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়।

।।১৩।।

"বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্ব্বরসস্য চ।।" (ভাঃ, ২/৬/১)

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ সর্ব্বজীবের বাগিন্দ্রিয় এবং বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্নির উৎপত্তিস্থান এবং তাঁহার রসনা হব্য, কব্য ও অমৃত নামক দেবলোক, পিতৃলোক, এবং মনুষ্যলোকের অন্ন, মধুরাদি ছয় প্রকার রস ও রসাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের উৎপত্তিস্থান।

।।১৪।।

"অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্।।"
(ভাঃ, ১০/৪০/১৩)

অগ্নিকে আপনার মুখ, পৃথিবীকে আপনার চরণ, সূর্যকে আপনার চক্ষু, আকাশকে আপনার নাভি, দিক্‌সকলকে আপনার কর্ণ, স্বর্গকে আপনার মস্তক, দেবেন্দ্রগণকে আপনার বাহু, সাগর সকলকে আপনার কুক্ষি এবং বায়ুকে আপনার প্রাণ ও বলরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন।

"রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।

নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতির্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমিষ্যতে।।
(ভাঃ, ১০/৪০/১৪)

বৃক্ষ ও ওষধি-সকল আপনার রোমরূপে, মেঘসকল আপনার কেশরূপে, পর্বত-সকল আপনার নখ ও অস্থিরূপে, রাত্রি ও দিবস আপনার নিমেষরূপে, প্রজাপতি আপনার মেঢ্ররূপে এবং বৃষ্টি আপনার বীর্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

"ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসোঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে।।"
(ভাঃ, ১০/৪০/১৫)

হে অব্যয়াত্মন্! জলচর প্রাণিসকল যেমন জলে বিচরণ করে অথবা মশক-সকল উডুম্বর ফলের মধ্যস্থ কেশরে অবস্থান করে, তদ্রূপ একমাত্র বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্য পুরুষরূপী বহু জীবসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রকল্পিত হয়।

"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ।।" (ভাঃ, ২/৫/৩৮)
"গ্রীবায়াং জনলোকশ্চ তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ।।" (ভাঃ, ২/৫/৩৯)

এই পুরুষের চরণ হইতে কটি পর্যন্ত অবয়বে পাতাল হইতে ভূলোক পর্যন্ত, নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষস্থলে মহর্লোক কল্পিত হয় এই পুরুষের গ্রীবায় জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক কল্পিত হয় এবং তদুপরি সনাতন বৈকুণ্ঠলোক অবস্থিত।

।। ১৬।।

"এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি।।" (ভাঃ, ১/৩/৩০)

প্রাকৃত রূপ-রহিত চিন্ময় শ্রীভগবানের এইরূপে মহদাদি ও পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপ সত্ত্ব রজস্তমো বিকার দ্বারা জীবসম্বন্ধই কল্পিত হয়।

"যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ।।" (ভাঃ, ১/৩/৩১)

যেমন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নীল আকাশ, ধূসর বায়ু প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রথম সাধকের উপাসনার জন্য শ্রীভগবানের বিরাট্‌রূপে কল্পিত হন।

নাসদীয় সূক্ত

ঋগ্বেদে, ১০/১২৯ সূক্ত। দেবতা — পরমাত্মা। ঋষি — প্রজাপতি। ছন্দ — ত্রিষ্টুপ্।

''নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্।।১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।২
তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্ব পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।৩।।
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।।৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।।৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।।৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।''

অনুবাদ : তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। ভুবনও ছিল না। অনন্ত আকাশ ছিল না। ব্যোমের উপরিদেশের দ্যুলোক প্রভৃতিও ছিল না। সুতরাং আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কোথায় স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর সলিল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি-দিনের প্রভেদও ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু, বায়ুর ব্যতিরেকে প্রাণনক্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছু ছিল না, অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। অকিঞ্চিৎকর বস্তু দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণিত আছে। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে সূক্তটির তাৎপর্য এইরূপ — ''নাসদীয় সূক্তে তর্কাতীত ভূমিতে উপস্থাপন করা হইয়াছে সৃষ্টির উৎসকে। সেকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না, কোনপ্রকার ভুবনও

(লোকসমূহও) ছিল না, অনন্ত আকাশ ছিল না। আবরণকারী কিছুই ছিল না। ঋষি ভাবিতেছেন, দুর্গম ও গভীর সলিল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যু বা অমরত্ব বলিতেও কিছু ছিল না; দিন বা রাত্রি বলিতেও কিছু ছিল না। জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে সেই একমাত্র বস্তু আত্মা অবলম্বনে প্রাণনক্রিয়া করিয়াছিলেন। পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অন্ধকার ছিল চারিদিকে অন্ধকার দ্বারাই আবৃত। চারিদিক্ ছিল জলময়। সমস্তই ছিল চিহ্নবর্জিত। ধারণাতীত এক অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সব কিছুই আচ্ছন্ন ছিল। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। প্রেম সঞ্চারিত হইল। মনের উপর তাহার প্রকাশ ঘটিল। এই প্রেম ভাব হইতে বা কামনা হইতেই সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষদের আবির্ভাব ঘটিল; মহিমা সকলের উদ্ভব হইল। ইহাদের রশ্মি বিস্তারিত হইল। শক্তির সৃষ্টি হইল। নীচের দিকে স্বধা, আর ভোক্তাপুরুষ অর্থাৎ প্রয়তি রহিলেন উপরে। উপ্ত বীজ শক্তির প্রভাবে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া অঙ্কুরিত হইল।''

এই সৃষ্টিক্রমের কোন তার্কিক ব্যাখ্যা নাই। জীবের সাধ্য নাই ধারণার গণ্ডীতে টানিয়া আনিতে পারে সেই সৃষ্টিরহস্যের কথা। কেহই এই সৃষ্টির উৎসের কথা জানেন না। দেবতারা আসিয়াছেন পরে। সুতরাং তাঁহারাও জানেন না। অতএব জানিতে পারেন একমাত্র সেই শক্তিমান, যিনি সর্বময় কর্তা। ঋষি বলিতেছেন, হয়তো বা তিনিও জানেন না। অপূর্ব ভাবনা জানিবেনই বা কি করিয়া। কারণ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তো একজনই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলা প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে — ''আমি না জানি, না জানে গোপীগণ।'' বেদের ঋষির উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় উপরের উক্তিতে। তিনি বিশ্বগ — বিশ্বোত্তীর্ণ, জানা ক্রিয়ার পরিধির ঊর্ধ্বে তাঁহার অবস্থান 'অত্যতিষ্ঠৎ'। রমেশচন্দ্র তৃতীয় মন্ত্রের 'তুচ্ছেন' পদের অর্থ করিয়াছেন অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা। সায়ণাচার্য 'তুচ্ছেন' পদে 'সদসদ্‌বিলক্ষণেন ভাবরূপেণাজ্ঞানেন' অর্থ করিয়াছেন। সায়ণ 'তপসা' অর্থ করিয়াছেন —'স্রষ্টুঃ পর্যালোচনরূপস্য।'

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

এই নাসদীয় সূক্তের অনুরূপ কথা পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে —

'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ। ন দ্যৌরাসীৎ। ন পৃথিবী। নান্তরিক্ষম্।

তদসদেব সন্মনোঽকুরুত স্যামিতি, তদতপ্যত। তস্মাত্তেপানাদ্ধূমোঽজায়ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তেপানাদগ্নিরজায়ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তেপানাজ্জ্যোতিরজয়ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তেপানান্মরীচ্যোঽজায়ন্ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তেপানাদুদারা অজায়ন্ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তদভ্রমিব সমহন্যত। তদ্বস্তিমভিনৎ।।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২/২/৯/১-২)

ম্যাক্সমূলর (Max Muller)-কৃত অনুবাদ ঃ

"There was then neither what is nor what is not, there was no sky, nor the heaven which is beyond. What covered? Where was it, and in whose shelter? Was the water the deep abyss (in which it lay)? .

There was no death, hence was there nothing immortal. There was no light (distinction) between night and day. That one breathed by itself without breath, other than it there has been nothing.

Darkness there was, in the beginning all this was a sea without light ; the germ that lay covered by the husk, that one was born lay the power of heat (tapas).

Love overcame it in the beginning which was the seed springing from mind, poets having searched in there (heart found by wisdom the bond of) what is not.

Their ray which was stretched across, was it below or was it above? There were seed - bearers, there were powers, self-power below, and will above.

Who then knows, who has declared it here, form whence was born this creation? Then gods came, late than this creation, who there knows whence it arose?

He, from whom this creation arose, whether he made it or did not make it, the highest seer in the hightest heaven, he from whom knows, or does even he not know?

এই নাসদীয় সূক্তের শ্রীঅরবিন্দকৃত ইংরাজী অনুবাদ—

1. Then existence was not nor non-existence, the mid-world was not nor the Ether nor what is beyond.

what covered all? where was it? In whose refuge? what was that ocean dense and deep?

2. Death was not nor immortality nor the knowl edge of day and night. That One lived without breath by his self-law, there was nothing else nor aught beyond it.

3. In the beginning, Darkness was hidden by darkness, all this was an ocean of inconscience when universal being was concealed by fragmentation, than lay the greatness of its energy that one was born.

4. That moved at first as desire within which was the primal seed of mind. The seers of Truth discovered the building of being in non-being by will in the heart and by the thought;

5. Their ray was extended horizontally; but what was there below, what was there above? There were Casters of the seed, these were Greatnesses; there was self-law below, there was will above.

6. Who indeed knows? Who in this word could explain this? Whence was this born? Of what came this varied creation? Even the Gods were born after it. So, who knows from whom or what it came into being?

7. From where this varied, variegated and vast creation cames into being? whether there is any one holding and maintaining it or not?

O beloved, the One who is seated in the Supreme Ether presiding over it, that alone knows it or knows not." (অগ্নিমন্ত্রমালা, pp. 522-528)

এই নাসদীয় সূক্তটির শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ এইরূপ :

"তখন (মূলারম্ভে) না ছিল সৎ (অস্তিত্বশীল জগৎ) না অসৎ (অলীক, অব্যক্ত মায়া), না ছিল আকাশ বা অন্তরিক্ষ অথবা তারও উপরে অন্য কোন কিছু (মহাশূন্য)। কে কাকে তখন আবৃত করেছিল? তখন না ছিল মৃত্যু, না অমৃত, না ছিল দিন ও রাত্রির কোন ভেদাভেদ। আপন শক্তি

(স্বধা) দ্বারাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ বায়ু ব্যতিরেকে শ্বাস নিচ্ছিলেন তখন। তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব তখন ছিল কি? অন্ধকার (তম = darkness) ছিল তখন গাঢ় অন্ধকারে (তমসা) আবৃত। এই বিশ্ব ছিল তুচ্ছ মায়া (অসৎ) এ আবৃত। অগাধ ও গহন জল কি ছিল তখন? চিহ্নহীন জলরাশির মধ্যে (মায়া হতে) জ্ঞানময় তপঃশক্তির মহিমায় (আপন স্পন্দনে) জন্ম নিলেন সেই অদ্বিতীয় সত্তা (সৃষ্ট হল জগৎ)। ক্রান্তদর্শী কবিরা (ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ) দেখতে পেলেন যে সৎ (অস্তিত্বশীল জগৎ) এর বাঁধন রয়েছে মহাশূন্যে অব্যক্ত মায়ায় (অসতে)। কে প্রকৃত জানে, কে স্পষ্ট করে বলতে পারে, কোথা হতে জন্মেছে, কোথা হতে আবির্ভূত হয়েছে এই বিচিত্র সৃষ্টি? ''কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?''

''দেবতাদের জন্ম তো সৃষ্টির পরে। তাহলে কে জানে কবে কোথা হতে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল বিশ্ব। যিনি এই বিশ্বের নির্লিপ্ত নীরব স্রষ্টা, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়লোকে সদানন্দময় বিরাজিত যিনি, হয়ত তিনি তা জানেন। অথবা তিনিও হয়ত তা জানেন না। তাহলে কে জানে? — ('বেদ উপনিষদ্', পৃ. ১৮-১৯)

মন্তব্য : এই যে কিছুই ছিল না — এই ধারণা আচার্য শঙ্করের নির্গুণ নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপের ভাবনার অনেক নিকটবর্ত্তী। 'তুচ্ছেন' শব্দের সায়ণাচার্য কৃত অর্থ বলিয়াছি — ''সদসদ্বিলক্ষণেন ভাবরূপেণাজ্ঞানেন।'' সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞান এই ধারণাও অবাচ্য শঙ্করের অনির্বচনীয় মায়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে মিলিয়া যায়। কাজেই এই সূক্তে আচার্য শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও মতবাদ স্থাপিত হইবার পক্ষে অনুকূল কথা। বৌদ্ধধর্মে নাগার্জুনের শূন্যবাদের সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এই নাসদীয় সূক্তও ''কিছুই ছিল না, ছিল না'' বলিয়া একটি বস্তু স্বীকার করেন। ''স্বধয়া তৎ-একম্ তস্মাৎ-হ-অন্যৎ ন পরঃ কিম্-চন্ আস।'' একমাত্র বস্তু ছিল — তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। শঙ্করাচার্যও ''অনির্দেশ্য নির্বিশেষ একরসঃ'' ইত্যাদি বলিয়া একটি পরম বস্তু ব্রহ্মস্বীকার করিয়াছেন। নাগার্জুনও তাঁহার শূন্যবাদের শূন্যকে অভাববাচী বলেন নাই। কিছু একটি ছিলই। নাগার্জুনের শূন্য অভাববাচী নহে। পরমার্থতত্ত্ব ও শূন্যতত্ত্ব মূলতঃ একই।

এই সূক্তে সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণিত আছে। কবিতার মাধুর্যে, বর্ণনার অসাধারণ শক্তিতে, ভাষার গাম্ভীর্যে ও তত্ত্বের গভীরতায় ইহার সমকক্ষ

পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনো ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ।

নাসদীয় সূক্ত (ঋ. ১০/১২৯)

কিছুই ছিল না যাহা সত্তাবান্, না ছিল সত্তাহীনতা।
না ছিল আকাশ, না ছিল বাতাস, শূন্যঘেরা নীরবতা।।
গাঢ় অন্ধকারে তিমিরাবরণ নিগূঢ় লুক্কাইত।
জল-স্থল-শূন্য ভেদাভেদহীন প্রপঞ্চ অপ্রকাশিত।।
মৃত্যু নাহি ছিল, না ছিল অমৃত্যু, চিহ্নযুত কিছু না কোথা।
কিবা দিবা-নিশা নাহি ছিল দিশা, না ছিল কোন পৃথক্‌তা।।
অসীম অনন্ত অম্বু রাশিও নাহি ছিল অবস্থিত।
নাহি আলোরেখা অন্ধকার ঢাকা তমস্বিনী পুঞ্জীভূত।।
কোথাও কেহ নাই ঊর্ধ্বে অধোদেশে পুরাতন কি সুনবীন।
ছিল একটিমাত্র শান্ত প্রাণবন্ত বায়ুহীন সত্তাসীন।।
আদ্যে জাগরণ উৎপত্তিকারণ মহাকামনার আবির্ভাব।
রেতোধা পুরুষ হইল উদ্ভূত অসীম মহিমা অসীম বিভাব।
দিকে দিকে রশ্মি বিচ্ছুরিত, ঊর্ধ্বে প্রযতি স্বধা নিম্নভাগে।
কে জানে সে তত্ত্ব কেবা রবে নীচে কেহ নাহি জাগে।।
সৃষ্টি হইয়াছে কি হয় নাই দেবতারা নাহি জানে।
সৃষ্টির পর দেবের প্রকাশ আদি তত্ত্ব কথা বলিবে কেমনে।।
পরম ব্যোমেতে অধ্যক্ষ যিনি, অনন্ত যাঁর বিচিত্রতা।
হয়তো তিনি জানেন, হয়তো তিনি জানেন না নিজ রহস্যময় প্রকটন কথা।

হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত

'হিরণ্যগর্ভ' শীর্ষক স্তোত্রে শ্রীহরির প্রকাশরূপ ও তৎসম্পর্কিত রহস্যের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে। এই রহস্যের সাবলীল বিকাশ ঘটিয়াছে বৈদিক ঋষির চিন্তার ফল্গুধারায়।

সৃষ্টির আনন্দেই স্রষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব অচিন্তনীয়, তাঁহার বিকাশতত্ত্ব অভাবনীয়। ঋগ্বেদের ঋষি ক্রমবিবর্তনের তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহাদের ভাষা কাব্য-সুষমা-মণ্ডিত, প্রতীকী এবং রহস্যাবৃত। হিরণ্যগর্ভের মত প্রতীকী তত্ত্বের উপলব্ধি একমাত্র সাধকের পক্ষেই সম্ভব। ঈশ্বর আবির্ভূত হন নাই। তিনি আছেনই। তিনি নিত্য বর্তমান। অনাদির আদি তিনি।

'হিরণ্যগর্ভে'র ভাবার্থ হইল এই যে, একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলিয়াই আসিতেছে অনাদি অনন্তের গর্ভে। ঈশ্বরের আবির্ভাব জন্ম-মৃত্যুর জালে আবদ্ধ নহে। তবুও ঈশ্বরের জন্ম হয়। যাঁহার জন্ম নাই, তাঁহারই জন্ম রহস্য লইয়া ঋষির ভাবনা — হিরণ্যগর্ভ তত্ত্বের অবতারণা। যিনি আবির্ভূত হইলেন, তিনি নিজেই স্রষ্টা; তিনিই বিশ্ব-নিয়ন্তা, তিনিই জীবন-ছন্দের সুরকার, তিনি বিশ্ব-ঐক্যের রূপকার।

হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত। ঋগ্বেদ, ১০/১২১ সূক্ত। দেবতা—কঃ (প্রজাপতি)। ঋষি — হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য। ছন্দ — ত্রিষ্টুপ্।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।২
যো প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৩
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া মহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৪
যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।

যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৬
আপো হ যদ্‌বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্ দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৮
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।। ৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।।" ১০

অনুবাদ ('বেদ শ্রীঃ' হইতে) — "আদিতে শুধু হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রেই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্ব-স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন। এহেন প্রজাপতি হিরণ্য-গর্ভকে আহুতি দ্রব্যের দ্বারা পরিচর্যা করিব। ১।

যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার বিধান সমস্ত দেবগণ মান্য করেন, (কর্মভেদে) যাঁহার ছায়া অমৃত এবং মৃত্যুও বটে, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ২।

যিনি স্বীয় মহিমায় জীবন্ত ও চলন্ত জগতের একচ্ছত্র রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণিসমূহের ঈশ্বর, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৩।

যিনি স্বীয় মহিমায় হিমবান্ উচ্চপর্বত সমূহ এবং জলের দ্বারা বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, দিক্‌গুলি যাঁহার বাহু, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৪।

যিনি সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সূর্য ও স্বর্গকে উপরে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আকাশে উদক নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৫।

আকাশ ও পৃথিবী দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইবার পর প্রজাপতি মনে মনে স্বীয় কার্য অবলোকন করিয়া হৃষ্ট ও দীপ্যমান হইলেন। যাঁহার আশ্রয়ে সূর্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইয়া উদিত ও উদ্ভাসিত হন, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৬।

জাগতিক বস্তুজাতের (মূলে অগ্নি উপলক্ষণ মাত্র) জন্মদাত্রী জলরাশি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলে তাহা যেন একটি (হিরণ্যবর্ণ) ডিম্বাকার ধারণ করে এবং তাহা হইতে দেবাদির এবং যাবতীয় জীবের প্রাণাত্মক এক অদ্বিতীয় প্রাণশক্তি প্রজাপতির উদ্ভব হইল, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৭।

প্রজাপতি জন্মিয়াই স্বীয় মহিমায় এই বারিরাশি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র এই (গর্ভধারিণী) জলরাশি হইতে জাগতিক বস্তুসমূহের উদ্ভব হইল। প্রজাপতি হইতে দেবাদি ও জীবজগৎ সৃষ্টি হইল। সুতরাং যজ্ঞের পক্ষে উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদির উদ্ভব হইল এবং প্রজাপতি স্বয়ং দেবতাদের এক ও অদ্বিতীয় অধিদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই যে প্রজাপতি ইহাকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৮।

প্রজাপতি জগতের জন্মদাতা, ধর্মজগৎ ধারণকারী এবং সত্যস্বরূপ। ইনি আবার সমস্ত লোকের জনয়িতা। জগতের আনন্দবর্ধক যে মহৎ বারি-রাশি — তাহাও তিনি দিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের হিংসা করিবেন না, এই প্রার্থনা করি। এহেন প্রজাপতিকে আমরা আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৯।"

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ — "সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান্ ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ১

যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ২

যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এ সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৩

যাঁর মহিমাদ্বারা এ সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টিবলে উল্লিখিত হয়, এ সকল দিক্-বিদিক্ যাঁর বাহু স্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৪

এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাকলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৫

দ্যাবা-পৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল, এবং সে দীপ্তিশীল দ্যাবা-পৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পারল, যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য— উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৬

ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, তারা গর্ভ ধারণ পূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল। তা হতে দেবতাদের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব?" ৭

যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সে জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৮

যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করব? ৯

হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারেনি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই। ১০

''কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'' কাহাকে আহুতি দান করিব? ঋ. ১০/১২১ সূক্তের এই অর্থ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন। 'কস্মৈ' কাহাকে নহে, ইহার অর্থ প্রজাপতিকে। কারণ এই ঋ. ১০/১২১ সূক্তের শেষ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন —

''প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।'' ১০

শুধু প্রজাপতিকে আহুতি দিলেই আমরা পূর্ণকাম ও ধনাধ্যক্ষ হইব। আবার আহুতি কালে যে সব মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রায় সকলের ঋষিই প্রজাপতি। সিসৃক্ষ পরব্রহ্মের প্রথম অবস্থা, তার পরের অবস্থা হিরণ্যগর্ভ। কারণ হিরণ্যগর্ভকে প্রজাপত্য বা প্রজাপতি বা প্রজাপতি - সম্ভূত বলা হইয়াছে, আর সর্বশেষ অবস্থা বিরাট্ পুরুষ — পুরুষোত্তম, তাঁহার মধ্যেই জগৎ রহিয়াছে।

(এই শেষ দশম মন্ত্রের অনুবাদও 'বেদ শ্রীঃ' হইতে দিতেছি।)

''প্রজাপতি, একমাত্র তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। অন্য কেহই ইহা পারিত না। তাই আমরা অভিলাষ পূর্তির জন্য আবশ্যকবোধ করিলে তোমাকেই আহুতি দিব। তাহা হইলেই আমরা বিপুল ধনের অধীশ্বর হইব। (অন্য কাহারও কাছে যাইব না, শুধু যজ্ঞ করিব।)''

প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থে সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১/২৪/১-২ মন্ত্রে ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে —

''কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা আদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ।।১
অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুর্নদাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ।।২''

হংসবতী ঋক্

"হংস শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।।"

মন্ত্রটি হইল ঋগ্বেদের ৪/৪০/৫ মন্ত্র। যজুর্বেদের ১০/২৪ এবং ১২/১৪ মন্ত্রও এই হংসবতী ঋক্। এই মন্ত্রটির ঋষি বামদেব। মন্ত্রটির লক্ষীভূত পরম বস্তু পরমাত্মা পরব্রহ্ম। মন্ত্রটি অতিশয় বিশিষ্টতাপূর্ণ বলিয়াই বারংবার আম্নাত হইয়াছে। মন্ত্রের যথাযথ রহস্য বুঝা কঠিন। শব্দের অর্থ অনুসারে কিছু ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মন্ত্রটির লক্ষীভূত পরম বস্তু পরব্রহ্ম ইহা পূর্বে বলিয়াছি। একটু ছোট করিয়া দেখিলে সূর্যকে বুঝায়। আবার আর একটু সংকীর্ণ করিয়া দেখিলে জীবাত্মাকে বুঝায়। আরও একটু ছোট করিয়া দেখিলে প্রাণবায়ুকে নির্দেশ করে।

পরমাত্মা পরব্রহ্মকে স্তব করা হইয়াছে দীপ্তিমান্ আদিত্যরূপে, প্রাণিগণের প্রেরকরূপে, অন্তরিক্ষস্থ বায়ুরূপে এবং দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নিরূপে। অগ্নি যেন যজ্ঞবেদীতে স্থিত — এই রূপে। আর স্তব করা হইয়াছে সকলের পূজ্য অতিথিরূপে, যজ্ঞগৃহে অবস্থানকারী আহ্বনীয়রূপে। ইনি মনুষ্যের প্রাণে স্থিত, উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থানকারী আদিত্যমণ্ডলরূপে আকাশে স্থিত। ইনি চতুর্বিধ ভূতস্বরূপে অবস্থান করেন অগ্নিরূপে, পাষাণে স্থিত জলরূপে, মেঘে অবস্থিত তিনি সর্বত্রগামী। তিনি সত্যে জাত, মহান্। বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে, এই মন্ত্র পরমব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। সকল উৎকৃষ্ট বস্তুতেই তিনি থাকেন বাস করেন, এই কথা গীতাও বলিয়াছেন —

"যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ।।"

বৃক্ষের ডাল-পালা পত্র-পুষ্পে বৃক্ষের জীবনীশক্তি বিরাজমান। গীতা বলিয়াছেন, জগতে যত উৎকৃষ্ট বস্তু, সকলই তাঁহার অংশ। সুতরাং জগতের সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুতেই ব্রহ্ম বিরাজমান, শ্রীভগবান্ তাহাতে অবস্থান করেন।

পরব্রহ্ম যেন একটি রাজহংস। তিনি সতত ঊর্ধ্বে উড়িয়া চলিয়াছেন প্রতিহত অসীম আনন্দাভিমুখে।

সূর্যকে বেদ বলিয়াছেন সুপর্ণ ও আকাশের বিহঙ্গম বহ্নি। সূর্যকে জগতের আত্মা বলিয়াছেন। আমাদের সৌরজগৎকে সূর্যের তেজ জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যাহ্ন বেলার আকাশে সূর্য যখন শিরোপরি তখন তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল ব্রহ্ম। সমস্ত দেবগণের মূল বিষ্ণু। বিষ্ণুর চরণে মধুর উৎস বলা হইয়াছে। এই মধু-ব্রহ্মই বিশ্বের মাধুর্যময় পরমাত্মা। সুতরাং এই হংসমন্ত্রও বিষ্ণুস্বরূপ সূর্যদেবতার মন্ত্র।

এই হংস মন্ত্রের লক্ষ্য বস্তু জীবাত্মাও হইতে পারে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩/১৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলয়াতে বহিঃ।" এই নবদ্বারপুরে দেহীরূপ যে জীবাত্মা, সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ একই। পার্থক্য মাত্র এই, জীবাত্মা-পাখীর মুখখানি বাহিরের দিকে, সে বাহিরের বস্তুসকলকে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লেহন করিতে করিতে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেছে। এই পাখী ইন্দ্রিয়ভোগী। শ্রুতি দুইটি পাখীর প্রসঙ্গে একটি পাখী পিপ্পল খায় (তয়োরেকং পিপ্পলং অশ্নাতি) বলিয়া এই জীবাত্মরূপী পাখীর কথাই বলিয়াছেন। যে পাখীটি শুদ্ধ পরমাত্মা, সে মায়াশক্তির আবরণে ভোগী-পাখী হইয়াছে। এই হংস মন্ত্রে সেই ভোগীপাখীটিই উদ্দিষ্ট।

এই দেহমধ্যে যে একটি প্রাণবায়ু তাহার নাম মুখ্যপ্রাণ। হংস, মন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু সেই মুখ্যপ্রাণও। এ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় পাখীর চিন্তন নহে, পাখীর আলাপ বা ধ্বনির স্মরণ। মুখ্যপ্রাণের সর্বদা উচ্চারিত ধ্বনিটি হইতেছে 'হংস'। এই 'হংস' মন্ত্রটি জপ করিতে করিতে 'সোঽহং'-এর মত উচ্চারিত হয়। 'সোঽহং'-এর অর্থ, সেই বস্তু আমি (সঃ-অহং)। 'আমি জীবাত্মা, আমি সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।' সুতরাং এই মন্ত্র জপের ফলে জীবাত্মা হংস আপন স্বরূপে স্থিত হইতে পারে।

প্রতিদিন শ্বাসে শ্বাসে এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়া থাকে কয়েক সহস্রবার।

"বিনা শিবোক্তি দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী।"

জীব প্রতিদিন ইহা ২১,৬০০ বার জপ করে। এই উচ্চারণকে তন্ত্রাচার্যেরা বলেন অজপা জপ। সাধক যদি তাঁহার মনটিকে ঐ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান জাগ্রত হয়। এই অজপা জপের ফলে জীবাত্মা-পরমাত্মার অভিন্নতা

পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমি ক্ষুদ্র জীবাত্মা, এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যাইবে। 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্য গুলিও ঐ একই কার্য সাধন করে। ভ্রান্তির অপসারণ ও স্বরূপে স্থিতি এই দুই কার্যই একবারে সাধিত হয়।

সুতরাং হংস মন্ত্রের চারিটি রূপ পাইলাম : পরমাত্মা রূপে, সূর্যরূপে, জীবাত্মারূপে ও পরমাত্মা-জীবাত্মার একাত্মতার অনুভবের মন্ত্ররূপে। শেষ অর্থে ঐ শুচিষদ্, বেদিষদ্, নৃষদ্, বরসদ্ এই বিশেষণগুলি এই মন্ত্রটিরই বিশেষণ হইবে, পাখীটির নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২/৩ মন্ত্রে এই হংস-পক্ষীর কথাই বর্ণনা এক অপূর্ব ভঙ্গীতে আম্নাত হইয়াছে— "তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

"যজুর্মন্ত্র (যজুর্মন্ত্র বিষয়ক মনোবৃত্তি) তাঁহার মস্তক, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, ব্রাহ্মণভাগ দেহমধ্যভাগ, এবং অথর্ববেদ স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছ।"

সংজ্ঞান-সূক্ত

ঋগ্বেদ, ১০/৭১ সূক্ত।

বেদ অপৌরুষেয়। দিব্যজ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ এই মহাগ্রন্থ। প্রতিটি সূক্তেই জ্ঞানের প্রদীপ্ত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে, সত্যের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানসূক্তে জ্ঞানচেতনার চরম ও পরম বিকাশ সাধিত হইয়াছে। এই সূক্তের একাদশটি মন্ত্রই বেদের শ্রোতৃবর্গকে পরমজ্ঞানের সন্ধান দিয়া চিরন্তন আলোর জগতে লইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানসূক্তের ঋষি বৃহস্পতি। তিনি শাশ্বত সত্যের বাঙ্‌ময় বিগ্রহ। জৈমিনি-ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ' (১/২৫/১০)। বৃহস্পতি স্বয়ং বেদব্রহ্ম। জ্ঞানসূক্তের তত্ত্বে দেবতা ও ঋষি এক হইয়া মহাজ্ঞানের আলোতে দেদীপ্যমান।

প্রথম মন্ত্রটি পবিত্র শব্দ (বাক্) সম্পর্কিত। শব্দের উৎস কোথায়? বাক্ আসিল কোথা হইতে? দ্রষ্টা ঋষিরা মানবের কল্যাণার্থে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকে শব্দে রূপ দিয়াছেন। বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া দেবতা বলিতেছেন, যিনি আদি বাক্, বিশ্বপ্রপঞ্চকে রূপ দিয়া আপন চেতনায় ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিহিত আছেন হৃদয়-গুহায়, তাঁহারই কৃপাশক্তিতে, ভালোবাসার শক্তিতে, অন্তর-হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন সেই প্রথম বাক্ । জ্ঞানিগণ বিবেক-বিচারের মাধ্যমে বাক্যকে শুদ্ধ ও পবিত্র করেন — শব্দ ও অর্থের মিলন-সাধন করেন। বাক্যের এই শোধন-ক্রিয়া যজ্ঞ-সদৃশ। ঋষিরা হৃদয়ে এই বাণী ধারণ করেন এবং এই দিব্যবাণী চারিদিকে ছড়াইয়া দেন। বেদমন্ত্রের মহাশক্তি এইভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে। এই দিব্যবাণী সকলের কর্ণগোচর হয় না — বোধগম্য হয় না। চক্ষু থাকিলেও দেখা যায় না, কর্ণ থাকিলেও শোনা যায় না। কৃপা করিয়া যদি তিনি তাঁর জ্ঞানময়রূপ তুলিয়া ধরেন তবেই তাহা বোধগম্য হয়। পতির নিকট পত্নী যেমন তাঁহার রূপরাশি অনাবৃত করিয়া ধরেন, ঠিক তেমনই জ্ঞানের দেবী যদি তাঁহার জ্ঞান-রূপ মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলেই গ্রহীতার বোধগম্য হয়।

বেদের গুহ্যতত্ত্ব অনুধাবন বা উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা বেদপাঠ করেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টা ফলপুষ্পহীন বৃক্ষকে পরিচর্যা করারই মত,

কারণ, যেসব জ্ঞানী বাণীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, গূঢ়ার্থ পাইয়াও পান নাই। যাহারা বেদবাণীর মঙ্গল-সূত্রের সন্ধান পায় না বা রাখে না, তাহাদের কথায় কোন সারবস্তু থাকে না। তাহাদের সবই মিথ্যা, বৃথা।

চক্ষু কর্ণ সকলেরই আছে। এই অর্থে সকলেই সমান। কিন্তু জ্ঞান সামর্থ্যের বিচারে মনের গতি অসমান। কেউ অল্প মেধাশক্তি সম্পন্ন, কেউ মধ্যমপ্রাজ্ঞ, কেউ বা গম্ভীর প্রাজ্ঞ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়া বেদবিদ্যা আলোচনা করিলেই 'শব্দ' হৃদয়ঙ্গম হয় না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার জ্ঞানবৃত্তির মাধ্যমে গভীরে প্রবেশ করিয়া শব্দের মর্মার্থ উপলব্ধি ও দর্শন করেন।

যে ব্যক্তি অপরা বা পরাবিদ্যায় বিচরণ করে না, যে ব্যক্তি বেদবিদ্যাপরায়ণ বা যজ্ঞপরায়ণ নহে, এমন ব্যক্তিদের বেদবাণী লাভ হইলেও পাপবুদ্ধি থাকিয়াই যায়। লৌকিক বুদ্ধির ঊর্ধ্বে সে উঠিতে পারে না।

বেদবাণীতে সম-অধিকারী ব্যক্তিবর্গ একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বলাভের মাধ্যমে আনন্দসাগরে বিরাজ করেন। এই কল্যাণকারী বেদজ্ঞ অজ্ঞানতা-নাশ করিয়া জ্ঞানামৃতের প্লাবন বহাইয়া দিয়া জগৎকে মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত করেন।

জ্ঞানসূক্তের শেষ মন্ত্রে আধ্যাত্মিক, যাজ্ঞিক এবং দৈবত ভাবধারার মহাসম্মেলন ঘটিয়াছে। দিব্যজ্ঞানই যজ্ঞ। যজ্ঞশীল হইয়া বা দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়াই বাক্-মূর্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। জ্ঞানসূক্ত এই পরম সত্যেরই সন্ধান দিয়াছেন। জ্ঞানসূক্তের তাৎপর্য তথা মহিমার সহিত পরবর্তীকালের শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের তুলনা করা যাইতে পারে।

সংজ্ঞান-সূক্ত। ঋগ্বেদ, ১০/৭১ সূক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, ৯ম মন্ত্রটি জগতী ছন্দ।।

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।।১
সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।।২
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে।।৩
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।।৪
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।

অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্।।৫
যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্।।৬
অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে।।৭
হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্ত্যু ত্বে।।৮
ইমে যে নার্বাঙ্‌ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ।। ৯
সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষনির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায়।।১০
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ।।১১"

শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য কৃত 'মর্ত্যেষু অমৃত' গ্রন্থের অনুবাদ অবলম্বনে — হে বৃহস্পতি, যিনি প্রথম বাক্ মন্ত্রের প্রথম জাগরণের দেবতা, অগ্রে পুরোভাগে আমাদের প্রেরণা দিয়া চালিত করেন, এই সমগ্র জগৎকে যিনি নাম ও রূপ দিয়া আপন চেতনায় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; যাহা এই জগতের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র প্রেরণারূপে যিনি বিরাজিত আছেন সেই তিনিই নিহিত হইয়াছেন অন্তঃকরণের হৃদয়-গুহায়। সেইস্থান হইতেই তাঁহার আবির্ভাব। ১।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনের বিচার দ্বারা বাক্যকে শুদ্ধ করেন, যেমন এক প্রকার চালুনির দ্বারা যবের ছাতু পরিষ্কার করিয়া নেওয়া হয় তদ্রূপ এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরস্পর প্রেম ও সখ্য সহকারে শব্দ ও অর্থের সম্মিলন সাধন করেন। শব্দ ও অর্থ পরস্পর বন্ধুর মত হইয়া উঠেন। তাঁহারা জানেন, কল্যাণময়ী বাক্‌লক্ষ্মী ঊর্ধ্বে নিহিত থাকিয়া ঐস্থানেই বিরাজ করেন। ২।

বাক্যের যে শোধন ক্রিয়া, ইহা একটি যজ্ঞের মত। যজ্ঞের দ্বারা বাণীর চলিবার পথকে জ্ঞানীরা জানেন। এইভাবেই জানিয়া শুদ্ধা বাণীকে ঋষি আহরণ করিয়া ধারণ করেন, সকল দিকে সম্প্রসারিত করেন। এইভাবে বেদের সপ্ত ছন্দ সর্বত্র প্রসারিত হইয়া ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়। বেদমন্ত্রের হৃদয়ের স্পন্দন সর্বত্র ছড়াইয়া যায়। ৩।

দিব্য-বাণীকে দেখিলেও সম্যক্ দর্শন করে না, শুনিলেও সম্যক্ শ্রবণ করে না। সেই দিব্য-বাণী একমাত্র তাঁহার কাছেই জ্ঞানময় রূপ প্রকাশ করেন, সুবেশা পত্নী যেমন পতির কাছে তাঁহার তনুশ্রী অনাবৃত করেন। ৪।

পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানধারাকে স্থিরভাবে পান করিয়াছেন,

তাঁহারা বলেন, বাণীর গভীর অর্থ আমরা পাইয়াও পাই নাই। যাঁহারা বাণীর গভীর অর্থ জানেন না তাঁহারা মিথ্যা মায়ার মধ্যে বিচরণ করেন। নিগূঢ় তাৎপর্যজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যাঁহারা বেদপাঠ করেন তাঁহারা দুগ্ধহীনা গভীর মত, ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের সেবা করেন মাত্র। তাঁহাদের বাণীর সেবা নিষ্ফল। ৫।

যে বেদমন্ত্রের মত পথের সাথী বন্ধুকে ত্যাগ করে তাহার বাক্যের কোন সারবত্তা থাকে না। সে যাহা কিছু শুনে অলীক, মিথ্যা শুনে। যেহেতু সুকৃতির মঙ্গলের পথ সে কিছুই জানে না। ৬।

সকলেরই চক্ষু আছে, কান আছে, তাই সকলেই সমান। কিন্তু জ্ঞান-সামর্থ্যের দিক্ হইতে তাহারা অসমান হইয়া থাকে। যাহাদের বেদবাণী সম্পর্কে অল্পজ্ঞান তাহারা কোমর-জলে দাঁড়াইয়া আছে। যাঁহাদের মুখ পর্যন্ত নিমগ্ন তাঁহারা মধ্যমপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, আর যাঁহারা সুগভীর জলে নিত্য ডুবাইয়া স্নান করেন তাঁহারা গম্ভীরপ্রজ্ঞা বিশিষ্ট পুরুষ। ৭।

যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ একসাথে বেদবিদ্যা আলোচনা করেন এবং হৃদয় দিয়া বাণীতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করেন তখন বেদস্নাত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপন জ্ঞানবৃত্তিসহ জ্ঞান-গভীরে বিচরণ করেন। ৮।

যে সকল ব্যক্তি ইহকালের অপরা বিদ্যাতে বিচরণ করে না আর পরা বিদ্যাতেও বিচরণ করে না, এবং বেদবিদ্যা-পরায়ণও নহে, যজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্ম-পরায়ণও নহে, সে প্রকৃত অজ্ঞানী। তাহার বেদবাণী কণ্ঠস্থ থাকিলেও পাপ-বুদ্ধি দূর হয় না। সে দেহের ইন্দ্রিয়জালে আবদ্ধ থাকে। সে কেবল লাঙ্গল চাষ করে, তাঁত বোনে। এই সকল সামান্য লৌকিক-ব্যবহারে মূল্যবান জীবন সীমাবদ্ধ রাখে। ৯।

যাঁহারা সমজ্ঞানী বন্ধুগণসহিত মিত্রতালাপ করিয়া সর্বদা বাণীর ধ্যানে আনন্দিত থাকেন তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের পরশে পাপ নাশ হয়। অজ্ঞান দূর হয়। তাঁহারা বেদবাণীর ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানের অমৃতধারা পান করেন এবং করান। তাঁহারা জগতের অশেষ কল্যাণকামী হন। ১০।

এই দিব্যজ্ঞান ইহা একটি যজ্ঞ। জ্ঞানই যজ্ঞ। যে-কোন শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-কর্মই যজ্ঞ। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞও বেদের জ্ঞানযজ্ঞের মূর্তপ্রতীক, তাহার আধ্যাত্মিক বিনিয়োগ। যিনি প্রকৃত বেদবেত্তা তিনি মন্ত্রকে পোষণ করেন। ধ্যানের দ্বারা জাগ্রত করেন। ক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পুষ্ট হইয়া উঠেন। অন্যকেও আধ্যাত্মিক তেজে পুষ্ট করিতে সমর্থ হন। সর্ববেদজ্ঞ ব্রহ্মা সৃষ্টির সম্ভূতির মূলীভূত বিদ্যার মূল-প্রবক্তা। আর সৃষ্টির যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তার ও বিলয়ের যে-জ্ঞান তাহার উপদেষ্টা। তিনি সৃষ্টিকর্মের যজ্ঞের যজ্ঞপুরুষের স্বরূপ-জ্ঞাতা ও মাত্রা নির্ধারণ করেন। ১১।”

কামসূক্ত

অথর্ববেদ, ১৯ কাণ্ড, ৫২ সূক্ত।

“কামস্তদগ্রে সমবর্তত মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

স কাম কামেন বৃহতা সযোনী রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি।।”১।।

“সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পরমেশ্বরের মনে কাম উৎপন্ন হয়েছিল অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা জেগেছিল। অতীত কল্পে প্রপঞ্চের বীজরূপ, প্রাণীদের কৃত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম পরিপক্ক হয়ে ফলোন্মুখ ছিল, সে'জন্য ফলদাতা, সর্বসাক্ষী, কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মেছিল। হে কাম, সর্বজগৎ সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর কর্তৃক উৎপাদিত তুমি, মহান্ দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরের সাথে সমানকারণ হয়ে (অর্থাৎ কারণান্তর রহিত হয়ে) হবিঃপ্রদাতা যজমানকে ধনপুষ্টি দাও।”

“ত্বং কাম সহসাসি প্রতিষ্ঠিতো বিভুর্বিভাবা সখ আ সখীয়তে।

ত্বমুগ্রঃ পৃতনাসু সাসহিঃ সহ ওজো যজমানায় ধেহি।।” ২।।

“হে কাম, তুমি শত্রুধর্ষণ সামর্থ্যে প্রতিষ্ঠিত, সর্বব্যাপক ও বিশেষরূপে দীপ্ত। হে সখা, আমাদের প্রতি সখার মত আচরণ কর। হে কাম, তুমি তীব্র বলযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুর পরাক্রম সহ্য করে থাক। শত্রুধর্ষণরূপ সেই সামর্থ্য ও বল যজমানকে দাও।”

“দূরাচ্চকমানায় প্রতিপাণায়াক্ষয়ে।

আস্মা অশৃণ্বন্নাশাঃ কামেনাজনয়ন্ত্স্বঃ।।” ৩।।

“দূরবিষয়ে অতিদুর্লভ ফলকামনাকারী এ-ব্যক্তির অভিমত ফল-প্রাপ্তির জন্য এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য পূর্বাদি সকল দিক্ অঙ্গীকার করে' কামের দ্বারা সুখ উৎপন্ন করেছে।”

“কামেন মা কাম আগন্ হৃদয়াদ্ধৃদয়ং পরি।

যদমীষামদো মনস্তদৈতূপ মামিহ।।” ৪।।

“ফলবিষয়ক ইচ্ছার দ্বারা কাম্যমান ফল আমার কাছে আসুক। জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে কামনাকারী নব ব্রহ্মা যে মন (অস্তিত্ব-ভাবনা-নিমিত্তক) ছিল, তা তাদের হৃদয় থেকে ফলকামী আমার হৃদয়ে আসুক।”

“যৎ কাম কাময়মানা ইদং কৃণ্মসি তে হবিঃ।

তন্নঃ সর্বং সমৃধ্যতামথৈতস্য হবিষো বীহি স্বাহা।।” ৫।।

“হে কাম, আমরা ফলকামনা করে তোমার উদ্দেশ্যে যে চরু-

পুরোডাশাদি হবি দিচ্ছি, তা তুমি ভক্ষণ কর, এই হবি স্বাহা-মন্ত্রে অর্পিত হোক এবং আমাদের কাম্যমান সকল ফল পূর্ণ হোক।”

অথর্ববেদ। কামদেবতা। ২ সূক্ত। ১৯-২১; ২৩-২৫ মন্ত্র।

শ্রীরায়মুণ্ড পানিক্কার-কৃত উক্তমন্ত্রসমূহের ইংরাজী অনুবাদ, (পৃষ্ঠা, 242 হইতে)।

কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি।। ১৯।।

19. Love is the firstborn, loftier than the Gods,
The Fathers and men.
You, O Love, are the eldest of all, altogether mighty.
To you we pay homage!

যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্ণা যাবদাপঃ সিষ্যদুর্যাবদগ্নিঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি।।২০।।

20. Greater than the breadth of Earth and Heaven
Or of Waters and Fire,
You, O Love, are the eldest of all, altogether mighty.
To you we pay homage!

যাবতীর্দিশঃ প্রদিশো বিষুচীর্যাবতীরাশা অভিচক্ষণা দিবঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি।।২১।।

21. Greater than the quarters and directions,
The expanses and vistas of the sky,
You, O Love, are the eldest of all, altogether mighty.
To you we pay homage!

জ্যায়ান্ নিমিষতোঽসি তিষ্ঠতো জ্যায়ান্ত্সমুদ্রাদসি কাম মন্যো।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি।। ২৩।।

23. Greater than all things moving and inert,
Than the ocean, O Passion,
You, O Love, are the eldest of all, altogether mighty.
To you we pay homage!

ন বৈ বাতশ্চন কামমাপ্নোতি নাগ্নিঃ সূর্যো নোত চন্দ্রমাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি।। ২৪।।

24. Beyond the reach of Wind or Fire,

The Sun or the Moon,

You, O Love, are the eldest of all, altogether mighty.

To you we pay homage!

যাস্তে শিবাস্তন্বঃ কাম ভদ্রা যাভিঃ সত্যং ভবতি যদ্ বৃণীষে।
তাভিষ্টমস্মাঁ অভিসংবিশস্বান্যত্র পাপীরপ বেশয়া ধিয়ঃ।। ২৫।।

25. In many a form of goodness, O Love,

You show your face.

Grant that these forms may penetrate within our hearts.

Send elsewhere all malice!"

স্কম্ভসূক্ত

মহাজাগতিক স্তম্ভ

স্কম্ভ সূক্তটি অর্থবেদের ১০ম কাণ্ডের ৭ম সূক্ত। ঋগ্বেদে ৩/৬১/৭ মন্ত্রে 'ঋতস্য বুধ্ন' প্রসঙ্গে ও ঋ. ১/৬৭/৫ মন্ত্রে 'তস্তম্ভ দ্যাম্' প্রসঙ্গে স্তম্ভের কথা আলোচিত হইয়াছে। অথর্ববেদে বেশ কিছুবার বলিয়াছেন।

মানুষ এবং মহাজগৎ, প্রত্যেকে ভিন্ন বিধানে অনুশাসিত হইলেও, ইহারা দুইটি ভিন্ন সৃষ্টি নহে। একটি কেন্দ্রস্থল আছে যাহার কোন আয়তন নাই, অর্থাৎ যাহা সব কিছুর নির্দেশক বিন্দু হইয়াও তাহাদের কোন অংশ নয়। সেই স্থলটি সব কিছুর ভূমি, সব কিছুর অবলম্বন। এই স্কম্ভের যথার্থ জ্ঞানোদয় হইলে এই জগতের রহস্যের উপলব্ধি আসে, ব্রহ্মের সন্ধান মেলে এবং জগতের গুপ্তসম্পদের সাংকেতিক অঙ্কের উদ্ধার সাধিত হয়।

সূক্তের সর্বত্রই ক্রমাগত প্রশ্ন — স্কম্ভটি কি? তিনি কে?

''কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধি তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্।।১।।
কস্মাদঙ্গাদ্ দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাদ্ বি মিমীতেঽধি চন্দ্রমা মহ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম্।।২।।''

ইহা এই প্রথম সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র। পরবর্তী দ্বিতীয় স্কম্ভ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে তাঁহাকে 'তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ' বলা হইয়াছে।

স্কম্ভ হইতেছেন সনাতনতম দেবতা, ব্রহ্মারও পূর্ববর্তী, এইজন্য তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম বলা হয়। তাঁহাতে সব কিছুই অবস্থান করিতেছে এবং সব কিছু ইহার দ্বারা আবিষ্ট রহিয়াছে।

এই সূক্তের উপর ধ্যান দিলে একটি ক্রম-বৃদ্ধি পর্যায় পরিলক্ষিত হইবে। স্কম্ভটি জ্ঞানমার্গীয় ও অধ্যাত্ম — এতদুভয়ের অনুমিতি বা প্রকল্প, যাহা পরাৎপর তত্ত্বকে বোধগম্য করিতে এবং উহার বহুধা প্রকাশকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে প্রয়োজন হয়। একত্বের দিকে বেশ খানিকটা অগ্রসর না হইলে কোন কিছুই বোধগম্য হইবে না। একত্ব কখনই বহুত্বের সমস্তরে থাকিতে পারে না। একত্বের স্থান আরও গভীরে। জ্ঞানমার্গীয় বহুত্ব অধ্যাত্ম-মার্গীয় একত্বকে অস্বীকার করে না। আধ্যাত্মিক ক্রমধারাটিকেও জ্ঞানমার্গীয় ক্রমধারা অপেক্ষা কম নহে, বরং একটু

বেশীই পরিত্যাগ করিতে হইবে। বেদের অন্তর্দৃষ্টিতে তখন মনে হইবে, স্কম্ভ যেন জাগতিক প্রপঞ্চ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আধ্যাত্মিক সত্তা হইতে বঞ্চিত পরমতত্ত্বের সবটুকু। স্কম্ভ তাহা নহে, কারণ স্বয়ং পরম-পুরুষের সম্ভাবনা ও শর্ত হিসাবেই স্কম্ভ দাঁড়াইয়া আছে।

উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন পণ্ডিত রায়মুণ্ড পানিক্কার তাঁহার *Vedic Experience* গ্রন্থে স্কম্ভসূক্তের আলোচনার প্রাক্কালে।

"The whole universe resides in Skambha and all values that men acknowledge as authentic are rested in it; faith, worship, sacrifice and all that transcends the emperical level are grounded on it." (*The Vedic Experience*, p. 61)

কর্মকাণ্ডীদের মত হইল— বেদের প্রতিটি অক্ষর নিত্য, সুতরাং তাহার অর্থ-চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। আর জ্ঞানকাণ্ডীরা মনে করিয়াছেন, সংহিতা তো কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং উহাকে স্পর্শ করারও প্রয়োজন নাই। উভয় পক্ষের কাছেই মূল সংহিতা উপেক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীঅনির্বাণ বলেন — "কর্মকাণ্ডীরা একদিকে কর্মের খুঁটিনাটি এবং তার প্রয়োগশুদ্ধি নিয়ে মত্ত থেকে বেদমন্ত্রকে যেমন গভীরভাবে তলিয়ে বোঝবার চেষ্ট করলেন না, জ্ঞানবাদীরাও তেমনি বেদের মন্ত্রাংশকে কর্মকাণ্ডীদের ইজারা-মহল মনে করে তার প্রতি উদাসীন রইলেন। কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে এই কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্ট হওয়ার ফলেই অর্থবিচারের দিক্ দিয়ে বেদমন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে এমন অনাদৃত রয়ে গেল।" (বেদ-মীমাংসা, ১ম, পৃ. ৬)

পণ্ডিতেরা বলেন — এই স্কম্ভসূক্তটিতে স্কম্ভকে বা আত্মাকে তথা বিশ্বাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত। মহাজাগতিক পুরুষপ্রবরের ভাবটিই পুরা সূক্তটিতে অন্তর্নিহিত।

"অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।
প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ।।"
(ঋ. ১/৬৭/৫)

স্বর্গকে দ্যুলোককে সত্যের মন্ত্রশক্তি দিয়ে (মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ) স্তম্ভের মত ধারণ করে রয়েছেন অগ্নি। অগ্নি বিশ্বের চিৎশক্তি এই স্তম্ভস্বরূপ। —"He has up-pillared Heaven with his Mantras of Truth." (*Hymns to the Mystic Fire*, p.223)

স্তম্ভ যেমন ছাদকে ধারণ করে তেমনি প্রধুম জ্যোতিরগ্নি স্তম্ভের মত স্বর্গকে ধারণ করেন, 'ধূমং স্তম্ভায়দুপ দ্যাম্'। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—

"অমূরো হোতা ন্যসাদি বিক্ষগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ।

ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমং স্তভায়দুপ দ্যাম্।।"

(ঋ. ৪/৬/২)

"like a pillar he makes his smoke a prop to heaven." (*HMF*, p. 223)

"বৈশ্বানরায় মীড়্হুষে সজোষাঃ কথা দাশেমাগ্নয়ে বৃহদ্ ভাঃ।
অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ স্তভায়দুপমিন্ন রোধঃ।।"

(ঋ. ৪/৫/১)

"With his vast and ample upbearing he props up the firmament like a pillar." (*HMF*, p. 217)

এই স্তম্ভশক্তির রহস্য হইল বিশ্বজীবনের গভীরতম রহস্য।

"অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্।।"

(ঋ. ৪/১৩/৫)

বিশ্বসত্যের এই মূল স্থিতি—সত্যের কেন্দ্রস্থ অটল আশ্রয় — *axis mundi* — তাকেই বলা হয়েছে 'স্তম্ভ' বা 'স্কম্ভ' — the cosmic pillar। সত্যের এই শাশ্বত 'স্কম্ভ' দ্যুলোক ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। — "দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্" (ঋ. ৪/১৩/৫)।

"The skambha appears as both the epistemic hypothesis and the ontological hypostaesis which are needed to make intelligible and to sustain the manifold aspect of reality......"

"The skambha symbolizes that naked "thatness" *tat-tva*, which renders reality intelligible in its manifold character and also gives a basis to all that is."

"The whole universe resides in *skambha* and all values that Men acknowledge as authentic are rooted in it; faith, worship, sacrifice and all that transcends the emperical level are grounded on it," (*The Vedic Experience*, pp. 61-62)

(ঋ. ১/৬৭/৩)— 'The secrecy of the secret core, (*HMF*, p. 23.)

'ঋতস্য বধ্নঃ'—

"ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্‌বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা।।"

(ঋ. ৩/৬১/৭)

"সত্যের ভিত্তিভূমি। চিন্ময় ভাগবত সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ভিত্তি। সত্যের নাভি, আশ্রয় বা কেন্দ্র। সৃষ্টিশক্তির কূটস্থ ভরকেন্দ্র।"

বুধ্নঃ অর্থ শীর্ষ, চেতনার আধার, ঊর্ধ্বস্থ কেন্দ্র ('ঊর্ধ্ববুধ্নঃ')। অনির্বাণের মতে বুধ্নঃ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বোধস্থান। "the foundation of the Truth, rtasya buddhnah" (*On The Veda*. p. 219), this foundation is therefore identical with the supreme plane." (OV, p. 219)''' (বেদমন্ত্র-মঞ্জরী, পৃ. ৫৫)

'সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ' —

"অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ।
রাজানা ক্ষত্রমহৃণীয়মানা সহস্রস্থূণং বিভৃথ সহ দ্বৌ।।" (ঋ. ৫/৬২/৬)

"সহস্র স্তম্ভসমন্বিত সৌধকে ধরে রয়েছে। বহু স্তম্ভ দ্বারা শক্তির বিপুল সৌধকে ধারণ করে রয়েছেন মিত্র ও বরুণ।"

স্তম্ভ কি করে?

নিম্নের কঠিন ভূমির উপরে ভর দিয়ে ঊর্ধ্বের সৌধকে ধারণ করে থাকে, তেমনি এই পৃথিবীর জড় চেতনার কঠিন ভিত্তির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অধ্যাত্মের দিব্য সত্যের অনন্ত প্রসার, জ্ঞানের শক্তির আনন্দের সৌধমালা। অর্থাৎ এই জগতের উপরেই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু স্তম্ভময় স্বর্গের শক্তি ও ঐশ্বর্য।" (বেদমন্ত্র-মঞ্জুরী, পৃ. ২৫৩)

"হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃস্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ।।"
(ঋ. ৫/৬২/৮)

"এই লৌহস্তম্ভ যত পার্থিব শক্তির দৃঢ়ভিত্তিকে আশ্রয় করে অটল রয়েছে স্বর্গের দিব্য মহিমা।....."

তাহার কোন অঙ্গে তপস্যা বিরাজ করে, কোন অঙ্গে ঋত বাস করে, কোন অঙ্গে ভাব শ্রদ্ধার স্থান, কোন অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত, কোন অঙ্গে তাহার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, কোন অঙ্গে মাতরিশ্বা বহমান, কোন অঙ্গ হইতে চন্দ্রমা পায় পরিমাপের দণ্ড। মহান্ স্কম্ভের আত্মা কে মাপ করিবে? কোন অঙ্গে তাহার এই পৃথিবী, কোন অঙ্গে অন্তরিক্ষ, গগন স্থির আছে কোন অঙ্গে। আকাশের বাহিরে যাহা তাহাই বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে? অগ্নিকে ঊর্ধ্বে চালায় কে? বাতাস প্রবাহিত কাহার দিকে? কম্পাসের কাঁটা সর্বদা কাহার দিকে হেলিয়া আছে? বল দেখি সেই স্কম্ভটি কি?

কাহার উদ্দেশে পক্ষ মাস অগ্রসর হয় সংবৎসর পানে? ঋতুগুলি কাহার দিকে অগ্রসর হয়? দুইবোনের মত দিবারাত্র ছুটে কাহার উদ্দেশে?

স্বয়ং প্রজাপতি কাহার আশ্রয় খোঁজে? কিসের শক্তি বিশ্ব ধরিয়া আছে? উত্তম অধম মধ্যম সব কাহাকে ধরিয়া আছে? সেই আশ্রয়ে তাহা কতখানি প্রবিষ্ট কতখানি অপ্রবিষ্ট? কতখানি অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহাকে ধরিয়া আছে? সহস্র সহস্র অংশ কলা কাহার আশ্রয়ে একীভূত আছে?

স্কম্ভ সম্বন্ধে এত কথা ঋক্‌সংহিতায় ও অথর্বসংহিতায় থাকা সত্ত্বেও উপনিষদ্ বা বেদান্তসূত্র ও সূত্রের ভাষ্যকারেরা ইহার সুযোগ নেন নাই কেন তাহা বুঝা যায় না। এই স্কম্ভকেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে স্পষ্টভাবে।

"যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
সর্বস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।।
স্কম্ভেনেমে বিষ্টভিতে দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ।
স্কম্ভ ইদং সর্বমাত্মবদ্ যৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ।।" (অ. ১০/৭/১-২)

সূক্তটিতে মোট ৪৪টি মন্ত্র আছে। প্রথম দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি প্রারম্ভে। শেষ দিকের আর দুইটি মন্ত্র কহিতেছি —

"অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্‌মনা।
সর্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ।। ৪০
যো বেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ।
স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ।।" ৪১

"In him exists no darkness, no evil.
In him are all the lights, including the three
that are in the Lord of life. The one who knows
the Reed of gold standing up in the water
is truly the mysterious lord of Lives."

(R. Panikkar, p. 66)

ভাবিতে অবাক্ লাগে, ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপনে বিশেষ শক্তিমান্ এই সূক্ত হইতে আচার্য শঙ্কর বা তাঁহার অনুবর্তিগণ কেহই কোন উদ্ধৃতি দেন নাই। শংকর বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য হইতে শত শত উদ্ধৃতি দিয়াছেন কিন্তু সংহিতা হইতে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই বলিলেও চলে। মনে হয় অথর্ববেদ-সংহিতার এই সূক্তটিকেও কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়াছেন। কর্মকাণ্ডের কথা বলিতেই শঙ্কর যেন ভীত। ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন — তাহাও বস্তুত শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতার শেষাংশ ৪০ অধ্যায়ের অন্তর্গত। সংহিতার এই অংশটি যদি উপনিষদের মর্যাদা পায় তাহা হইলে অথর্ব-সংহিতার এই স্কম্ভসূক্তটিও উপনিষদ্ না হইবার কোন কারণ নাই।

পণি ও সরমা

ঋগ্বেদ, ১০/১০৮ সূক্ত। ঋষি ও দেবতা — পণিগণ, সরমা। ছন্দ— ত্রিষ্টুপ্।

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরি পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি।।১
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্‌বঃ।।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবৎ তথা রসায়া অতরং পয়াংসি।।"২

ইন্দ্র পাঠাইয়াছেন সরমাকে পণির কাছে। পণিরা সরমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সরমা! তুমি কি বস্তু ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছ? সুদূর দূরান্ত পারাবারের কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছ? রসাতলে জলরাশি কি করিয়া পার হইয়াছ? তোমার কি আদেশ? সরমা উত্তর করিলেন — হে পণিবৃন্দ! আমি ইন্দ্রের নির্দেশে আসিয়াছি। আমি দূতের কাজ করি। তোমাদের গুপ্তকর্ম্মের সন্ধান লইতে আসিয়াছি —

"কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাহথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি।। ৩
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎ স যস্যেদং দূতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে।।"৪

পণিরা কহিলেন, ইন্দ্র দেখিতে কেমন? তিনি নিজে আসুন, তাঁহাকে আমরা আমাদের গাভীযূথের পতি বানাইয়া দিব। তিনি হবেন আমাদের গো-পতি। তিনি আমাদের বন্ধু হইয়া যাইবেন। সরমা কহিলেন, ইন্দ্রকে কেহ দমন করিতে পারে না। কোন গভীর জলধারা তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না। তোমরা ইন্দ্রের হাতে মরিবে।

"ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্ সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদয়ুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তু তিগ্মা।। ৫
অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ।।" ৬

পণিরা কহিলেন, আমাদের গো-গণের প্রতি তোমাদের লালসা, সেই জন্য আসিয়াছ স্বর্গের প্রান্ত হইতে। কে তাদের ছাড়িয়া দিবে? যুদ্ধ হইবে। আমাদেরও অস্ত্রশস্ত্র আছে। সরমা কহিলেন, তোমাদের বাক্য ব্যর্থ হউক।

তোমাদের পাপদেহ। তোমাদের চলিবার পথ অগম্য হইবে। বৃহস্পতি স্বর্গে বা মর্তে তোমাদের কোন কল্যাণ করিবেন না।

"অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ।। ৭
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অয়াস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ।।" ৮

পণিরা কহিলেন, আমাদের ধনের গুপ্তস্থান পাষাণ দিয়া ঘেরা। সেখানে আছে গো, অশ্ব ও অর্থে পরিপূর্ণ। সুরক্ষী পণির দল তাহা রক্ষা করে। এই গহনস্থানে তুমি বৃথা আসিয়াছ। সরমা বলিলেন, ঐ দেখ ঋষিরা আসিতেছেন। অঙ্গিরা ও অয়াস্য আসিতেছেন, তোমাদের সম্পদ্ তাঁহারা বাঁটিয়া লইবেন। তোমাদের মুখে কথা থাকিবে না।

"এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম।। ৯
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্ যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ।।" ১০

পণিরা কহিলেন, সরমা! তুমি আমাদের ভগ্নী হইয়া এখানে থাক। আমাদের গো-ধনের ভাগ তোমাদিগকেও দিব। তুমি ইন্দ্রের কাছে ফিরিয়া যাইও না। সরমা বলিলেন, আমি ভাই-বোন কুটম্বিতা কিছু বুঝি না। তোমরা জান না ইন্দ্র আর অঙ্গিরা ঋষিরা দারুণ। ভালো চাও তো পালাও। (অপভজাম অর্থ ভাগ দেব।)

"দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্গাবো যন্তু মিনতীর্ঋতেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূল্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ।।" ১১

শোনো পণির দল! ভাল চাও তো দূরে পালাও এখান হইতে। উজ্জ্বল গো-যূথ সত্যে স্থিত হইবে। তোমাদের লুকানো ধন-রাজি বৃহস্পতি খুঁজিয়া বাহির করিয়া অধিকার করিয়াছেন। সোম দেবতা ও পেষণী দেবতা যুগল, উজ্জ্বল ঋষিরা, সকলেই তাঁহারা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। (গ্রাবাণঃ অর্থ পেষণ প্রস্তর)।

আসল কথাটি কি?

এই কথোপকথনের মধ্যে বুঝিবার চেষ্টা করিব। পণিরা দস্যুদল। তাহারা ধন-সম্পত্তি ও গো সমূহ চুরি করিয়া রাখিয়াছে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের চেষ্টা, পণিদের নিকট হইতে এই ধনরত্ন উদ্ধার করা। ইন্দ্র তাঁহার চর সরমাকে পাঠাইলেন পণি দস্যুদের হাবভাব জানিবার জন্য। সরমার পিছনে আসিতেছেন ঋষিগণ, গুরু বৃহস্পতি ও স্বয়ং ইন্দ্র। তাঁহারা শত্রু পরাস্ত করিয়া গোযূথকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।

দেবাসুরের সংগ্রাম পুরাণে বিবৃত আছে। বেদে তাহার বীজ দৃষ্ট হয়। যুদ্ধক্ষেত্র অন্তরে, বাইরে কোন মানুষের নহে। বেদের যুদ্ধ সাধকের অন্তরে, সাধক ভক্তের জীবনে। একদিকে দেব শক্তি আর একদিকে অসুর শক্তি। তাঁহাদের স্বভাব কেমন বিপরীতমুখী তাহা গীতা ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন 'দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ'-এ। সকল মানুষের জীবনেই এই যুদ্ধ আছে। সাধক-জীবনে ইহা স্পষ্টতর। চণ্ডী-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব এই যুদ্ধের নাম করিয়াছেন 'সাধন-সমর'। একদিকে আধিভৌতিক চেতনা আর একদিকে আধ্যাত্মিক চেতনা। একদিকে ভোগৈষণা আর একদিকে ব্রহ্মৈষণা। পার্থিব ভোগ আর পরমার্থিক ভোগ।

পণিরা পার্থিব ভোগের শক্তি। তহাদের নিবাস রসা বা রসাতলে (subconsicious)। অবচেতনার অন্ধকার সমুদ্রে। বেদে দুইটি সাগরের উল্লেখ আছে। একটি উপরের জ্যোতির সাগর, অন্যটি নীচে তমোময় অন্ধকার সাগর। যোগীর ভাষায়, নীচে স্বাধিষ্ঠান, উপরে সহস্রার। স্বাধিষ্ঠান অবচেতনার মূলে ভূলোক আর সহস্রার সত্যলোক। সত্যলোক নিরন্তর নির্মল আনন্দে ডুবিয়া আছে।

মানুষ দেবত্বে উঠিতে চায়। উঠিতে পারে না কেন? পণিদের তমোময় টানে। দেহ-ইন্দ্রিয়ের তমঃ সাধককে বাধা দেয়। নীচের দিকে টানিয়া নামায়। ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনা পণিরা। ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মনের রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্রিয়ের ভোগ টানে নীচের দিকে। আর ইন্দ্র টানে উপরের দিকে। মন সর্বদা দোলায়। মন নীচের দিকে সব সদ্‌গুণকে টানিয়া ডুবাইয়া রাখে। তাই পণির চেতনাকে পূর্ণ জয় করিতে হইলে চাই ইন্দ্রের সহায়তা। ইন্দ্র যে মনের রাজা তাহা বেদ নানাভাবে বলিয়াছেন। ইন্দ্র মন ও দূত — মননশীল। ইন্দ্র মনায়ু। মনন শক্তিতেই তাঁহার আয়ু। ইন্দ্র পুরন্ধ্রী। ধী শক্তির বিগ্রহ। ইন্দ্র গোদা—আলোর দাতা। গো অর্থ আলো জ্যোতি। গোরাজি জ্যোতিঃপুঞ্জ।

ইন্দ্র সরমাকে পাঠাইয়াছেন পণিদের নিকট। সরমা হইল বোধি (Intuition) শক্তি। শুদ্ধ মনে চারটি শক্তি — দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রবণ, বোধি ও বিবেক। ইহাদের বৈদিক নাম ইলা, সরস্বতী, সরমা ও দক্ষিণা। ইলা হইল দিব্য দৃষ্টি (Revelation), সরস্বতী হইল দিব্য শ্রবণ (Inspiration), আর সরমা বোধি (Intuition) এবং দক্ষিণা হইল বিবেক (Discrimination)। ইহারা পরস্পর জড়িত। ইহারা একটি শক্তির বিভিন্ন প্রকার। এই সরমা বা বোধি আসিয়া পণিদের সঙ্গে আলাপ করিল। পণিরা কৌশল করিয়া সরমাকেই তাহাদের দলে টানিতে চাহিল। সরমা রাজি হইল না। বুঝিল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সরমা বলিল পণিদের,

তোমরা পালাও। ঐ দেখ আমার পিছনে কে কে আসিতেছেন। সরমার পশ্চাতে আসিয়াছেন দেবতার গুরু বৃহস্পতি। ইনি হইতেছেন সত্যের বাঙ্‌ময় মূর্তি। বৃহস্পতির আর এক নাম বাচস্পতি। অন্তরাত্মা যখন আপন সত্যে সচেতন হইয়া উঠে তখন জড় সত্য ডুবিয়া যায়।

পণিদের সাথে যুদ্ধে আসিতেছেন অঙ্গিরা ঋষি। অগ্নির আরেক নাম অঙ্গিরা। অগ্নির সাধনায় যে সিদ্ধ হইয়াছে তাঁহার নাম অঙ্গিরা ঋষি। যে সাধক অগ্নিময় হইয়াছেন তাঁহার তেজে সকল অপবিত্র পুড়িয়া যায়। এই ঋষিদের পিছনে আসিয়াছেন স্বয়ং ইন্দ্র।

দেহ-ইন্দ্রিয়ের জড়-চেতনার মধ্যে শুদ্ধ-বুদ্ধির যে প্রথম-প্রকাশ তাহাই পণিদের মধ্যে সরমার আগমন। ইন্দ্রের আগমনে কামশক্তি সব হীনবীর্য হইয়া যায়। সাধকের জীবনে দিব্য আনন্দের অমৃত প্রকাশ পায়। এই আনন্দই সোম। এই জড়দেহ ভোগের মধ্যে যে আনন্দ তাহাও সোম। এই সোমকে ছেঁচিয়া নিষ্কাশন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাই হয় অপবিত্রতাহীন অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ আনন্দ। শুদ্ধ আনন্দই সোম। এই সোমরস ছেঁচা ও ছাঁকার কথা বেদ বলিয়াছেন। ইহার গভীর তাৎপর্য আমাদের বুঝিতে হইবে। সোমকে কঠোর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ছেঁচিয়া তীব্র ভজনের দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে ভোগানন্দই প্রেমানন্দে পরিণত হয়।

অগ্নি ও দেবগণ

ঋগ্বেদ, ১০/৫১ সূক্ত। দেবতা — অগ্নি ও দেবগণ। ছন্দ — ত্রিষ্টুপ্।

সূক্তের মোট নয়টি ঋকে অগ্নি ও দেবগণের কথোপকথন চলিয়াছে। 'হবি বহন' কাজে উত্ত্যক্ত হইয়া অগ্নি জলে নীচে আত্মগোপন করিয়াছেন।

প্রথম ঋকে জাতিস্মর অগ্নিকে দেবগণ বলিতেছেন যে, তাঁহার বিবিধ রূপায়ণ দেখিয়াছেন একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা। অগ্নির প্রশ্ন — সকল রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কোন্ সে দেবতা? দেবত্বের অভিমুখে জ্বালাময়ী শক্তির বসতি কোথায়? দেবগণ উত্তরে বলিতেছেন যে, তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন যম দেবতা। অগ্নি তাঁহার দেহ বহুল রূপায়ণে লুকাইয়া রাখিয়াছেন হবিঃ-বহনের ভয়ে।

৫ম ঋকে দেবগণ দেবত্বের অভিলাষী মানুষের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। অগ্নিকে আহ্বান জানাইতেছেন, মনকে শুদ্ধ-পবিত্র করিয়া আহুতির দ্রব্য বহন করিতে।

দেবগণের আহ্বানে সাড়া দিয়া, স্বর্গীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অগ্নিদেব সম্মত হইলেন দেবগণের অভিপ্রেত কর্মে ব্রতী হইতে।

মূলকথা হইল, জীবনে সুপ্ত অগ্নি-শক্তিকে আগে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে পরমার্থ লাভের জন্য। ঊর্ধ্বমুখী ইচ্ছাশক্তির আগুনে অসুর সত্তাকে আহুতি দিয়া জীবনকে করিয়া তুলিতে হয় মহিমান্বিত। অগ্নির হবিঃ-বহন কার্যের তাৎপর্য হইল, অসুর সত্তাকে আহুতি দিয়া সাধককে দেবত্বের পথে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। দেবগণ তাই অগ্নিকে স্বমহিমায় জাগিয়া ওঠার আহ্বান জানাইয়াছেন। অগ্নি তাঁহার দাহিকা শক্তির মাধ্যমে জীবনের মলিনতাকে দগ্ধ করিয়া সাধককে সন্ধান দিতে পারেন মহাজীবনের মহাউদ্ধারণের। দেবগণ তাই জীবনযজ্ঞের পুরোভাগে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন অগ্নিকে। অগ্নি-দেবগণের কথোপকথনের ইহাই অন্তর্নিহিত নির্যাস।

অগস্ত্য ও লোপামদ্রা

ঋগ্বেদ, ১/১৭৯ সূক্ত।

দেহ চেতনার মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার বিকাশের মাধ্যমেই সংঘটিত হয় দিব্য জীবনের সিদ্ধি। সাধনার মাধ্যমে উপরের চেতনা তথা সত্যধর্মকে নীচে নামাইয়া আনিতে হয়। এই ক্ষেত্রে কঠিন বাধারও সম্মুখীন হইতে হয়। এই বাধা কাটাইয়া পুরুষ প্রকৃতির দিব্য একত্ব লাভেই হয় দেবত্বের প্রতিষ্ঠা ও সাধনার সিদ্ধি।

অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা দীর্ঘ সাধনার পর হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। পুরুষ-প্রকৃতির স্বর্গীয় মহামিলনের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা তথা সিদ্ধিলাভে উৎসুক। লোপামুদ্রা সত্যধর্মের অবতরণের শেষ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। জরা আসিয়া পড়িয়াছে। লোপামুদ্রা তাই চান, পুরুষের দিব্য-জ্ঞান শক্তির-লীলাকে প্রকট করিয়া ধরুক।

অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন যে, কোন সাধনাই বৃথা নহে। জরাকে জয় করিয়া মনে স্থান না দিয়া বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করিতে হইবে অখণ্ড পুরুষ-প্রকৃতির সমন্বয়ে। কামনার বশবর্তী হইয়া আশু ফললাভের পক্ষপাতী নহেন অগস্ত্য। কামনার ধারা পুরুষ ও প্রকৃতির সার্থক ও স্বর্গীয় মিলনের অন্তরায়। চির শুভ্র, চির নির্মল দিব্যসত্তাকে আশ্রয় করিয়া জীবনকে রসাপ্লুত করিয়া তুলিবার জন্য অগস্ত্য আহ্বান জানাইতেছেন লোপামুদ্রাকে।

এই কথোপকথনের পরে জনৈক শিষ্যের প্রশস্তিসূচক মন্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, জীবের কামনার গ্রন্থি কাটিয়া ফেলিতে পারে একমাত্র সেই সত্যপুরুষের আনন্দশক্তি। নিজের জীবনসাধনার মাধ্যমে অগস্ত্য তাই লাভ করিয়াছেন নবজীবনের, সিদ্ধজীবনের মন্ত্র, দিব্যজীবনের আলো। দেবত্বের স্তরে উন্নীত হইয়া, শ্রেয় জীবনের অধিকারী হইয়া অগস্ত্য লাভ করিয়াছেন পরম কল্যাণময় সত্যবস্তু।

প্রথম দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে লোপামুদ্রার নৈরাশ্যভাব।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে অগস্ত্যের অভয়বাণী এবং বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব পরিস্ফুট।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রে জনৈক শিষ্যের মাধ্যমে শ্রেয়োজীবনের বার্তা।

ইন্দ্র ও অগস্ত্য

ঋগ্বেদ, ১/১৭০ সূক্ত।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বক্তা ইন্দ্র। দ্বিতীয় ও পঞ্চম ঋকেব বক্তা অগস্ত্য।

ইন্দ্র বলিতেছেন, পরম সত্য কালাতীত। ইহাকে গণ্ডীর ভিতরে আনিতে গেলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অগস্ত্য ঋষির পরমার্থ লাভের স্বকীয় প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই দেবরাজ ইন্দ্রের একটি উক্তি উচ্চারিত হইয়াছে ১৭০ সূক্তের ১ম মন্ত্রে। ২য় মন্ত্রে অগস্ত্য তাঁহার ঋষিসুলভ ভাব-ভঙ্গীতে ইন্দ্রের সহায়তা চাহিয়াছেন। ইন্দ্রও ভ্রাতৃসুলভ সহমর্মিতা জ্ঞাপন করিয়া বেদী সাজাইয়া অগ্নিপ্রজ্জ্বলনে ঋত্বিক্-গণকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষি অগস্ত্যকে সঙ্গে লইয়া অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞ বিস্তার করিতে চাহিতেছেন। ইন্দ্রের প্রতি-সংলাপে মুগ্ধ অগস্ত্যঋষি ইন্দ্রের মহতী ভাবধারার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাবৃত্তি ইন্দ্রের আনুগত্যে ভগবন্মুখী হউক।

উর্বশী ও পুরূরবা

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। প্রথম মন্ত্র দুইটি —

"হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্।।১
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।।২"

এই সূক্তটিতে ১৮টি মন্ত্র আছে। শেষের মন্ত্রটি এই—

"ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমে তদ্ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ।
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে।।"১৮

পুরূরবা ও উর্বশী এই দুইজনার কথোপকথন এইরূপ আঠারটি মন্ত্রে। প্রত্যেকটি মন্ত্র আলোচনা করিব না। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সাধ্যমত বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পুরূরবা কে?

'পুরূ' মানে বহু, 'রব' মানে কথা। অনেক কথা যে বলে সে পুরূরবা। সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষের দেহই একমাত্র কথা বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, বৃথা কথা, বাজে কথা, কল্যাণকর অকল্যাণকর কথা মানুষ অনবরত বলে। কোন পশুপক্ষী বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, একমাত্র শব্দ ছাড়া। মানুষ যতই ঊর্ধ্ব স্তরে উঠে ততই মৌন হইয়া যায়, লোকের সঙ্গ করা ত্যাগ করে। নির্জনে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকে। পুরূরবা হইতেছে মানুষ। মনোময় জীব। সর্বদাই অধিক কথা বলে।

মানুষের স্বাভাবিক কাজ হইল মনন। মানুষের মননভূমি ক্ষুদ্র। দেহ মন প্রাণ এই তিন ভূমিতেই সীমাবদ্ধ। মানুষের সাধনা হইল মনন শক্তিতে ঊর্ধ্বে বৃহতের চেতনা জনলোক মহর্লোক ভেদ করিয়া সত্য লোকে উঠিয়া যাওয়া। তখন মানুষের দিব্য জন্ম হয়। দেবত্ব অভিমুখী যে অভিসার তাহা আশ্রয় করিয়া পরম বৃহৎ ভূমিতে স্থিত হওয়া।

উর্বশী কে?

উর্বশী দিব্য লোকের আনন্দময় আলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উর্বশী কবিতায় লিখিয়াছেন, 'হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।' নন্দন অর্থ আনন্দঘন। আনন্দঘন লোকে যাঁহার বাস। আবার লিখিয়াছেন, 'উষার উদয় সম

অনবগুণ্ঠিতা। তুমি অকুণ্ঠিতা।' উর্বশী নির্মল, শুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী আনন্দের আধার। উর্বশী বৃহতের আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। উর্বশী ও উষা একই। যখন মানস চেতনায় নামিয়া আসিয়া দেহ, মন ও প্রাণের মধ্যে ক্রিয়াপরায়ণ হয় তখন সে উর্বশী। আর যখন সদানন্দময় মহর্লোক ছাড়িয়া, সত্যলোক ছাড়িয়া যায় তখন সে উষা।

ঋষিদের দৃষ্টিতে অনন্ত বিশ্বে একটিই আনন্দশক্তি। আনন্দশক্তি একটি বৈ দুইটি নাই। ঐহিক সুখের যে আনন্দ আর উচ্চতম ভূমির আনন্দ তাহা মূলতঃ একই। একই আনন্দ দেহের ভোগে, প্রাণের ভোগে ও মনের ভোগে নিম্নমুখী, ক্ষণিক, নশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ আনন্দই যখন দিব্যলোকে, মহর্লোকে বা সত্যলোকে নিত্য-আনন্দ-স্বরূপে ক্রিয়া করে তখন সে ব্রহ্মানন্দ।

পুরূরবা যখন সকল সাধারণ মানুষের মত দেহ, প্রাণ ও মনের ভূমিতে চলিতেছিল তখন উর্বশী তাঁহার সঙ্গে তিন ভূমিতেই আনন্দপ্রদ, ছিল। পুরূরবা শুধু মানুষ নহে, সাধক মানুষ। তাহার সাধ ছিল, সে সাধনা করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিবে। উর্বশীও তাঁহাকে সেই উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে পুরূরবার সাধনপথ স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন উর্বশী তাহাকে ছাড়িয়া যায়। পুরূরবার জীবন আনন্দহীন হইয়া পড়ে। তখন সে ঊর্ধ্বরথ-যাত্রী উর্বশীকে ডাকিয়া বলে — "দাঁড়াও, একবার এস, তুমি কি কঠোর! কয়েকটি কথা বলি শুন। আমার মনের কথা অব্যক্ত রহিয়াছে, শুনিয়া যাও। না শুনিয়া গেলে কল্যাণময় হইবে না।"

"হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্।।"১।।

উর্বশী উত্তর করিল, "আর কথা শুনিয়া কাজ নাই। আমি আদি উষা। আমি ওপারে চলিয়া যাইতেছি। আমাকে বান্ধিয়া রাখা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তোমার তপস্যা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। তপস্যাকে আবার দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া তুমি উঠিয়া আইস। তীব্র তপস্যায় তোমার নবজন্ম হইবে। সেই লোকে মৃত্যু নাই। অমৃত সেই লোকে তোমার সাথে আমার মিলন হইবে।

"তোমার সঙ্গে আমার দুইটি শর্ত ছিল। (১) তোমাকে কখনও নগ্ন দেখিব না। তাহা দেখিতে হইয়াছে। আর (২) আমার দুইটি মেষের বাচ্চা ছিল। তাহাদের তুমি সর্বদা রক্ষা করিয়া আমার পার্শ্বে রাখিবে। সেই প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করিয়াছ। দুইটি মেষের বাচ্চা আমার ধৈর্য্য ও কৌমার্য। তোমার জন্য এই দুইটিও গিয়াছে। তোমার শর্ত-ভঙ্গে আমি এখন পুত্রবতী। তুমি দেহ, মন, প্রাণ এই তিনের নশ্বর অসুন্দর আনন্দে

আপন যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন, চল, আমরা তেমনিভাবে অম্লান বদনে স্বীয় স্বীয় দানের অংশ গ্রহণ করি। ২।

আমাদের মন্ত্রোচ্চারণ, আমাদের অবস্থান, এবং আমাদের মন এক হউক, আমাদের চিত্ত অভিন্ন হউক। বন্ধুগণ, আমরা সকলে একত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেন একইভাবে আমরা অগ্নিতে হবি সমর্পণ করি। ৩।

আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের হৃদয় অভিন্ন হউক, আমাদের চিন্তা অভিন্ন হউক, যেন আমরা পূর্ণভাবে পরস্পরের পার্থক্য বিভেদ দূর করিয়া একই পথে পরিচালিত হই।৪।"

শ্রীঅরবিন্দকৃত ইংরাজী অনুবাদ —

1. "O Fire, O strong one, as master thou unitest us with all things and art kindled high in the seat of revelation; do thou bring to us the Riches.

2. Join together, speak one word, let your minds arrive at one knowledge even as the ancient gods arriving at one knowledge partake each of his own portion.

3. Common Mantra have all these, a common gathering to union, one mind common to all, they are together in one knowledge; pronounce for you a common mantra, I do sacrifice for you with a common offering.

4. One and common be your aspiration, united your hearts, common to you be your mind, So—that close companionship may be yours."

(*Hymns to the Mystic Fire*, p. 607)

ঋগ্‌বেদ সংহিতা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। প্রতি মণ্ডলে বিশেষ বিশেষ কিছু কথা বলা হইয়াছে। প্রথম মণ্ডলের ১ম সূক্তে অগ্নিদেবতার কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের শেষ মন্ত্র অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের শেষ চারটি মন্ত্রের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম ও শেষ (দশম) মণ্ডল, উভয়েই ১৯১টি সূক্ত। সূক্ত সংখ্যার এই সাদৃশ্য বিশেষ কোন সংকেতবাহী কিনা তাহা আমরা জানি না বা বলিতে পারি না। ঘটনাচক্রে এইরূপ মিল ঘটিয়াছে বলিয়াও মন মানিতে চায় না। ১৯১ সংখ্যাটির দুই দিকে ১ ও মধ্যে ৯; যেন ইঙ্গিত করিতে চাহেন, একেই আরম্ভ একেই শেষ; মধ্যে ৯ যেন অপরিমিতের প্রতীক। ৯ অঙ্কটির শেষে আবার ১-এর পুনরাবৃত্তি। ইহার তাৎপর্য যেন একছন্দে আরম্ভ একছন্দে শেষ, মাঝখানে বৈচিত্র্যময়তা। অবশ্য প্রথম ১ ও শেষ

১-এর পার্থক্য আছে। প্রথম ১ নিরেট ১, অর্থাৎ নেহাৎই ১; শেষ ১ দশ (১০)-এর আগমনসূচক। ৯-এর পরে ১০, ১৯-এর পরে ২০, অর্থাৎ ৯-এর পরবর্তী অঙ্ক অধিকতর, উন্নততর বা উচ্চতর কিছুর প্রতীক। ইহাকে পণ্ডিতের ভাষায় বলা যাইতে পারে চেতনার উত্তরণ বা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ। অশেষবিধ সাধনা ও তপস্যার মধ্য দিয়া এই উত্তরণ।

ইহার পর কোথায় শেষ তা আমরা বলিতে পারি না, কারণ অঙ্কের সংখ্যার কোন শেষ নাই। শ্রীঅরবিন্দ একটি ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন — 'Vedic Algebra'। Algebra-য় abc ও xyz প্রতীকরূপে ব্যবহৃত। বেদে ব্যবহৃত যে কোন সংখ্যা একটি প্রতীক। বেদে ব্যবহৃত প্রতিটি অংকের রহস্যের আলোচনা শ্রীঅরবিন্দের মত মহা মনীষীর পক্ষে সম্ভব।

শ্রীঅমলেশ ঋগ্বেদের প্রথম ও শেষ দশম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ১৯১ এর তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিয়াছেন —

"৯ = ৩ × ৩ (Three lower hemisphere × Three upper hemisphere)

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষ × সৎ-চিৎ-আনন্দময় কোষ

এই তিনের ঊর্ধ্ব অধঃ মিলে = ৯

= সমগ্র সৃষ্টির ক্রিয়াত্মক ব্যক্ত রূপ

= বলা যেতে পারে সমগ্র বেদের সৃষ্টিক্রিয়াত্মক রূপ = ৯

তাই এই ৯ বেদব্রহ্ম।

নয় বা নবম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ন-অব অথবা বন্ ধাতু থেকে। ধাতুগত অর্থ="পাওয়া যায় না" "জয় করা যায় না"— (not to be own, not obtained)। যাস্ক অর্থ করেছেন—"ন অব বননীয়া নাবাপ্তা বা।" (নিরুক্ত, ৩/১০) বাস্তবিকই, ৯ যদি সমগ্র বেদব্রহ্মের ঊর্ধ্ব অধ, সৃষ্টি ব্যক্ত ক্রিয়া তবে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না, "নাবাপ্তা"।

এই ৯ = বেদ। তার প্রথমে ১ (এক) এবং পরে ১ (এক) = ১৯১ এক = 'ই' ধাতু থেকে অর্থাৎ গমন করা শুরু হওয়া (to go) = 'এক' বলতেই গতির যাত্রার শুরু — "এক ইতা সংখ্যা" (নিরুক্ত, ৩/১০)। অতএব প্রথম '১' সৃষ্টির যাত্রারম্ভ, এবং দ্বিতীয় '১' যাত্রার শেষে ০ (শূন্য)-এর উপকূল অর্থাৎ অনন্ত অব্যক্তের কিনারে। ৯ অর্থাৎ বেদ-এর দুই পাশে দুইটি ১ অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে অনন্তের কূলে পর্যবসান।"

বেদের প্রথম মন্ত্রটি অগ্নিসূক্ত, শেষ মন্ত্রটিও তাহাই (অগ্নিসূক্ত)। অগ্নির বিশেষত্ব তাঁহার শিখা, যাহা সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী। অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করা যায়, উহা ততই ঊর্ধ্বগামী হয়। তপস্যার মধ্যে যে ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা বা ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহারই প্রতীক অগ্নিসূক্ত। গঙ্গার

তিনটি ধারা —পাতালে ভোগবতী, মধ্যে ভাগীরথী এবং সর্বোচ্চ লোকে অলকানন্দা। আমরা সাধারণ মানব, সকলেই ভোগমুখীন ভূমিতে। দেহেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য সদাই লালায়িত। আমাদের সাধনার লক্ষ্য অলকানন্দা অভিমুখী, সচ্চিদানন্দে পৌঁছানো। অগ্নিশিখার ঊর্ধ্বগতি দিয়া আরম্ভ, পূতাগ্নিতে শেষ। অগ্নিতে শুরু ও অগ্নিতে শেষ, তাহার বিশেষ তাৎপর্যটি ইহাই মনে হয়।

দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তের মন্ত্রচতুষ্টয়ের প্রথম মন্ত্রটি অগ্নি বিষয়ক। বাকি তিনটি মন্ত্র সংজ্ঞান, অর্থাৎ যাথার্থ্যজ্ঞান যাহা সাধনার চরমত্বের অভিধায়ক। সাধনার চরমে পৌঁছিলে একটি একত্বের অনুভূতি জাগে। আচার্যগণ উহাকে বলিয়াছেন একমততা বা ঐকমত্য ইহা পরমজ্ঞান ও পরমশান্তির প্রতীক। যে গৃহে দশ জন ব্যক্তি বাস করেন, সেখানে মতের অনৈক্য ঘটিলে নিরন্তর বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি ঘটিতে থাকিবে। ঐকমত্য হইয়া চলিলে সেখানে সদাই সুখশান্তি বিরাজ করিবে।

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিতে ঋষি অগ্নিকে বলিতেছেন—হে অগ্নি, তুমি পরমপ্রভু, তুমি অভিলষিত ফলদাতা, তুমি সকল প্রাণের সাথে মিলিত আছ। তুমি আমার জীবন যজ্ঞ-বেদীতে উদিত হও। জীবনের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহা আমাদের প্রদান কর। মনের ঐক্য (Unity of mind) ও মতের ঐক্য (Unity of ideology) আমরা পরম সম্পদ্ বলিয়া মনে করি। উহা আমাদের প্রদান কর।

পৃথিবী পাঁচশত কোটি নরনারীর আবাসস্থল। এই সকলের প্রাণ-মন যদি একাত্ম হয়, একমুখী হয়, একইভাবে ভাবিত হয়, তবে আমাদের সমাজসৃষ্টিতে সর্বোচ্চভূমিতে আরোহণ করা সম্ভব। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। মহান্ এক একত্বের ভূমিতে উন্নীত হইলে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এক কথায় জাগতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। বিশ্ব সংসার মধুময় ও শান্তির আগারে পরিণত হয়। এই লক্ষ্য কিরূপে সাধিত হইবে, তাহা পরবর্তী তিনটি মন্ত্রে বলিয়াছেন।

বিশ্বমানবের পরম উদার এক মিলনক্ষেত্র আন্তর্জাতিক ঐক্য, সংহতি, সাম্যের মহা বার্তাবাহী শেষ মন্ত্র তিনটি। ঋষি বলিতেছেন, 'সং গচ্ছধ্বং' একই সঙ্গে চল, একই লক্ষ্যে, একই পথে চল। 'সং বদধ্বং'— একই সঙ্গে বল। মতের ঐক্য হইলে, একই ভাবনায় ভাবিত হইলে তবেই বক্তব্য এক হইবে, অর্থাৎ এক সঙ্গে বলা সম্ভব হইবে। তখন বিভেদ বিরোধ আর থাকে না। 'সং বো মনাংসি জানতাম্,' অর্থাৎ পরস্পরের মন পরস্পর সম্যক্রূপে জানো, ঐক্যের মহান্ ভূমিতে মিলিত হইলে পরস্পরের ভাবের বিনিময় সম্ভব হইতে পারে।

মিলনটি কেবল বাহিরের নহে, মিলনটি মুখ্যতঃ অন্তরের। পৃথিবীর সকলে যদি একসঙ্গে চলেন, প্রীতির টান যদি একই রূপ থাকে, তবেই একত্রে চলা সম্ভব হইবে। পশুরা একসঙ্গে চলে এবং তাহা সম্ভব হয় চালকের লগুড়ের আঘাতের ভয়ে। পিপীলিকা বা পাখীরাও একসঙ্গে চলে। একসঙ্গে চলা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নহে। যদি ইতর প্রাণীতে উহা সম্ভব হয়, তবে মানুষে কেন উহা সম্ভব হইবে না? কোন্ ঐকতানে তাহারা একত্রে চলিতেছে? কত যুগ যুগান্তর পূর্বে সত্যদ্রষ্টা মঙ্গলকামী ঋষিগণ ইচ্ছা করিয়াছেন, 'মানবগণ যেন একত্রে চলে,' 'একত্রে বলে' ও 'ঐকমত্যে ভাবিত হয়। উহাতে বিশ্বমানবের সুখশান্তি নিহিত।'

ঋষিরা পশু-পক্ষীর দৃষ্টান্ত দেন নাই বটে, তাঁহারা দিয়াছেন দেবতাদের দৃষ্টান্ত। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেন। যজ্ঞকালে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে একই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। যাঁহার যাঁহার আহুতি তিনি তাহা গ্রহণ করেন। সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। চলতি কথায় বলা হয়— "অগ্নি-মুখা বৈ দেবতাঃ"। ঋষিরা চাহেন, দেবতাদের এই শৃঙ্খলা যেন মানুষের মধ্যে হয়। হে মানবগণ, তোমরা অনুসরণ কর দেবতাদের। যজ্ঞের ভাগ লইয়া যেমন তাঁহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ঘটে না, তদ্রূপ তোমরা একপ্রাণতার আদর্শে একত্র হইয়া চল। তাহা হইলে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, দুঃখ-অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং জীবন সুখ-শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে ঋষি ইচ্ছা করিয়াছেন—হে মানবগণ, তোমাদের মন্ত্র অভিন্ন হউক (সমানো মন্ত্রঃ), তোমাদের মিলনক্ষেত্র, সংঘ এক হউক (সমিতিঃ সমানী), তোমাদের চিত্ত-মন অভিন্ন হউক (সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্), সমানভাবে অর্থাৎ অবিরোধে তোমরা মন্ত্র জপ কর (সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ) এবং সমবেত হইয়া তোমরা পানাহার কর (সমানেন বো হবিষা)— তোমাদের সমবেত এই প্রয়াস আমি অভিনন্দিত করি (জুহোমি)।

মানুষের সংঘ পৃথক্ ও বহু হইতে পারে। কিন্তু মতাদর্শ, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক বা অভিন্ন হইলে তাহা বিরোধ, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষের কারণ হয় না। তোমাদের মন্ত্র অভিন্নভাবে জপকৃত হইবে। মন্ত্র পৃথক্ হইলেও অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে, কারণ মন্ত্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক পরমপুরুষ বা পরমা-প্রকৃতিকে লাভের জন্য জপ কৃত হইয়া থাকে, যেমন এক গন্তব্যস্থলে আমরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া পৌঁছাইতে পারি। এইরূপ সমবেত ও আ ার্থক প্রয়াস সকল নরনারীর নিকট ঋষি অভিলাষ করিয়াছেন। যেখানে পানাহার সমবেতভাবে ষ্ঠিত হয়, সেখানে সম্মিলন

হয় আনন্দের, তাই থাকে না কোন দ্বন্দ্ব-বিরোধ। আনন্দের মিলনে যে পানাহার, তাহা পুষ্টিদায়ক হইয়া থাকে। ঋষির দৃষ্টিতে এইরূপ মানবের সম্মেলন ও সমবেত চেষ্টাকে ঋষি অভিনন্দিত করিয়াছেন।

এই মন্ত্রটিকে বিশ্বের সকল নরনারীর মহামিলনের মন্ত্ররূপে আচার্যেরা উল্লেখ করিয়াছেন। বিরোধ-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষহীন ও সমভাবে সাধনভজন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী উপায় বলিয়া পরিগণিত। সংঘগুলির সংহতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পরম সহায়ক। সংঘবদ্ধতার অমোঘশক্তি বুদ্ধদেব অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সার কথা—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," "ধম্মং শরণং গচ্ছামি" ও "সংঘং শরণং গচ্ছামি"। বৌদ্ধধর্মের বিপুল ও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সম্ভব হইয়াছিল সংঘশক্তির উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য। পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, "সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"। কলিযুগে অন্যশক্তি তেমন বলবান্ নহে সংঘশক্তির মত। মৌমাছিদের সংঘবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু আহরণ করিতে গেলে উহারা সমবেতভাবে আক্রমণ করে। এই হেতু মৌচাক ভাঙ্গা খুবই কঠিন কাজ।

আমাদের সকলের পক্ষে সমান ও এক মন্ত্র বলা যায় প্রণব অর্থাৎ 'ওঁ'। ইহা বীজ, ঈশ্বরস্বরূপ। কেবল হিন্দুর ঈশ্বর নহে; খ্রীষ্টান মুসলমান — সকলের ঈশ্বর। সকল ধর্মের মানুষই ইহা জপ করিতে পারেন এবং এক মহামিলন ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারেন। ব্রহ্মগায়ত্রী সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়। উচ্চ-নীচ সকল বর্ণের, সকল ধর্মের মানুষের জপ করিতে বাধা নাই। তারকব্রহ্ম নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এই নাম ভেদাভেদ ভুলিয়া সমবেতভাবে সকল ধর্মের মানুষের সংকীর্তন করিতে কোন বাধা নাই। সর্ব মানবের ঐক্য ও জাতীয় সংহতি আনয়নের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে ও জীবনে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর রূপে এই নাম-সংকীর্তন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

বেদ ও বৈদিক মন্ত্রে সকলের অধিকার নাই, এইরূপ একটি ধারণা সর্বসাধারণে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বেদে এইরূপ কোন উক্তি কোন মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। বরং ইহার বিপরীত কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকারী বিষয়ে বেদ পরম উদার। শুক্ল যজুর্বেদের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যায়—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ।।" (২৬/২)

"পরমেশ্বর সব মানুষের প্রতি আজ্ঞা দিতেছেন; যথা (যেমন)

(আমি) জনেভ্যঃ (সকল জন বা মনুষ্যের জন্য) ইমাম্ (এই) কল্যাণীং (কল্যাণকারিণী, মুক্তিদায়িনী) বাচং (বেদবাক্য) আবদানি (বলিতেছি বা উপদেশ দিতেছি) (এখানে 'জনেভ্যঃ' পদটি দ্বারা কাহাকে কাহাকে বুঝাইতেছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে পরেই বলিতেছেন) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রায় (শূদ্রকে উপদেশ দিতেছি) অর্যায় (বৈশ্যকে উপদেশ দিতেছি) স্বায় (আত্মীয়জনকে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে উপদেশ দিতেছি) এবং অন্যান্যদের উপদেশ দিতেছি, (অরণায় ৮। অরণায় = পরার। মহীধর ভাষ্য)। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কল্যাণকারিণী বা মুক্তিদায়িনী বেদবাণী কাহাকেও বলিবার নিষেধ নাই। (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বামীর অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত)।

এই বেদের আজ্ঞা পালন করিয়াই ঋষি সবাইকে ব্রহ্মগায়ত্রী ধ্যান করিতে ডাকিয়াছেন— তাই বলিয়াছেন 'ধীমহি'। এস, সকলে মিলিয়া এক মন্ত্রে ধ্যান করি। এই মন্ত্রের উপরই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের ভিত্তি।" (ব্রহ্মগায়ত্রী, পৃ. ১৭)।

ঋগ্‌বেদের শেষ সূক্তের শেষ মন্ত্রে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের তরে ঋষির অন্তরস্থিত শুভেচ্ছাবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। "সমানী ব আকৃতিঃ"— তোমাদের আকৃতি, আশা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ অভিন্ন হউক, এক হউক। "সমানা হৃদয়ানি বঃ" অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়, হৃদয়স্থভাব এক হউক। "সমানমস্তু বো ম॰ ."— তোমাদের মন, মনের গতি প্রকৃতি এক হউক। আকৃতি, হৃদয়, মন সমজাতীয় শব্দে ঋষি আমাদের অন্তরলোকের সমুদয় ভাব ও তরঙ্গগুলির সমন্বয় সাধন ইচ্ছা করিতেছেন। হৃদয়ের উপরিভাগে বহু কামনা, বহু প্রকারের বাসনা, বহুবিধ প্রয়াস, বিভিন্নভাবের অভিব্যক্তি। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে আছে আমাদের একটি কামনা, পূর্ণতালাভের বাসনা, আনন্দপূর্ণ হওয়ার অভিলাষ।

সকল স্বার্থভাবনা বিসর্জন দিয়া ও আত্মবিলোপ সাধনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার তপস্যা ভারতের। সকলের আত্মার আত্মা পরমাত্মা। পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গে যোগসাধন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে যিনি পৌঁছাইয়াছেন তিনি সকলের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন করেন —

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।" (গীতা, ৬/৩০)

—যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এই অনুভূতির অনবদ্য প্রকাশ দেখিতে পাই, "..... মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা — যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। .... তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।" ('মানুষের ধর্ম')

এই দর্শনের ফলে মানব সকলপ্রকার বিভিন্নতা, সকল বিচ্ছেদ ও সকল বিরোধের চির অবসান ঘটাইতে সক্ষম হয়। তখন সকল সংশয়, সকল দ্বন্দ্ব ও সকল অবিশ্বাস হইতে মুক্ত হইয়া সর্বমানবের ও মানবেতর সকল জীবের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। সকলের মধ্যে "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" যিনি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করেন। গীতাশাস্ত্র এই দর্শনের কথা আমাদের শুনাইয়াছেন —

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।" ৫/১৮

— বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গরু, হাতি ও কুক্কুরে যিনি সমদর্শী, তিনিই আত্মতত্ত্ববিৎ।

দ্বন্দ্বাতীত এই একাত্মক ভূমিতে পৌঁছানো সাধনের চরম পরিণত অবস্থা। তখন এইরূপে দর্শনভাগ্য লাভ করিয়া সাধক ধন্যাতিধন্য হন। শ্রীমদ্ভাগবত অনুরূপ দর্শনলাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্যরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন, —

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্।।" ৩/২৯/২৬
"অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।" ৩/২৯/২৭

— যে আত্ম-পরে সামান্যমাত্রই ভেদ দর্শন করে, আমি মৃত্যুরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির ঘোরতর ভয় বিধান করিয়া থাকি।

এই কারণে মানুষমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য আমাকে সর্বপ্রকার প্রাণীর অন্তর্যামী ও সর্বভূতে অবস্থিত জানিয়া দান মান মৈত্রী ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলকে অর্চনা করা।

এই সুমহান্ আত্মিক যোগযুক্ত ভূমিতে ঋষি বিশ্বমানবকে দেখিতে চাহিতেছেন। এইখানে মানবজীবনের পূর্ণতা, সাধন-ভজনের চরমতা, ঈশ্বরের স্বধর্ম (মম স্বাধর্ম্যমাগতাঃ) লাভ জীবনের পরম সার্থকতা, সত্তার

পরিপূর্ণ আনন্দময়তা (রসং হ্যেবায়ং লব্‌ধ্বানন্দী ভবতি—তৈত্তিঃ, ২/৭)। এই অনুভূতিতে মানুষ আপনার করিয়া লইতে পারেন সকল মানবকে, মিলিত হইতে পারেন এই সাম্যক্ষেত্রে। কম্যুনিজম্ যে সাম্যের কথা প্রচার করেন, তাহা ভারতীয় সাধনার উক্ত সাম্যের তুলনায় নিম্নস্তরের। দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন এই সার্বিক মিলনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মানবকে উন্নীত ও মিলিত দেখিতে ঋষির অভিলাষ। জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ইহাতে নিহিত। ইহার অভাবে সর্বত্র মানুষ আজ হিংসা বিদ্বেষ কলুষতার শিকার হইয়া অশেষ দুর্গতি, দুঃখ ও অশান্তির কবলিত। ভাবিতে বিস্ময় জাগে কত যুগ পূর্বে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার এই মহান্ আদর্শ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সকল স্বার্থ-ভাবনা ও আত্ম-কেন্দ্রিক প্রয়াসের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহারা বিশ্বের সর্বমানবের সুখ শান্তি আনন্দলাভের এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের দিব্য অনুভব তাঁহার লেখনীতে—

"ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল।

.... ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। ..... এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা। ...... পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গে যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল।" (শান্তিনিকেতন : বিশ্ববোধ)

এই কথাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেবের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত *Cultural Heritage of India* গ্রন্থের (Vol. I) এ স্বামী সর্বানন্দের Vedas and Their Religious Teachings প্রবন্ধের উপসংহারে।

"Self-abnegation and harmony are the keynotes of the spiritual life of Vedic sages. In fact, this spirit of sacrifice, restraint, and harmony through love, and desire for the attainment of immortality in life; came to be dominant factors of the cultural life of Indo-Aryan from the earliest day of the Rg-Veda. No one can understand the full significance of the spiritual culture of India, both ancient and modern, unless he keeps in view these predominant trends of the inner thought-life of the land. One in the many, unity in variety, harmony and

not discord is the perennial message of Vedic India. The last sukta of the Rg-Veda breathes this out unequivocally thus.

"Assemble together, speak with one voice, let your minds be all of one accord .... Let all priests deliberate in a common way. Common be their assembly, common be their mind, so be their thought united ...... united be the thoughts of all, that all may live happily, that ye may all happily reside."

সামবেদের শেষ মন্ত্রদ্বয়

''ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাঁসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ।। ১৮৭৪ (২)
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।'' ১৮৭৫ (৩)

অনুবাদ — হে দেবগণ, আমরা যেন সর্বদাই কল্যাণকর বাক্য শুনি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন (সর্বদাই) কল্যাণকর বস্তু দেখি; আমরা যেন সুস্থ দৃঢ় শরীর লাভ করিয়া তোমাদের স্তুতি করিতে পারি, যেন দেবগণের স্তুতি করিতে পারি এবং দেবগণের উপাসনা করিতে পারি, এইরূপ যোগ্য আয়ু যেন পাই।

বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, বিশ্ববেদা পূষা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন; অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, ওম্ বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

[বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র — মহাকীর্তি ইন্দ্র। বিশ্ববেদা পূষা — সর্বজ্ঞান সম্পন্ন জগৎপোষক সূর্য। অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য — অপ্রতিহত বজ্রযুক্ত হইয়া বিস্তৃত অন্তরিক্ষে নিবাস করেন। জলের ক্ষরণকারী দেবতা। বৃহস্পতি — বিশাল এই জগতের বা বিপুল জলরাশির পালক। এই মন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে আত্মারূপী সূর্যেরই স্তুতি করা হইয়াছে, কারণ সূর্যের বিভূতিই ইন্দ্র, তার্ক্ষ্য, বৃহস্পতি নামে পরিচিত।]

এইটি লক্ষণীয় বিষয় যে, ঋষিদের প্রার্থনায় তাঁহারা যাহা চাহিয়াছেন তাহা সকলের জন্য, নিজের জন্য নহে, অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র যাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, সেই ঋষিগণও অপৌরুষেয় হইয়া যান আমি; আমার, এই সকল অহংবোধ তাঁহাদের থাকে না। তাঁহাদের সকল কথা, সকল কার্য, সকলই মঙ্গলকর ও সকলের তরে।

(শ্রীপরিতোষ ঠাকুর অনূদিত ও সম্পাদিত 'সামবেদ সংহিতা' হইতে গৃহীত।)

যজুর্বেদের শেষ মন্ত্র

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।
ওম্ খং ব্রহ্ম।।" ৪০/১৬-১৭

অনুবাদ— হে অগ্নি, পরম সম্পদ্ লাভের জন্য আপনি আমাদিগকে উত্তম মার্গে লইয়া চলুন। হে দেব, সকল প্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার পরিজ্ঞাত, আপনি আমাদের সকল কুটিলতা ও পাপ বিদূরিত করুন। আপনার উদ্দেশ্যে বহুতর নমস্কার বচন উচ্চারণ করিতেছি।

সুবর্ণময় পাত্র দ্বারা আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্য পুরুষের মুখ আচ্ছাদিত আছে; তবুও আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ প্রত্যক্ষ, তাহা কার্যকারণের সংঘাতের দ্বারা প্রবিষ্ট আমি। আকাশের মত ব্যাপক ব্রহ্মের ওঙ্কারের দ্বারা ধ্যান করিতেছি।।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষি অনুভব করিয়াছেন আমাদের চিত্তের কুটিলতা ও কলুষতা, যাহার ফলে দুর্বাসনা ও কুকর্মের প্রবৃত্তি হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে সক্ষম হই না। পাপ, অন্যায় জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হই, কে যেন বলপূর্বক ঐ পাপ কার্যে আমাদিগকে নিয়োজিত করে, স্বয়ং অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।" (গীতা, ৩/৩৬)

ঋষির কোন দুর্বাসনা বা পাপ নাই। তিনি আমাদিগের দুরবস্থা দৃষ্টে, আমাদিগের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা করিয়াছেন। পাপ, কুটিলতা ও দুর্বাসনা হেতু সত্যস্বরূপ আমাদিগের নিকট আচ্ছাদিত অর্থাৎ অপ্রকাশিত আছেন, সূর্যদেব করুণা করিলে ঐ আচ্ছাদন অপসারিত হইবে এবং আমাদের জীবনের সকল অমঙ্গল রাশি দূর হইবে এবং সত্যস্বরূপের দর্শনলাভে জীবন ধন্য হইবে।

অথর্ববেদের শেষ পবের মন্ত্র : কাল

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা ক্ষেত্রে 'কাল' বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও বিষয়টি লইয়া প্রণালীবদ্ধ বিস্তারিত গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি দেখা যায় শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম ও উন্নত সাধক দার্শনিক অনেকেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। মননের গভীরতায়, সত্য তত্ত্বের উদঘাটনে, দিব্য অনুভূতির মাধুর্যে উহা অতুলনীয়।

সুপ্রাচীন অথর্ববেদের ঊনবিংশ কাণ্ডে ষষ্ঠ অনুবাকের অষ্টম ও নবম সূক্ত দুইটি 'কাল' বিষয়ক। এখানে অষ্টম সূক্তের প্রথম ও নবম সূক্তের শেষ মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা।।"
১৯/৬/৮/১

"ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ।
সর্বাল্লোঁকানভিজিত্য ব্রহ্মণা
কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ।।" ১৯/৬/৯/৫

অনুবাদ : "কালরূপ অশ্ব বহন করিতেছে অর্থাৎ ছুটিতেছে (কালপক্ষে অশ্ব বলিতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান), তাহার সপ্তরশ্মি অর্থাৎ সাতটি লাগামযুক্ত (সপ্তরশ্মি অর্থাৎ ছয়টি ঋতু ও একটি অধিমাস), সহস্র নয়ন (সহস্র সংখ্যক অহোরাত্রযুক্ত), জরাহীন (সর্বদা একইরূপ), প্রভূত শক্তিশীল (অর্থাৎ প্রভূত জগৎ উৎপাদনের শক্তিযুক্ত)। তাহাকে আরোহণ করেন (অতিক্রম করেন) ক্রান্তদর্শী কবিগণ, বিদ্বান্‌গণ এবং তাহার চক্রগুলি নিখিল ভুবনসমূহ (সকল প্রাণীর প্রতি ধাবমান)।

এই লোকেও, পরমলোকেও, পুণ্য লোকসমূহকে, পুণ্য বিধৃতিসমূহকে (অর্থাৎ ভূলোক, স্বর্গলোক, পুণ্যলোক ও দুঃখরহিত অন্যসকল লোক), সমস্ত লোককে জয় করিয়া ব্রহ্মের দ্বারা কালই সে গমন করেন পরম দেবতা (অর্থাৎ দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া পরম কালদেব সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন)।"

কালসূক্ত দুইটিতে কাল ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিখিল ভুবনের প্রকাশক, নিখিল সৃষ্টি কালের উপর স্থাপিত, দ্যুলোক-পৃথিবীর সৃষ্টিকারী, সকলের প্রভু বা নিয়ন্তা, কালই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া প্রজাপতিকে (ব্রহ্মাকে) ভরণ করেন, কাল-রূপ পরমাত্মা হইতে অপ্‌সমূহ, সূর্য সৃষ্ট হইয়াছে, পুনরায় কালেই লয় প্রাপ্ত হইবে, কালের আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ, সকল বিশ্ব অবস্থান করিতেছে।

গীতার একাদশ অধ্যায় 'বিশ্বরূপদর্শন যোগে' শ্রীভগবানের প্রলয়রূপ দর্শনে অর্জুনের অন্তরাত্মা ব্যথিত (প্রব্যথিতান্তরাত্মা)। করাল দন্তদ্বারা বিকৃত ভীষণ মুখগহ্বরে (দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রণি) সকল সৃষ্টি ধ্বংসশীল দর্শন করিয়া ভয়বিহ্বল অর্জুন, সখা কৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন — উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন (আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ)।

উত্তরে শ্রীভগবান্ জানাইলেন — সৃষ্ট্যাদি ধ্বংসকারী আমি ভয়ানক কাল (কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ)। কাল যে ঈশ্বরস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই।

বহুকাল পরে বেদান্তদর্শনের ভায্য (গোবিন্দভাষ্য)-কার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন— "ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।" (গোবিন্দভায্য ভূমিকা) অর্থাৎ, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম — এই পঞ্চ তত্ত্ব বলিতে আমরা বুঝি বিকারহীন স্বরূপ। ঈশ্বর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই কাল।

"অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ।।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ৭ম)

শ্রীমদ্ভাগবতও ঈশ্বরস্বরূপকেই তত্ত্ব বলিয়াছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।" ভা. ১/২/১১

ভূতগণকে যাহা সঙ্কলিত, প্রেরিত বা গণিত করে তাহাই কাল, বলিয়াছেন সুশ্রুত (১/৬/২)। কাল বলিতে সকলেই বুঝেন সময়, যাহা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ স্বরূপ অক্ষয়। এই কালই শ্রীভগবান্— "অহমেব অক্ষয়ঃ কালঃ" (গীতা, ১০/৩৩)।

উপরে উল্লিখিত অথর্ববেদের অভিমত, অর্থাৎ কালই সকল সৃষ্টির উৎস, উপনিষদ্ পরবর্তী যুগে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মতে বিশ্বসৃষ্টির মূলে সাতটি পৃথক্ বস্তু ক্রিয়াপরায়ণ, যথা — কাল (Time), প্রকৃতি (Nature), বিধান (Law), দৈব (Chance), মৌলিক পদার্থ (elements), সীমাবদ্ধ সত্তাসকল (finite

selves) এবং এই সকলের সংযুক্তাবস্থা (combination of all these)। মাতৃ উপনিষদে দুই প্রকার কালের উল্লেখ দেখা যায়, ইহা অভিনব সংযোজন— কাল (Time) ও অ-কাল (Timeless)।

মহাপ্রলয় কালে কাল আছে কিন্তু উহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। কারণ, সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, সৃষ্ট বস্তুর কোন কিছু নাই। সকলই অব্যক্ত, পরিমাপের অতীত অবস্থা, পরিমাপ করিবে এমন কেহ নাই। অথচ কাল রহিয়াছে, নিত্য, অপ্রতিহত ও অখণ্ড তাহার প্রবাহ। ইহাকেই বলিয়াছেন — অ-কাল (Timeless) অবস্থা।

যে-কাল (Time) আমরা পরিমাপ করিতে পারি সেই কালও নিত্য। এই কাল সূর্যের পরিস্পন্দন হইতে সৃষ্ট। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত, প্রদোষ-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা, দিবা-রাত্র, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড সময়ের এই বিভাগ— নিত্য সত্য কিছু নহে, ইহা একটি সাধারণ চলতি প্রথা মাত্র, ইহাকে convention but not real বলা যায়। কারণ, সূর্য প্রভাতে উদিত হইয়া দিবা-রাত্রি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে। আরও সঠিকভাবে বলিতে হইলে বলা উচিত — পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় নিজেকে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া অর্ধেক অংশে সূর্যের আলো পৌঁছাইতে পারে না, এইজন্য সেখানে তখন রাত্রি। দিবা-রাত্রির এই বিভাগ নিত্য সত্য নহে। গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে এই সময় সীমা পৃথক্ হইবে। সূর্য হইতে যে গ্রহের দূরত্ব যত বেশী, সেখানে দিবা-রাত্রের সময়-সীমা তত বেশী হইবে। সেই জন্য দিবা-রাত্রির, মাস-ঋতুর বা বৎসরের এই বিভাগ সত্য (real) কিছু নহে। এইজন্য সময়ের এই তথাকথিত বিভাগকে conventional but not real বলা হইয়াছে।

এই conventional time-এর সঙ্গে দেশ বা স্থান (space)-এর নিকট সম্বন্ধ। শুধু সম্বন্ধের নৈকট্য নহে, অবিনাভাব সম্বন্ধ বলিলে ঠিক হয়। কোনও ঘটনা ঘটিলেই কোন্ দেশে বা স্থানে ঘটিল এবং কোন্ কালে বা সময়ে ইহা ঘটিল জানিতে হইবে। যদি বলি বেলা দশটা — তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে কলিকাতা বা দিল্লী বা লণ্ডন। কেননা, কলিকাতায় যখন দশটা, লণ্ডনে তখন দশটা নহে। ইহার কারণ, সেকেণ্ডে প্রায় সতেরো মাইল গতিতে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে নিয়ত প্রদক্ষিণরত, ফলে গোলাকৃতি ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে সূর্যের আলো একই সময় সর্বত্র সমভাবে পতিত হয় না। সেইজন্য পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়। আবার পৃথিবীর সময়ের হিসাবের সহিত মঙ্গলগ্রহের সময়ের মিল হইবে না। পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলের লাগে ৬৮৬ দিন। সুতরাং স্থানভেদে

সময়ের হিসাব ভিন্ন হইতেই হইবে। এইরূপ বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি, প্রভৃতি গ্রহগুলির সর্বত্রই পৃথিবীর তুলনায় সময়ের হিসাব পরিবর্তিত হইবে। ভারতের সহিত আমেরিকার একদিনের সময়ের পার্থক্য হয়। এইজন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া একটি কাল্পনিক তারিখের সীমারেখা (date line) স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অতএব কালের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ সর্বত্রই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কাল; সুতরাং time-এর উল্লেখ করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের উল্লেখ অপরিহার্য।

অপর একটি কালের ভাবনা (conception of time) বলা হইতেছে।

বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বৃক্ষ ক্রমে অসংখ্য ডাল-পালা, শাখা-পত্র, ফুল-ফলে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই ফল পক্ব অবস্থায় পুনরায় বীজের জন্ম দেয়। সেই বীজ আবার বৃক্ষ, ডাল-পালা ইত্যাদি ক্রমে সৃজন ক্রিয়া ঘটায় চক্রাকারে। চক্রাকারে সংঘটিত এই সৃজনক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে 'কাল'। কালের এই সৃজন-ক্রিয়া একই ভাবে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে, এইজন্য বলা যায় এই আবর্তন Circular but real। "সর্বে কালেন সৃজ্যন্তে হ্রিয়ন্তে চ" (মহাভারত, ১৩/১/৫৬) কালের এই সৃজন ক্রিয়ার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (purpose or objective) কিছু নাই।

সাধক সাধন-ভজন করেন ঈশ্বরলাভের জন্য। একই নাম গান, একই মন্ত্র বার বার জপ, একই শ্রীমূর্তির ধ্যান করিতে থাকেন। সাধনার আরম্ভে চিত্তের যে অবস্থা, শেষে সিদ্ধাবস্থায় তাহার চিত্তের একটি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। চিত্তের এই ক্রমোন্নত অবস্থা বা ঊর্ধ্বগতি ঘটায় কাল। আচার্যগণ সাধনার এই বৃত্তাকার অথচ ক্রমোন্নত দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন —

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, প্রেম-১১)

কাল-কৃত এই circular but spiral গতি লক্ষণীয়। সাধনার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হেতু circular এবং ক্রমোন্নত অবস্থায় উন্নীত হওয়া যাহা উহার লক্ষ্য বা ফল spirally upward (ক্রমোন্নতির পথে ঊর্ধ্বোত্তরণ)। এই হেতু সাধনার এই গতিকে বলা যায় circular but spiral।

সাধনায় সিদ্ধাবস্থার পরেও বিশুদ্ধ রাগানুগা মার্গের সাধকের জীবনে

ঈশ্বরানুভূতির একটি দিব্য অপ্রাকৃত ক্রমোন্নত অবস্থার কথা বৈষ্ণবাচার্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন—

"রাধা-প্রেমা বিভু, যার বাড়িতে নাহি ঠাঞিও।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ৪/১২৮)

এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমের গতি সরল ঊর্ধ্বগামী — straight rectilineal। কৃষ্ণ প্রেমের উন্নত হইতে উন্নততর দশার, যেখানে রাগ মার্গের ভক্তগণই কেবল পৌঁছাইতে পারেন, তাহার মাধুর্যময় চিত্র আমরা পাই বৈষ্ণব মহাজনের বর্ণনায়—

"নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে 'কৃষ্ণে' প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য-২৩)

আনন্দচিন্ময় রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের রসমাধুর্য ভক্তের আস্বাদ্য। উক্ত ভাবানুসারী বা ভগবদশাশ্রিত ভক্তগণই একমাত্র অধিকারী ঐ রসমাধুর্য আস্বাদনের।

"সবে মাত্র গোপীগণের ইহাতে অধিকার।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি-৪)

বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে সাধনার সর্বোচ্চ ভূমি ইহাই। বৈদিক ধারার মর্ম উপলব্ধি করিলে বুঝা যায় উভয় ধারার মধ্যে কোন অমিল নাই।

এই সকল-প্রকার সাধন-ভজনের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে কালচক্রের গতি ও ক্রমোন্নতভাব ক্রিয়াশীল। ইহা কিভাবে হইতেছে বিশেষভাবে ধ্যানের বিষয়।

শান্তিমন্ত্র

ঋগ্বেদ, ৪/৩১ এবং ১/৮৯ সূক্ত। দেবতা — ইন্দ্র। ঋষি — বামদেব ও গোতম। ছন্দ — গায়ত্র্যাদি এবং দেবতা — বিশ্বদেবগণ। ঋষি— রহূগণের পুত্র গোতম। ছন্দ — জগতী।

"কয়া নশ্চিত্র আ ভূবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ১
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃড়্হা চিদারুজে বসু।। ২
অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতিভিঃ।।" ৩

(ঋ.৪/৩১/ ১-৩)

"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।"
"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।"

(ঋ. ১/৮৯/৬, ৮)

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।
ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ।। হরিঃ ওঁ।।

অনুবাদ ('বেদ শ্রীঃ' হইতে) — "(বন্ধুগণ) কি প্রকার তর্পণের দ্বারা সদা-বর্ধনশীল, ভজনীয় ও সখা ইন্দ্র আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন? কোন্ সৎ কর্মের দ্বারা তাঁহাকে এখানে (যজ্ঞে) উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব? ১

হে ইন্দ্র, কোন্ শ্রেষ্ঠ সত্যভূত মাদক দ্রব্যে তোমাকে আপ্যায়িত করিলে তুমি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ ধন আহরণ করিবে? ২

হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা ও স্তোতা, তোমার যে শত শত রক্ষার উপায় রহিয়াছে তাহা দ্বারা আমাদের সমূহ দুর্গতি অপসারণ কর। ৩

শ্রেষ্ঠ রক্ষক ইন্দ্র, ধনাধিপ পূষা এবং তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি আমাদের প্রতি শুভকরী হউন, বৃহস্পতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। ৪

হে দেবগণ! যাহা শুভকর শুধু তাহাই যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্থির ও কর্মঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া (সুস্থ শরীরে) তোমাদের স্তব কীর্তন করি, যেন দেবনির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া জীবনধারণ করিতে পারি—এই আমাদের কামনা। ইতি শম্।"

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।
ওঁ হরি, ওঁ হরি, ওঁ হরি। হরি ওঁ।।

।। গ্রন্থপঞ্জী ।।

১. অথর্ববেদ সংহিতা : শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী অনুঃ
২. অদ্বৈত-সিদ্ধিঃ : শ্রীমধুসূদন সরস্বতী
৩. অষ্টাধ্যায়ী : ভগবান্ পাণিনি
৪. আকাশ ব্রহ্ম : অযাচক (শ্রীঅশোকনাথ রায়)
৫. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (১-৩) : স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাঃ (উদ্বোধন)
৬. উপনিষদ্ ভাবনা (১-২) : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৭. ঋগ্বেদ সংহিতা : শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী
৮. ঋগ্বেদ সংহিতা : শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত
৯. ঋগ্বেদ : দ্বিতীয় ভাগ : শ্রীদ্বিজদাস দত্ত (১৩২৭)
১০. ঋগ্বেদ সংহিতা : শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী (১৩৪১)
১১. ঋগ্বেদ সংহিতা : শ্রীপরিতোষ ঠাকুর
১২. ঋগ্বেদে শক্তিসাধনা : শ্রীশ্যামদাস চট্টোপাধ্যায় (১৩৭৬)
১৩. ঋগ্বেদ : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
১৪. ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্ত : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
১৫. ঋগ্বেদ ভাষ্যপরিচয় (বিনোদ-ভাষ্য): শ্রীসুকোমল দত্ত
১৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
১৭. কালিদাস রচনা সমগ্র : মহাকবি কালিদাস (বসুমতী)
১৮. কুলার্ণব-তন্ত্রম্ :
১৯. গীতাধ্যান (১-৬) : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
২০. গায়ত্রী রহস্য : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
২১. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
২২. চণ্ডীচিন্তা : মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
২৩. চৈতন্য-চরিতামৃত : শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত
২৪. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ :
২৫. নিরুক্তম্ : যাস্ক, শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাঃ
২৬. দাদূ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী
২৭. পুরোহিত দর্পণ : শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৮. যোগসূত্র (পাতঞ্জল যোগ-দর্শন): ভগবান্ পতঞ্জলি
২৯. বাণী ও রচনা : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
৩০. বাঙ্গালার বাউল : শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
৩১. বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ : শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

৩২.	বেদ ও বিজ্ঞান	:	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী
৩৩.	বেদ পরিক্রমা	:	শ্রীমতী পুবরী পাল
৩৪.	বেদ-বেদান্ত : পূর্বখণ্ড: ব্রহ্মসূত্র	:	মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৩৫.	বেদমন্ত্র - মঞ্জরী	:	শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য
৩৬.	বেদ-মীমাংসা (১-৩)	:	শ্রীঅনির্বাণ
৩৭.	বেদ রহস্য	:	শ্রীঅরবিন্দ
৩৮.	বেদ শ্রীঃ	:	শ্রীহরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য
৩৯.	বেদাঙ্গ বর্ণ	:	শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য
৪০.	বেদের পরিচয়	:	ড. যোগীরাজ বসু
৪১.	বৃহদ্দেবতা	:	শৌনক, কুমার রায় (চৌখম্বা)
৪২.	ব্রহ্মগায়ত্রী	:	মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৪৩.	বৈদিক সংহিত্য সংকলন (১ম)	:	শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
৪৪.	বৈষ্ণব পদাবলী সমগ্র	:	ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৪৫.	ভট্টিকাব্যম্	:	মহাকবি ভট্টি
৪৬.	ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ	:	শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত
৪৭.	ভাগবত ধর্মের বেদমূলতা	:	স্বামী বিদ্যারণ্য
৪৮.	ভাগবতম্	:	প্রভুপাদ শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত
৪৯.	ভাস্বতী গায়ত্রী	:	ড. সীতানাথ গোস্বামী
৫০.	মর্ত্যেষু অমৃত	:	শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য
৫১.	মনুসংহিতা	:	ভগবান্ মনু
৫২.	মহাভারতম্	:	ভগবান্ বেদব্যাস, পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাঃ
৫৩.	যজ্ঞকথা	:	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৫৪.	যজুর্বেদ সংহিতা	:	শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী অনুঃ
৫৫.	রবীন্দ্র রচনাবলী	:	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৬.	রাগ ও রূপ (১ম)	:	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৫৭.	শতপথ ব্রাহ্মণ	:	
৫৮.	শ্রীগীতা	:	শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত
৫৯.	সত্যার্থঃ প্রকাশঃ	:	স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
৬০.	সামবেদ সংহিতা	:	শ্রীপরিতোষ ঠাকুর অনুদিত
৬১.	সর্বানুক্রমণী	:	
৬২.	সূর্য-সিদ্ধান্তঃ	:	আর্যভট্ট, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত
৬৩.	*Agnimantramala*	:	Sri Aurobindo

৬৪. *Bases of Yoga* Sri Aurobindo
৬৫. *The Bible : Old and New Testamen*
৬৬. *Civilisation of ancient India* : Ramesh Ch. Dutta
৬৭. *The cultural heritage of India* (Vol. I) : Sri Ramkrishna Institute of Culture.
৬৮. *The Discovery of India* : Pt Jawaharlal Neheru
৬৯. *History of the Indian Philosophy* : Dr S.N. Dasgupta.
৭০. *Hymns to the Mystic Fire* : Sri Aurobindo
৭১. *Indian Antiquary* : Don Bullar
৭২. *India of the age of Brāhmanas* : Dr Yogiraj Basu
৭৩. *Indian philosophy* (Vol. I) : Dr S. Radhakrishnan.
৭৪. *On the Veda* : Sri Aurobindo.
৭৫. *The Orion* : Balgangadhar Tilak.
৭৬. *Rigvedic India* : Abinash Ch. Das.
৭৭. *Secrets of the Veda* : Sri Aurobindo
৭৮. *The Serpent Power* : John Woodroffe
৭৯. *The Suprental Manifestation* : The Mother's Talk (pondicherry)
৮০. *The Vedic Age* : R.C. Majumdar
৮১. *The Vedic Experience* : Raimundo Panikkar
৮২. *Vedic Symbolism* : Sri Aurobindo
৮৩. *Vedic Mythology* : Macdonell

বেদ-বিচিন্তন

গ্রন্থ সম্বন্ধে দুইটি হার্দিক অভিমত

শ্রীপরিতোষ ঠাকুরের অভিমত

আমার অগ্রজপ্রতিম ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীদ্বারা 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতেছি। নিজের অক্ষমতা পুনঃপুনঃ জানাইলেও বৈষ্ণবের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তাই লিখিতেছি। আমার বক্তব্য আমি সব বিন্যাস করিয়া বলিব না, সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলিব।

প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ। আমি অবশ হইয়া সমগ্র গ্রন্থ পড়িলাম।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থে ঋগ্বেদ-সংহিতাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া অন্য অন্য বেদসহিতে বেদের অধ্যাত্ম-বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যায় আবিষ্ট বিহ্বল। যৌবনকালে যিনি কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মাতোয়ারা হইতেন, বর্তমানে নব্বই-অতিক্রান্ত জীবনে গ্রন্থ লিখনে তাঁহার সেই মগ্নভাবের রতিমাত্র বিচ্যুতি ঘটে নাই। মহান্ অগ্নিকে ডাকিয়া যেন বলিতেছেন, "হে পুরাণপুরুষ, সদা আনন্দময়। তোমার জন্য, বিশ্বদেবগণের জন্য, আনন্দের কুশখণ্ড বিছাইয়াছি, তুমি বিশ্বদেবগণকে আবাহন করিয়া আন। সকলে মিলিয়া আসন গ্রহণ কর। নির্ঝর আনন্দবারি বর্ষণে আমাদিগকে কর চিরপুলকিত।"

বাল্যকালে শুনিয়াছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বেদবিরোধী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে পড়াশুনা করিয়া সেই ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সমগ্র বেদ-সাহিত্য যে বৈষ্ণব ভাবধারার ভাবনায় সাবলীল ব্যাখ্যা করা যায় তাহা ব্রহ্মচারীজীর 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থ না পড়িলে জানিতে পারিতাম না। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতবাদের বেদ-বাদকতা এমন অপরূপভাবে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

গায়ত্রী বিষয়ক অধ্যায়টি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। উহা দুই-তিনবার পড়িয়াছি।

ব্রহ্মচারীজীর উপাস্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের যেসব বাণী-গ্রন্থ মধ্যে দিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়।

সখ্যভাব, পিতৃভাব, বন্ধুভাব, শৃঙ্গার রস, দাস্যভাব, ভক্তিভাব প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলে বিকীর্ণ আছে। সেই মন্ত্রগুলি একত্রে একটি গ্রন্থে থাকিলে ঋগ্বেদের ১০,৫৫২ মন্ত্র পড়িবার উৎসাহ ও ধৈর্য্য যাঁহাদের নাই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা হয়। সেইরূপ বিজ্ঞান, সমাজ, আচার-বিচার প্রভৃতি বিষয়েও পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থে সেই সকল প্রয়োজনের পরিপূর্তি ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিচারে গৃহীত মন্ত্রগুলি পাইয়া অধ্যাত্ম-ভাবনা যাঁহাদের নিকট আদরণীয় তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

বেদে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমি ব্রহ্মচারীজীর সহিত একমত। বৈদিক যুগে নারীর বেদে অধিকার ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ও যজ্ঞের কারণে উপবীত ধারণ করিতেন। বর্তমান যুগেও দক্ষিণ ভারতে অনেক নারী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা যাঁহারা বেদ-চর্চা করেন তাঁহারা জানেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য চতুর্বর্ণ-অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্যতীত আর কাহারও বেদ পড়িবার অধিকার ছিল না, ইহা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিদেশী শাসক ব্রিটিশ শাসনাধীনকালে ইংরেজরাই সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রথম অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) হইয়াছিলেন একজন ব্রিটিশ। বিদেশীয়রা সেই সময় সারা পৃথিবী জুড়িয়া বেদচর্চায় করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের নিকট বিদেশীয়গণ বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ শিক্ষালাভ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অথচ একই সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে টোলবিভাগে অব্রাহ্মণের সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার ছিল না বিশেষতঃ বেদশিক্ষার অধিকার ছিল না এবং অদ্যাপি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের টোল বিভাগে নারীগণ বেদ পড়িবার অধিকার পান নাই। ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাধ্যবাধকতা নাই।

কাষ্ঠ শব্দের একটি অর্থ অরণি, যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অরণি ধরণীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া ফসিলের রূপ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে হীরকখণ্ডের জন্ম দিয়া থাকে। বেদ বলেন, অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতিই অগ্নি। যে কাষ্ঠ মৃতবৎ এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ধরিত্রীগর্ভে প্রোথিত, সেখানে গিয়া কাষ্ঠের রূপান্তর ঘটিলেও তাহার হীরকখণ্ডরূপ জ্যোতির্ময়রূপটি হারাইয়া গেল না। ইহা হইতেই বুঝা যায় অগ্নির গুরুত্ব কতখানি। জ্ঞানচক্ষুতে ইহা অবলোকন করিলেই অধ্যাত্ম-ভাবনার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। আমরা হাজার বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া মৃতবৎ ছিলাম। ক্রমে বেদের ফসিলের মত অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিলেও ক্রমে

তাহার উজ্জ্বলতা বেদমাতাই প্রকাশ করিলেন। বিদেশীয়দের বিকৃত অনুবাদ সত্ত্বেও তিনি স্বমহিমায় মুমূর্ষ অবস্থা হইতে পুনর্জীবন লাভ করিলেন। গত দুইশত বৎসর ধরিয়া আমরা নূতন উদ্যমে বেদচর্চা করিতেছি এবং তাহার সুফলও পাইতেছি। স্বামী দয়ানন্দ শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ এবং তাঁহাদের অনুগামী ব্যক্তিগণের দ্বারা বেদের যে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইতেছিল তাহা বর্তমানে 'বেদ-বিচিন্তন' গ্রন্থে আসিয়া একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে উদ্ভাসিত হইল। ইহার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মচারীজীর এই পুস্তক বঙ্গদেশীয় বেদপন্থী-সমাজে আদর্শস্থানীয় হইবে।

তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। বেদ সম্পর্কে খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সকল লেখকের রচনা পড়িয়াছেন। সেই সকল রচনা হইতে লেখকের নাম উল্লেখ করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনেই এইরূপ করিয়াছেন, যাহা বহু মর্যাদাসম্পন্ন লেখক করেন না — তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রকৃত লেখককে স্বীকৃতি দেন না, ইংরেজী ভাষায় যাদের Plagiarist বলা হয়। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, স্বনামখ্যাত ব্রহ্মচারীজী তাহা করেন নাই বরং অমানীদের (অর্থাৎ বেদের জগতে স্বল্পখ্যাতদের) মান দিয়াছেন, মানীদেরও মান দিয়াছেন। যিনি প্রকৃত বিনয়ী তিনিই ইহা পারেন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানী-অমানী সকলেই সমান।

বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর মধ্যে বাংলাভাষায় রচিত বেদ সম্পর্কে আমরা তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ পাইয়াছি— (১) ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর (আমার স্বর্গতঃ পিতৃদেব) কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত যাস্কাচার্যের 'নিরুক্তম্', চারখণ্ডে সমাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। (২) শ্রীঅনির্বাণ প্রণীত 'বেদ-মীমাংসা', তিনখণ্ডে সমাপ্ত। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। (৩) ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত 'বেদ-বিচিন্তন', একখণ্ডে সমাপ্ত। শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলিকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত। বেদপন্থীদের পক্ষে এই অমূল্যগ্রন্থগুলি অবশ্য পঠনযোগ্য।

প্রজ্ঞাভারতী আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক বাঙ্ময়ী পূজা

ওঁ

বিশাল-বিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-শর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে।।১।।
জগতাং বান্ধবং নিত্যং মাধুর্যমূর্ত-বিগ্রহম্।
নমামি সততং ভক্ত্যা মোহনং বন্ধুসুন্দরম্।।২।।
ওঙ্কারনাথদেবায় গুরবে পরমাত্মনে।
সীতারামস্বরূপায় নমামি বেদমূর্তয়ে।।৩।।
প্রজ্ঞাঘন-তপোমূর্তি-বেদব্যাস-স্বরূপিণম্।
মহানামব্রতং বন্দে বেদতত্ত্ব-প্রকাশকম্।।৪।।

মানব সভ্যতার বিস্ময় শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতি। প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম এই সংস্কৃতি আজও সঞ্জীবিত। কালান্তরেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিশাল এবং বিচিত্র বৈদিক সাহিত্য এই পাবনী ধারার উৎস। ধর্মের দ্বারা ভারত বিধৃত। আর "বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্" বেদই আমাদের সব কিছুর মূল। ইতিহাসের ধারাপথে বহিরাক্রমণে এবং আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ে বেদের বিভিন্ন অংশ বিলুপ্ত। নিত্য যজ্ঞের নিয়মিত অনুশীলন এবং নিরন্তর বেদপাঠ ও চর্চাও ব্যাহত। তবুও বেদের উত্তরাধিকারই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। বেদপ্রণিহিত ধর্মই আমাদের পরম আশ্রয়। কিন্তু, বেদের সামগ্রিক কেন, আংশিক পরিচয়ও অধিকাংশ শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের নেই, নেই ধর্মব্রতীদেরও। বেদ-বিমুখতায় হয়েছে আমাদের মহতী বিনষ্টি। বেদের মধ্যেই ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম সামগ্রিক ভাবে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। অধ্যাত্মভাবনাই রয়েছে তার মর্মমূলে। বৈদিক ঋষিদের অন্তশ্চেতনা এবং হৃদয়ের অনুভূতি যে ভাষায় এবং ভঙ্গীতে, আচারে এবং আচরণে প্রকাশিত হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে কালের ব্যবধানে তা আমরা অনেকটা ভুলে গেছি। সেই জীবনের রহস্য অনেকটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। অথচ আমাদের আত্ম-সমীক্ষার এবং আত্মপরিচয়ের জন্য তার প্রয়োজন অপরিহার্য। তার জন্য চাই শ্রদ্ধা ও সাধনা। জ্ঞানপণ্য বণিকদের দ্বারা বেদের মর্মোদ্ঘাটন সম্ভব নয়। ঊনবিংশ

শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে বিদেশী পণ্ডিতদের অসাধারণ শ্রমে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থরাজির কিছু কিছু মুদ্রণ শুরু হল। তখন বৈদেশিক ভাবদাস নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের চিত্ত এই দিকে আকৃষ্ট হল। রাজা রামমোহন বেদেরই অংশ উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করে তন্ত্রকে অবলম্বন করে নতূন ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন করলেন। পরে জার্মেন মনীষী ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলার সমগ্র ঋগ্‌বেদ ১৮৪৯ হতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৪ বৎসর ধরে অসাধারণ শ্রমে ৬টি খণ্ডে প্রকাশ করলেন। তাতে সায়ণভাষ্যও রয়েছে। প্রতিখণ্ডের শেষে তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"শর্মণ্যদেশজাতেন শ্রীগোতীর্থনিবাসিনা।
মোক্ষমূলর-ভট্টেন ভাষ্যমেতদ্ বিশোধিতম্।।"

সংস্কৃতে শর্মণ্য হল জার্মেণী, শ্রীগোতীর্থ হল অক্‌স্‌ফোর্ড এবং মোক্ষমূলর ভট্ট হলেন স্বয়ং ম্যাক্সমূলর। তিনি তাঁর ভূমিকায় লিখলেন— "......We may now safely call the RigVeda the oldest book, not only of the Aryan Humanity, but of the whole World and may hope that —

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ ঋগ্‌বেদমহিমা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।"

তারপর প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে যেমন বেদচর্চার দ্বার উন্‌মোচিত হল, তেমনি বঙ্গভারতেও এল বেদকে নিয়ে চিন্তাশীলদের মধ্যে ভাবান্দোলন। সত্যব্রত সামশ্রমী, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বটব্যাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীমৎ অনির্বাণ প্রমুখ মনীষি-মণ্ডলী বেদচর্চায় নানাবিধ দিগ্‌দর্শনে প্রবৃত্ত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকশ্রেণীর সাম্মানিক স্তরে ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বেদের অংশবিশেষ পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হল। চতুষ্পাঠীতেও বেদের পাঠ্যসূচি নির্মিত হল। লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করে মঠ-মন্দির নির্মিত হয়েছে, উৎসবের আয়োজন হয়েছে, প্রভূত প্রসাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মূল বেদগ্রন্থ মুদ্রণ, আলোচনা এবং পাঠের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। স্মার্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু বৈদিকযজ্ঞের আয়োজনে অনীহা। বঙ্গীয় কিছু প্রকাশকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বেদমুদ্রণের এবং বেদবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে কুণ্ঠিত। বহু পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেদাধ্যয়নের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যোগ্য অধ্যাপক, উৎসাহী বিদ্যার্থী এবং অর্থের অপ্রতুলতায় হয়ে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভূবনমঙ্গলবিগ্রহ শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব 'বেদ ভগবান্' নামে

মূল বেদগ্রন্থ প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণে উদ্যোগী হন। আর্যশাস্ত্র প্রকাশে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কোনও বঙ্গীয় বেদপাঠী তেমন পাওয়া যেত না দশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। তাঁরই প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় এবং সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের নিঃশুল্ক এবং আবাসিক বৈদিক গুরুকুল হতে এখন নূতন প্রজন্মের তরুণ বঙ্গসন্তান বেদপাঠকদের উদ্‌ভব হল। এই অধম ঐ সংসদের জন্মলগ্ন হতে কার্যকরী সভাপতিরূপে কৈঙ্কর্য করে আজ আপ্তকাম।

কিন্তু বেদবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থের অভাব অনুক্ষণ অনুভব করছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের বেদ-রহস্যের উন্মোচক নিবন্ধাবলী ইংরেজী ভাষায় রচিত। শ্রীমৎ অনির্বাণ এবং স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর দু'চারটি অনবদ্য গ্রন্থ অতুলনীয়। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ড. যোগীরাজ বসুর বেদবিষয়ক গ্রন্থ ক্ষুদ্রাকার। কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় বিত্তবান হিন্দু-প্রকাশক ও ধর্মনেতাদের লজ্জা দিয়ে জনৈক মুসলমান বিদ্যারসিক প্রয়াত আবদুল আজিজ আল আমান মূল বেদ গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। বহুপূর্বে বঙ্গাক্ষরে অর্থ ও আলোচনা সহ প্রকাশিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর বেদগ্রন্থ আমাদের অবহেলায় হারিয়ে গেছে।

এই সব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বেদ নিয়ে কোনও আলোচনা গ্রন্থ এই পর্যন্ত বঙ্গে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বয়সে শতবর্ষের প্রান্তে উপনীত মনীষী ভাগবত-গঙ্গোত্রী পূজ্যপাদ ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীদেব জাতির গ্লানি অপসারণে প্রবৃত্ত হলেন। 'বেদ-বিচিন্তন' নামে বিশাল তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ তিনি জাতিকে উপহার দিলেন। পূর্ববর্তী সকল বেদ-চিন্তকদের আলোচনার পরিপূরক এই অনবদ্য গ্রন্থ। বেদবিষয়ক যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি দিয়েছেন। সূচীপত্র দেখে বিস্মিত হতে হয়, গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হতে হয়। বেদের আলোচনায় স্বর-ছন্দ-নিরুক্তি প্রভৃতি অতি জটিল বিষয়েও তিনি সর্বজনবোধ্যরূপে আলোচনা করেছেন, যা করতে গিয়ে অনেকে দিশেহারা হয়ে যান। বেদের ভাষা, তত্ত্ব, দেবতা, দর্শন, রস, রহস্য, অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। বেদের উপর সামগ্রিক আলোচনা সহ এমন সুখপাঠ্য গ্রন্থ শুধু বাংলাভাষায় নয়, অন্য ভাষাতেও দেখিনি। অতি জটিল বিষয়কে অতি সরল, সহজগ্রাহ্য, সর্বজনবোধ্য এবং মধুর করে পরিবেশনের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ড. ব্রহ্মচারীর রচনার বৈশিষ্ট্য। সর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টিতে এই বৈষ্ণব-বৈদান্তিক গীতা চণ্ডীর মর্মকথা যে রকম আকর্ষণীয় করে লিখেছেন, তা অতুলনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীচৈতন্যদেবের এবং প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা-ভাষ্যকার

রূপে তিনি অদ্বিতীয়। আধুনিক জীবনের সমস্যার নিরসনে তাঁর পথনির্দেশক গ্রন্থরাজি অতীব হৃদয়গ্রাহী এবং সমুচিত। অতীতে মহর্ষি ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করেছিলেন। বর্তমানে ব্রহ্মচারীজী বেদের এবং ব্রহ্মসূত্রের মনোজ্ঞ অভিনব ভাষ্য রচনা করেছেন। বর্তমানগ্রন্থে তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি প্রতীচ্য পণ্ডিতবর্গের গবেষণার রীতি এবং প্রাচ্য সাধকদের মনীষার ধারাকে সমন্বিত করেছে। নবযুগের বেদব্যাসরূপে তাঁকে বন্দনা করি। এই গ্রন্থ আচার্য T.P.Mahadevan এর বেদমূল্যায়নকে সার্থক করে তুলেছে —

"Whatever be the value attached to the vedic literature by modern scholars, whatever be the stage of civilization represented by the Vedas as judged by modern sciences and modern standards, no one can deny the fact that the Vedas satisfied the needs of the intellect, of the imagination, and of the emotion of a great nation for a long period, extending over at least three thousand years, and the records of the nation in the fields of intellect and imagination are not below the achivements of any other nation that has appeared on the face of the earth till now."

[The cultural Heritage of India vol-I. p. 220]

মরমী বেদজ্ঞ শ্রীমৎ অনির্বাণ বেদচর্চার শৈলী এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা ড. ব্রহ্মচারীজীর "বেদ-বিচিন্তনে" মূর্ত হয়ে উঠেছে। .....

সামগ্রিক বেদের পরিচয়বহ এই গ্রন্থ বেদবিদ্যার্থীদের যেমন অবশ্যপাঠ্য তেমনই বেদানুসন্ধিৎসু সর্বজনেরও অধ্যেতব্য। যাঁরা নিজের জীবনের শিকড়ের সন্ধান চান, তাঁদেরও এইটি মহৎ অবলম্বন। জাতি এই মনীষীর কাছে নানা বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়েও ঋণী হয়ে রইল। বলি—

বিচিন্তনং বৈ বেদানাং সর্বেষাং চ সুখাবহম্।
বেদালোক-প্রসারেণ করোতু বিশ্বমঙ্গলম্।।

ইতি

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী
[ভারতের বেদবিদ্যার জাতীয় গবেষণাচার্য]

বেদ-বেদান্ত

পূর্বখণ্ড : ব্রহ্মসূত্র

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

'বেদান্ত' নামটি এই যুগে চালু করিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী যত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মূলে বেদান্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আর কিছুদিন বাঁচিলে নিশ্চয়ই একখানি বেদান্ত-ব্যাখ্যা আমাদের দিয়া যাইতেন। এক শতাব্দী পরে সেই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। 'বেদান্ত-সূত্র' লইয়া বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এক কথায় অতুলনীয়।

বেদান্ত ব্যাখ্যার দুইটি ধারা আছে। একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আর একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। দুইটি সম্প্রদায়ের বক্তব্য পাশাপাশি রাখিয়া এইরূপ তুলনামূলক গ্রন্থ আমরা আর পাই নাই। ভাষা সহজ সরল প্রাঞ্জল। দার্শনিক পরিভাষার গ্রন্থে যতটুকু কাঠিন্য পরিহার করা যায় না তাহাই আছে। ঐ কঠিনতা গ্রন্থকে উপভোগ্য করায়। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও দর্শন রসে কিঞ্চিন্মাত্র লোলুপ সাধারণ নবনারী — গ্রন্থখানি সকলেরই উপাদেয়। মাধুকরী — আশি টাকা।

"এই গ্রন্থ লিখেছেন বৈষ্ণব সমাজের চূড়ামণি ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত পূজ্যপাদ স্বনামধন্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাঁর এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা যায়, এই সব গ্রন্থ মনুষ্যে লিখিতে নারে এইসব ধন্য ধন্য।"

— পণ্ডিত দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ দামোদর আশ্রম, আদ্যাপীঠ।

"আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা বিরল দৃষ্টান্ত। জিজ্ঞাসু মনের তৃপ্তি সাধনে আপনার সারস্বত সাধনার রসপ্রবাহ পর্যাপ্ত হইবে মনে করি। সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারীর পক্ষেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করা সম্ভব — যাহা বর্তমান সময়ে দুর্লভ। সারাৎসার তত্ত্বপ্রসাদ লাভে প্রসন্ন মানসে বিজিজ্ঞাসু জনের উপকার হউক ইহাই প্রার্থনা।"

— পণ্ডিত দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ হৃষীকেষ আশ্রম, তারকেশ্বর।

"আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, এই ঘোর অন্ধকারময় কলিযুগের দুর্দিনেও এমন একজন আচার্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীরূপে। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দরের কৃপায় আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। ব্রহ্মচারীজির ব্যাখ্যার এখানেই চমৎকারিত্ব যে তিনি সূত্রের মূল তাৎপর্যটি এমন সহজ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মনে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি এক একটি সূত্রের অর্থ প্রাচীন আচার্যরা যিনি যেভাবে করিয়াছেন, তাহার যথাযথ উল্লেখও করিয়াছেন। বেদান্তের তিনটি প্রস্থানের উপরই এইরূপ হৃদয়গ্রাহী সর্বজনবোধ্য মনোজ্ঞ আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী যথার্থ আচার্য পদে নিজেকে অভিষিক্ত করিলেন। এখন দেশ হইতে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন প্রায় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই বঙ্গভূমিতে। তাহার উপর দর্শন

শাস্ত্রের অবচ্ছেদকাবছিন্নের জটিল পরিভাষায় কণ্টকাকীর্ণ গহন অরণ্যে প্রবেশ সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষেও কঠিন। সেখানে সকলের অবাধ সঞ্চরণের রাজপথ রচনা করিয়া দিয়া গেলেন এই আচার্য। বঙ্গীয় সাহিত্যে তাঁহার এই অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নবতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াও অক্লান্ত এই জ্ঞানতপস্বীর উদ্‌ভাস্বর লেখনী আমাদের 'অমৃতেন হি প্রত্যুঢ়া' ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত আমাদের সেই আলোক লোকে উত্তীর্ণ করুক এই প্রার্থনা।

— ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

"ব্রহ্মবিদ্‌বরেণ শ্রীমন্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয়েন বিরচিতং 'বেদ-বেদান্ত'-নামধেয়ং গ্রন্থং ময়া দৃষ্টম্‌। গ্রন্থেঽস্মিন্‌ তত্ত্বনির্ণয়ে অবশ্যজ্ঞাতব্যা বিষয়াঃ প্রশ্নাদ্যকারেণ তথা সন্নিবেশিতাঃ যেন তত্ত্বজিজ্ঞাসূনাং জ্ঞাতব্যমনন্যন্নাবশিষ্টমস্তীতি মে প্রতীতিঃ। অস্মিন্‌ সঙ্কটময়ে কালেঽস্য গ্রন্থস্য সরলীকৃত-ব্যাখ্যা মোক্ষেচ্ছুনাং পরমসহায়কং ভবতি। অস্য পরিশীলনেন সম্পূর্ণং দ্বৈতাদ্বৈত-শাস্ত্র-পরিজ্ঞানং বিনৈবাকর-গ্রন্থাধ্যয়নং স্ফুটং ভবিষ্যতীতি বিদ্যার্থিনাং ঝটিতি ব্রহ্মবিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুমিচ্ছতাঞ্চাপরেষামশেষকৃতয়ে কৃতিরিয়ং ভবিতেতি প্রচার-বাহুল্যমস্য কাময়ে।"

— পণ্ডিত শ্রীমুরারীমোহন বেদান্তাদিতীর্থ, হাওড়া পণ্ডিত সমাজ।

"নবতিবর্ষ অতিক্রমের পরও তাঁর মননশীলতায় জরা তো আসেই নি, বরঞ্চ নিত্য নব নব সৃজনে শাস্ত্র ব্যাখ্যানে আরো যেন মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পূজ্যপাদ ভাগবত গঙ্গোত্তরী ড. মহানামব্রত বহ্মচারীজিকে দেখছি অতিদুরূহ গ্রন্থেরও অতি মনোগ্রাহী ভাষ্য রচনায় গভীর গবেষণায় তথ্যসমৃদ্ধ তত্ত্বের মধুর পরিবেশনে সানন্দে অভিনিবেশ। বার্ধক্যে অন্যদের দৃষ্টিশক্তি যখন বন্ধ্যা হয়ে যায় তখনও দেখছি এই ভাগবত পুরুষের নিত্য নব সৃজনী প্রতিভার নব নব উন্মেষ। এক কালে বঙ্গ-ভারতে ভাগবতী কথার অক্লান্ত পরিবেশনে ব্যাসাসনে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শুকদেব।

বঙ্গসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁর শব্দচয়ন, রচনাশৈলী, প্রকাশ-ভঙ্গী একান্ত তাঁরই। বাংলাভাষায় ধর্মসাহিত্যে তিনি চক্রবর্তী-সম্রাট্‌। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য লীলার পরিবেশনে মর্মানুসন্ধানে, শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা ও চণ্ডীর ব্যাখ্যায় তাঁর চিত্তচমৎকারী রচনা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ্‌। কিন্তু এখন তিনি বেদের উত্তুঙ্গ হিমশৈল এবং বেদান্তের গহন অরণ্যানী গভীর নিশায় এবং অনলস সাধনায় পরিব্রজন করে যে তত্ত্বসম্পদ্‌ বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে জনগণকে উপহার দিয়েছেন, তা অনবদ্য। প্রজ্ঞার সঙ্গে মাধুর্যের, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের বিরাট্‌ সমাহার এতে দেখে বিস্মিত। যে তত্ত্বজ্ঞান তিনি লাভ করেছেন কঠোর সাধনায়, তা অকাতরে তিনি দিয়ে গেলেন জাতির বোধির মুক্তির জন্য।

দুরূহ গ্রন্থের 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' এই বঙ্গভাষা বিধৃত ভাষ্য পাঠ করে বঙ্গবাসী ধন্য হোক্‌। সবাই মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়— 'আনন্দে করুন পান সুধা নিরবধি।"

— ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।

"গ্রন্থের লেখক ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তিনি যথার্থ ভাগবত-গঙ্গোত্রী। বিশ্ববন্দিত

ভক্তপূজিত বৈষ্ণবাচার্য। সকল শাস্ত্র ও সাধনা, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। সকল প্রস্থানে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। তিনি জ্ঞানে গম্ভীর, আবার কারুণ্যে করুণ। মমতায় মিত্র তিনি পরম বন্ধু। দৃষ্টিতে কবি, সৃষ্টিতে মৌনী। তিনি এই যুগে যথার্থ 'শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ'।

ব্রহ্মসূত্রের ভিতরে ভারতীয় সকল দর্শন ও মার্গের যত পূর্বপক্ষ, উত্থিত যত প্রশ্ন ও সংশয়, সেইসব তিনি এক নিরপেক্ষ তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সূত্রের মধ্যেই নিহিত যত মতের সংশয় তর্কজাল, তিনি তাঁর শাণিত যুক্তির ধারে বোধির দীপ্তিতে সকল সংশয় গ্রন্থি ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যাস-সূত্রের মর্মার্থ। আর এসবই তিনি করেছেন ভাগবতের লীলারসের অন্তর্যামিত্ব দিয়ে। সেই সঙ্গে এক একটি সূত্রেব অর্থপুষ্টির জন্য স্ব-ইচ্ছায় তুলে নিয়েছেন বিভিন্ন উপনিষদ্, শ্রুতিব মন্ত্র ও তাৎপর্য। মহানামব্রতজীর আলোচনায় শুষ্ক দার্শনিক কচকচি নেই; এখানে সমস্তটাই হয়ে উঠেছে এক মননমধুর রস • ণুর ভাব-অবগাহন।

এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য এই, ভক্ত জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীব তো কথাই নেই, আমাদের মত সাধারণ পাঠকেবও এমন হয়, যখন মন বলে কিছু বুঝি নাই, কিন্তু তখন অন্তর বলে, সব পেয়েছি। গ্রন্থখানি আমাদের সেই সকল পাওয়াব পিতৃধন।

নানা সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য অনেক আছে, কিন্তু সকল মত ও পথের চিন্তাধারাকে একত্রে এক সার্বিক আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে এমন নিবপেক্ষ পর্যালোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি। ব্রহ্মচারীজী তাঁব বর্তমান দ্বিনবতিতম বযসেও এমন অসামান্য গ্রন্থ বচনা করে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনের ক্ষেত্রে বঙ্গভাষায় এক শাশ্বত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন কবলেন, এই গ্রন্থের মন্ত্রাত্মক ভাবমাহাত্ম্য আমাদের চিত্তে চিরকাল ভাগবতী দিব্যালোক ধারণ কবে থাকবে— 'তস্তম্ভ দ্যাম্ মন্ত্রেভিঃ সত্যৈ'। বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে এ এক নিঃশব্দ সূর্যোদয়।"

— শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য।

"বেদান্ত বোঝা এবং বেদান্তের ব্যাখ্যা করা কোন কালেও সহজ ছিল না। তাঁরাই বেদান্ত বুঝেছেন, বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, যাঁদের জ্ঞান এবং অনুভব সমান ভাবে গভীর, বেদান্তের প্রতি, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা অবিচল। আপনি বঙ্গীয় বৈষ্ণব এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতদের মধ্যে অতি বিশিষ্ট বিদ্বান্ এবং ভক্ত যিনি প্রগাঢ় জ্ঞান এবং অনুভব দ্বারা বেদান্তের পরিশীলন করে চলেছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু কথিত এমন এক অনুপম ধর্ম সাধনার সঙ্গে আপনার সংযোগ, যাতে বেদান্ততত্ত্বের সঙ্গে এই বিশ্ব, এই বিশ্বের সংখ্যাতীত প্রাণী, এই মানুষ এবং মানুষের প্রবাহ বিজড়িত হয়ে থাকে। তার জন্যই আপনার অসামান্য বেদান্ত-ভাষ্যে এক অনির্দেশ্য, কিন্তু অনুভববেদ্য মহাজীবনের স্পন্দন আমার মতো জড়বাদীকেও টেনে ধরে রাখে। আপনার এই গ্রন্থ নূতন ভাবনার আকর গ্রন্থ।

সুপরিণত বার্ধ্যক্যে এইরূপ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য তাঁরাই রচনা করেন, যাঁদের মহাজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এক গভীর অর্থ বহন করে। শুনেছি, Those whom God loves die young, কিন্তু একথাও বলা যায়, Those whom God Loves never die। আপনি চিরায়ুষ্মান্ হোন। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।"

— অধ্যাপক শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

"আপনার বেদ- বেদান্ত যে কি অপূর্ব হয়েছে! আপনার বই পড়ে আমার বেদান্ত পাঠের আচার্যগণ যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগীন পণ্ডিতমশাই-এর কাছে 'পঞ্চপদিকা বিবরণ' পড়েছিলাম। দক্ষিণী পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত শাস্ত্রীর কাছে ব্রহ্মসূত্র 'ভামতী' টীকা সহ, আর শ্রীঅশোক শাস্ত্রীর কাছে উপনিষদ্‌গুলি, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী পড়াতেন, 'শ্রীভাষ্য'। বহুদিন আলোচনা হয়নি বলে যেন অনধীত হয়ে গিয়েছিল। আপনার বই পড়ে যেন স্বপ্নের ছবি বাস্তব হয়ে যাচ্ছে আবার। এ গ্রন্থ তো একা পড়ে সুখ হয় না। ...... এই বয়সে এই দুরূহ তত্ত্বগ্রন্থ কি করে যে এমন করে লিখলেন আমি কিছুতেই ভাবনায় আনতে পারি না।"

— ড. বাসন্তী চৌধুরী।

"প্রাচ্যও পাশ্চাত্য খ্যাতনামা পূজনীয় ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির পরিচয় প্রদান দীপালোকে সূর্যপ্রদর্শন সদৃশ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার তিনটি সমাখ্যা আমরা পাইয়াছি — 'ভাগবত গঙ্গোত্তরী', 'পরাবিদ্যাচার্য্য' ও 'বেদার্থ-বিদ্‌গণের প্রথম সারিতে স্থিত'। বর্তমানে এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানস্বরূপ এই 'বেদ-বেদান্ত' গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আর একটি নামে তাঁহাকে ডাকিতে সাধ হয় 'ব্রহ্মসূত্র- প্রসূনমধুপ'।" — ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ।

"সাধনে ভজনে রচনে বচনে ভারত মনীষার এক অপূর্ব আলোকস্তম্ভ শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী। এই আলোকস্তম্ভ হইতে সম্প্রতি যে আলোকোচ্ছ্বাস ঘটিয়াছে তাহার নাম 'বেদ-বেদান্ত : পূর্বখণ্ড'। উপোদ্‌ঘাত এবং আভাষ অত্যন্ত শিক্ষাবহ। অজ্ঞান-ধ্বান্ত মার্তণ্ডের ন্যায় এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা পুলকিত, চমৎকৃত ও কৃতকৃতার্থ। অগণিত ভাষ্যকার ও অনুভাষ্যকারদের তিনি সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ও বৈষ্ণব গোষ্ঠী প্রধানতঃ এই দুইটি গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়া স্বল্পেতে বহু কথনের প্রশংসনীয় প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। Brevity is the soul of wisdom — ইহা দেখাইয়াছেন।

আজ সংস্কৃত ও শাস্ত্রচর্চা উপেক্ষিতা ও নির্বাসিতা। তথাপি বিভিন্ন মঠে মন্দিরে আশ্রমে ও সাধকের গৃহে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চা কিছু কিছু করেন তাঁহাদের সকলেরই এই গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা ইহা একবার পাঠ করিবেন তাঁহারা গ্রন্থটিকে নিত্যপাঠ্য করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বেদান্তপাঠ করিলে যে শুষ্ক বৈদান্তিক হয় — এই ভয় অবশ্যই দূর করিবে এই অমূল্য গ্রন্থটি।"

— ভারতাজির।

"বেদান্ত দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের অভাব নেই। দার্শনিক গ্রন্থ মাত্রই বোঝা কঠিন, বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রের বিষয় এত গভীর ও সূক্ষ্ম যে, প্রচলিত অধিকাংশ গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা সহজবোধ্য নয়। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সহজ সরল ভাষায় গ্রন্থকার সূত্রগুলির অর্থ এমন ভাবে তুলে ধরেছেন, প্রসঙ্গত বিভিন্ন শাস্ত্রের উপাখ্যান দিয়ে বোঝানোর ফলে ব্রহ্মসূত্রের মূল বক্তব্য বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

ভক্তিমধু সহযোগে ব্রহ্ম-সূত্র সেবনের যে নির্যাস গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় তা দুর্লভ। গ্রন্থকারকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।"

— 'শ্রীসুদর্শন'।